# পরিচয়

৭০ বর্ষ



পরশুরামের পৌরাণিক গল্পগুচ্ছ
: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ও নেপাল মজুমদার
: প্রণব চট্টোপাধ্যায়

নরক প্রকাশ্য হোক
(লালবাজার টর্চার সেলে সাতাশ দিন)
লতিকা গুহ

এছাড়া
গল্প / কবিতা / পুস্তক আলোচনা

# ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের ব্যবস্থা হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

আই. সি. এ. ২৭৩১

বিদ্যাসাগর সেতু, শরৎ সদন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়াম ও ডুমুরজলা স্টেডিয়াম— হাওড়ার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শুধু পৌর সুখ সুবিধা নয়— পুরবাসীর সার্বিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।

সুবিনয় ঘোষ
মেয়র
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

# সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।

কমছে নিরক্ষরতা
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।

কেবল উৎসাহদান নয়
আসুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে।

শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ২৭৩১

নেপাল মজুমদার

সুনীল সেনগুপ্ত

অমিয়ভূষণ মজুমদার

মার্চ—২০০১

# পরিচয়

## ১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারার অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

৬। পরিচয় সমিতির সদস্যদের দাম ও ঠিকানা ঃ—

১। গোপাল হালদার (মৃত), ফ্ল্যাট-১৯ ব্লক-এইচ, সি. আই. টি বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাত-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু (মৃত), ৭৩-এল মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল (মৃত), ১২৪ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত), ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৮। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩ ফার্ণ রোড, কলকাতা-১৯। ৯। শীতাংশু মৈত্র (মৃত), ১/১/১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১০। বিনয় ঘোষ (মৃত), ৪৭/৩, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১১। সত্যজিৎ রায় (মৃত), ফ্ল্যাট-৮, ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১২। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৩। হরিদাস নন্দী, ১৮/১/১১ গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা-৩৩। ১৪। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৫। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা' ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৬। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত), পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৭। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯/১ কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৮। নিবেদিতা দাশ (মৃত), ৩সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মৃত), ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০। ২১। শান্তা বসু, ১৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ২২। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২ ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৩। ধীরেন্দ্র রায় (মৃত), ১০৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৪। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। ২৫। দ্বিজেন্দ্র নন্দী (মৃত), ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী। ২৬। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৭। সুনীল সেন (মৃত), ২৪ রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৮। দিলীপ বসু (মৃত)

, ২০০ এল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ২৯। সুনীল মুন্সী, ১/৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩০। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২ পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩১। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩২। শিপ্রা সরকার, ২৩৯/এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৩। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৪। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত), ১৯ ড্র শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৫। রনজিৎ মুখার্জি, পি-২৬ গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৬। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, লেক গার্ডেনস, কলকাতা। ৩৭। অমল দাশগুপ্ত (মৃত), ৮৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৮। প্রদ্যোৎ গুহ (মৃত), ১/এ মহীশূর রোড, কলকাতা-৭। ৪০। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪১। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত), ৬১২/১ ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪২। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৪৩। নির্মাল্য বাগচী (মৃত), ফ্ল্যাট-বি সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা। ৪৪। তরুণ সান্যাল, ৩১/২ হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৫। বিদ্যা মুন্সী, ১/৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৪৬। বেদুইন চক্রবর্তী (মৃত), ফ্ল্যাট-২, ১৬ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ৪৭। অমিয় দাশগুপ্ত (মৃত), ২ যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৮। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮ বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

আমি পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু
৩১-৩-২০০১

# পরিচয়

ফেব্রুয়ারি-জুলাই ২০০১
মাঘ ১৪০৭-আষাঢ় ১৪০৮
৭-১২ সংখ্যা, ৭০ বর্ষ

প্রবন্ধ

# পরশুরামের পৌরাণিক গল্পগুচ্ছ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও নানা পুরাকাহিনীর চরিত্রদের নিয়ে একের পর এক গল্প লিখেছেন পরশুরাম। তাঁর লেখার ঝোঁক শেষের দিকে অনেক পালটেছে, কমে এসেছে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ। কিন্তু দেবদেবী, মুনিঋষি, স্বর্গের অপ্সরা—এদের নিয়ে রঙ্গ করার শখ তাঁর কখনোই মরে নি। ফলে "জাবালি" (১৯২৬) থেকে "কর্দম মেখলা" (১৯৫৮) পর্যন্ত মোট কুড়িটি গল্পে পৌরাণিক চরিত্রদের নিয়ে বিস্তর মশ্‌করা করা হয়।

প্রথমে গল্পগুলির একটি তালিকা দেওয়া যাক :

| | |
|---|---|
| ১. জাবালি | (১৩৩৩ ব.) |
| ২. পুনর্মিলন | (১৩৩৬ ) |
| ৩. হনুমানের স্বপ্ন | (১৩৩৭ ) |
| ৪. প্রেমচক্র | (১৩৩৯ ) |
| ৫. দশকরণের বানপ্রস্থ | (১৩৪৯ ) |
| ৬. তৃতীয়দ্যূতসভা | (১৩৫০ ) |
| ৭. রামরাজ্য | (১৩৫৬ ) |
| ৮. তিন বিধাতা | (১৩৫৭ ) |
| ৯. ভীমগীতা | (১৩৫৭ ) |
| ১০. চিরঞ্জীব | (১৩৫৭ ) |
| ১১. ভরতের ঝুমঝুমি | (১৩৫৮ ) |
| ১২. রেবতীর পতিলাভ | (১৩৫৮ ) |
| ১৩. গন্ধমাদন বৈঠক | (১৩৫৯ ) |
| ১৪. পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী | (১৩৬০ ) |
| ১৫. বালখিল্যগণের উৎপত্তি | (১৩৬০ ) |
| ১৬. স্মৃতিকথা | (১৩৬২ ) |
| ১৭. নির্মোক নৃত্য | (১৮৭৮ শক) |
| ১৮. অদলবদল | (১৮৭৯ ) |
| ১৯. যযাতির জরা | (১৮৭৯ ) |
| ২০. কর্দম মেখলা | (১৮৮০ ) |

সব ক'টি গল্পই যে আগাগোড়া পৌরাণিক পটভূমিতে লেখা—এমন নয়। "প্রেমচক্র"-এ

ফ্রেম গল্পটি সমকালের; তিন ঋষিকুমার ও তিন ঋষিকন্যার 'হোপলেস হেক্‌সাগোনাল' প্রেমের কাহিনীটি এসেছে 'গল্পের ভেতরে গল্প' হয়ে (শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' (আ মিডসামার নাইটস্‌ ড্রিম)-এ চতুষ্কোণ প্রেম অবধি এগিয়েছিলেন)। "ভূশণ্ডীর মাঠে"-ও এই রকম তিনজোড়া প্রেমের কাহিনী। প্রচলিত ত্রিকোণ-প্রেমকাহিনীর চেয়ে এগুলি আরও সরেস। "ভরতের ঝুমঝুমি"-তে দুর্বাসা আসেন দেশভাগের (১৯৪৭) পর ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পটভূমিতে : এখানে মজার সঙ্গে মিশে থাকে সমকালীন রাজনীতির হালচাল। "দশকরণের বানপ্রস্থ"-ও কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা-মূলক গল্প (এটিকে ঠিক হাসির গল্প বলা যায় না)।[৮] "রামরাজ্য", "তিন বিধাতা" আর "গন্ধমাদন বৈঠক"-এর মূল প্রসঙ্গ দেশের তথা দুনিয়ার দুরবস্থা, দুর্নীতি, অপরাধ, অনাচার, যুদ্ধ ইত্যাদি। এগুলো বন্ধ করার উপায় খোঁজা হচ্ছে কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। গল্প তাই শেষ হয় কানাগলিতেই। "ভীমগীতা"-ও বেশ থিসিস-মার্কা গল্প। এতে মজা থাকলেও, রাজনীতিক দর্শনের বিষয়টিই মুখ্য। সব মিলিয়ে পৌরাণিক গল্পের মধ্যেও বৈচিত্র্য অনেক।

'রামায়ণ'-এর খেই ধরে গল্প এসেছে দুটি ("জাবালি" ও "হনুমানের স্বপ্ন"), 'মহাভারত' থেকে চারটি ("পুনর্মিলন", "তৃতীয়দ্যূতসভা", "ভীমগীতা" ও "পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী")। এর সঙ্গে "যযাতির জরা"-কে ধরলে হবে পাঁচটি। 'মহাভারত'-এর আদিপর্বে এই উপাখ্যানটি আছে; রাজশেখর বসু-র সারানুবাদে অধ্যায়টির নাম একই : "যযাতির জরা"।[৯] "কর্দমমেখলা" আর "ভরতের ঝুমঝুমি"-তে বালিকা ও যুবতী শকুন্তলাকে দেখা যায়। কিন্তু যযাতির মতোই, শকুন্তলাও 'মহাভারত'-এর কেন্দ্রীয় কাহিনীর চরিত্র নন। কৃষ্ণ হাজির হয়েছেন চারটি গল্পে— একমাত্র এই চরিত্রটিকেই পরশুরাম খানিকটা ইতিবাচকভাবে হাজির করেন। এছাড়া দুই মহাকাব্যের যাবতীয় চরিত্র (মুনিঋষি সমেত—একমাত্র জাবালি বাদে)-কেই কমবেশি হাসি-ঠাট্টার খোরাক করা হয়েছে।

কোনো ধর্মেই পরশুরাম বিশ্বাস করতেন না, তাই কোনো ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। 'মহাভারত'-এর জগৎ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি মনে রাখার মতো :

> মহাভারতকথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃষ্ট লোকে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা চলে, ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় পড়ে নাকাল হন; তাঁদের তুলনায় বাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়ু শিশুমাত্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সবচেয়ে বড় কাজ। বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, যে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্রীপুরুষ অসংকোচে তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরুড় গজকচ্ছপ খান, এমন সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসীতেও জরায়ুর কাজ হয়।[১০]

আগেই বলা হয়েছে, একমাত্র জাবালিকেই রেয়াত করেছেন পরশুরাম। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র এখানে যে কোনো সাধারণ মানুষেরই মতো, তাঁর দেবত্ব একেবারেই প্রকট নয়। পরশুরাম লেখেন :

> দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী, কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে।

অপ্সরাদের নিয়ে পরশুরামের রসিকতা শুরু হয় এই গল্প থেকে। জাবালি নাকি তপস্যা করছেন, 'তাহার অভিসন্ধি কি তাহা এখনও সম্যক অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবত তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিংবা ওইরূপ কোনও পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না।' ঋষিদের তপস্যা ভাঙার একটিই অব্যর্থ উপায় আছে : অপ্সরা পাঠিয়ে মন ভোলানো। প্রথমেই তাই ইন্দ্র হুকুম করেন, "উর্বশীকে ডাক।"

উর্বশীকে পাওয়া যায় না, তাই শেষ পর্যন্ত ঘৃতাচী বলে এক অপ্সরাকে পাঠানো হয়। কিন্তু জাবালির স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে তিনি চূড়ান্ত বেইজ্জত হয়ে ফিরে আসেন। কুচক্রী নারদ তখন নৈমিষারণ্যের ঋষিদের খুঁচিয়ে জাবালিকে মারার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুর পরে নরকে তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়। অল্পক্ষণ নরকবাসের পর তিনি প্রাণ ফিরে পান। ব্রহ্মা তাঁকে বর দিয়ে বলেন (যদিও তিনি কোনো বর চান নি) : 'লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।'[১]

জাবালিকেই পরশুরাম বেছে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশের মুখপত্র হিসেবে। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্মীয় আচার—জাবালি কিছুই মানেন না। তর্ক করা তাঁর স্বভাব, তাই লোকেও তাঁর ওপর চটা (তর্কে হেরে যায় বলে)। জাবালি অনেক উচ্চ বিষয়ে চিন্তা করেন। যেমন, 'এই অন্নজলাবলম্বী মানব শরীরে পঞ্চভূতের কিংবিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয় তাহা স্থায়ী কিনা।' অবশ্য 'এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা' আর হয় না।

নিজের মত প্রসঙ্গে জাবালি বলেন : 'আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনও প্রকারে কাজ চালাইলা লই। আমার স্বর্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।'[২]

নারদ যেমন কুচক্রী, অন্য ঋষিরাও তেমনি প্রতিহিংসু। জাবালির সঙ্গে কথায় না পেরে 'ধর্মপ্রাণ' বিপ্রগণ খেপে ওঠেন। জামদগ্ন্য মুনি তো কুঠার দিয়ে তখনই 'নাস্তিককে সাবাড়'

করতে চান। 'স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি'র কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান প্রবল। তিনি বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত! ছি ছি, মনু কি মনে করিবেন।'[৬] কিন্তু তাই বলে তো আর জাবালিকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না। তাই তাঁর পরামর্শ : 'বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।' জাবালি নামক সাপ তাহলে মরে, আবার ধর্মের লাঠিও ভাঙে না।

ঋষিদের নিয়ে রসিকতা শুরু হয়েছিল 'খর্ববপু বিরল-শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর'-ওয়ালা বালখিল্য ঋষিদের দিয়ে।[৭] স্ত্রীর অনুরোধে জাবালি 'তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণ বেষ্টনীর (অর্থাৎ, উঠোনের বেড়ার) পরপারে ঝুপ ঝুপ করিয়া নিক্ষেপ' করেছিলেন। কিন্তু এখানেই ব্যাপারটা চোকে নি। নরকে, খোদ কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে, কয়েকজন যমদূতের সঙ্গে খর্বট, খল্লাট, খালিত এই তিন বালখিল্যকে 'বিষণ্ণ বদনে' ঢুকতে দেখা যায়। মজা পেয়ে জাবালি জানতে চান, 'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?' উত্তরে খর্বট বলেন, 'জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

মিথ্যেটা কিন্তু সেই মুহূর্তেই ধরা পড়ে যায়। 'যমরাজের ইঙ্গিতে কিংকরগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রাকার কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন।[৮] কুম্ভ হইতে চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল।' অবশ্য শুধু যে এই তিন বালখিল্যই যমকে অভিশাপ দেন—এমন নয়। 'রুদ্রাক্ষর মালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড একটি কুম্ভ' দেখিয়ে যম জাবালিকে বলেছিলেন : ভার্গব (অর্থাৎ জামদগ্ন্য পরশুরাম), দুর্বাসা, কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ তার মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছেন (এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জাবালির খুনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন)। কৌতূহলী হয়ে জাবালি বললেন, কুম্ভের ভেতরে কী হচ্ছে সেটি তিনি দেখতে চান। যমের আজ্ঞা পেয়ে একজন চাকর এক বিরাট কাঠের হাতা দিয়ে খুব সাবধানে কয়েকজন ঋষিকে তার ভেতর থেকে তুলে আনলেন। 'সিক্তজটাজুট ধূমায়িত কলেবর' ঋষিরা পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন, 'রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—'।

এইভাবে রাগী ঋষিদের নিয়ে পরশুরাম এমন বিদ্রূপ করে চলেন তাঁর লেখকজীবনের শেষ পর্যন্ত। ঋষি, তপস্যা ইত্যাদি তাঁর কাছে ঠাট্টার বিষয়। "প্রেমচক্র"-র ভুশুণ্ডি মুনি, "হনুমানের স্বপ্ন"-র মহর্ষি লোমশ, "পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী"-র জ্বলজ্জট (অপ্সরা পঞ্চচূড়া যাঁর কাছে মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা শুনতে আসেন)—এঁদের সকলকেই একই কালাপাহাড়ী তুলিতে আঁকা হয়েছে। দুর্বাসা ("ভরতের ঝুমঝুমি") আর বিশ্বামিত্র ("কর্দম মেখলা") তো রীতিমতো করুণার পাত্র।

যে-সব গল্পে অন্য ঋষি ও অমরদের দেখা যায় ("গন্ধমাদন বৈঠক"), সেখানেও তাঁরা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই অসহায়। সকলেই বোঝেন পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে আটকানোর কোনো উপায় কারুরই জানা নেই। এর মধ্যে আবার নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বেধে যায়, একে অন্যকে দুষতে থাকেন আর হনুমানের মতো অমর প্রাণী বাঁদুরে স্বভাব অনুযায়ী বেশ নির্বোধ প্রস্তাবও দেন।[৯]

সাক্ষাৎ বিধাতাও অবশ্য পরশুরামের গল্পে একই রকম অসহায়। নিধিরাম যখন তাঁকে একজন জবরদস্ত অবতারের ফরমাশ করেন, তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি কি মনে কর সিভিলিয়ানদের মতন একদল অবতার আমি পুষে রেখেছি আর তোমাদের দরকার হলেই পাঠাব।' অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া মানুষের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। "গা-মানুষ জাতির কথা"-র শেষে পরশুরাম যা বলেছিলেন, বিধাতাপুরুষও তার বেশি কিছু বলতে পারেন না : "ওহে নিধিরাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেয়োখেয়ি মারামারি করে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর কালক্রমে সুবুদ্ধি সৎ পুরুষের আবির্ভাব হবে।" ("নিধিরামের নির্বন্ধ")

পৌরাণিক চরিত্রদের মধ্যে ভীমকে দিকে পরশুরাম কিঞ্চিৎ জ্ঞানের কথা বলিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম সন্ধেয় ভীম এসে কৃষ্ণকে বললেন : ছয় রিপুর মধ্যে 'মোহ মদ মাৎসর্য—এই তিনটে প্রবল হলে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। একেবারে লোপ পেলেও বোধ হয় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রথম তিনটি [অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ] না থাকলে বংশরক্ষা হয় না, আত্মরক্ষা হয় না, ধনাগম হয় না।'

বোধহয় খানিক উস্‌কে দেওয়ার মতলবেই কৃষ্ণ বললেন, 'সাধু সাধু! ভীমসেন, আপনি অনেক চিন্তা করেছেন দেখছি।'

'ভীম খুশী হয়ে বললেন, ওহে জনার্দন, তুমি হয়তো মনে কর যে মধ্যম পাণ্ডব শুধুই একজন গোঁয়ার গোবিন্দ দুর্ধর্ষ বীর, যুদ্ধ আর ভোজন ছাড়া কিছুই জানে না। তা নয়, আমি দর্শনশাস্ত্রেরও একটু আবটু চর্চা করেছি। যদি চাও তো কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা শোনাতে পারি।'

কৃষ্ণের মতো আমরাও ভাবতুম : ভীম নেহাতই মাথামোটা পেটুক। 'মহাভারত'-এ অবশ্য দেখা যায়—রাজশেখর বসুই লক্ষ্য করেছিলেন—ভীম চমৎকার কুযুক্তি দিতে পারেন। বনবাসে তেরো মাস যেতে না যেতে তিনি অধীর হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "কৃষক যেমন অল্প পরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ করেন।...সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পূতিকা [পুঁইশাক], সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বৎসর গণ্য করুন। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন। তাতেই পাপমুক্ত হবেন।"[১০]

এরপর যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে ভীম যা বলেন তার অনেকটাই হয়তো পরশুরামের মনের কথা। অন্যত্র যেমন সিদ্ধিনাথের মতো খানিক খ্যাপা লোককে দিয়ে পরশুরাম তাঁর মনের কথা বলেন, এখানেও তা-ই ঘটেছে। তবে তিনি মাত্রাজ্ঞান হারান না। ভীমের পাশাপাশি কৃষ্ণকে দিয়ে তাঁর বক্তব্য দরকার মতো শোধন-মার্জন করান।

উর্বশী যে মর্ত্যে যেতে চান না—সে কথা প্রথম শোনা গিয়েছিল "জাবালি"-তে। ইন্দ্র যখন হুকুম দেন—উর্বশীকে ডাক, তখন

মাতালি আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—"হে দেবেন্দ্র, উর্বশী আর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—"

ইন্দ্র কহিলেন, "হুঁ, তার ভারি তেজ হইয়াছে।"

নারদ তখন পরামর্শ দেন, 'মর্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাহাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনি সে মর্ত্যলোকে যাইবার জন্য আবদার ধরিবে।'

যেন এরই খেই ধরে আসে "নির্মোক নৃত্য" গল্পটি। তার গোড়াতেই দেখা যায় : উর্বশী আবদার ধরেছেন তিনি মর্ত্যলোকে যাবেন। ইন্দ্র জানতে চান উর্বশীর এমন শখ হলো কেন। উর্বশী নতমস্তকে বললেন, 'দেবরাজ, এখানে আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে। অর্থও প্রচুর পাব' (শেষ অংশটির ইঙ্গিত ভালো নয়—উর্বশী যেন পৃথিবীতে রোজগার করার জন্যেই আসেন)। স্বর্গে তিনি যে আদর পান তাতে তাঁর মন ভরে না : 'মানুষের কাছে ঢের বেশি আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।" অমরাবতীর কোন কবি এমন লিখতে পারে?' (রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী" থেকে চরণদুটি উদ্ধৃত করে পরশুরাম যেন আবার উর্বশীর 'মস্তক ভক্ষণ'-এরই পুনরাবৃত্তি করেন)।

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় : কুতুক, পর্বত আর কর্দম—এই তিন দিব্যমানবকে উর্বশী যদি কাবু করতে পারেন তবেই উর্বশীর অহঙ্কার ন্যায্য বলে প্রমাণ হবে (উর্বশী দাবি করেছিলেন : দেবর্ষি, মহর্ষি সমেত স্বর্গের সব পুরুষকেই তিনি কাবু করেছেন)। গল্পের বাকি অংশে দেখা যায় : পর্বত আর কর্দম 'মহাকাবু' হলে, কুতুক সত্যিই নির্বিকার। স্ট্রিপ-টিজ-এর শেষে উর্বশী যখন সম্পূর্ণ অনাবৃতা হয়ে দাঁড়ালেন তখনও কুতুকেব কৌতূহল মেটে নি। উর্বশীর নারীত্ব কোথায়—তা তো দেখা গেল না! ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ও দেহের প্রভেদ কি?'

এই অপমানের পরে উর্বশী প্রতিজ্ঞা করলেন : 'আমি অমরাবতীতে থাকব না, মর্ত্যে ও যাব না, তপশ্চর্যা করব।' পরশুরাম গল্পটি শেষ করেন এই বলে : 'অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসী মালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন এবং নিত্যধাম গোলকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।' এককথায়, পুরোপুরি বৈষ্ণবী হলেন।

এই পরিণতি অন্য একটি চরিত্র, "অদলবদল"-এর আয়ান ঘোষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শিখণ্ডীর সঙ্গে পুরুষত্ব বিনিময় করে তাঁর কোনো লাভ হলো না, শিখণ্ডীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুরুষত্বও ধ্বংস হয়ে গেল। পরশুরাম জানান :

> কিন্তু তাঁর জীবন বিফল হল এমন কথা বলা যায় না। কালক্রমে আয়ানের এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হল। তিনি মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে আয়ানী নামে খ্যাত হলেন, শ্রীখোল বাজাতে শিখলেন এবং ব্রজমণ্ডলে যে গোপিনী বাস করত তাদের নেত্রী হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্তন করতে লাগলেন।

"বালখিল্যগণের উৎপত্তি" গল্পটি ছোটো ছোটো বামপন্থী দলকে ব্যঙ্গ করে লেখা—যদিও এখন আর বোধহয় অনেকেই ব্যাপারটি ধরতে পারেন না। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কত যে ছোটোখাটো দল প্রার্থী দিয়েছিল (যাঁদের প্রায় সকলেরই জামানত জব্দ হয়) সে-কথা এখন ইতিহাস। গল্পটির দিক থেকে তাতে অবশ্য লাভই হয়েছে। ছোটো এই গল্পটিকে এখন অন্যভাবেও দেখা যায়। বিশেষ করে আধুনিক স্লোগানের সংস্কৃত রূপগুলি খুবই মনোহারী। 'মহান ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম্ (=থাকুন), অন্য গুরু ম্রিয়তাম্ (=মরুক)!'; 'বিশ্বামিত্র ধন্যবাদ, বশিষ্ঠাদি নিন্দাবাদ!'; 'বালখিল্য বর্ধন্তাম্ (=বাড়ুন), আর সবাই ক্ষীয়ন্তাম্'! (=ক্ষয় হোক)—এমন সব 'আরাব' (স্লোগান) কল্পনা করা শক্ত। আর গল্পের শেষে যে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স্, সেটিও বেশ উপভোগ করার মতো।

পৌরাণিক চরিত্র কিন্তু অ-পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এইসব গল্পে কৌতুকই প্রধান। তবু, আগেই বলা হয়েছে, এইসব চরিত্রদের মুখ দিয়েই পরশুরাম নানা বিষয়ে—দেশবিদেশের অবস্থা, মানুষের ভবিষ্যৎ, যুদ্ধ ও শান্তি, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি—মতামত হাজির করেন। হনুমান সর্বদাই মজাদার কিন্তু নির্বোধ (শুধু "হনুমানের স্বপ্ন"-এ নয়, "রামরাজ্য" আর "গন্ধমাদন বৈঠক"-এও), কৃষ্ণ সর্বদাই বুদ্ধিমান (চতুর বললেই ঠিক হয়), ভীম কম বুঝদার, যুধিষ্ঠিত নিতান্তই ভালোমানুষ। বাকিরা নেহাতই এলেবেলে—যদিও সর্বদাই চরিত্র-অনুযায়ী মানানসই।

এইখানে এসে আমরা একটি প্রশ্নের মোকাবেলা করতে পারি : পরশুরাম কেন এত পৌরাণিক চরিত্র আমদানি করেন। ব্যাপারটা এমন নয় যে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' বা অন্য কোনো পুরাণের কাহিনী তিনি নতুন করে লিখছেন। "পুনর্মিলন" ছাড়া বাকি সব গল্পের আখ্যানই তাঁর নিজের উদ্ভাবন। মজা করার জন্যে অবশ্যই কিছু গল্পের পৌরাণিক পটভূমি বেশ কাজে দেয়। বউ ছাপাই নিয়ে "হনুমানের স্বপ্ন"-র মতো তির্যক ব্যঙ্গের গল্পে তো বটেই, "রেবতীর পতিলাভ" বা "পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী"-র মতো গল্পেও চেনা ঘটনার অজানা কারণ কল্পনা করায় আলাদা একটা মজা আছে। "যযাতির জরা", "অদলবদল" ও "স্মৃতিকথা"-য় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরাম এখানে ভাস-এর পা-এর ছাপ ধরে এগিয়েছেন। "তৃতীয়দ্যূতসভা" সম্পর্কে একই কথা খাটে (যদিও গল্প হিসেবে এটি অনুপম, আখ্যান আর চরিত্র—দু-এর বিচারেই)। "রামরাজ্য", "তিন বিধাতা", "ভীমগীতা", "গন্ধমাদন বৈঠক"—এগুলির মূল উদ্দেশ্য দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কিছু ভাবনা চালাচালি।

পৌরাণিক চালচিত্র ও পৌরাণিক চরিত্র দুই-ই পরশুরামকে এক চমৎকার রূপক (অ্যালিগরি) রচনার সুযোগ দেয়। "জাবালি"-তে তিনি আগেই তিন বালখিল্য ঋষিকে চূড়ান্ত হেনস্থা করিয়েছিলেন। তাঁর কাছে এঁরা নঞর্থক চরিত্র। "ভরতের ঝুমঝুমি"-তে দেশভাগের কথা আসে একেবারে শেষে, কিন্তু অমোঘ তার পরিণতি। বিদায় নেওয়ার আগে দুর্বাসা যে রাহাখরচ বাবদ নগদ দশটি টাকা আদায় করেন—এও ভোলার নয়।

অর্থাৎ, কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়, নানা উদ্দেশ্যেই পরশুরাম এইসব পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার আমদানি করেছেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে জাবালির বকলমে। তবু সব মিলিয়ে একটা ধারণা না হয়ে যায় না : ঋষি, তপস্বী, আশ্রম, তপোবন ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব ভাবগম্ভীর ধারণা হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সময় (উনিশ শতকের শেষ) থেকে স্বদেশী যুগ (১৯০৫-০৮) ও তার পরেও চালু ছিল—তারই বেলুনে খোঁচা দিয়ে চুপসে দেওয়া বা deflate করার জন্যে পরশুরাম সারা জীবন এই ধরনের গল্প লিখে গেছেন।

পরশুরামের এই পৌরাণিক গল্পগুলির অন্য এক তাৎপর্যও আছে। "রাতারাতি" (১৩৩৬-৩৭) অবধি তিনি লিখেছিলেন চোস্ত সাধুভাষায় : শুধু সংলাপ ছিল চলিতে। "প্রেমচক্র" (১৩৩৯) থেকেই চলিত ভাষায় গল্প লেখা শুরু।[১১] তারপরে আর কখনও তিনি সাধুভাষায় গল্প লেখেন নি। ফলে "গুরুবিদায়" ও "হনুমানের স্বপ্ন"-র পরে কোনো গল্পেই আর সাধুভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। চলিত বাঙলা শব্দ ও প্রবাদের তৎসম (সংস্কৃত) রূপও তাই আর পাওয়া যায় না—"জাবালি"-তে যার ব্যবহার ছিল হাসির এক বাড়তি উৎস। 'শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিছেদক', 'হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভ্যাঙচাইবেন না'—এমন বাক্য লেখার সুযোগ আর পরের গল্পগুলিতে আসে না। কিন্তু 'মেঘদূত'-অনুবাদ আর 'রামায়ণ',-'মহাভারত'-সারানুবাদের সময় থেকেই (যথাক্রমে ১৩৫০, ১৩৫৩, ১৩৫৬-য় প্রকাশিত) তিনি চলিত গদ্যে প্রয়োজনমতো প্রচুর তৎসম শব্দের প্রয়োগ শুরু করলেন। 'নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন...' বাক্যটি এর ভালো নমুনা।[১২]

এমন এক চলিত গদ্যর প্রকল্প পরশুরামের মাথায় অবশ্য অনেক আগে থেকেই ছিল। ১৩৪০-এ "সাধু ও চলিত ভাষা" প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব দেন : 'এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিত জনের ভাষা দু-এরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্যসংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিক ভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না।'[১৩] এর সমর্থনে তিনি বলেছিলেন : 'এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধু ভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '...হয়ে উঠল' লিখলেই গুরু-চণ্ডাল দোষ হবে না। দু দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে।'

একটা কথাই পরশুরাম বলেন নি : চলিত ভাষায় মুখের শব্দর পাশাপাশি ভারী তৎসম শব্দ হাসিরও কারণ হতে পারে—হাস্যকর বলে নয়, সচেতন প্রয়োগের কৌশলে। "জাবালি"-র ঠিক উলটো রীতিতে, "বালখিল্যগণের উৎপত্তি"-তে এই কৌশলের মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন তিনি নিজেই। 'ক্রতু একটু চিন্তা করে বললেন, এরা ব্রাহ্মণ সন্তান, অপজাত হলেও অধৃষ্য ও অবধ্য, নতুবা মুখে লবণ দিয়ে ব্যাপাদিত করা যেত।'—এই বাক্যে 'অধৃষ্য'

ও 'ব্যাপাদিত' শব্দ দুটি একেবারে মোক্ষম, ক্রতুর মুখে মানিয়েছেও চমৎকার। পরশুরাম ছাড়া আর কে-ই বা 'বলপ্রয়োগের অযোগ্য' ও 'বিনষ্ট' বোঝাতে হাসির গল্পের ভেতরে এমন দুটি শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন?

টীকা :

১ জীবনদর্শন বিষয়ে পরশুরাম ("জাবালি" বাদে) এই একটিই ইতিবাচক গল্প লিখেছিলেন। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : কর্মেই মুক্তি; কর্ম ছাড়া জীবনে আর কিছু চাওয়ার ও পাওযার নেই।

২. বাজশেখব বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত সারানুবাদ', কলকাতা : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স, ১৩৭০ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬), পৃ. ৩২-৩৪। পরশুবাম অবশ্য গল্পটি নতুন করে লিখেছেন—শতকরা একশ ভাগ বানিয়ে।

৩ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ছয়।

৪. 'পবশুরাম গ্রন্থাবলী' (১৩৭৬) ও 'পবশুরাম গল্পসমগ্র' (১৩৯৯)-এ "জাবালি"-ব শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'সংস্কারের' না ছেপে ভুল করে 'সংসারের' ছাপা হযে আসছে। ফলে মানেটাই বদলে যায়। পরশুবামের জাবালিকে রামাযণ-যাত্রা, 'জাবালির পালা'য একইভাবে এনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেখানে আকাশবাণী শোনা যায়, 'জাবালে! জাগ্রত হও, সংস্কারের নাগপাশ হতে মানবমনকে মুক্ত কর।' এছাড়া 'অবণ্যকাণ্ড পালা'-তেও জাবালি মাঝে মাঝে দেখা দেন। 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', খণ্ড ৩, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৩৯৮ দ্র.।

৫. যাবতীয় ভাববাদী ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শাস্ত্রেব অর্থাৎ বেদ-এর নিত্যতা ও অপরিবর্তনীযতাব ওপবে জোর দেওয়া হয। কোনো কোনো দর্শনে আবার বেদকে অপৌরুযের অর্থাৎ কোনো মানুযেব বচনা নয—এমনও দাবি কবা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনই এর প্রধান প্রচারক। তার বিরুদ্ধে বস্তুবাদী জাবালি দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব বা ডায়ালেকটিক্‌স্‌-এর প্রথম সূত্রটি এইভাবে হাজিব কবেন।

৬. মনু কী মনে করবেন—এই চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। 'মনুসংহিতা', ১১।৫৫-য ব্রহ্মহত্যাকে মহাপাতক বলা হয়েছে। যতই অনাচাবী হোন, জন্মসূত্রে জাবালি তো ব্রাহ্মণ, তাই সবাসবি তাঁকে খুন করা যায় না।—অবশ্য শুধু 'মনুস্মৃতি' নয, বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চ (বা সপ্ত) মহাপাতকের তালিকায ব্রহ্মহত্যাব কথা থাকে। P.V. Kane, *History of Dharmasastra*, Vol. 4, Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1973, pp. 10ff., বিশেযত পৃ ১৭-২০ দ্র.।

৭. 'বালখিল্য' নামটি বহু প্রাচীন। শব্দটির ব্যুৎপত্তি জানা যায না। 'ঋগ্‌বেদ'-এর কয়েকটি সূক্তকে (৮।৪৮-এর পরে) "বালখিল্যসূক্ত" বলা হয। 'মহাভারত', 'ভাগবত-পুরাণ' ইত্যাদি বইতেও এই যাট হাজার ঋযির জন্মেব কথা আছে। এঁরা সবাই ছিলেন বুড়ো আংলা, অর্থাৎ বুড়ো আঙুল সমান লম্বা। তবে "বালখিল্যগণের উৎপত্তি" গল্পে পরশুরাম যা লিখেছেন তার সবটাই তাঁর নিজেব বানানো।

৮. 'মনুসংহিতা', ১১।১৬৬-তে পঞ্চগব্য খেয়ে ছোটোখাটো চুরিব প্রাযশ্চিত্তর বিধান আছে। পাঁচটি গরু সংক্রান্ত জিনিস হলো : দই, দুই, ঘি, গোবব আব চোনা। গরম পঞ্চগব্যে ভরা একটি ছোটো কুণ্ডর কল্পনাটি অসাধারণ।

৯. "গন্ধমাদন বৈঠক"-এ হনুমান ধর্মযুদ্ধর নীতি বেঁধে দেন : দুই পক্ষের প্রধান বীররা মল্লযুদ্ধ

করবেন, 'চড়, লাথি, দাঁত, নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক্ অস্ত্রের প্রযোগে আপত্তির কারণ নেই।' চার্চিল আর স্তালিন, ট্রুম্যান আর মাও-সে-তুং-এর মধ্যে মল্লযুদ্ধ হলে আগে এঁদের দৈহিক বলের পাল্লা সমান করে দেওয়া হবে। একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকবেন, 'যে বেশী বলবান তাকে তিনি প্রথমেই যথোচিত প্রহার দেবেন যাতে তার বল প্রতিপক্ষের সমান হয়ে যায়।' ভার্গব পবশুরাম বলেন, 'বৎস হনুমান, কোনো মানুষই তোমার এই বানরিক বিধান মেনে নেবে না।'

১০ টী. ২, পৃ. বারো। 'মহাভারত' · প্রামাণিক সংস্করণ, আরণ্যকপর্ব, বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর সম্পা., পুণা : ভাণ্ডাবকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৪১, ৩৬।৩২-৩৩। প্রচলিত সংস্করণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., কলকাতা : বঙ্গবাসী, ১৮২৬ শক, ৩৫।৩৩-৩৪। মূলে শেষের শ্লোকটি হলো :

অথবানডুহে রাজন্ সাধবে সাধুবাহিনে।
সৌহিত্যদানাদেতস্মাদেনসঃ প্রতিমুচ্যতে।।

'অথবা, হে রাজা, সাধুর (বণিকের) বাহন কোনো সাধু (স্বভাব) ষাঁড়কে প্রচুর খাইয়ে এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।'

কালীপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদে (অধ্যায় ৩৫) 'সাধু' শব্দটিকে 'বাহিনে'-র বিশেষণ হিসেবে ঠিকই ধবা হয়েছে, কিন্তু 'সাধবে' শব্দটি বাদ পড়েছে। বর্ধমান রাজবাড়ির তর্জমায় (অধ্যায় ৩৫) আছে 'সাধুশীল ও সাধুবাহক বৃষভ'। রাজশেখর বসুব সারানুবাদে (টী. ২, পৃ. ১৬০) আবাব 'সাধুবাহিনে' শব্দটি বাদ পড়েছে।

'মহাভাবত'-এর এই অংশের রচযিতা পরোক্ষে ধর্মশাস্ত্রকারদেব কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করেছেন বলে মনে হয। মনু, পবাশর প্রভৃতি কারও স্মৃতিতে কি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ বা মিথ্যাভাষণেব এমন প্রাযশ্চিত্তব বিধান আছে?

১১. স্বনামে রাজশেখব বসু প্রথমে প্রবন্ধ লিখতেন সাধুভাষায়। "ভাষা ও সংকেত" (১৩৩৮)-এই তিনি প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহাব কবেন।

১২. টী. ২, পৃ. ৩৩৮।

১৩. 'লঘুগুরু'-র অন্তর্গত, 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', খণ্ড ১, ১৩৮০, পৃ. ৩৪৯-৫০। এব পবেব উদ্ধৃতিও এই একই উৎস থেকে।

আলোচনা

# সময়ের পদচিহ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ও নেপাল মজুমদার

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

অর্ধশতাব্দী সময়কালের এক বিশিষ্ট সারস্বত সাধক নেপাল মজুমদারের জীবনাবসান বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি-সমাজ ভাবনা-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রথাবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ও বিধিবিধান নিয়ন্ত্রিত পাঠক্রম শাসিত জ্ঞানচর্চার প্রচারের চমক থেকে বছরের পর বছর নিজেকে একান্তে সরিয়ে রেখে গুরুবাদী গবেষণার পথ থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধারায় নীরবে জ্ঞানসাধনা করে গেলেন। চলমান সময়ের মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সার্বিক প্রচার অহংবোধ ও দাম্ভিকতার তৈরি প্রচার থেকে দূরে থেকেছেন সারাজীবন। অথচ মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, লড়াই, সংগ্রাম, আত্মমর্যাদা সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শোষণমুক্তির মানবিক স্পর্ধা, ইতিহাস-দর্শন, সময়ের সত্যানুসন্ধানে এবং সর্বসময়ের মানবাগ্রগমনের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

বড় ছোট জমিদার অধ্যুষিত বীরভূম জেলার হেতমপুর গ্রামে কিছু ভূসম্পত্তির মালিক এক পরিবারে ১৯২৬ সালে নেপাল মজুমদারের জন্ম। পাশাপাশি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া খরাপ্রবণ রুক্ষ লাল মাটি, বাউরি-বাগ্দী-বেদে-কৃষক-ভূমিহীন কৃষক-খনি অঞ্চলের সস্তা শ্রমিক এবং কর্মহীন নানা অনিশ্চিত কাজ-অকাজের এমনকি অপরাধজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরও ঘাম-রক্তের অঞ্চল। এ সময়ের কথাসাহিত্যের মরমী রূপকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর সর্বসময়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মহামিলনের বাণীর উদগাতা রবীন্দ্রনাথের বীরভূম জেলার সার্বিক আবহের প্রেক্ষিতের মধ্যে নেপাল মজুমদারের সারা জীবনের সাহিত্য-সংস্কৃতির, ইতিহাস চর্চা, গবেষণার ব্যাপ্তি ও প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মুক্তমনাদর্শ, বিশ্বভারতীর বিশ্বজ্ঞান চর্চার আদর্শ, দেশে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার, স্বাধীনতার জন্য অহিংস গান্ধীবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ, রবীন্দ্র জীবনাবসান, ক্ষমতাহস্তান্তরের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী জমানার অবসান, ফলত দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্ত সামাজিক মূল্যবোধের অপহ্নব ইত্যাকার সব ঘটনা-দুর্ঘটনা তাঁর সারস্বত সাধনার বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপট হিসেবে থেকেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ শিক্ষার তাঁর সুযোগ ঘটেনি। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করার পরই সারা দেশে বিয়াল্লিশের তুলকালাম স্বাধীনতা আন্দোলনে দুবরাজপুর সিভিল কোর্ট এবং পোস্ট অফিস দখলের মুখ্য ভূমিকায় থাকার ফলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার সময় ১৯৪৬ সালে লয়াবাদ কোলিয়ারিতে

শ্রমিকসভায় বক্তৃতার সময় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। কারামুক্তির পর বাংলা বিহার এলাকার কয়লাখনির শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনে ক্রমশই নেতৃত্বের দিকে পৌঁছতে থাকেন। সেসময় তিনি পান্নালাল দাশগুপ্ত ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া অর্থাৎ আর. সি. পি. আইয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। জেলে থাকাকালীন ১৯৪৯ সালে যক্ষ্মা এবং বুকের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে নিরাময় স্যানাটোরিয়ামে থাকার সময়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্র গবেষণায় যুক্ত হলেন। ইতোমধ্যে ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বীরভূম জেলার সাথে যুক্ত হয়েছেন। পরিচিত হয়েছেন মুজফ্ফর আহমেদের সাথেও। স্বাধীনতা পত্রিকায় তখন লেখালেখি শুরু করেছেন। দেশ পত্রিকায় 'নেতাজী ও রবীন্দ্রনাথ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৭'র সাধারণ নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী হিসেবে দুবরাজপুর কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব আসে এবং স্বাধীনতায় তাঁর ছবিও প্রকাশিত হয়। পরে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর অনুকূলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে হয় পার্টির নির্দেশেই। বাংলা ভাষায় শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চা গবেষণার ক্ষেত্রে এঘটনা নিতান্তই আনন্দের। অন্যথায় একজন বিধায়ক বা সাংসদ বা মন্ত্রীও হয়তো পাওয়া যেতো, কিন্তু পাওয়া যেত না নেপাল মজুমদারকে।

রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর দীক্ষা আর এক পর্বতসদৃশ গবেষক ও সমাজভাবুক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। শান্তিনিকেতনে বছরের পর বছর একজন আশ্রমিক বিদ্যার্থীর মতো কঠোর পরিশ্রমে রবীন্দ্রজীবনের তথ্য ও সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্বিষয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে নানা সময়ে প্রবোধকুমার সেন, পুলিনবিহারী সেন, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ড° কালিদাস ভট্টাচার্য, ড° নীহাররঞ্জন রায়, শৈলেশচন্দ্র সেন, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন, অমিয় চক্রবর্তী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অনিলকুমার চন্দ প্রমুখ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির মহাশয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে নানা সময়ে নানাভাবে সাহায্য নির্দেশনা পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন নিজের অধ্যবসায় বিদ্যোৎসাহিতা শিষ্যসুলভ নম্রতা বিনয় এবং সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার কারণেই। আমাদের ভারতীয় শিল্পাদর্শের সনাতনী ধারার জ্ঞানচর্চার একটা সময়ানুগ ও বাস্তবানুগ ছবির প্রতিফলন তাঁর জীবনে দেখা যায়। অথচ শুধুই যে তথ্যানুসন্ধানে কোনো সত্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে গৃহাভ্যন্তরে গ্রন্থকীটের ভূমিকায় যে তিনি আদৌ থাকেননি, তাঁর সমগ্র জীবনধারণ আর জীবনযাপন তার প্রমাণ। দীর্ঘ চর্চা-গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও সত্যোপলব্ধি দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনচর্যার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার প্রক্রিয়ায় সারাজীবন নিবদ্ধ থেকেছেন। শ্রমশীল মানুষের দিনবদলের আন্দোলন-সংগ্রামে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন সারাজীবন। মানবমুক্তির সর্বপ্রকারের কার্যক্রমে তিনি মুখ্য ভূমিকায় থেকেছেন। জীবনভর যুক্ত থেকেছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের কাজে।

এ শিক্ষাই যথার্থ রবীন্দ্রশিক্ষা। এই শিক্ষাদর্শ নিয়েই বিশ্বমানবমুক্তির, মানবিক মূল্যবোধের, মানবিক সম্মান প্রতিষ্ঠার চিরবিবেকবান মানুষ রবীন্দ্রনাথের আট দশকের কর্মময়-সৃষ্টিময় এবং তাবৎকালের বিশ্বমানচিত্রের ঘটনা-দুর্ঘটনা এবং সত্যানুসন্ধানের ইতিবৃত্তের হদিস

করেছেন তিনি। উপনিষদের কবি, অধ্যাত্ম সাধনার কবি, প্রেম ও সত্য-শিব-সুন্দরের সাধক কবি-আশ্রমিক রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় তপোবনাশ্রমের কবি এবং মুনি ঋষিকল্প রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ধারণার ধারার বিপরীতে এক সম্পূর্ণ অন্য রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন। এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের যারা হাল চষে, মাটির অভ্যন্তর থেকে সম্পদ নিয়ে আসে, যারা সভ্যতার পিলসুজ যাঁদের গা বেয়ে শ্রমের ঘাম ঝরছে, যেথায় প্রদীপের তলায় ভয়ানক অন্ধকার, যারা নগরে-বন্দরে বাণিজ্যের পসরা নিয়ে যাত্রা করে এককথায় যারা সভ্যতার হাল ধরে আছে তাদের পক্ষের রবীন্দ্রনাথ। দেশে বিদেশে তাঁর জীবদ্দশায় যেখানে যখন সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ বা তাণ্ডব চলেছে, আধিপত্যবাদের নগ্ন আক্রমণে মানুষ পর্যুদস্ত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। ভারতের ইতিবাচক রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থনে যেমন মতপ্রকাশ করেছেন। যে কোনোরকম নেতিবাচক ভূমিকার বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। এককথায় তাঁর সারাজীবনের রবীন্দ্রগবেষণায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক চিরপ্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথকে মানুষের সামনে নেপালবাবু প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই করাতেই তাঁর বিশিষ্টতা। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সাথে পরতে-পরতে প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে থাকা বহুমুখিন বহুমাত্রিক সৃষ্টির প্রকাশ্য, নেপথ্য এবং অনাবিষ্কৃত নানা দিক নানা কথার মালা থেকে প্রতিটি ফুলের অস্তিত্ব সন্ধান করেছেন। আর নেপাল মজুমদার সন্ধান করেছেন, তৎসময়ের বাংলা ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বের তপ্তখোলার মতো পরিস্থিতি, অগ্নিগর্ভ সব ঘটনা, ভারতসহ সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সারা বিশ্বের দু দুটো যুদ্ধ এবং হিটলার-মুসোলিনী ফ্রাঙ্কো প্রমুখ ফ্যাসিস্ট দস্যুদের তাণ্ডব ইত্যাদি সব ঘটনা আশ্চর্য তথ্য বিন্যাসে এবং সুবিশাল পটভূমির সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তাঁর রচনায়। ছয় খণ্ডে বিস্তৃত 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' এক কথায় এমন একটি আকর গ্রন্থ যা আগামীদিনের শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস রাজনীতি সমাজ ভাবনা ইত্যাকার সমস্ত প্রসঙ্গেই উৎসাহী বিদ্বজ্জনসমাজের কাছে সমাদৃত হবে এসত্য অবিসংবাদী।

১৯৬১ সালে যখন 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ হয় তখন লেখকের ধারণা ছিল তিন খণ্ডে এই বিষয়ের শেষ করা যাবে। কাজ শুরু করার পরে লেখকের উপলব্ধি হল যে, কবির রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের ধারায় একদিকে যেমন কবির বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং চিন্তানায়কদের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় হিসেবে তাঁদের নিজেদের বক্তব্যই বেশি উদ্ধৃত করেছেন। ফলে বিষয়ের সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবেই রক্ষিত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতো কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছ থেকেও রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের বহু তথ্য ও সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনায় ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে বাংলা রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের চেহারা অত্যন্ত কৃশপ্রাণ এবং খুব ধীরে তা অগ্রসর হয়েছে। তবু তার

স্বরূপ বা চেহারা নির্ণয় করেই মহারবীন্দ্রজীবনের প্রেক্ষাপটের সন্ধান করেছেন লেখক। কারণ লেখক জানতেন যে জগতের মহান শিল্পী সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সেই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ দ্বন্দ্বগুলি প্রতিফলিত হয়। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে প্রথম খন্ড শেষ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯১৯ থেকে ১৯২৭ সালের সময়সীমার ভিতর যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বিতর্কও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কবি ও গান্ধীজীর মতবিনিময়, চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মনীষী রঁমা রোলাঁর সাথে আলোচনা, ফ্যাসিজমের প্রতি ধিক্কার, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মনোভাব এবং শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জওহরলালের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে সবরমতী আশ্রমে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার, জেনিভায় আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ক আলোচনা, সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গ, শান্তি আন্দোলন ও ভারতবর্ষ, হিজলী হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা হয়ে আবিসিনিয়ার তথ্য ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গের আলোচনায় শেষ হয়। চতুর্থ খণ্ডে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ও বামপন্থী গণসংগঠনের প্রসার, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, স্পেনে ফ্যাসিবাদ ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ, আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলনে কবি, নোগুচি রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে ১৯৩৮ সালের মিউনিক সংকটকাল থেকে ১৯৩৯ সালের আগস্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত কবির রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ভাবনার ইতিবৃত্ত ধরা হয়েছে। এই খণ্ডে প্রগতি লেখক সম্মেলন, সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন, মার্কসবাদী প্রগতি সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, দেশীয় রাজ্যে গণআন্দোলন কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিষয় ধরা আছে। সর্বশেষ খণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন ভারতবর্ষের কথা আছে। সারা পৃথিবীর যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্টদের চেহারায় কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব রুশ-চিন যুদ্ধ, আধুনিক বাংলা কবিতা ও ধূর্জটিপ্রসাদ রোগশয্যায় মহাকবি এবং সভ্যতার সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন, বেদনার্ত মহাকবি, মহাপ্রয়াণ। প্রত্যেকটি খণ্ডের উল্লিখিত সব ঘটনা, আলোচনা—আন্দোলন, মতপ্রকাশ দেশ ভ্রমণ ইত্যাকার সমস্ত কিছুর সাথে মহাকবির সৃষ্টিশীলতার সমস্ত বৃত্তান্ত ও এই খণ্ডের সুবশিাল পটভূমির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

ছ খণ্ডে ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ এই মহাগ্রন্থ ছাড়াও আরও এগারো খানা চিরস্মরণযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। (ক) রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (খ) রবীন্দ্রনাথ ঃ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ (গ) রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স (ঘ) বানান বিতর্ক (ঙ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (চ) মহাজাতি সদনের অধিকার প্রসঙ্গে ছাত্র পরিষদের দপ্তর সরানো প্রসঙ্গে মামলার সূত্র ও প্রয়োজনীয় ইতিহাস (ছ) বন্দী মুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (জ) গণতান্ত্রিক মানুষের অধিকারের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (ঝ) বিশ্বভারতীর বন্ধু হ্যারি টিম্বার্স (ঞ) রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী এবং (ট) বিশ্বভারতীর বন্ধু এলমহার্স্ট ইত্যাদি সব গ্রন্থেও লেখকের শ্রমশীল গবেষণা, জ্ঞানের বহুমাত্রিকতা এবং তীক্ষ্ণ মনীষীর পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে অবস্থান করে এই সুবিশাল

পরিমাণ ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনের উদাহরণ তেমন নেই। নিজেকেই নিজের পথ তৈরি করে এগোতে হয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিচিতি না থাকার অসহায়তা জয় করতে লেখকের সময় লাগে নি। প্রথম খণ্ড বিদ্যোদয় লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হবার ক্ষেত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ভূমিকার কথা আমরা শুনেছি।

সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী এই কঠিন কঠোর পরিশ্রমী গবেষণার কাজ ঘরে বন্দী থেকে যে করে গেছেন তা নয় জীবনের সকল পর্বেই সময়ের মানুষের সামাজিক-গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে মুখ্য ভূমিকায় নিযুক্ত রেখেছেন। শুধুমাত্র রসদৃষ্টিতেই তিনি বিষয়ের বিচার বিবেচনা করেননি সব সময়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতার দৃষ্টিতেই সমস্ত বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। গুরুদেব বন্দনা, ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, একদলের রবীন্দ্রদূষণ থেকে কবিকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্র আলোচনা গবেষণায় ক্রমশঃ মার্কসবাদীদের যুক্ত হওয়া, পরে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুর্জোয়া শব্দের প্রথম ব্যবহার এবং পরে রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে লেখাটিকে কেন্দ্র করে নীহাররঞ্জন রায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, চিন্মোহন সেহানবীশ, নীরেন রায় প্রমুখের লেখায় বাস্তবতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে সব তাঁর রচনায় একান্ত প্রামাণ্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

সত্তরের দশকে রাজ্যে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের কালো দিনে বাহাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম দিনটি থেকে যুক্ত ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত সংঘের সভাপতি পদে থেকেছেন। যতদিন শারীরিক সামর্থে পেরেছেন জেলায় জেলায় সভাসমিতিতে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। বন্দী মুক্তি এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বরাবর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সত্তরের ঘোরতর দুর্দিনেও নানা আন্দোলনে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য শান্তিনিকেতনে একাধিকবার গিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন, শান্তিদেব ঘোষ, রাণী চন্দ, অমিতা সেন, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, সোমেন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের স্বাক্ষর এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ ও সামাজ্যবাদ বিরোধিতা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের মানবধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও শান্তির সপক্ষে আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ ও চর্চা করার মানসিকতা তিনিই আমাদের মধ্যে এনেছেন। তিনি প্রভাতকুমারের গবেষণার আদর্শ গ্রহণ করলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব সময়েই ইতিহাচক ভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বস্তুবাদী বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিষয়ের নেতিবাচক দিকটির দিকে তর্জনী তুলতেও কখনই দ্বিধা করেন নি। "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে-করতে লিখেছেন তাঁর রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। মার্কসিজমের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই; কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়?" শচীন সেনের Political Philosohpy of Rabindranath[৬] গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মত প্রকাশিত হয়েছে।

নেপাল মজুমদার তাঁর বিপুল সৃষ্টিকর্মের জন্যে ১৯৭৮ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৮৩ সালে রামমোহন ১৯৮৫তে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১৯৯৩এ জগত্তারিণী বক্তৃতা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮৬তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ডি, লিট উপাধি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য এবং সাহিত্য বারিধি ইত্যাদি সম্মানও পান। রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। জীবনে কোনোদিন সস্তায় সহজে কিছু পাবার থেকে শতহাত দূরে অবস্থান করেছেন। কোনোরকমের অনৈতিকতার সাথে সামান্যতম আপস করেননি। এমন নির্লোভ মানুষ এসময়ে কম দেখা যাবে। এতবড় গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কাজে জীবনের বেশির ভাগ সময়েই প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পান নি। হেতমপুর থেকে শান্তিনিকেতনে কাজ করার পর কলকাতায় এসে কখনো প্রয়াত কথাসাহিত্যিকার তপোবিজয় ঘোষের কলেজ রোর এক চিলতে বাসস্থানে তার স্ত্রী-কন্যাদের সাথে একটা তক্তপোষ আশ্রয় করে, কখনো বাগুইআটি অঞ্চলে ভাইপো ভাইপো-স্ত্রীর সংসারে অতিথি হিসাবে, কখনো নন্দন পত্রিকার দপ্তরে হোটেল নির্ভরে কখনো একা শিয়ালদার ফর্ডাইস লেনের ডঃ সলিল ঘোষের একদা একাউনটেন্ট জেনারেল, ঠাকুরদার জরাজীর্ণ আক্ষরিক অর্থেই বার ঘর এক উঠোনের এক বাড়ির একখানা ঘরে কিছুদিন বছরের পর বছর নিজে রান্না করে জামা কাপড় কেচে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে কোনদিন রামমোহন লাইব্রেরী, কোনোদিন সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ কাউন্সিল ঘুরে লেখক শিল্পী সংঘ হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পড়া আবার ভোরে উঠে পড়তে বসা এই তাঁর নিত্যকর্ম। কিছুদিন পরে বরানগর গার্লর্স স্কুলের শিক্ষিকা কমল চৌধুরীর সাথে পঞ্চাশোর্ধ বয়সে বিবাহ। এক কন্যাসন্তানের জন্ম দুসপ্তাহ বাদে শিশুটির মৃত্যু, স্ত্রীর ধারাবাহিক অসুস্থতা নিজের জীবনাবসানের দুবছর আগে স্ত্রীর মৃত্যু পরে বিধাননগরের ফ্ল্যাটে নিজের গুরুতর অসুস্থতা, চিকিৎসা এবং প্রায় ভয়াবহ একাকিত্বের মধ্যে দাঁড়িয়েও শেষ দিন পর্যন্ত লেখা পড়ার কাজ করেছেন। অনেক লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। দেখা হলেই বলতেন একটা বড় লেখায় হাত দিন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী কবিতা-কথাসাহিত্যে নাটক ও সংস্কৃতির ইতিহাস লেখার কথা বলতেন, বলতেন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কথা বাংলা কবিতায় প্রগতি চিন্তা-চেতনা, বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ইতিবৃত্ত, কথা সাহিত্যে সামন্তশোষণ-শাসন ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিষয় বিয়ে ভাবতেন এবং আমাদের বলতেন লেখার দায়িত্ব নিতে। আসলে অতটা শ্রমস্বীকার করে কোন কাজ করার মানসিকতা আমাদের সকলের নেই। দূরাভাষে কথা হলেই শেষে বলতেন একদিন আসুন, অনেক কথা আছে। উল্লিখিত সব লেখালেখি, লেখক শিল্পী সংঘের নানা প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলতেন। ব্যক্তিগত লাভালাভ, ক্ষোভ পরনিন্দা পরচর্চার কোনো প্রসঙ্গ কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। নতুন প্রকাশিত বই নিয়ে দেখা করতে গেলে খুব খুশী হতেন। অনেক লেখার কথা বলতেন। কারও লেখায় তথ্যের ভুল দেখলে বা ফাঁকিবাজি দেখলে বন্ধুদের কাছে বলতেন, সভায় বক্তৃতায় সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন, নিজের লেখায় নিজের মত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু কখনো নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে বিসংবাদে জড়িয়ে যেতেন না। অথচ যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথেই সত্যের স্বরূপ নির্দেশ করতেন।

জীবনে কোনোদিনই কোনো মাস মাইনের চাকরি বা বাঁধা আয় রোজগারের চেষ্টা করেন নি। পারিবারিক জমির ফসলের কিছু ভাগের সামান্য অর্থমূল্য, অগ্রজ অধ্যক্ষ ডঃ গোপাল মজুমদারের সহায়তা নিজের বই বিক্রীর সামান্য আয় পরবর্তী কালে পুরস্কার এবং নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ধারাবাহিক বক্তৃতার কিছু অর্থমূল্য সব মিলিয়ে জীবনের একটা বড় অংশ আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই কাটিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে এই ভাবে প্রজ্ঞাচর্চার কাজ করেছেন। কোনোদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে কেউ দেখে নি। প্রচারের থেকে দূরে অবস্থান করেছেন, সভা সমিতি, বক্তৃতা বিবৃতি ইত্যাদি থেকে লেখার কাজেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। শিক্ষিত, শ্রমশীল, জ্ঞানানুসন্ধ একদল তরুণ-তরুণীদের দিয়ে অনেক কাজ করানোর ইচ্ছা ছিল। তেমন সাড়া না পেয়ে দুঃখ করেছেন কখনো।

নেপাল মজুমদারের শেষ ইচ্ছা ছিল (ক) সংসদে আইন করে মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি রূপে ঘোষণা করা হোক। (খ) কবির যাবতীয় রচনা চিত্র সঙ্গীত বাড়ি ঘর জাতীয় সম্পদ বলে অধিগ্রহণ করে বিশ্বভারতীর হাত থেকে উত্তরায়ন কমপ্লেক্সের মালিক Rabindranath Tagore Society র হাতে দেওয়া হোক (গ) গান্ধীজির রচনাবলীর মতো রবীন্দ্রনাথের বাংলা এ ইংরাজী সমগ্র রচনার সুসম্পাদিত রচনাবলী প্রকাশ করা হোক, (ঘ) কবির সুবিপুল পরিমাণ চিঠিপত্র এবং ভাষণ ইত্যাদি টীকা সহ প্রকাশিত হোক। (ঙ) রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিপুল সংখ্যক Tagore clippings প্রকাশ করা হোক, চিরদিনের গবেষকদের কাছে যা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। (চ) বিশ্বভারতী এবং বাংলা আকাদেমির সমগ্র কার্যক্রম যৌথ প্রয়াসে সম্পাদিত হোক ইত্যাদি। বীরভূমের কোনো গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের একটা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে ছিল। এ বিষয়ে কোয়েকার দলের হ্যারি টিম্বার্সের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। হ্যারি টিম্বার্স শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরে সোভিয়েত মেডিকেল মিশনে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। হ্যারি টিম্বার্সের জীবন ও কর্মধারা নিয়ে তাঁর পুস্তিকা বিশেষ প্রামাণ্য। তাঁর অকিঞ্চিৎকর অর্থও তিনি এ বিষয়ে দিতে চেয়েছেন। তার বিপুল পরিমাণ বই-পত্র তাঁর থেকেও অনেক বেশি আরও অজস্র লেখার সব বিষয়বন্দী ফাইল, স্মারক, নানা সময়ে দেশও বিদেশের নানা মনীষী ব্যক্তির সাথে চিঠি পত্রের আদান-প্রদান।

চরম অনটনেব সময়েও অন্যকে বুঝতে দেন নি। নেপাল মজুমদারের মৃত্যুর সঙ্গে একটি মেধাবী ও সৎ সময়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই।

---

প্রয়াত নেপাল মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেব উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল।

# নরক প্রকাশ্য হোক

[ লালবাজার টর্চার সেলে সাতাশ দিন ]

লতিকা গুহ

পদ্মার পাড় থেকে জীবন সায়াহ্নে

এতোগুলো বছর কেটে গেছে—কত ঘটনার টানা পোড়েনে কতখানি বয়স যে বেড়ে গেছে—জীবনের এই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে বারবারই স্মৃতি টেনে এনে ফেলে রাজশাহীর পদ্মার পাড়ে। আমার শৈশব কৈশোরের মেদুর দিনগুলি। তারা আমার সায়াহ্নকে করেছে স্নিগ্ধ সহনীয়। বয়সের দাওয়ায় বসে আশ্চর্য এক আলোছায়ার বৃত্তকে আমি বড়—আরও আরও বড় হতে দেখি। জীবনের এবড়ো-খেবড়ো উঠোনে বৃত্তটা ছড়িয়ে পড়ছে—ওটা আমাকে গ্রাস করছে।

বৃত্তটা বিন্দু হয়ে ফুটে উঠলো প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের চত্বরে—একরাশ ছড়িয়ে পড়া খিচুড়ির মধ্যে থেকে। খিচুড়ি থেকে উঠে আসা হাল্কা ধোঁয়া আর অদ্ভুত এক অচেনা গন্ধ ধীরে ধীরে বিন্দুটাকে টেনে টেনে বড় করে তুললো একটা বৃত্তে।

সেটা ছিলো—১৯৭৪ সালের ১৪-ই আগস্ট। তারপর—আরও ক-তো দিন—প্রায় তিন বছর।

সেই দিনগুলো আমার কাছে এখনও-টান টান বোধে বন্দী হয়ে আছে—বয়সের দাওয়ায় বসে আজও আমি তাদের দেখি।

**লিখে রাখি সেই সব দিন**

কেন যে লিখতে বসেছি—কতোজনেই তো কতো কিছু লিখেছে—'সে সব দিনের কথা'। কেমন একটা বোধ ঠ্যালা মারে মাঝে মাঝে। আর ঠ্যালা মারছে সৌমেন, ওরফে শান্তনু, অর্থাৎ 'বুড়ো'। ও লিখছে—'উজ্জ্বল অন্ধকার', যে কাহিনী আমাকেও ছুঁয়ে যায়। তাই হয়তো ও ঠ্যালা মারে—কারণ, ও জানে, কথা হয় লেখা, লেখা হয় ইতিহাস। চিত্রিত করে সময় আর চরিত্রকে—ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র। কিন্তু ক্লান্ত লাগে—ভীষণ ক্লান্ত লাগে লেখার কথা ভাবলে।

শুধু 'সে সব দিনের কথা' তো নয়—আরও পেছনের অনেক কথা, যা আমাকে শেষ পর্যন্ত এনে ফেললো ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ের যন্ত্রণায়, প্রেরণায়। আর আরও পরের অনেক কথা যা আমাকে পৌঁছে দিলো সায়াহ্নের স্নিগ্ধতায়।

লিখিনি। লেখার কথা ভাবিনি বহুদিন। আমার সেই বৃত্তটাকে আমি বড় আরও বড় হতে দেখছি—দেখছি আমার সে সব দিনগুলোকে, আমার স্নিগ্ধ সায়াহ্নের ছায়াতলে বসে। প্রতিটি কোণ থেকে আমি দেখছি—সময় ও সমাজ, ব্যক্তি ও বস্তু। ভাবতে বসলে মাথাটা কেমন করে ওঠে। লিখতে লিখতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যেতে হবে? কেন? এই তো বেশ আছি—সায়াহ্নের প্রশান্তির মৌতাতে।

**যেখানে থেকে শুরু**

কিন্তু শুরু করবো কোথা থেকে......

১৯৪৯ সালের ভেজা ভেজা রাত—সারা রাত কুক্ পাখি ডেকে মরছিলো আর এক অবোধ বেদনা ভেতরে ভেতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো। একটা ভয় ভয় চেতনা শিরশিরিয়ে উঠছিলো শরীরটাতে—মা, বাবা, ভাইবোন, দুই দাদাকে যদি দর্শনা জংশনে আটকে দিয়ে সব জিনিষ পাকিস্তানী পুলিশ আর কাস্টম্‌স্ কেড়ে নেয়। কোথায় কোন্ দূরে চলে গেলো ওরা। আমি মেজদি আর ফুলদা রয়ে গেলাম রাজশাহীতে.......আমার এক দেশ ছিলো। আমার ভালোবাসার পদ্মাপাড়......আজ আমার কোনো ভূমি নেই, দেশ নেই। শুধু কলোনি কলোনি করে করে......

আপাতত, তিলজলার একটা সরকারী আবাসনে। ঠিক এর আগের আস্তানা ছিলো দমদমে—জপুর রোডে ৭ নম্বরে......সেখানে থেকেই শুরু করি।

কিন্তু দিনটা কি তবে ১৯৭৪ সালের ১৭-ই জুলাইয়ের আর একটা ভেজা ভেজা রাত হবে......

টিপটিপ বৃষ্টি—অগুন্তি কুকুরের অবিশ্রাম চিৎকার আর প্রচুর সশস্ত্র পুলিশের বুটের আওয়াজ—দরজায় ধাক্কা—এক বিষন্ন ভয়ার্ত বিধবার শীর্ণ মুখ। এখান থেকে শুরু তো করাই যায়। কিন্তু সেই শুরুরও শুরু অন্য কোথাও....... ১৯৭৩ সাল, বাগবাজার।

সাতের দশকে ভালোবাসা

কী ভয়ংকর বিভ্রান্তির দিনগুলি তখন......১৯৬৭ নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থান.....১৯৬৯.....'৭০......'৭১.......'৭২.......ভয়ংকর এক লড়াইয়ের উত্তাপ আর দমন-পীড়ণের দাপট......

তখন আমি থাকি বাগবাজারে রামকান্ত বোস স্ট্রীটের ওয়ার্কিং উইমেন্স হোস্টেলে—মঙ্গলবার রোববার ছাড়া রোজ দোতলা বাসে কলেজ যেতাম। হোস্টেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম মিছিল যাচ্ছে—লাল পতাকা হাতে হাতে শ্লোগান উঠতো—'নকশালবাড়ী লাল সেলাম', 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম'। কেমন একটা অনুভূতি হতো।.....নানা রকম পত্রিকা কিনতাম.....মাঝে মাঝে কিনতাম প্রচুর লিটল্ ম্যাগাজিন। এক সময় দেখলাম বাব্লুর দোকানে বিক্রী হচ্ছে 'লিবারেশন', 'দেশব্রতী'। প্রায়ই যেতাম কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে। পরিচয় হলো কিছু কবি, সাহিত্যিকের সঙ্গে। অনেকেই ছাত্র, কয়েকজন অধ্যাপক। ভেঙে ফেলা আর গড়া আর স্বপ্নময় দিনগুলির ভাবনার ছায়ায়—একটা আমেজ—একটা উত্তেজনা আমি দেখতাম কফি হাউসের সেই মানুষগুলির চোখে-মুখে, কথায়, লেখায় কবিতায়। অথচ ওরা কতো সাধারণ, ওরা কেউ বিপ্লবী নয়,........কিন্তু 'নকশালবাড়ী' একটা ব্যাপার ছিলো তাদের কাছে। আমার ভালো লাগতো, কিন্তু অদ্ভুত এক অস্থিরতাও কাজ করতো। এখন বুঝতে পারি—আমি কিছু করতে চাইছিলাম। আমি এখন নড়তে চাইলাম। আজ আমি বুঝতে পারি ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত আমার জীবনটা ছিলো কী ভয়ংকর বোকা বোকা। অবশ্যই তার জের আরও কয়েকটা বছর টেনে চলেছিলাম আমি—তারপর দ্বিধাহীন নিশ্চয়তায় শক্ত এক প্রত্যয়ের ভিতে পা দিয়ে দাঁড়ালাম—যেখান থেকে আজও আমি এক পাও সরিনি।'

সে ছিলো এক নতুন হাওয়ার দিন—ঝোড়ো হওয়ার দিন। আজ আর সে হাওয়া নেই......আজ আমরা কেবল দেখছি বিশাল গহ্বরের মুখ ঢাকা রয়েছে যে ঠাণ্ডা পাতলা বরফের আস্তরণে—আমরা সবাই তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

সেই সময় ঝোড়ো হাওয়ায় ফয়দা তোলার জন্য কিছু ধড়িবাজ, শকুন প্রগতির বাজারে বেরিয়ে পড়লো। এমনই কয়েকজনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তারা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলো—অনেক কিছু চিনিয়েছিলো। তখন একটু একটু করে নানা প্রশ্ন আমার মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। বই কিনতে শুরু করলাম কিছু কিছু। কফি হাউসে, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বইয়ের দোকানে, স্টলে এক সম্প্রদায়ের মানুষদের খুব ভালো বুঝতাম না। 'বুদ্ধিজীবী' মানেই যে পণ্ডিত নয় এবং অনেক ধড়িবাজ ধন্ধাবাজও যে 'বুদ্ধিজীবী' হতে পারে, সেটা এই সময়টাতে শিখলাম। দেখতাম, এই 'বুদ্ধিজীবী' সম্প্রদায় খুব বই কেনে, ভয়ঙ্কর ধূমপান করে, চায়ের চেয়ে কফি বেশী খায়, একটানা একটা লিটল্

ম্যাগাজিনের সাথে যুক্ত থাকে, স্থানান্তরে সুরা পান করে অথবা বাড়িতে বসেই গলা ভেজায়। মদ খাওয়াটা প্রগতি চর্চার অঙ্গ হিসাবে অনেকেই মনে করতো—মেয়েদেরও দেখতাম। কিন্তু ওদেরকে বিশেষ 'বুদ্ধিজীবী' হতে দেখিনি।

আমি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন যেন এক অস্থিরতা বোধ করতাম। মনে হতো, সব কিছু কেমন অর্থহীন অথবা বিরাট এক ভণ্ডামি, এবং 'বুদ্ধিজীবী' নামক সম্প্রদায় বিশেষ সুবিধা ও সম্মান ভোগ করছে কোন রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার না করেই। আমার কেমন যেন লজ্জা করতো—কেমন একটা কষ্ট হতো, রাগ হতো।

কে যেন বলেছিলো—অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চাইতে, একটা বাতি জ্বালানো অনেক ভালো। কথাটা মাত্র কয়েক বছর আগে সৌমেনের মুখে শুনেছিলাম। দারুণ ভালো লাগে আমার কথাটা। তা, হয়তো এই রকমই একটা বোধ কাজ করেছিলো তখন।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলাম, বুদ্ধিজীবীদের সামনে নানা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে হবে—ওদের দিয়ে কথা বলাতে হবে—লেখাতে হবে নতুন করে। কাজটা সহজ ছিলো না।

শেষ পর্যন্ত লেখালাম রনেশ দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সঞ্জয় মুখার্জী-কে। বিনয় ঘোষ নতুন লেখা দেননি—সমর সেন লিখলেন 'চন্দ্রবিন্দু বাদে'। সমর সেনের এই ছোট্ট বাংলা লেখাটা দরুণ চমকে দিয়েছিলো অনেক বুদ্ধিজীবীকে—কারণ, উনি তখন সহজে কিছু লিখতেন না, আর আমিই একটা লেখা লিখিয়ে নিতে পেরেছিলাম—এটা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছিলো।

সকলের লেখা নিয়ে বের হলো—'বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন'। বোতল সবুজ রঙের প্রচ্ছদে সাদা অক্ষরে বইটার নাম ছিলো—আর ছিলো লেখকদের নাম। সম্পাদনায় ছিলো আমার নাম—তখন ছিলাম লতিকা মুখার্জী। মাত্র পাঁচশো কপি ছাপাই—প্রায় সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিলো। বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো বইটা। বইটার ভূমিকাটা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

ভূমিকাতে ছিলো মাও-সে-তুঙের উদ্ধৃতি—বুদ্ধিজীবীদের নেমে এসে দাঁড়াতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের পাশে, শিক্ষা ও বৌদ্ধিক চর্চার বাতাবরণে থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। আর আশ্চর্য, এই একটি উদ্ধৃতিকে উপলক্ষ্য করে আমার জীবনটাতে যে এতো রকম ওলোট-পালট যেতে পারে, আজ তা ভাবতে বসলে কেমন অবাক লাগে, অদ্ভুত একটা মজা লাগে। ভাবি, জীবনের বাঁকে বাঁকে কতো কী যে বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে—তা কোন প্রাজ্ঞতা দিয়েই বোধ হয় আন্দাজও করা যায় না—সে বিস্ময়, কখনো আনে আনন্দ, কখনো বেদনা। আমি বিস্ময়ের বাঁকে বাঁকে বৃক্ষরোপণ করে আজ এসে পৌঁছেছি ষাটের কোঠায়। ফিরতি হিসেবে এক একটা বাঁকে যখন ফিরে ফিরে যাই, তখন বৃক্ষতলে নিই কিছুটা জিরিয়ে। এমনই এক গাছের ছায়ায় জিরোতে জিরোতে আমি এই মুহূর্তে চলে এসেছি বাগবাজারে 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসবাড়ির পেছনের এক বস্তিতে। খোলার চালের বাড়ির এবড়ো-খেবড়ো শান বাঁধানো এক বিধ্বস্ত দাওয়ায় কাঠের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছি। কোণের ঘর থেকে গান ভেসে এলো—'পূর্ব দিক লাল....', 'জন্মিলে মরিতে

হবে.......', 'জাঙ্গুতেরি নিশানরি.....', 'বোকা বুড়োর কাণ্ড দ্যাখোরে......', আরও আরও অনেক গান। গান গাইছে 'বুড়ো'। পরে—অনেক পরে জানলাম বুড়োর আসল নাম 'সৌমেন'।

'বুদ্ধিজীবী ও নান প্রশ্ন' তখন অনেকের হাতে পৌঁছেছে। পৌঁছেছে সৌমেনের হাতে, চালা ঘরের ছেলে বাসব, শেখরের হাতে। রনেশ দাশগুপ্তর ভগ্নীপতি মিহিরদার মারফৎ তখন মাও সে-তুঙের উক্তিটি নিয়ে বৈঠক করার প্রস্তাব রেখেছিলো সৌমেন। বৈঠকে আমি যে কাউকে ঠিক ঠিক বোঝাতে পেরেছিলাম—তা মনে হয় না। তবে এরই সূত্র ধরে, বাসবদের বাড়ির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো। আর তারই সঙ্গে খুবই দ্রুত আমি আর সৌমেন খুব কাছাকাছি এসে গেলাম। আমি নিজে কথা বেশী বলতাম না। শুধু শুনে যেতাম ওদের কথা, বুড়োর কথা। ক-তো কথা যে বুড়ো বলতো। গ্রামের চাষীদের বিপর্যস্ত জীবনের কথা, শহরের মেকী বিপ্লবী ও মার্ক্স্বাদীদের কাহিনী, স্বদেশ ও প্রতিবেশী দেশের লড়াইয়ের ইতিহাস, ওর মা দাদা-দিদিদের গল্প। ছোট ছোট ভাইঝি ভাইপোর সম্বন্ধে কী গভীর ভালোবাসা নিয়ে বুড়ো কথা বলতো। স্বপ্নের ছবি আঁকতো কথা আর গানে, গানে আর কবিতায়—এক শোষণহীন অপমানহীন স্বদেশ ও সমাজ নিয়ে। বুড়ো কাজ করতো হত-দরিদ্র চাষীদের গ্রামে। লড়াইয়ের গান বাঁধতো—'ওঠো চাষী ভাই......', 'মুক্তির যে সংগ্রামে লড়ছে ভিয়েৎনামে......'। কতো গান। কতো কথা। শুধু নিজের কথা বাদ। আমারও কখনো মনে হয়নি জিজ্ঞাসা করি। শুধু শোনা আর গ্রহণ, একদম গভীরে গহনে। ঠিক যেন আকাশের জল ধরিত্রীর গভীর অন্তরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে। আমার নিজের কথাও তেমন করে বিলিনি—বলার দরকারই মনে হয়নি। আমি এক নতুন জমানার খবর পাচ্ছি। নতুন দিগন্ত দেখতে পাচ্ছি। 'বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন'-তে পৌঁছতে যে তাগিদ কাজ করেছিলো তা যেন এক নিশ্চিত লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। লড়তে হবে। নিপীড়িত নিরন্ন বিপন্ন মানুষের জন্য লড়তে হবে। ছোট্টবেলা থেকে—দেশভাগের দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও হয়েছি পর্যুদস্ত ও অপমানিত। তার জবাব দিতে হবে। আমি ভয়ঙ্কর সুখী হয়ে উঠছি। মধুর উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলাম। অতীত থেকে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী অবধি আমার জীবনচর্চার মেকী মুর্খ রূপটা ধরা পড়তে লাগল। আমার আশেপাশের অনেক কিছুকে ঘৃণা করতে শিখলাম। আমি ভালোবাসা শিখলাম। মানুষকে ভালোবাসা।

আমি বিপদকে ভালবাসলান। আমি বুড়োকে ভালোবাসলাম। পুলিশের ছায়া ঘোরে ওর পিছু পিছু। সমস্তটাই বিপদ, সমস্তটাই সত্য। আমি একটুও বিচলিত হইনি। গভীর প্রশান্তিতে এগিয়ে এসে অকম্পিত প্রত্যয়ে বুড়োর হাত ধরলাম।

এক সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালাম। সে শেষে এলো। এবং সে নিঃশব্দ দাপটে।

১৯৭৩ সালের পয়লা মে.....আমাদের বিবাহ এলো। উত্তাল সমুদ্র আমাদের সাক্ষী। আর কেউ নেই। কিছু নেই। আমরা বিবাহিত। না পুরোহিত, না রেডবুক, না রেজিস্ট্রার। বিশ্বাস করি সব বিবাহই তাইই হওয়া চাই।

বুড়ো চলে গেলো বাঁকুড়ায়। হস্টেলে রইলাম আরও দু'মাস। তারপর দমদমে ক'দিন। অবশেষে নিরাপত্তার কারণে বেলেঘাটায় ছোট একটা ঘর নিয়ে, আমি একা থাকতে আরম্ভ

করলাম। বুড়ো মধ্যে মধ্যে কখনো আসতো। থাকতো দু'এক দিন—চলে যেতো আবার বাঁকুড়ার গ্রামে।

অতন্দ্র সময়

এরই মধ্যে চিনতে আরম্ভ করেছি দুস্থ অপমানিত মানুষদের। তাদের কাছে যাই প্রায় প্রতিদিন—সহরের এখানে ওখানে, সহরের বাইরেও। এরই মধ্যে বেরুলো—সাইক্লো করা 'লাল ভোর', 'সাহসী বোন'। বেরুলো বুড়োর 'স্বরূপ গুপ্ত' ছদ্মনামে বিপ্লবী কবিতার বই—'ন্যায়যুদ্ধের কবিতা'। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে এসে, বুড়োই এ সব করতো। ওর রাজনীতির চিন্তা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তখন ঝড় বইছে। বুড়ো পার্টির কাছে জোরালো প্রস্তাব রাখলো গোপন পার্টি সংগঠনের পাশে—প্রকাশ্য গণসংগঠন গড়ে তুলে গণআন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এবং এই প্রশ্নতেই বুড়ো হয়ে পড়লো প্রায় নিঃসঙ্গ। প্রচণ্ড বিরোধিতা, আক্রমণ ও অপমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো ওকে।

মাঝে মাঝে যখনই কলকাতায় আসতো, তখনই ওকে দেখতাম ভয়ংকর ভারাক্রান্ত, দিশেহারা। অনেক অনেক পরে, আমি এমনও শুনলাম যে, যদি বুড়ো পুলিশের হাতে ধরা না পড়তো, তা হলে ওকে খুন হতে হতো সেই সব 'বিপ্লবীদের' হাতেই এক সময় যাদের ও 'কমরেড' বলে বিশ্বাস করেছিলো।

সৌমেনের সঙ্গে বিয়ে—এটা একটা ঘটনা হয়ে উঠেছিলো। 'কমরেডদের' আর বাড়ির লোকদের কাছে কতো রকম যে জবাবদিহি করতে হয়েছিলো বুড়োকে। শুধুমাত্র, স্থির অকম্প্র আবাহন ছিলো মায়ের হাতে—আমাদের মা সুধারাণী গুহ।

সব কিছু নিয়েই আমার হস্টেলের জীবনকে পেছনে রেখে যখন চলে এলাম, তখন ব্যথা পেয়েছিলাম, ব্যথা দিয়েছিলাম। মা, সেজদি অর্চনা, জয় অর্থাৎ গৌরী চলে এসেছিলো আমার খুব কাছে। আমি ওদের আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম। মা ছিলেন নিটোল এক স্নেহাধার। অথচ এক অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণু ও শান্ত অবিচল ব্যক্তিত্ব।

এ সব কিছুকে উপলব্ধিতে টেনে এনে, বিরাট কিছু পাওয়ার আনন্দে অভিভূত হয়ে যখন একটা বছর কাটিয়ে দিয়ে, ১৭-ই জুলাইয়ে গভীর রাত্রে—টিপটিপ বৃষ্টি পড়া, অজস্র কুকুরের ডাকে সশব্দ রাত্রে, পুলিশের হাতে বন্দী হলাম—তখনও আমি একটুও ভয়ে কাঁপিনি, দুঃখে টলিনি, হতাশায় ভাঙিনি। আমি জানি তার একমাত্র কারণ—ভালোবাসা।

অদ্ভুত এক ভালোবাসা—সর্বাত্মক ভালোবাসা। কিন্তু এটা কি আচ্ছন্নতা—এর নাম আসলে উপলব্ধি। এরই নাম আসলে 'পাওয়া'।

**ওরা গভীর রাতে এলো**

'৭৪-য়ের ১৭-ই জুলাইয়ের মধ্যরাত্রে ওরা এল। তছনছ করল ঘরদোর। আমাদের তিনজনকে নিয়ে রওনা হ'ল। আমরা তিনজন ঃ সেজদি (অর্চনা), জয় (গৌরী চ্যাটার্জি) আর আমি (লতিকা গুহ বা সাথী)। গৌরীকে জয় আর আমাকে সাথী নাম দিয়েছিল বুড়ো বা সৌমেন।

সামনে পেছনে সশস্ত্র রক্ষীদল। বাড়ীওয়ালা দুইভাই শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছেন,

"এত রাত্রে এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

অফিসার চেম্বার দেখিয়ে জবাব না দিয়ে দু একটা কাগজ বের করে শুধু বলল, "সই করুন।"

আকাশ মেঘে মুখ ঢেকে রেখেছে। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মাথায় পড়ছে। আশে পাশের বাড়ীর অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়ে হয়ত বা কেউ কেউ উঁকি দিয়ে দেখছে।

কুকুরগুলো চেঁচানো বন্ধ করেছে। হাতে বন্দুক আর নিস্তব্ধ রাতের রাস্তায় বুটের আওয়াজ কি ওরা চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে?

বাড়ি থেকে সাত আট মিনিটের পথ হাঁটিয়ে ওরা আমাদের একটা ভ্যানে তুলল। পুলিশ গুলো অন্য আরও দুটো ভ্যানে উঠে পড়ল। মাঝখানের ভ্যানে আমরা বন্দী হলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়িগুলো পাড়ার ভেতরে ঢোকেনি। মানুষের বসতির মাঝখানে গিয়ে ওদের মনোনীত শিকার ধরতে ওরা ভয় পায়। পাছে গাড়ির আওয়াজে জেগে গিয়ে সবাই দেখে ফেলে ওদের শ্বাপদ বীরত্ব।

জনহীন দমদম রোড। দমদম বাজার—সেভেন ট্যাঙ্কস্—চিড়িয়া মোড়। ভ্যানগুলো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল কাশিপুর থানার সামনে।

এবার আমরা থানার একটা ঘরে। অন্য ভ্যান থেকে আর কেউ নামল না। একটু পরেই আবার ভ্যানগুলোর চলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

"আপনি কি করেন?" হঠাত দেখি দুজন মহিলা পুলিশ আমার দিকে তাকিয়ে....

সংক্ষেপে বললাম, "কলেজে পড়াই।"

আমি আমার শাশুড়ি মায়ের কথা ভাবছিলাম। ছোট দুটো বাচ্চা মেয়ের কথা ভাবছিলাম—বুড়োর দুটি ভাইঝি। ওরা বেড়াতে এসেছে দিদার কাছে।

এবার মহিলা পুলিশ দুটোকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, পুলিশের কাজ করবার মতো মানানসই মুখের চেহারা। ভাবলেশহীন। অকোমল যুবতী। কিন্তু এরা কেন আমাদের বাড়িতে যায়নি? একটাও তো মহিলা পুলিশ ওই দলটাতে ছিল না। আলসেমি? নাকি 'নক্সাল মেয়ে' ধরতে মেয়ে পুলিশ দরকার হয় না? হবেও বা।

"জানেন তো, লালবাজার থানা। —আপনারা মেয়ে—যা জানেন সব বলে দেবেন। আপনাদের ছেড়ে দেবে। বোঝেনই তো, থানা তো...।"

আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভালো করে দেখলাম। আরে, ওরা ভয় দেখাচ্ছে নাকি?

মনটা কেবল পিছনে পিছলে এই পশ্চাৎপট থেকে ওই পশ্চাৎপট সরে সরে যাচ্ছে। বাঁকুড়ায় বুড়ো এখন কোথায় কোন গ্রামে বিচালির বিছানায় শুয়ে আছে না জেগে বসে আছে—মা শিশু দুটোকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে তো এখন...কলেজে কাল কি কি ক্লাশ যেন আছে...জয় যে জড়ির এমব্রয়ডারী করছিল শাড়ীতে সেটা তো শেষ হয়নি...কাল সেজদির ডি. আই অফিসে যাওয়ার কথা...। মনটা আবার ফিরে এল থানার ঘরটাতে।

ওরা তো জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সকাল সকালই চলে আসতে

পারব। ওরা তো আর গ্রেপ্তার করেনি। ওয়ারেন্ট তো দেখায়নি। তল্লাশির অর্ডারও দেখায়নি। অবশ্য ঘরটাকে তোলপাড় করেছে। কি কি সব দখলও করল। তার মধ্যে একটা জং-ধরা তরকারি কাটার ছুরিও ছিল। আমার কলেজে যাওয়ার সুন্দর কালো ব্যাগটাও নিল। ড্রয়ার খুলে প্রচুর চিঠিপত্র নিল। স্পুল টেপ রেকর্ডারটাও নিল। একরাশ বই নিল। কিন্তু আমাদের সে সবের কোন হিসাব দেখাল না। সইও করাল না।.......তার মানে তেমন গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। ছেড়েই দেবে। ওরা তো মাকে বলল "জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ওদের লালবাজারে নিয়ে যাচ্ছি।" তবে? ওদের তো অসীম ক্ষমতা। ওরা তো বলতেই পারত, "ওদের গ্রেপ্তার করছি"।.......সুতরাং, আমি মুর্খ—আমি বিশ্বাস করলাম জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছেড়ে দেবে—এরকম কতই তো হয়।

হায়রে বৃষ্টিবিধুর সেই নিশা—তুনি কত সত্য ছিলে তোমার ভাষা বুঝিনি গো। তুমি সেদিন কেঁদেছিলে—আমি বুঝিনি গো। তুমি জেনেছিলে আমরা তিন মেয়ে পাপের চেহারা চাক্ষুষ দেখতে চলেছি। তোমার কালো বুক চিরে জল ঝরছিল কত মানুষের বেদনার মোচড়ে মোচড়ে। আমি সেদিন তোমায় বুঝিনি, কিন্তু আজও তোমার সেই কান্নাভেজা আকাশ পট চোখে ভাসে। হায় নিশা, আমার ১৭ই জুলাইয়ের নিশা।

হঠাৎ গাড়ি চলার আওয়াজ। আওয়াজ থানার সামনে এসে থামল। মহিলা পুলিশ একজন বলে উঠল, "ওই ওরা 'রেইড' ক'রে ফিরল।"

ঘরে ঢুকল কজন হোমরা চোমড়া পুলিশ যারা আমাদের বাড়ি তছনছ করেছিল। আমাদের নিয়ে তুলল আবার ভ্যানে। শেষরাত্রের নীরবতাকে টুকরো টুকরো করে ছুটে চলল ভ্যান। আপার সার্কুলার রোড ধরে খান্না হ'য়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে এল উল্টোডাঙা থানার সামনে। নেমে গেল একজন মহিলা পুলিশ। এবার ভ্যান মানিকতলা হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে সোজা এসে ঢুকল লালবাজারে। আমার এতদিনের চেনা রাস্তাগুলোর বিস্মিত বুকে ঠোক্কর দিয়ে দিয়ে ভ্যানটা প্রায় তিনবছরের মতো আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে চলে এল লালবাজারে।

বাঁ দিকের গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ হাতি বাড়িটার মাঝের সিঁড়িটার সামনে ভ্যান দাঁড়াল। আমাদের নামিয়ে দোতলার বারান্দায় বেঞ্চে বসতে বলল দুজন পুলিশ। ১৯৭৪-য়ের ১৭ই জুলাইয়ের নিশা তখন প্রায় নিঃশেষ। ভোর চারটে সাড়ে চারটে। আসলে ঘন্টা চারেক আগেই ১৮ই জুলাই শুরু হ'য়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ আমরা তিনজনে নিজেদের মধ্যে একটাও কথা বলিনি। এবার ভোরের আব্ছা আলোয় পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকেই বোধ হয় বোঝার চেষ্টা করলাম অন্যজনের কি মনে হচ্ছে। প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে তিনজনেই তিনবারে বললাম, "মা এতক্ষণে কী জানি না করছে!"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ট্রামের ঘর্ঘর্ ঘটাং ঘট আওয়াজ—আরও একটা স্বাভাবিক দিন শুরু হ'ল। বারান্দার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম লালবাজারের বিশাল চত্বরে ইতস্ততঃ ভ্যান আর প্রাইভেট গাড়ি ছড়ানো ছিটানো। কখনো একটা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে। চত্বরের ও প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পুলিশের আনা গোনা। কেউ সাদা পোষাকে। কেউ সশস্ত্র।

যারা আমাদের ধরেছিল তারা সামনের অফিস ঘরটায় আসা যাওয়া করছে। এদেরই লম্বা ফর্সা অফিসারটি প্রথমে আমাকে অফিসে ডাকল। এর নাম মানস ব্যানার্জি। এইই আমাদের ঘরে ঢুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল 'লতিকা গুহ কে?'

মানস মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। সবশেষে সৌমেনকে নিয়ে নানা প্রশ্নের জাল বুনতে থাকল। তারই মধ্যে জিজ্ঞাসা করল আমি নক্সালবাড়ি রাজনীতি করি কিনা। কিছু সত্য কিছু মিথ্যা মিলিয়ে জবাব দিলাম। শেষ পর্যন্ত জানাল, "আপনাদের বাড়ি থেকে অনেক চিঠি ও কাগজপত্র পাওয়া গেছে।"

এরপর অর্চনা আর জয়কে প্রায় একই প্রশ্ন করেছিল।

ততক্ষণে বেলা বেড়েছে। বারান্দাতেই বসে আছি। লাল বাজারে প্রচুর ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। বারান্দা দিয়ে অফিস ঘরটায় ঢোকার দুটো দরজা। ডানদিকের দরজাটার ওপরে লেখা 'স্পেশ্যাল সেল'। এটাকে 'এ্যান্টি নক্সাল সেল'ও বলা হ'ত। এটি তৈরি হয়েছিল নক্সালদের খতম করার জন্য।

আসলে রনজিৎ গুহ নিয়োগীর হিংস্রতার প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করা তথা তার হিংস্রতার সাফল্যকে পুরষ্কৃত করার জন্যই এই 'স্পেশ্যাল সেল' তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই ছিল এই সেলের সর্বজনবিদিত এবং প্রায় সর্বজননিন্দিত হোতা ও পিতা। ইতিমধ্যেই সে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়ে গেছে। সুতরাং তার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই 'স্পেশ্যাল সেল'।

এবং অবশেষে ১৮ই জুলাই সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রনজিৎ গুহ নিয়োগী ওরফে রুণু গুহ নিয়োগীর স্পেশ্যাল সেলে আবির্ভাব। সে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগের এই বিশেষ সেলের ও.সি বা 'বড়বাবু'। বহু অত্যাচারের ইনাম এই বড়বাবু গিরি।

সমস্ত অফিসটায় বেশ সাজো সাজো রব পড়ে গেল। সবাই টান টান হয়ে বসল বা দাঁড়াল।

বারান্দায় বসে এ সবই লক্ষ্য করছিলাম। একটা টাক মাথা পুলিশ সেই সাত সকালেই বারবার বলার চেষ্টা করছিল আমরা কি করলে মুক্তি পেয়ে যাবো। তার নাম আদিত্য।

"বড়বাবু আমাদের খুব ভালো। দয়ার শরীর। একটু কিছু পাইয়ে দিলেই ছেড়ে দেবে আপনাদের।"

"একটু কিছু পাইয়ে দেওয়া মানে?"—আমি অবাক্।

"এই মানে......কোথায় রেড বুক ডাম্প করা আছে, বা বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র লুকানো আছে, বা কমরেডদের নাম ধাম এই আর কি।"........আমার কেমন হাসি পেল।

**নির্যাতন কক্ষ**

একটু বাদেই 'বড়বাবু' জয়কে ডেকে পাঠাল। অফিস ঘরে বসে আমি, সেজদি নানা আশঙ্কায় মুহূর্ত গুনছি। সামনের অফিস ঘরটার মধ্য দিয়ে পেছনের ঘরটায় জয়কে নিয়ে গেল। দুটোঘরের মাঝখানে বেশ বড়সরো দরজা। এই দরজা দিয়ে পেছনের ঘরটার খানিকটা দেখা যায়। এটা রুণু গুহ নিয়োগীর নিজস্ব অফিসঘর। 'বড়বাবু'টি এবার শুরু করল তিনটি

মেয়ের ওপর অত্যাচার। কখনো নিজের হাতে পায়ে, কখনো বা তার পোষ্য অধস্তন পুলিশগুলোকে দিয়ে। এবং অনুক্ষণ সে নিরীক্ষণ করেই চলল ঠিকঠিক মতো মারধোর চলছে কিনা বা তার মনমতো খবরাখবর আমাদের কাছ থেকে বের করা যাচ্ছে কিনা। রুণুর এই 'থার্ড ডিগ্রী' প্রয়োগের বর্ণনা সৌমেন 'উজ্জ্বল অন্ধকার' বইয়ে খুঁটিয়ে লিপিবদ্ধ করেছে।

জয় রোগা লম্বা। কুড়ি বছরের শ্যামা মেয়েটি আমার শাশুড়িমায়ের পরম আদরের। রুগ্ন জয় মাথা উঁচু করেই পুলিশটার পেছনে পেছনে টর্চার চেম্বারে ঢুকল। একটু পরেই হুঙ্কার, লাঠিমারার আওয়াজ কানে আসতে লাগল। রুণুর গলার আওয়াজ ফেটে পড়েছিল.... "মার্ মার্..মার্ শালীকে।" গালিগালাজ অনর্গল বেরুচ্ছিল। সবমিলিয়েই বেশ ভয় ভয় আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। এবার রুনু হাঁকল, "এই কে আছিস্—অর্চনাকে নিয়ে আয় ভেতরে।"

রুণুর মন্দিরে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম বেশ হৈ চৈ করেই শুরু হয়ে গেল।

একজন অর্চনা অর্থাৎ সেজদিকে 'টর্চার চেম্বারে' ডেকে নিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ও বেরিয়ে এলে গলা নামিয়ে জেনে নিলাম জয়কে হাত পা বেঁধে দুটো চেয়ারের হাতলে লাঠিতে করে ঝুলিয়ে পায়ের তলায় মারছে। জয়কে দেখিয়ে রুণু শাসিয়েছে—সব কিছু না বললে ওরও এই দশা করবে রুণু।

...হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। 'দাঁতভাঙা' শচীন সাঁ করে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। সবাই কেমন সচকিত। কে যেন বলে উঠল "ডাক্তার ডাক্তার ডাকো। অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

ডাক্তার এল। একটু পরেই এক কাপ দুধ এল। বুঝলাম রুগ্ন মেয়েটা মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাই অত ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি—পাছে হাজতে আসতে না আসতেই মারা পড়ে।

এবার আমার পালা। কমল ডাকল আমাকে। সামনের ঘরটাতেই কমল শুরু করল ওর নির্যাতন তৎপরতা। বারান্দার দিকে মুখ করে দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে আমাকে দাঁড়াতে বলল কমল। রুণু তখন ওর অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কমলের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করছে আর নানা নির্দেশ দিচ্ছে। রুণু ওকে বলল, "জিজ্ঞাসা কর সৌমেন কোথায়। কমরেডদের নাম জিজ্ঞাসা কর।"

পরম বশম্বদ কমল প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। আমার জবাব দেবার তো কিছু নেই। দু একটা প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দিচ্ছি। নয়ত চুপ করে আছি অথবা বলছি "জানি না"। হঠাত ফস্ করে একবার সত্যি কথা বলে ফেলতেই সেজদি আমার দিকে চমকে তাকাল।

"ভাইয়া কে?" "সৌমেন"—আমি বললাম। আসলে 'ভাইয়া' সই দিয়ে সৌমেন সেজদিকে একটা মামুলি চিঠি দিয়েছিল ওর কুশল সংবাদ জানিয়ে। সেটা পুলিশগুলোর হাতে পড়েছে।

এইবার একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে চিৎকার করে উঠল কমল। "সৌমেন কোথায়?" "জানি না।"...ব্যস্ আমাকে দেওয়ালে ঠেসে ধরে বাঁ গালের ওপর পাগলের মতো চড় মারতে থাকল রুণুর আজ্ঞাবাহক। বুঝতে পারলাম গালটা ফুলে উঠছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। সভ্য

দেশ—বহু প্রাচীন সভ্যতার দেশ বাংলা তখন আমার ঝাপসা চোখে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে গেল।

অবশেষে কমল হাল ছেড়ে দিল। আমি এসে আগের টুলটাতে বসলাম। সেজদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—এখুনি কেঁদে ফেলবে যেন!

এ সময়েই জয় বেরিয়ে এল টলতে টলতে। পা ঘসে ঘসে ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। আমরা তিনজনে চোখে চোখে কথা বলে নিলাম। ঠিক থাকতে হবেই। 'একদম ভাঙবো না'—এই কথাটাই চোখ থেকে চোখে চলে গেল। অত্যাচারীরা কিছুই বুঝল না।

সন্তোষ এসে সেজদিকে বলল, "বড়বাবু ডাকছে।"—সেজদি রুণুর অফিসে ঢুকল সন্তোষের পেছনে পেছনে। রুণু দুটো একটা কড়া কড়া প্রশ্ন করল। তারপরেই হুঙ্কার—"এই, এটাকে ঝোলা!"

হুঙ্কার চিৎকাল গালিগালাজ। আড়াইখানা ঘরের সমস্ত স্পেশ্যাল সেলটাই যেন আস্ত নরক। গা ঘিন্ ঘিন্ করত। রাগে গা শির্ শির্ করত। ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় কান্না পেত না। মুষড়ে পড়তাম না। চুপ করে দেখতাম, শুনতাম, সহ্য করতাম সবকিছু। একটুও চঞ্চল হইনি। আকুল হইনি। তিনজনের কেউই না।

বেশ মোটাসোটা গোলগাল তুলতুলে চেহারা সেজদির। ভোর বেলায় উঠে দমদম থেকে আঁদুল ছাড়িয়ে কোলড়া গ্রামের স্কুলে পড়াতে যেত সেজদি। প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে ওর কাজের ঝক্কি ঝামেলাও প্রচুর। এসব মিলিয়ে তবু কি করে যে সুন্দর স্বাস্থ্য বজায় রেখেছিল সেজদি। শুধু পরিশ্রম তো নয়। এমন কি দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তাও ওর স্বাস্থ্যকে ভাঙতে পারেনি। সেই ভারী শরীরটা এবার দুটো চেয়ারের হাতলে ঝুলতে থাকল।

মোটা বেতের লাঠি, রুণু আর তার সাগরেদ সন্তোষ, আদিত্য, অরুণ ব্যানার্জি, কমলদের বুটশুদ্ধ পায়ের লাথি সেজদির পায়ের তলায়, কোমরে পাছায়, মাথায় অব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েই গেল। পরম বীরত্বের ব্যঞ্জনা ঝরে ঝরে পড়ছে রুণুর মুখে, বুটপরা পায়ের লাথিতে আর ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুটে।...এই বুটপরা পায়ে লাথি মেরেই, এই চুরুট জ্বালিয়ে রেখেই, তেল পাকানো লাঠিতে পিটিয়েই অর্চনা, জয়, আমি আর পরে সৌমেনকে এবং এই ভাবেই আরও অনেক মানুষ-মানুষীকে ধ্বংস করেই রুণু-সরকার চেয়েছিল নকসালবাড়ি রাজনীতিকে ছারখার করে দিতে। এছাড়া আর কোন পন্থা পুলিশ আর পুলিশী রাষ্ট্রের মস্তিষ্কে আসতেই পারে না। পুলিশী নির্যাতন ছারখার করতে পেরেছিল কি পারেনি, কিম্বা অন্য কোন কারণ ছারখার করেছিল কিনা সেটা অন্যতর প্রশ্ন। কিন্তু এটা নিরেট সত্য যে রুণু-মার্কা পুলিশী নির্যাতন সারা ভারতে অনেক মানুষকে কাবু করতে পারলেও কিছু মানুষকে এতটুকু পারেনি—যেমন পারেনি সেদিনের সাতনম্বর জপুর রোডের গুহ পরিবারকে, যেমন পারেনি আজকের কুষ্টিয়া অবন্তিকা আবাসনের গুহ পরিবারকে—এমন কি আজ মানবিক নাগরিক অধিকার রক্ষার মেকী ধ্বজাধারীরা রুণুকে মদৎ দিলেও।

এই রুণু অর্চনাকে চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়েও এক মুহূর্তের জন্যও স্থির নিশ্চিত থাকতে পারছিল না। এত অত্যাচার সত্ত্বেও তার উদ্দেশ্য সফল হবে তো? তাই বোধ হয় রুণু একবার

করে টর্চার চেম্বার ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। ঢুকেই লাথি মারছে, নয় চুরুটের ছ্যাঁকা দিচ্ছে পায়ের তলায় বা কনুইয়ে। আর গালাগাল যেন ইষ্টমন্ত্র।।

রুণুর মুখে কি বিচিত্র এক হাসি। অত্যাচার করার সুখবোধ হয়ত এইরকম হাসির জন্ম দেয়। আমাকে শাসাল—"সব কিছু না বললে এই রকমই দশা হবে!"......পালা করে মার চলল। রুণু—সন্তোষ—আদিত্য—শচীন—কমল.....হাত ফের্‌তা মার। নিখুঁত নির্যাতনের ব্যবস্থা। এ প্রায় ফালাঙ্গা পদ্ধতিতে অত্যাচার।

ফালাঙ্গা। ঝুলিয়ে পায়ের তলায় মারাই হচ্ছে ফালাঙ্গা। সৌমেনের লেখা থেকেই জেনেছি গ্রীস ও আর্জেন্টিনার নির্যাতনের ইতিহাসে এই পদ্ধতির অত্যাচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য পীড়ন পদ্ধতি। যে কোন ভাবেই ঝোলাতে পারে। এইরকম মারকে 'বাস্তিনা দো'-ও বলে। শাহ কমিশন রিপোর্টে উল্লেখিত জরুরী অবস্থায় উত্তর ভারতে প্রচলিত এই রকম ঝুলিয়ে পায়ের তলায় পুলিশী মারে নাম 'কুর্শি-চড়ানা'। লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ-প্রবর রুণু গুহ নিয়োগী এই পদ্ধতিটি বেশ মন দিয়েই অনুশীলন করেছে দেখা গেল। ওরা আবার ঝুলিয়ে সব সময় মারে না—শুধু দীর্ঘসময় ঝুলিয়েই রাখে—পা দুটো ওপরের দিকে উঠে থাকে আর মাথাটা নীচে ঝুলে পড়ে। সৌমেনকে স্পেশ্যাল সেলে এইভাবে বহুক্ষণ শুধু ঝুলিয়েই রেখেছিল। শুনেছি ওরা ভিডিও চালিয়ে দেশ বিদেশের অত্যাচারে পদ্ধতিগুলো শেখে।

রুণুর নির্দেশে আদিত্য আমাকে আবার অফিস ঘরে নিয়ে এল। জয় আর আমি বসেই থাকলাম। অনেকক্ষণ ভাবছি, সেজদির না জানি কি দশাই করছে ওরা। মারের আওয়াজ বা হুঙ্কার এখন বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রুণু চেযারে পিছ লাগিয়ে বসে ঘন ঘন চুরুট টানছে। মুখটা রাগে যেন ফেটে পড়ছে। টেবিলের তলায় বুটশুদ্ধ পাদুটো ছটফট করছে।

ততক্ষণে ওরা সেজদিকে চেয়ারের হাতল থেকে নামিয়ে হাত পায়ের বাঁধন খুলে চোরা চেম্বারের ছোট খাটিয়ার শুইয়ে দিয়েছে। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে অবশ হাত পা টেনে টেনে সার ফিরিয়েছে। চোয়াল চেপে ধরে নাকের ওপরের দিকে দুপাশ টিপে প্রবল জোরে ঝাঁকিয়ে সেজদির চেতনা ফিরিয়েছে। খাটিয়ার পাশ ধরে উঠে বসল সেজদি। কিছু পরে আদিত্য ওকে ধরে ধরে অফিসঘরে নিয়ে এল। দেওয়াল ধরে ধরে সেজদি বসল। মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেললে তো ওদের কার্যোদ্ধার হ'ত না, তার ওপর দুর্নাম হ'ত। তাই যে করেই হোক সেজদির জ্ঞান ফেরাতেই হয়েছে, একেবারে মেরে ফেলার আগে মার বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টাটা নিখুঁতভাবেই প্রয়োগ তো হল। অন্তত অত্যাচারের আনন্দ তো পাওয়া গেল, কোন গোপন তথ্য না পাওয়া গেলেও!

সেজদি যেন চেয়ারে বসে থাকতে পারছে না মাথাটা কেবলই নীচের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। ও কষ্ট করে মাথাটা সোজা রাখার চেষ্টা করছে। মাথা যে সোজা উঁচু করে রাখতেই হবে...অত্যাচারের সমস্ত দিনগুলো আমরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম—সবসময়ই মাথা সোজা আর উঁচু রাখতে হবে।

অফিস ঘরটায় পুলিশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেউ কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে

কথা বলছে, হাসছে। কেউ নির্বিকারভাবে একটা বিরাট খাতায় কিসব লিখে রাখছে। দেখেই বোঝা যায় অত্যাচারের এই তাণ্ডবগুলো এদের জীবনে কোথাও কোন দাগ কাটে না। বরং উপভোগ করে। ভাবছিলাম, এরাও কি সাধারণ মানুষ? নাকি, পুলিশ নামের এক বিশিষ্ট মনুষ্য সম্প্রদায়? এদের সংসার থাকে না? এরা কি লেখাপড়া শিখেছে? শিখলেও, সেটা কি সাধারণ স্কুলে কলেজে, নাকি বিশেষ কোন পাঠশালায়?

মায়ের কথা মনে পড়ল।.......হায় মা, তুমি এখন কোথায় যে কি করছ! তোমার মেয়েরা, ছেলের বৌ যে এখন কোথায় তা তোমরা জানো না। জানো না যে, তারা এখন অত্যাচারের পরবর্তী কর্মসূচীর আশঙ্কায় মুহূর্ত গুণছে। তুমি এখন এই ভরদুপুরে আমাদের আশি টাকার কামরাটার জানালায় বসে রাস্তার দিকে চেয়ে আছো হয়ত। ভাবছ, কখন আমরা ফিরব। কারণ, ওরা যে বলেছিল জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু না, বৃথা তোমার আশা। ওরা এখন আমাদের লক্-আপে পাঠাচ্ছে না। মা, তুমি কি স্নান খাওয়া করেছ? বুবু মিঠু কি কাঁদছে? মা, আমরা যে সেই কাল রাত দশটায় খেয়েছিলাম তারপর থেকে একটু জলও খাইনি। পাবো কোথায়? অবশ্য পুলিশগুলো খাচ্ছে—চা, জল,খাবার। এক হাতকাটা একটা ছেলে এনে এনে দিচ্ছে। কিন্তু মা, আশর্য, আমাদের একবারও খাওয়ার কথা মনে হয়নি। মার খেতে খেতে গলা শুকিয়ে গেলে একবারও জল খাওয়ার কথা ভাবিনি। আসলে এক সর্বাত্মক ঘৃণা আমাদের শরীরের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলোকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

বেলা গড়িয়ে দুটো আড়াইটে হবে।...“ওদেরকে লক্-আপে নিয়ে যা।”—অমিত মজুমদার নির্দেশ দিল দীনা আর আদিত্যকে।

সেজদি ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না। জয়ও খোঁড়াচ্ছে। কোন রকমে সিঁড়ি দিয়ে ধরে নামাল আদিত্য সেজদিকে। ধরে ধরেই নিয়ে চলল লক-আপে। অত্যাচারের বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাধাবাজার স্ট্রীট আর লক্-আপ বাড়িটার ধারেই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট। দুটো বাড়ির মাঝখানের বেশ প্রশস্ত চত্বরটা খুঁড়িয়ে হেঁচড়ে হাঁটতে বেশ অনেকটা সময়ই লেগে গেল সেজদি আর জয়ের। মাঝে মাঝেই জয়কে ধরছিলাম আমি—ছোটবেলা থেকেই দুর্বল-শরীর ও। তার ওপর পড়েছে মার.....

লক্-আপ। হলদে রঙের তিনতলা বাড়ি। একতলায় অফিস। ও.সি বসে আছে। আদিত্য কি একটা চিরকুট দিল। আমাদের তিনজনের নাম লিখল খাতায় আর জিজ্ঞাসা করল, “কোথা থেকে ধরেছে?”

“দমদম।”—আমি বললাম।

ও.সি চিরকুটটা পড়ে বেশ জোরে জোরেই বলে বলে লিখল, “নো কমপ্লেন, নো ইনজুরি”—অবাক্ হয়ে ভাবলাম, আমাদের তিনজনের চেহারা, শরীরের অবস্থা দেখেও কি ও.সি সাহেবের একবারও মনে হল না যে আমরা আহত, আমাদের “ইনজুরি” আছে, ‘কমপ্লেন’ থাকতে পারে? হ্যা, মনে যে তার হয়েছিল বা হ'ত তা আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম আর তবুও কেন যে ওই মিথ্যা রিপোর্ট লিখত তাও বুঝতে পেরেছিলাম পরে।

আসলে ওরা স্পেশ্যাল সেলকে ভীষণ ভয় পেত।

এক বৃদ্ধা মহিলা ওয়ার্ডার পাশেই দাঁড়িয়ে। আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তল্লাসি করল সারা শরীরে হাত বুলিয়ে। এঁকে আমরা পরে মাসীমা বলতাম। মাসীমা আমাদের তিনজনকে নিয়ে এগোলেন। সেজদি, জয় ঠিক মতো হাঁটতে পারছিল না। দোতলা পার হয়ে তিনতলায় যেতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের। একতলার সিঁড়ির শুরুতে বিশাল কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলছে। তালা খুলে দিল জমাদার। আবার একই রকম দরজা দোতলার সিঁড়িতেও। তালা খুলে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে দরজা ফাঁক করে দোতলা পার হয়ে তিনতলায় নিয়ে এল আমাদের। সেখানেও তালা। দুপুরের প্রায় নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে আবার ঝন্‌ঝন্‌ করে দরজা খুলে আমাদের তিনতলায় মেয়ে বন্দীদের সেলে ঢুকিয়ে দিল।

বেশ বড় একটা ঘর। তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠেই লম্বা বারান্দা। বারান্দায় দুধারে মুখোমুখি সারিসারি ওয়ার্ড বা সেল। লোহার মোটা গরাদ দেওয়া দরজা। বিরাট তালা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিক ঘুরে একটা ছোট স্টোর রুম ছাড়িয়ে বাঁ দিকেই ফিমেল ওয়ার্ড বা সেল। সেলে ঢুকেই বাঁ দিকে ঘরটার মাঝামাঝি একটা দেওয়াল তোলা—মেয়ে বন্দীদের আব্রুরক্ষাই নাকি এই দেওয়ালের কাজ। সেলের ডান দিকে বাথরুম পায়খানা।

আমরা বাথরুমে মুখহাত ধুয়ে নিলাম। বিশেষ কিছু কথা বলছিলাম না। শুধু এর ওর আঘাতের জায়গায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এবার এল খাবারের ডাক। গোলগোল শালপাতা পরপর তিনটে পেতে দিয়েছে বাইরের বারান্দায়। ঠাণ্ডা কিছু ভাত, লালচে ডাল আর লাউয়ের ডালনা। খেতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। সেলে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিল। এবার পা ছড়িয়ে বসলাম ঘরের মেঝেতে।

ঘরটায় জানালা নেই। অনেক উঁচুতে কাঁচে ঢাকা স্কাইলাইট গোটা তিনেক। এক কোনায় স্তূপীকৃত কম্বল। অন্য কোনায় কিছু জঞ্জালের সঙ্গে রয়েছে হলুদ রঙ মাখানো একটা শায়া আর একটা ব্লাউজ। পরে শুনেছিলাম ওগুলো মলয়ার। ওকে ঠিক আমাদের আগেই ধরে এনেছিল। ওকে টেবিলের ওপর উপুড় করে শুইয়ে পাছার ওপর লাঠির পর লাঠি চালিয়েছিল। চামড়া মাংস ফেটে রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়। তারজন্যই বার্নল জাতীয় হলুদ মলম সেই ক্ষতে লাগানো হয়েছিল।

পৌনে চারটে। সেল খুলে আবার আমাদের বারান্দায় বের করে আনল। বারান্দায় মুখোমুখি দুই সারি বন্দী বসে আছে দু'ধারের দেওয়াল ঘেঁসে। আমরাও বসলাম। একটা করে ভাঁড় দিয়ে যাচ্ছে একজন, আর একজন তাতে চা ঢালছে। চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। চায়ের কেটলি-হাতে ছেলেটির কি যে মায়া হল—আমাদের তিনজনকে দুবার করে চা ঢেলে দিল। চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই চিরকুট হাতে লক-আপের জমাদার আমাদের তিনজনের নাম হাঁকল। আবার 'স্পেশ্যাল সেলে' যেতে হবে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

জমাদারের সঙ্গে একতলার অফিসে এসে দেখি আদিত্যরা দাঁড়িয়ে আছে। ও. সি-র টেবিলে একটা খাতায় কিসব লিখে ওরা আমাদের স্পেশ্যাল সেলে নিয়ে এল। তিনজনের

শরীর, বিশেষতঃ সেজদি, জয়ের, আর যে; বইতে পারছে না। তখন বিকেল চারটে সাড়ে চারটে।

আমরা অফিসে ঢুকতেই কেমন যেন হৈচৈ পড়ে গেল। গালাগাল শুরু হল। অমিত মজুমদার জিজ্ঞাসা করল, "কিরে খেয়েছিস? কি খাওয়াল?" আমরা কোন জবাব দিলাম না। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে অরুণ ব্যানার্জি—টুস্কি মেরে ওস্তাদি গানের সুর ভাঁজছিল। হঠাৎ টেবিল থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে দড়াম করে জয়ের পিঠে বসিয়ে দিল এক ঘা। তারপর আবার গুণগুণ গাইতে লাগল। এক কোণে দাঁড়িয়ে সন্তোষ আমাদের দিকে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করছে। টেবিলে বসে উমাশঙ্কর আর মানস গভীরভাবে কি একটা বিষয় আলোচনা করছে। শচী, গালে বড় আঁচিল—টেবিলে বসে কি সব লিখছে। এমন সময় প্রদীপ ঘোষ রুণুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আবার ঢুকে গেল। একটু পরেই সন্তোষ সেজদিকে ডেকে নিয়ে গেল রুণুর ঘরে।

"চেম্বারে ঝোলা আবার ওটাকে"—রুণুর হুঙ্কার শোনা গেল।

ঠিক সকালে যেভাবে ঝুলিয়েছিল সেভাবেই আবার ওকে ঝোলাল দুটো চেয়ারের হাতলে। আবার শুরু হল সমবেত অত্যাচার। এবারে নতুন সংযোজন হল কপালের ঠিক মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা জল ফেলা। এসবই ঘটছিল রুণুর নির্দেশে আর কখনো রুণুর স্বয়ংক্রিয়তায়। ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে—আর সেজদির ব্রহ্মতালু অব্দি কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা মাথায়—সারা গায়ে...মুখের পাশ দিয়ে গাঁজলা গড়াতে থাকল...

এই সমস্ত নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের সাফল্যে হাসি হাসি মুখ করে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল রুণু-সন্তোষ-আদিত্য, আরও অনেকে। কিন্তু ক্রমে রুণুর মুখের হাসি উধাও। কেমন একটা দুশ্চিন্তা—কেমন একটা ক্রোধ, কেমন একটা ব্যর্থতার জ্বালা ওর মুখে ফুটে উঠল। না, কিছুই যে জানা গেল না এত অত্যাচার করেও।

বহুক্ষণ কেটে গেল। সন্ধ্যা নেমেছে। রাত শুরু হয় হয়। সেজদিকে অফিসঘরে যখন নিয়ে এল বুকটা আমার হাহাকার করে উঠল। একি দশা করেছে ওরা! কী বিধ্বস্ত ওর সমস্ত শরীর...চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে...চুল অবিন্যস্ত।

আবার আমাদের সেন্ট্রাল লক-আপে ফিরিয়ে আনল আদিত্য আর অন্য একটা পুলিশ। আদিত্য আর সেই পুলিশটা সেজদিকে বগলের তলায় হাত দিয়ে কোনরকমে টেনে টেনে নিয়ে এল। আবার 'নো ইনজুরি, নো কমপ্লেন', আবার মহিলা ওয়ার্ডারের তল্লাশি। এবার ওয়ার্ডার তরুণী, নাম বুলু। আবার ওপরে ওঠার পালা।

বুলু ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আমি পারব না এমন আসামী ওপরে তুলতে। তুলতে হয় আপনারা তুলে দিয়ে যান।"

আদিত্য নিরুপায় হয়ে সেজদিকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সেই একই ঝনঝনানি দরজাতে। এবার রাত হয়েছে...রাত বাড়ছে...ঝনঝনানি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখন রাত প্রায় আটটা।

.বারান্দায় সব আসামী লাইন দিয়ে মুখোমুখি বসে গেছে। শালপাতায় ভাত ডাল তরকারি পড়ল। রাত্রে মাছ নেই। আমরা একবারে খেয়ে সেলে ঢুকলাম। রাত্রে তবু কিছু মুখে তোলা গেল।

রাত কতো হলো

এতক্ষণে সমস্ত লক্‌আপ শান্ত হয়ে এসেছে। আমরা সেলের একটা কোণে বসলাম। এবার শুরু হল সারা দিনের বিস্ময় বেদনা আতঙ্ক আর আচ্ছন্নতার কড়চা। সেজদি দেখাল ও শরীরের ক্ষত আর মারের চিহ্ন। চুরুটের ছ্যাঁকা কনুইয়ে, পায়ের পাতার তলায়, পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে। জয়েরও পায়ের পাতার তলায় আর ওপরে চুরুটের ছ্যাঁকা। ফোস্কা পড়ে গেছে। পায়ের পাতা ফুলে উঠেছে। আমার ফুলে ওঠা গালে কমলের পাঁচ আঙুলের দাগের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে সেজদির চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ওকে কাঁদতে দেখে জয়ও ফুঁপিয়ে উঠল। সারাদিনের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করতে করতে মায়ের অবস্থার কথা আমরা যখন কল্পনা করছি তখন নিঃশব্দ কান্নায় আমরা তিনজনেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম।

হঠাৎ চমকে ধড়মড়িয়ে উঠলাম তিনজনেই। ঝনঝন করে সিঁড়ির দরজা খোলার আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে জমাদারের শমনি হাঁক—"গোপাল দাস, অফিস কল্"।...ছেলেদের সেলের গরাদ খোলার ও বন্ধ করার আওয়াজ হল। অবশেষে ঝনঝন করে সিঁড়ির দরজাও বন্ধ হল। বুঝলাম গোপালকে নিয়ে চলে গেল। পরের দিনই আমরা পুলিশদের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলাম যে গোপালকে নিয়ে 'রেইড' করতে গিয়েছিল স্পেশ্যাল সেলের পুলিশগুলো।

সারা রাতই বারবার ঝনঝনিয়ে দরজা খোলা বন্ধ হল। হয় বন্দী বের করে নিয়ে যাচ্ছে, নয় বন্দী ঢোকাচ্ছে। শুধু স্পেশ্যাল সেল থেকে নয়, অন্যান্য নানা বিভাগ বা উপবিভাগ থেকেও। যতবার দরজা খোলা হচ্ছে ততবারই আমরা কেঁপে কেঁপে উঠছি—আতঙ্ক হচ্ছে এই বুঝি আমাদের নাম ধরে ডাকে! এই আওয়াজ এখনো যেন কানে বাজে। দরজা খোলা বন্ধ করার আওয়াজ যে এত বীভৎস, এত নিষ্ঠুর হতে পারে! একটা আওয়াজ—একটা ধাতব আওয়াজ নিজেই যে একটা অত্যাচার হতে পারে জানতাম না। আর জমাদার যখন রাত্রের গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে বন্দী বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁক পাড়ত তখন যেন ওকেই জল্লাদ মনে হত।

ঊনিশে জুলাই। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। আলো ফুটছে কালো রাতের কিনার দিয়ে। অনেক ওপরের স্কাইলাইট দিয়ে আন্দাজ করা যাচ্ছে দিন শুরু হল। তিনজনে সারারাত জেগে কাটালাম। চোখে মুখে জল দিয়ে একটু সুস্থ লাগছে। ছটা বাজল। সেলের গরাদ খুলে বারান্দায় বের করে এনে চা আর একটা করে দেশী নোন্‌তা বিস্কুট বিলি করা হল সার দিয়ে বসা বন্দীদের হাতে হাতে। চা-পর্ব শেষ। মাটির ভাঁড়গুলো হাতে করে নিয়ে সেলে ঢুকলাম। গরাদ আবার বন্ধ হল।

স্নান করার জল আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কোন পোষাক না থাকায় স্নান করা গেল না।

শুধু মাথা, হাত পা, মুখে, ঘাড়ে কানে বেশ করে জল দিয়ে বার বার ধুলাম। বেলা দশটায় গরাদ খুলে আবার বারান্দায় সার দিয়ে বসাল। আবার সার সার শালপাতা পড়ল। তাতে গরম গরম ভাত, ফ্যান মেশানো লালচে ডাল, লাউ আলুর তরকারি আর পমফ্রেট মাছ। ডালে প্রচুর সোডা দেয় বলে হলুদের সঙ্গে মিশে ডালটা লালচে হয়ে যায়। পমফ্রেট মাছ তখন সেই চুয়াত্তর সালে খুবই সস্তা ছিল বলে রোজই ওই মাছ দিত। জয় মাছ খেত না, তাই ও পেত এক ভাঁড় দই নামক বস্তু। মাছের বদলে দইয়ের ব্যবস্থা দেখে হাসি পেত। আশ্চর্য রকমের খারাপ খেতে ছিল প্রতিটি খাবার। জয় সেজদি তো কিছুই খেত না বলতে গেলে। আমার মুখ অভ্যস্ত ছিল হস্টেলের খাবার খেয়ে, তাই আমি একটু মুখে তুলতে পারতাম ঐ সব অখাদ্য। অবশ্য হস্টেলের খাবার অত খারাপ ছিল না। সেজদি জয় কিন্তু মা'র রান্না ছাড়া কোনও দিনও খায়নি। আমি বোঝাতাম, না খেলে যে পারবে না এত অত্যাচার সহ্য করতে, অনির্দিষ্টকালের বন্দিত্ব বহন করতে। তবু ওরা প্রায় না খেয়েই থাকত।

খাওয়া শেষ। আবার সেলে ঢোকা। কিন্তু ঠিক সাড়ে দশটায় স্লিপ হাতে মহিলা ওয়ার্ডার গরাদ খুলে আমাদের নিয়ে একতলার লক্-আপ অফিসে এল। আদিত্য সন্তোষ আমাদের নিয়ে চল স্পেশ্যাল সেলে। সেজদি জয় খুব কষ্ট করে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। স্পেশ্যাল সেলে একটুক্ষণ বসিয়ে রেখে নীচে নামিয়ে এনে ভ্যানে তুলল। সঙ্গে চলল অমিত মজুমদার। ভ্যান এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছল শেয়ালদা কোর্টে।

এই প্রথম কোর্টের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় শুরু হল। কোর্টবাবু সান্যালের ঘরে আমাদের আটকে রাখল। কিছুক্ষণ বাদে অমিত, শচীন, আদিত্য এল একটা কাগজ হাতে নিয়ে। কোর্টবাবুর ঘরে বসে জানতে পারলাম আমাদের তিনজনকে তিনটে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ঃ সেজদির নাম নন্দা, জয়ের নাম টুকু আর আমার নাম উর্মিলা। এসবই ওরফে নাম।

আমাদের নামে কেস দিল। অ-নেক পরে জানতে পেরেছিলাম সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কেস। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, পুলিশ খতমের পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই সমস্ত মারাত্মক অভিযোগ, অথচ আমরা সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মুখ দেখতে পেলাম না। ম্যাজিস্ট্রেটও যে কেন আমাদের মতো এত সাংঘাতিক অপরাধীদের দেখতে চাইলেন না তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ, একটা কথা তখন আমরা সকলেই শুনতাম যে সে সময় ম্যাজিস্ট্রেটরাও নাকি পুলিশদের ভয় পেতেন। যাই হোক্, আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হল না। এর পরও কোনওদিনই নেওয়া হয়নি। আমাদের কোর্টে হাজিরা শুধু কাগজে কলমেই হয়ে যেত। আমাদের নিয়ে গিয়ে সোজা কোর্টের লক্-আপে ঢুকিয়ে দিত। ব্যস্, সেটাই কোর্টের সামনে 'প্রডিউস্' করা। তার ফলে, ম্যাজিস্ট্রেট কোনওদিনই জানতে পারলেন না যে স্পেশ্যাল সেলের পুলিশ আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টের সামনে উপস্থিত করায়নি, জানতে পারেননি যে কী অকথ্য অত্যাচার ওরা আমাদের ওপর করেছে, জানতে পারেননি যে কি কি বেআইনী কাজ ওরা করেছে—যেমন, আমাদের বাড়ি তল্লাশি করে বাড়িতেই আমাদের বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্রের তালিকা দেখায়ওনি, সইও করায়নি ইত্যাদি।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ভ্যানে করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এল রুণুর নরকরাজ্য স্পেশ্যাল সেলে।

বিরাম নেই

আরে বাব্বাঃ, সবাই যে মুখিয়ে আছে! যেন অপেক্ষা করে আছে কতক্ষণে তিনটে নারী-শিকার আসবে আবার ওই নরকে। আসতে না আসতেই গালাগালির প্রবাহ বইয়ে দিল। এত কুশ্রী অঙ্গভঙ্গীও জানে ওই মোটাসোটা পুলিশগুলো! পরেছে তো ভদ্র-দুরস্ত পোষাক-ট্রাউজারস্ আর বুশশার্ট। দু-একজন ধুতি আর সার্ট—বোঝাই যায় ওরা হিন্দুস্তানী 'ইনফরমার'।—এত কুৎসিত ভাষা আর কদর্য কথা এরা শিখেছে কোথা থেকে? কোন্ মনুষ্য সমাজে এরা থাকে? শুনেছি অন্ধকার জগতের অপরাধী বা অপরাধপ্রবণ লোকেরা অনেক সব কদর্য ভাষা বলে, কার্যকলাপ করে। এরা এই পুলিশগুলো কি ওই অন্ধকার জগতেরই শরিক? ওদের কি গৃহ নেই? ওদের কি গার্হস্থ্য-সংস্কৃতি নেই? ওদের কি পাড়া নেই? প্রতিবেশী? এমন কি প্রকৃতিও নেই? যে প্রকৃতি ধৈর্য শেখায়, শেখায় নম্রতা, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তাকে করে উর্বর, শালীনতাকে লালন করে সৌন্দর্যকে বজায় রাখে? নাঃ, সত্যিই ওদের কিচ্ছু নেই। ওরা মানুষ হিসেবে পুলিশ তৈরীর কারখানায় ঢোকে। ক্রমে হয়ে ওঠে লোভী, বিকৃতরুচি, নির্মম, অনুভূতিহীন এক ধরনের জীব। এরা না বোঝে সমাজ, না বোঝে পরিবার। এদের পরিচয় থানা-ভিত্তিক বা ব্যারাক-ভিত্তিক। অস্বাভাবিক মনস্তত্বের গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে এরা।. এমন কি এরা এদের নিজেদের পরস্পরকেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু এদের ব্যতিক্রমী প্রতিনিধি কি নেই একেবারে?

অবশ্যই আছে। লালবাজারে একনাগাড়ে সাতাশ দিনের নিটোল অত্যাচারী পরিমণ্ডলে একটিমাত্র পুলিশকে দেখলাম—সে মানুষ। তাকে সবাই 'সরকার' বলেই ডাকছিল। একমাত্র তাকেই দেখেছিলাম কখনো পুলিশী লাঠি হাতে তোলেনি। একটা কুবাক্যও বলেনি। কোনও রকম নির্যাতনও করেনি। ওর হাতে জোর করে গুঁজে দিচ্ছে লাঠি সন্তোষ দীনা—আর শান্ত দৃঢ়তায় ও শুধু বলেছে, "বড়বাবু আমার হাতে কোনওদিনই লাঠি ধরাতে পারবে না।" আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখছি আর শুনছি। ভাবছি—এও কি সম্ভব? সেন্ট্রাল লক্-আপের কর্মী বা অফিসাররা পর্যন্ত ভয় পায় যে স্পেশ্যাল সেলকে, সেই সেলের 'বড়বাবু'কে ভয় পায় না তারই অধস্তন 'সরকার'? আর যখন সরকার এই কথা বলছে ঠিক তখনই অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে অরুণ ব্যানার্জি সেজদির মাথার ওপর গাঁট্টার পর গাঁট্টা মেরে। তখন ছিল উনিশে জুলাইয়ের বিকেল প্রায় চারটে.......

আমরা বারান্দায় বসে আছি। ঠিক আমাদের সামনেই গোপালকে মারতে মারতে লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটাচ্ছে শচীন আর দীনা। গোপালের প্যান্টটা ভিজে গেছে। পায়খানা পেচ্ছাপ করে ফেলেছে মার খেতে খেতে। আদিত্য কাছেই দাঁড়িয়েছিল। দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "ব্যাটা শয়তান—কী হয়রানিই কর্‌ল আমাদের! বন্দুক বই সেন্টার—সব দেখিয়ে দেবে বলে ধানক্ষেতের মধ্যে মাইলের পর মাইল শুধু ঘুরপাক খাওয়াল শালা। ওকে আরও পেটানো দরকার। শা-ল্‌লা!"

সেইদিন কোর্ট থেকে আমরা স্পেশ্যাল সেলে ঢোকামাত্র গালাগালি আর অশালীন অঙ্গ ভঙ্গী দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করার পর শুরু হল ওদের অন্য পর্যায়ের কাজ। অরুণ ব্যানার্জি ঝাঁ করে একগোছা কাগজ নিয়ে এসে বলল, "এগুলোতে সই কর।" সই করতে হল। কাগজগুলোর কিছু ছিল সাদা, কিছু কাগজের ওপরে কিসব ছাপাও ছিল। কিছু কাগজে অনেক কিছু লেখা ছিল। সই করিয়েই নিয়ে নিল। তারপর প্রদীপ আর শচী কিছু রাজনৈতিক পত্রিকা থেকে পড়ে গেল আর তা শুনে শুনে আমাদের লিখতে হল। তাছাড়া কিছু লেখা কপিও করতে হল।

বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় সাড়ে তিনটে চারটে। হাওড়ার এক অফিসার এল। এখানে থেকে জরুরী তলব পেয়েই সে এসেছে। সেজদিকে অরুণ ব্যানার্জি ডেকে নিয়ে গেল। রুণুর ঘরে বসে হাওড়ার অফিসারের সামনে সেজদিকে একঘেয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে হতাশ রুণু অরুণ ব্যানার্জিকে ইঙ্গিত করতেই শুরু হল গাঁট্টা মারা। শেষে যখন অরুণ থামল সেজদির মাথায় তখন এখানে ওখানে ফুলে উঠেছে।

রুণুর ফোন বেজে উঠল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে রুণু ফোনটা ধরেছে—"ইয়েস স্যার। হ্যা, হ্যা—প্রশ্ন করছি স্যার। নাঃ, কিছুই বলছে না মেয়েছেলেগুলো। ঠিক আছে স্যার।"

রুণু ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, "সাহেবের ফোন।"—অর্থাৎ ডি.সি. ডি.ডি. বিভূতি চক্রবর্তীর ফোন, রুণু যার ডান হাত।

আবার নূতন উদ্যম। রুণু ডাকল, "কমল, গৌরিটাকে নিয়ে আয়।"......বেশ কিছুক্ষণ বাদে গৌরী টর্চার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। কী বেহাল অবস্থা করেছে মেয়েটার। ও টলছে।

রুণু এসে দাঁড়াল মাঝখানের দরজায়। রাগে ফেটে পড়ছে মুখটা। ভারী চোয়াল দুটো যেন ঝুলে পড়েছে।........"কমল, লতিকাকে চেম্বারে নিয়ে যা।"

প্রভুর আদেশে কমল আমাকে নিয়ে টর্চার চেম্বারে ঢুকল। আমার হাতদুটো মোটা দড়ি বাঁধল—হয়ত ভয় ছিল ওর হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে ওকেই না মারতে আরম্ভ করি। এরপর শুরু হল বেধড়ক মার। আমার বাঁ দিকের কোমরে আর পাছায়—প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে। মাঝে মাঝে একই প্রশ্ন "সৌমেন কোথায়?" শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

এবার আবার সেজদির পালা। রুণু কমলকে দেখিয়ে সেজদিকে বলল, "এই হচ্ছে সোনেকা হাথ। বুঝলি? কথার জবাব দিবি ঠিক ঠিক। নে কমল, লাগা মগজ ধোলাই!"—কমল তক্ষুণি সেজদির পাতলা নরম চুলগুলো মুঠো করে ধরে ওকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে দিল। মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে যাওয়ার আগেই আবার টেনে নিল নিজের দিকে। বহুক্ষণ চলল 'মগজ ধোলাই'। শেষে একটা মহিলার চুল ধরে হাতলাট্টুর খেলাটায় ক্ষান্ত দিল কমল। ঘর ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে কমল বেরিয়ে গেল। —সেজদির মুখ দিয়ে তখন গাঁজলা উঠছে।

মগজ তো ধোলাই হল না। এবার কি করবে রুণু? কাছেই আদিত্য।—"এই শালীটাকে চুল ধরে ঝোলা দেখি আদিত্য। কথা বলবে না মানে!"

আদিত্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমেই সেজদির কপালের ওপরের চুল পট্‌পট্ করে ছিঁড়ল।

তারপর ও আর আরেকটা পুলিশ দুটো চেয়ারে দাঁড়িয়ে দুপাশ থেকে সেজদির চুল ধরে ওপরে টেনে তুলে ঝোলাতে থাকল। ঝুলন্ত সেজদির পাছা আর পায়ে পড়তে থাকল রুণুর বুটশব্দ লাথি। পুড়িয়ে দিল ওর প্রতীকী চুরুটের আগুনে হাতে পায়ের এখানে ওখানে। মুখ থেকে নিসৃত হতে থাকল অশ্রাব্য বাক্‌বর্ষণ। অবশেষে আদিত্যরাও শ্রান্ত। ওরা চুল ছেড়ে দিল। ধপ্ করে সেজদি মেঝেতে পড়ে গেল। প্রায় অচেতন। মরে গেল না তো? তাই ঝটিতি জলের ঝাপ্‌টা ইত্যাদি।

ওদের যে কাজ

গৌরীকে আগেই নিয়ে গেছে সেন্ট্রাল লক্ আপে। এবার আমাকেও একাই নিয়ে গেল। রাত প্রায় আটটা। লক্-আপ অফিসে সেজদির জন্য চিন্তিত হয়ে বসে আছি। এমন সময় সেজদিকে কোনরকমে চাগিয়ে আদিত্য আর আরেকটা লোক ঢুকল। সেজদি খুব কষ্ট করে বেঞ্চেও বসল। লক্আপ ও.সি বলল, "যেরকম মেরে মেরে নিয়ে আসেন!" তারপর কেমন একটা মুখ করে, যেন পরম বিতৃষ্ণায় লিখল," নো ইনজুরি, নো কমপ্লেন'।

"তোমাকে আজ ভীষন মেরেছে, না সেজদি? "আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সেজদি মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করতে পারল না। তখন ঘুরে বসে আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা ওকে আজ প্রচণ্ড মেরেছেন, না?"

আশ্চর্য! এ কি নিলর্জ্জতা, না কি অনুশোচনা? আদিত্য অকপটে স্বীকার করল, "হ্যা, প্রচণ্ড মেরেছি। জীবনে আমি কোন মেয়েছেলেকে এভাবে মারিনি।"

আমার বুকটা হায় হায় করে উঠল। কী যে হবে সেজদির! ভীষণ দুশ্চিন্তা। নাঃ, তবু নুইব না আমরা।

হঠাৎ বুলুর ঝাঁঝানি—"যান্ যান্—আমি পারব না এসব আসামী ওপরে তুলতে। আপনারা মেরে মেরে আনবেন—।"

আদিত্য কাঁচুমাচু মুখ করে অন্য লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে সেজদিকে কোনরকমে ধরে তুলে নিয়ে এল তিনতলায় একেবারে সেলের গরাদের সামনে। খাওয়ার সময় সেজদি একদম খেতে পারল না।

আজ আর আমাদের তিনজনকে একই সেলে রাখল না। সেজদিকে রাখল আমাদের উল্টোদিকের সেলটাতে। কেন যে এই ব্যবস্থা হল ভেবে ভেবেও বুঝতে পারলাম না। সম্ভবত মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য। 'সলিটারি সেল' তো একটা শাস্তি! থানার কাজ তো তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করা—তারা কি মারধর সহ অন্যান্য শাস্তি ও দিতে পারে? এইসব নানা প্রশ্ন মনটা ওলোটপালট করে দিচ্ছিল। এইভাবে একা রাখল ২রা অগাষ্ট অব্দি। আমাদের সেল থেকে সেজদির সেলটার খানিকটা অংশ দেখা যায়—সেটাই বাঁচোয়া। সেজদি 'সলিটারি সেলে' ঢুকে গিয়ে কিছুক্ষণ গরাদের কাছে বসে থাকল। আমরা বললাম, "সেজদি যাও শুয়ে পড় গিয়ে।"

আমরাও আব্রু দেওয়ালের এপারে এসে ঠাণ্ডা মেঝেতেই কাৎ হলাম। কম্বলগুলো এত নোংরা, এত ছার পোকায় ভর্তি। শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম, দেওয়ালের ফুটো দিয়ে ছারপোকা

বেরুচ্ছে। আমি আর জয় আলোচনা করছিলাম একা একা এখন ও ঘরে কি করছে। হঠাৎ সেজদির চিৎকাল "সাথী, সাথী—" কি ব্যাপার? ছুটে গেলাম গরাদের কাছে। একটা মাতাল আসামী তখন সেজদির গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে মাতলামি করছে। আমি আর জয় চিৎকার করে ওয়ার্ডারকে, জমাদারকে ডাকতে থাকলাম। ভয়ঙ্কর ভাবে গরাদ ঝন্‌ঝন্‌ করে বলতে থাকলাম—"এক্ষুণি গরাদ খোল। আমরা মারব লোকটাকে।"

ওয়ার্ডার, জমাদার ছুটে এল। ওদিকে ছেলেদের সেল থেকে কয়েদীরা চিৎকার করছে। "ছেড়ে দাও ওকে আমাদের হাতে"......আমরা রাগে দুঃখে, অপমানে, অসহায়ত্বে কাঁপছি। একেতো পুলিশের অত্যাচার অপমান, তার ওপর কয়েদীও অপমান করবে! সংঘবদ্ধ অত্যাচারী পুলিশকে না রুখতে পারি, তাই বলে একটা মাতাল অসভ্য কয়েদীকেও কি রুখতে পারব না? হয়ত মানসিক চাপ বাড়ানোর জন্য স্পেশ্যাল সেলই ওকে উস্কেছিল। ইতিমধ্যে কজন সেপাই এসে পেটাতে পেটাতে নিয়ে গেল মাতালটাকে।

অনেকমাস বাদে জেলখানায় আমাদের রাজনীতিক সহবন্দিনীদের যখন এ ঘটনাটা বলেছিলাম তখন তারা তীব্র সমালোচনা করেছিল, কারণ 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত' একজন সহবন্দীকে এভাবে সেপাই দিয়ে পেটানো নাকি অত্যন্ত অন্যায় ও বেঠিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের যুক্তি আমি বুঝিনি। আমরা নিজেরাই তাকে পেটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের গরাদ থেকে বেরুতে দেবে কেন? আর প্রোলেতারিয়েত হতে পারে, তাও আমরা সঠিক জানি না, তবু লুম্পেন তো বটেই। সহবন্দী বলে তাকে শাস্তি দেব না? বিশেষ যখন বন্দিত্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের অপমান করছে!

সে রাতও কাটল। আগের রাতের মতো বীভৎস আওয়াজ আর শমনি ডাকের আতঙ্কের মধ্য দিয়ে।

বিশে জুলাই। সকালে উঠে আমরা চায়ের ভাঁড় ভেঙে তার গুঁড়ো দিতে দাঁত মেজে তৈরী হয়ে আছি কতক্ষণে গরাদ খুলবে। গরাদ ধীরে দাঁড়িয়ে আছি। সেজদি ও ধারের গরাদের কাছে এসে বসে আছে। এক বিপন্নতাবোধ আমাদের মধ্যে গুমিয়ে গুমিয়ে উঠছিল। তবু কঠোর ধৈর্য ধারণ করে রয়েছি ভেতরে ভেতরে। যখনই একান্ত হয়েছি সেন্ট্রাল লক্ আপে পরস্পরে আলোচনা করেই নিয়েছি আমরা ভয়ঙ্কর দৃঢ় আর ধৈর্যশীল থাকব। থেকেওছি শেষ দিন পর্যন্ত.....

সমস্ত অফিস ঘরটায় লোক গিজগিজ করছে। কিছু যেন বাইরের লোকও আছে। ওহো, এদের মধ্যে দুজন আবার প্যান্ট-শার্টের ব্যাপারী—প্রদীপ আর শচীকে প্যান্টের কাপড়ের নমুনা দেখাচ্ছে আর হেসে হেসে গলে পড়ছে যেন। হাত-কাটা ছেলেটা চা দিচ্ছে একে ওকে। ঘরে রয়েছে উমাশঙ্কর, মানস, অমিত, দীনা, নীলু, আদিত্য, সরকার—আরও অনেকে। রুণু নিজের চেয়ারে বসে চুরুট টানছে। আমাদের বসিয়ে আজও কিছু সাদা, লেখা, ছাপানো কাগজ দিল সই করার জন্য। কিছু ফর্মের মতো কাগজও ছিল। ওরা যা যা বলল লিখতে হল। জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করল আবার। একই প্রশ্ন। সৌমেনের হদিশ, নকসালবাড়ি রাজনীতি করি কিনা, ছেলেদের নাম ধাম ইত্যাদি।—আমাকে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, "ছাত্রীদের পলিটিক্স

দেওয়া হত নাকি?"

আমি পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, "পলিটিক্স দেওয়া মানে?"

"প্যা-লি-ন্টি-ক্-স্ দেওয়া ম্যানে!" ভেংচি কেটে প্রদীপ বলল। "মারব এমন লাথি!"

আমি লোকটার রাগ দেখে হেসে ফেলে মুখটা ঘুরিয়েই দেখি উমাশঙ্কর জ্বলন্ত সিগারেটটা জয়ের অনাবৃত ডান কাঁধের ওপর চেপে ধরল। জয়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছি ও দাঁতে দাঁতে চেপে যন্ত্রণার আওয়াজটাকে ঠেকাচ্ছে।—কিছুতেই উঃ আঃ শব্দ বের করা চলবে না তো—কোনও দুর্বলতাই আমরা ওদের দেখাব না।

এমন সময় রুণু হাঁকল, "এই, অঞ্জনটাকে নিয়ে আয়।" অঞ্জন ঢুকে গেল রুণুর ঘরে। কিছু বাদেই টর্চার চেম্বার থেকে লাঠি পেটানোর আওয়াজ আর গালাগাল শোনা যেতে লাগল। ভয়ঙ্কর মর্মন্তুদ আর্তনাদ যেন দেওয়াল ফেটে বেরিয়ে আসতে থাকল। অঞ্জন মার সহ্য করতে না পেরে চেঁচাচ্ছে। উঃ, কানে শোনা যাছে না! কী বীভৎস লাগছে ওর আর্তনাদ।

আওয়াজ থামল। অঞ্জন বেরিয়ে এল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বুঝলাম ওকেও পিটিয়েছে ঝুলিয়ে পায়ের পাতার তলায়। ও বারান্দায় বেঞ্চটায় গিয়ে বসল।

অরুণ ব্যানার্জি গুনগুন করে ঠুংরির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সেজদির দিকে এগিয়ে এল। "কিরে গান জানিস?" অরুণের প্রশ্ন। সেজদি কোন জবাব দিল না। অরুণ দড়াম করে সেজদির পিঠে বসিয়ে দিল লাঠির ঘা। আবার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রুণুর ঘরের দিকে যেতে জয়ের পা-টা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। আচমকাই ঘটে গেল ব্যাপারটা—তাই চাপাস্বরে জয় একটু উঃ করে উঠল। অরুণ ব্যানার্জি হাসতে হাসতে ঢুকে গেল রুণুর ঘরে।

সন্তোষ পাশেই ছিল। জয়ের চুলটা টেনে বলল, "বড্ডো লাগল, না?" জয় আস্তে আস্তে উঠে বারান্দার বেঞ্চটায় বসল।

সেজদিকে প্রদীপ তখন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ওরা অনেক চিঠিপত্র নিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। আত্মীয়-স্বজনের চিঠি। সৌমেনের একটা চিরকুটও পেয়েছিল ওরা। তাতে বাঁকুড়ার একটা গ্রামের বাড়ির ঠিকানা ছিল। ওই ঠিকানায় জানাতে বলেছে আমাদের, বিশেষ করে মায়ের কুশল সংবাদ। মা তখন সর্দি কাশিতে ভুগছিল। চিরকুটটা নষ্ট করে একটা ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ভাইয়া, বুড়োর হাতে লেখা চিঠি—যেন এক পরম সম্পদ। প্রদীপ এখন পড়েছে সেই চিঠি নিয়ে। সেজদি বলেই চলেছে ও চেনে না ঠিকানার মালিককে। রাগের চোটে প্রদীপ জ্বলন্ত সিগারেটের ডগাটা চেপে ধরল সেজদির হাতের ওপরে। তারপর উঠে গিয়ে ঢুকল রুণুর ঘরে। হঠাৎ সন্তোষ একটা ঘুঁসি লাগিয়ে দিল সেজদির ঘারের পাশে। সেজদি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল।

ওদিকে অঞ্জনকে নিয়ে পড়েছে মানস আর অমিত। অমিত ফাঁকে ফাঁকে এসে একটা ফাইল ঘাঁটছে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাত সেজদির পায়ে এক ঘা লাঠি মেরে দিল। কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বলল," নাঃ অন্য ওষুধ দিতে হবে। এস.বি.তেই পাঠাব এগুলিকে।" এস.বি.অর্থাৎ পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ।

প্রাচীর চলে গেলো

বিশে জুলাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস। কার্জন পার্কে ছিল প্রগতিশীল কয়েকটি গোষ্ঠীর জমায়েত ও নাটক অনুষ্ঠান। হঠাৎ স্পেশ্যাল সেল প্রায় ফাঁকা করে রুণু সমেত অমিত অরুণ আদিত্য-টাদিত্য সবাই কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ফিরে এল বিকেল গড়িয়ে গেলে। হাত পা ছড়ে গেছে। বুঝলাম কোথাও গিয়েছিল হামলা করতে। পরে জেনেছিলাম ওরা কার্জন পার্কে গিয়েছিল অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করতে। এবং সেদিনই কার্জন পার্কে প্রবীর দত্তকে হত্যা করে পুলিশ নেতৃত্বে। প্রবীর তখন শেষ কৈশোরের কবি।

সে দিন বেলা চারটে পর্যন্ত নানা নির্যাতন পর্ব সমাধা হলে আবার আমাদের সেন্ট্রাল লকআপে নিয়ে এল এবং সেই একই প্রহসন 'নো ইনজুরি, নো কমপ্লেন।'

এতসব অত্যাচারেও যখন রুণু ব্যর্থ হচ্ছে তখন কি করবে রুণু? ব্যর্থতা মেনে নিলে তো তার চলবে না। অনেক বড় শিরোপা পেয়েছে সে। তার ওপর ওপরওয়ালার ধ্যাতানিরও তো আশঙ্কা আছে। তাই আবার রাত আটটায় তিনতলার দরজার গা শিউরোন ঝনঝনানি আর সঙ্গে সঙ্গে শমনি হাঁক—'অর্চনা গুহ, লতিকা গুহ—অফিস কল্।'

চমকে উঠলাম। এতরাত্রে আবার ডাক কেন? আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। তবু মনে মনে আওড়ালাম "কিছুতেই হারব না।" আমাদের গরাদ খুলে নিয়ে এল স্পেশ্যাল সেলে।

প্রায় নির্জন লালবাজারের চত্বর। রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ কমে এসেছে। কিছু ভ্যান দাঁড়িয়ে। কিছু সশস্ত্র পুলিশ এখানে ওখানে। সেজদি ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তিনদিন ধরে অত্যাচার, আতঙ্ক, আশঙ্কা—সবকিছু ওকে অবশ করে ফেলছে। ও আমাকে ধরে হাঁটাচ্ছিল। স্পেশ্যাল সেলের বাড়িটা নিঝ্‌ঝুম। বেশির ভাগ আলোই জ্বলছে না। লম্বা বারান্দাটা আলো আঁধারিতে ভৌতিক লাগছিল। বারান্দায় দু তিনটে পুলিশ। কিছুক্ষণ অফিস ঘরে বসিয়ে রেখে সেজদিকে আদিত্য রুণুর ঘরে নিয়ে গেল।

আদিত্যকে রুণু বলল টর্চার চেম্বারে সেজদিকে নিয়ে গিযে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আদিত্য সেজদিকে চেয়ারে বসিয়ে ভয় দেখিয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকল। শাসিয়ে বলল সব কিছু বলে না দিলে চারজন হিন্দুস্তানীকে ডাকবে। তারা তৈরী হয়েই আছে ধর্ষণ করার জন্য! কিন্তু—

রুণু ওর ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কিছু বলছে না কি?" আদিত্য যে মুহূর্তে জানাল যে সেজদি কিছুই বলছে না রুণু যেন লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল টর্চার চেম্বারে। অজস্র খিস্তি করতে করতে আদিত্যকে বলল, "ওর হাতদুটো বাঁধতো।" হাত বাঁধা হলো।

এইবার রুণু আসামীদের কোমরে বাঁধার দড়ির চামড়া বাঁধানো গোল প্রান্তটা দিয়ে সেজদির মাথায় অবিরাম মেরেই চলল। মাঝে মাঝে লাথিও চালাল। গালাগাল তো ছিলই। আমি পাশের অফিস ঘরটা থেকে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনতে লাগলাম—প্রায় মিনিট প্রায় মিনিট পনেরো ধরে। ঠিক যেন নারকেল ফাটানোর আওয়াজ। উঃ, আওয়াজটা আমি যেন সহ্য করতে পারছি না। এখনও আমার কানে যেন আওয়াজটা বাজে। নিস্তব্ধ রাত্রে ঐ আওয়াজটা যে এক বিকৃত ব্যক্তিত্বের অত্যাচারের তা যে কেউ শুনলেই বুঝতে পারত।

এ সবই ঘটছিল স্পেশ্যাল সেলের ব্যর্থতার জ্বালা থেকে।

এবার আমাকে লক্-আপে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগে নিল। আমি জিজ্ঞাসা করলমা "অর্চনা যাবে না?"

"পরে যাবে।"—মনটা আমার কেমন শঙ্কিত হল।

আমাকে তিনতলার সেলে ঢুকিয়ে দিল। তখন খাবার সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমি আর জয় বললাম অর্চনা না এলে খাবো না। কি করে যে খবরটা ছেলেদের সেলেও পৌঁছে গেল জানি না। রান্না ঘরের ছেলেগুলোই হয়ত নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করে আলোচনা করছিল। তাতেই খবর ছড়িয়েছে। ব্যস্—তিনতলার সমস্ত বন্দীরা জানিয়ে দিল যতক্ষণ না অর্চনাকে ফিরিয়ে আনা হবে তারা কেউ খাবার খাবে না।

রাত তখন প্রায় নটা। সেজদিকে আদিত্য আর অন্য একটা পুলিশ প্রায় চ্যাং দোলার মতো করে নিয়ে এল। ওয়ার্ডার বুলু কিছুতেই রাজি হয়নি এরকম আহত অসুস্থ বন্দিনীকে ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে। গরাদের মধ্য থেকে দেখলাম সেজদির ভয়ঙ্কর অবস্থাটা। কোন রকমে মেঝেতে বসল। জল চাইল অস্ফুট গলায়। ওয়ার্ডার ভাঁড়ে করে জল দিল। সেজদি পারল না ভাঁড়টা মুখ অব্দি তুলতে। ওয়ার্ডার খাইয়ে দিল জলটা। তারপর কোনরকমে হামাগুঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকে গেল সেলের ভেতর দিকে।

এরপর সেলের মধ্যেই আমাদের খাবার দিল। আমরা আর সেদিন খেতে পারিনি। ছেলে বন্দীরা খেয়ে নিল। গরাদ সব বন্ধ হল।

সেই রাত্রেই চারটি মেয়ে বন্দী এল। ভীষণ দুস্থ। প্রচণ্ড ব্যচাল। কেমন ঝগড়াটে মতো। তিনটির বয়স বোধ হয় কুড়ি পেরয়নি, একজন একটু বয়স্কা। জিজ্ঞাসা করতেই বলল, "পেটি কেস্। ময়দান থেকে ধরে এনেছে।" বুঝলাম সব। ভাগ্যহীনাদের দারিদ্র্যের মাসুল। আমি যখন জানালাম পুলিশ আমাদের নকসাল সন্দেহে ধরে এনেছে, সবচেয়ে ছোটটি গম্ভীরভাবে বলল,"ও বুঝেছি। 'পার্টি'র কেস। মানে রাজনীতিক পার্টির মামলা। ওদের ভাগ্যে রাতের খাবার জোটেনি। আমার আর জয়ের খবরটা দিয়ে দিলাম। সাররাত ওরা বক্‌বক্ করছে। অসহ্য লাগছে আমাদের। ঘুম তো ঠিক হয় না। কিন্তু কথার আওয়াজ ভালো লাগছিল না। আসলে সব সময়েই আমাদের অতন্দ্র চেতনা শুধুই একটা বীভৎস ঝনঝনানি শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত। মেয়েদের বললাম, "একটু চুপ করো না।" ওরা ঝগড়া করে উঠল—"কেন, তোমরা ঘুমোও না ওদিকে। আমরা কথা বলব না তো কি করব। কাল সকালেই তো চলে যাবো।"

**শরীর**

একুশে জুলাই। সবে ভোর হয়েছে। সেজদিকে দেখার চেষ্টা করলাম। নাঃ দেখা যাচ্ছে না। বেশ একটু আলো ফুটলেও ওকে দেখা গেল না। তখন আমি আর জয় ডাকতে থাকলাম। না, তাও তো সাড়া নেই। শেষে চিৎকার করে ডাকতে থাকলাম "সেজদি, সেজদি"। আমাদের চিৎকাল শুনেই হয়ত ওর ঘুমের আচ্ছন্নতা কেটে গেছিল। হামাগুঁড়ি দিয়ে গরাদের কাছে এসে বসল। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, "আমি যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাদের

ডাক শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সাড়া দিতে পারছিলাম না, শরীরটা নাড়াতেও পারছিলাম না। আমার মাথায় ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে।''......আমি জয় তখন গরাদবন্দী অসহায় দর্শক।

ছটায় গরাদ খুলে চায়ের আয়োজন শুরু হল। সেজদিকে ধরে ধরে বারান্দায় বসালাম। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। মাথাতে হাত দেওয়াই যাচ্ছে না যেন। এত ব্যথা মাথায়। জয় ওর চুলগুলো নেড়েনেড়ে জট ছাড়িয়ে ঠিকঠাক করে দিল। মাথার এখানে ওখানে ফুলে উঠেছে। গা বেশ গরম। গলা দিয়ে স্বর যেন বেরুচ্ছে না। তবু থেমে থেমে গতরাতের রুগ্ণ আদিত্যের তাণ্ডব কাহিনী বলে গেল।

চা খেতে খেতে আমরা তিনজন ঠিক করলাম 'পেটি কেসে'র মেয়েদের হাত দিয়ে গোপনে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমার জামাইবাবুকে একটা চিঠি পাঠাব। জামাইবাবু ঐ কোর্টেই বয়োজ্যেষ্ঠ উকীল। ব্যাঙ্কশাল কোর্টেই মেয়েগুলোর মামলা। আজই ওরা খালাস পেয়ে যাবে। সেলের ভেতরে এসে এদের জিজ্ঞাসা করলাম ওরা আমার জামাইবাবু নলিন চ্যাটার্জিকে চেনে কিনা। ওরা তো হৈ হৈ করে উঠল—চেনে। ওদের বললাম কোর্টের কোন ঘরে উনি বসেন। "সে আমরা ঠিক চিনে বের করে নেব।" তখন ওদের খুলে বললাম আমাদের ইচ্ছাটা। ওরা সহজ সহমর্মিতায় বুঝে গেল যে ওই চিঠি জামাইবাবু পেলেই আমার মা বাবা ভাইবোন খবর পেয়ে যাবে আমরা কোথায় কিভাবে আছি। জানতে পারবে ২ রা অগাষ্ট শেয়ালদায় মামলার তারিখ আছে। পরম বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় দেখলাম ওই দুস্থ, অশিক্ষিত, সমাজের আলোর আড়ালে থাকা কিশোরী মেয়েগুলো অবলীলায় রাজি হয়ে গেল চিঠি নিয়ে যেতে। বিশেষ করে ছোটটি তো ছটফটিয়ে বলে উঠল, "দাও না কি দেবে। আমরা ঠিক করে নিয়ে যাবো। আমাদের তো পুলিশ প্রায়ই তুলে আনে ঠিকমত বরাব্বর না দিলেই। আমরা তখন গায়ের কাপড় চোপরের মধ্যে লুকিয়ে টাকা পয়সা, নস্যি, বিড়ি নিয়েই এখানে ঢুকি, আবার বেরিয়েও যাই। ওরা ধরতেও পারে না। ভাবছ কেন? দাও না কি লিখে দেবে।"

কাগজ কলম তো নেই। লিখব কিসে? ঘরের কোনায় ওই তো একটা কাগজের ঠোঙা—ময়লা ময়লা। তবু সেটারই একটু সাদা অংশ ছিঁড়ে নিলাম। চায়ের ভাঁড়ভাঙা টুকরো দিয়ে অতি কষ্টে কয়েকটা কথা লিখে ভাঁজ করে ওদের হাত দিয়ে দিলাম। কি কায়দায় ওরা যে মুহূর্তে ওটা কোথায় যে লুকিয়ে ফেলল তা বুঝতে না বুঝতেই ভাত খাওয়ার ডাকে এল। ওরা খেয়ে বারান্দা থেকেই সোজা নীচে নেমে গেল জমাদারের সঙ্গে। ওদের কোর্টের ভ্যান ততক্ষণে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কল্‌কল্‌ করতে করতে প্রাণবন্ত মেয়েগুলো চলে গেল। তখন আর মনে হল না মেয়েগুলো ঝগড়ুটে, বাচাল বা বিশৃঙ্খল বিপথগামী। ওরা আমাদের বন্দীত্বের জীবনে প্রথম বন্ধু। ওদের তো কোনও দিন ভুলতে পারতো না। কিন্তু কোনদিন ওদের দেখাও পাবো না। হয়ত আজ ওরা বেঁচে নেই। হয়ত বাধ্য হয়েছে আরও আরও অন্ধকারে ডুবে যেতে আর সমস্ত মান মর্যাদা স্বাস্থ্য খোয়াতে।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো ওরা চিঠিটা ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছিল। আমার

জীবনবৃত্তে একটা ছোট ঝক্‌ঝকে তারার মতো ওরা আলো দিতেই থাকবে।

**মোট সাতাশ দিন**

একুশ তারিখ সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর কাটিয়ে বিকেল, বিকেল্ উৎরে রাত হয়ে গেল। সারা দিনে আর অফিস কল্ এল না। অথচ প্রতি মুহূর্তে বুকটা ছ্যাঁৎ করে করে উঠছে—ওই বুঝি ডাক এল। আবার বুঝি শুরু হবে অত্যাচার, গালাগাল আর নোংরামি। নাঃ, সারাটা দিন মেঝেতে শুয়ে বসেই কেটে গেল। ওপারের সেলটায় সেজদি শুয়েই থাকল। মাঝে মাঝে গরাদের কাছে ঘসটে ঘসটে এসে বসছে। বেশিক্ষণ মাথাটা সোজা রেখে বসতে পারছে না। একটু বাদেই একদম ভেতরের দিকে গিয়ে শুয়ে পড়েছে—যাতে বারান্দা থেকে কেউ না দেখতে পায়। মাঝে মাঝেই আমরা চেঁচিয়ে ডাকছি ওকে—অনেকক্ষণ সাড়া না পেলে। ডাকাডাকি শুনে গরাদের কাছে এসে দেখা দিচ্ছিল।

সেদিন দুপুর দুটো। আমরা দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে এপারে ওপারে কথা বলছি। অঞ্জনকে নিয়ে জমাদার এল। ও কোনরকমে বসে অতি কষ্টে হাত দিয়ে ভাত তুলে তুলে খেল। ওর হাঁটা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম কী অত্যাচারটাই না করা হয়েছে। এমন কি নাক মুখ অব্দি ফাটিয়ে দিয়েছে মেরে মেরে। গতকাল ঝুলিয়ে মেরেছে। আজও প্রচণ্ড মার খেয়েছে। জামাটা অব্দি ছিঁড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল ওদিকের সেলে। আমাদের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

সন্ধ্যের পর ঝন্‌ঝন্ করে দরজা খোলার আওয়াজ। জমাদারের মমতাহীন চিৎকার—"অঞ্জন কর—অফিস কল্।"

আবার শুরু হবে সন্ধ্যার নির্জনতায় অকথ্য অত্যাচার তরুণ ছেলেটার ওপর।

আজ আর আমাদের স্পেশ্যাল সেল যাত্রা নেই। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করতে বসলাম একদিনের ঘটনার পরিসরকে। কতটা কি গভীর আর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া আর আমাদের যৌথ জীবনের ওপর, আমাদের ব্যক্তি সত্তার ওপর, ব্যক্তি স্বার্থের ওপর এবং সর্বোপরি চারপাশের পরিচিত সমাজ তথা সৌমেনের রাজনীতিক পরিমণ্ডলের ওপর—সব কিছু একটু একটু করে মেপে মেপে দেখছিলাম নিজের মনে। জয়ের সঙ্গে কথাও বলছিলাম এ নিয়ে। জয়ের মনোবলটা চমৎকার আছে। একটুও ভেঙে পড়েনি এত অত্যাচার আর বন্দীত্বের অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও। সে-ও ভাবছে অনেক কিছু। আমাদের মা, ওর নিজের মায়ের অবস্থা আর ভাইয়া মানে সৌমেনের অবস্থা নিয়ে ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমিও ভাবছি 'বুড়ো' কি করবে যখন শুনবে। তাছাড়া ও যদি হঠাৎ এর মধ্যে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দমদমে চলে আসে! পুলিশ নিশ্চয়ই সর্বদা নজর রাখছে আমাদের বাড়ির ওপর। ওকে পেলেই গ্রেপ্তার করবে। আর তারপর......। না, আর ভাবতে পারছি না।

সন্ধ্যের পর সেলের ভেতর কমজোরী আলোটা একটা লালচে বিষণ্ণ আভা ছড়াচ্ছে। চুপ করে বসেছিলাম—ভাবছিলাম সৌমেনের চিরকুটটা কেন যে ছিঁড়ে ফেলিনি আমরা! ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়েই পড়লাম।

পরদিন বাইশ তারিখ আবার অফিস কল্। অভ্যস্ত অভ্যর্থনায় আমাদের অফিসে বসিয়ে

ওদের রীতি মতন আচরণ শুরু করে দিল। টুকটাক মারধোর, কটুকাটব্য, বোকা বোকা প্রশ্ন, ভয় দেখানো, লেখানো—সবই চলল। এইভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে দুপুর। হঠাৎ শুনলাম অঞ্জনের বাড়ি থেকে ওর মা বাবা এসেছে জামা কাপড় নিয়ে। আমরা চমকে উঠলাম। এ ওর দিকে তাকালাম। মা বাবাকে লালাবাজারে দেখা করতে দেয় নাকি?

"আপনাদের মা আর বড়দাও পরশু এসেছিলেন। দেখা হয়নি আপনাদের সঙ্গে?" আদিত্য বলে উঠল।

"কই, না তো! আমরা তো কিছু জানি না।"

মনটা মুহূর্তে যেন ভেঙে পড়ছিল। শক্ত করলাম। ভাবলাম মিথ্যে কথা বলছে। গলাটা শুকিয়ে উঠল। ইস্, এই নরকরাজ্যে আমাদের খোঁজে মা এসেছিল! হায়রে, কত শাস্তিই যে পাচ্ছে মা বিনা দোষে। নাকি, ছেলের নকসালবাড়ি রাজনীতি করার দোষে? অথচ নকসাল বাড়ি রাজনীতি বা তার দলীয় সংগঠন তো বেআইনী বলে ঘোষিত নয়। তবে শাস্তি কেন? আসলে কায়েমি শক্তি আর সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানালে শক্তিমানেরা তা সহ্য করে না।

অঞ্জনের মা বাবা ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন। কি একটা খাবার মা ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। কী খুশি খুশি মুখ! ছেলের হদিশ পেয়েছেন তাঁরা শেষপর্যন্ত। আর সেটাই কিন্তু হল কাল। অঞ্জনের আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেল। রুণুর সেল জেনে ফেলল অঞ্জন হাওড়ায় সি.পি.এম. এলের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। পুলিশ ওকে খুঁজছিল। অঞ্জন ওর আসল নাম নয়।

পরিষ্কার জামা কাপড় পড়েছে অঞ্জন। কিন্তু মুখটা কালো করে বসে আছে—হতাশা আর আতঙ্ক ফুটে বেরুচ্ছে। আজ ভয় ওকে গ্রাস করছে যা এ'কদিন দেখিনি। মা-বাবার ব্যাকুল স্নেহ ওকে অজান্তে কঠিন পরীক্ষায় ঠেলে দিল। মা বাবা চলে যেতেই অঞ্জনকে হ্যাঁচকা টানে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিল। "এঃ নতুন জামা কাপড় পরেছে শালা!"—বলেই সকলের সামনে টান মেরে জামাটা খুলে নিল ওরা। হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে গেল টর্চার চেম্বারে। রুণুর সদর্প উপস্থিতিতেই সবটা ঘটছে। কী হাসি হাসি ব্যঞ্জনা রুণুর মুখে—যেন ওরই এক সাফল্য অঞ্জনের আসল রূপ ধরে ফেলাটা! একটু পরেই অঞ্জনের আর্তনাদ একটা হাহাকার তুলে দিল সমস্ত স্পেশ্যাল সেলটায়।

অনেকক্ষণ বাদে অঞ্জনকে দেখা গেল রুণুর সামনের চেয়ারে বসে আছে। রুণুর সঙ্গে কথা বলছে। ওর মনোবল ভাঙতে শুরু করেছে.....গড়্গড়্ করে বলতে থাকল সেইসব কথা যা এতদিন ও ধৈর্যের সঙ্গে বন্দী করে রেখেছিল।

তখন বিকেল শেষে বিষণ্ণ সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বারান্দায় রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আকাশ থেকে পাক খেতে খেতে একটা শকুন নামছে।

বারান্দায়, অফিস ঘরে কেমন যেন ফূর্তির আমেজ বইতে থাকল। কমল একবার বেরিয়ে গিয়ে নীচে থেকে মদ খেয়ে ফিরে এল। রাধাবাজার স্ট্রীটে অসংখ্য ঘড়ির দোকানের মাঝেই নাকি একটা মদের ঠেক আছে। শচীন দীনা আদিত্যরা খৈনি বিনিময় করছে। চা-ওলা ছোঁড়াটা চা বিলি করছে। আমাদেরও এগিয়ে ছিল কাপে করা চা। "না আমরা খাবো না এ চা" বলতেই কেমন রাগে লাল হয়ে উঠল অমিত মজুমদার। অরুণ ব্যানার্জি বেশ গলা খুলেই

কালোয়াতি ধরেছে। মানস, উমাশঙ্কর রুণুর দুপাশে দাঁড়িয়ে বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে অঞ্জনের যন্ত্রণা উপভোগ করছে।

আমার গলা শুকিয়ে উঠেছে। সেজদিকে কী বেদনার্ত দেখাচ্ছে! জয় সেই থেকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়েই রেখেছে যাতে অঞ্জনের এই ভেঙে যাওয়াটা না চোখে পড়ে। কেবলই মনে হচ্ছে কেন যে ওঁরা এলেন ছেলের খোঁজ করতে। ও যে আরও বেশি মার খাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি মারখাচ্ছে ওর বিবেকের হাতে মনের অন্তর্লীন। ওর বেদনাটা আমাদের স্পর্শ করেছে।

সেই সন্ধ্যায় আমরা লক্‌আপ অফিসে বসে আছি। সঙ্গে পাহারা ছিল দীনা আর নীলু। পাশের বেঞ্চেই বসে আছে হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল, "অর্চনাকে খুব মেরেছে না?"

"হ্যা। খুব।" আমার ছোট জবাব।

"বেশ করেছে।" দীনার মুখটা নিষ্ঠুর নির্বিকার।

"তাহলে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?" আমি বোকার মতো না বলে পারলাম না।

সেদিন গভীর রাত্রে নিশাচরের ডাক আবার। ঝন্‌ঝন্ করে খুলল তিনতলার কোলাপসিব্‌ল্ গেট। তারপরেই "অঞ্জন কর। অঞ্জন ক-অ-র্।"......গেট বন্ধ হবার আওয়াজ। অঞ্জনকে নিয়ে চলে গেল। আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় কেন কোথায় নিয়ে গেল, কিসের জন্য? বারবার ছেলেটার তরুণ লালচে মুখটা চোখে ভেসে ভেসে উঠছিল। পরদিন সকালে মহিলা ওয়ার্ডার বুলুর কাছে শুনলাম অঞ্জনকে রেইড করানোর জন্য নিয়ে গেছে। শুনেছি 'রেইড' করানোর জন্য অনেক সময় বোরখা পরানো হয় বন্দীকে। অঞ্জনকেও নাকি তাই করা হয়েছিল।

বুলু ভীষণ নিরুত্তাপ শুষ্ক। কাজের চাইতে চেঁচামেচি বেশি করত। কিন্তু থানা সম্বন্ধে ও আমাদের এটা ওটা খবর দিত। ও পরিষ্কার বলেছিল স্পেশ্যাল সেল ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে এবং যে কোন সময় যে কাউকে এরা বিপদে ফেলে দিতে পারে, এমন কি অন্য ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের পর্যন্ত।

সেজদি, জয়ের সাংঘাতিক শারীরিক অবস্থা দেখে বুলু একদিন বলেই ফেলল, "আপনারা ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন না কেন যে আপনাদের এভাবে অত্যাচার করছে?"

"কিন্তু আমাদের তো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নেয়ইনি।"

"হ্যাঁ ওরা এরকমই করে।" ওয়ার্ডার মাসীমা মাঝেমাঝেই গল্প করতেন আমাদের সঙ্গে। মাসীমাও একই কথা বলতেন—"ওরে বাবাঃ, ওরা যা সাংঘাতিক।" এই মাসীমার এক বোনপোকে নকসাল সন্দেহে ধরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছিল। মলদ্বার দিয়ে গরম সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়েছিল। উনি আরও অত্যাচার পদ্ধতির কথা বললেন—যেমন, কানের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া, গরম হিটারের ওপর বসতে বাধ্য করা ইত্যাদি। আমরা নিজেরা আলোচনা করতাম মাসীমা হয়ত রুণুর দালাল হিসাবে আমাদের ভয় পাইয়ে মনোবল ভাঙার জন্যই এসব বলছেন। কিন্তু আমরা অন্যত্রও শুনেছি এইরকম বীভৎস অত্যাচার পদ্ধতির কথা। মাসীমা বলতেন, "কি করব মা, পেটের দায়ে এই কাজ করতে হয়। রুণুর স্পেশ্যাল সেল যে কী

ভয়ঙ্কর—সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কখন বুঝি চাকরি যায়, কখন বুঝি গ্রেপ্তার করে। নকসালদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই সর্বনাশ।"

সত্যিই, মাসীমা, বুলু কেউই বেশিক্ষণ কথা বলত না আমাদের সঙ্গে। অন্য ওয়ার্ডার বা জমাদারের সামনেও বলত না।

সেলের গরাদের কাছাকাছি থাকত একজন পুরুষ ওয়ার্ডার বা জমাদার। কখনো কখনো সে লুকিয়ে চুরিয়ে কথা বলত আমাদের সঙ্গে এবং তার কথার প্রধান ঝোঁকেই ছিল রুণুর সেলকে গালাগাল দেওয়া। চরম ঘৃণায় কথায় কথায় ওদের উদ্দেশ্যে বলত "শালারা হারামি আছে।"

দিন যায় এক এক করে। মাঝে মাঝেই স্পেশ্যাল সেলে নিয়ে যায়। একই রকম প্রায় অভিজ্ঞতা বারবার। যেদিন নেয় না সেদিন সারাটা সময় কাটানো গরাদের ধারে বসে ওপারের গরাদে বসা সেজদির সঙ্গে কথাবার্তা চলে। আহত, অসুস্থ সেজদির চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই পুলিশরা করেনি। আসলে তাহলে ওদের কুকীর্তিগুলো নথিভুক্ত হবার ভয় ছিল যে। বরঞ্চ সেল থেকে ফিরলেই নীচের অফিসে লেখানো হত।" নো কমপ্লেন, নো ইনজুরি।"

লালবাজার স্ট্রীট আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট দিয়ে ঘড়ঘড় করে ট্রাম যায়, ঘন্টা বাজে টং টং। তীব্র হর্ন বাজিয়ে বাসগুলি ছোটে। মানুষের কোলাহল ভেসে আসে রাস্তা থেকে, দোকান থেকে। কখনো কখনো মাইকে কোন চেনা গানের রেশ। মনটা হাওয়া হয়ে যায়। চলে যায় সেলের দেওয়াল ভেদ করে। ঘুরে বেড়ায় এ রাস্তায় ও রাস্তায়। আবার কখন যেন ফিরে আসে লালবাজারে—স্বপ্নের চট্‌কা ভেঙে চায় নীচের চত্বরে ভ্যানের আওয়াজ শুনে বা লক্‌আপের দরজা খোলার ঝনঝনানিতে। ধরমরিয়ে উঠে পড়ি। "সেজদি যাও, শুয়ে পড় গিয়ে" বলে ঘরে পায়চারি করি। জয় শুঁটি শুঁটি মেরে শুয়ে আছে। থাক্। ওর গায়ে জ্বর। আমি ভাঁজ করা কম্বলগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে উঁচু করে নিয়ে স্কাই-লাইট দিয়ে ডিঙি মেরে লালবাজারের চত্বরটাকে চোখ দিয়ে জরিপ করি। দূরে স্পেশ্যাল সেল দেখা যায়।

বিকল্পহীন নরক। নরকটার গুহ্যতম ঘর হচ্ছে টর্চার চেম্বার। বাইয়ের বারান্দা থেকে দেখাই যায় না। বাইরে থেকে শোনাই যায় না আর্তনাদ বা মারের আওয়াজ। কিন্তু শোনা যায় অফিস থেকে। ঘরটায় একটা খাটিয়া পাতা। দু তিনটে চেয়ার। এককোণে একটা ছোট বেসিন। ঘরটায় টাল দিয়ে রাখা আছে সি.পি.আই.এম.এল.য়ের বাজেয়াপ্ত পোষ্টার, পত্রিকা, বই। তা ছাড়া লালপতাকা, বিরাট বড় ছবি লেনিনের, চারু মজুমদারের। কয়েকগাছা লাঠি, দড়ি এক কোনায় রাখা আছে। জলের জগ আর কাঁচের গ্লাশ একটা। এঘরে আলো বাতাস ঢোকে না। সবসময় টিমটিমে আলো জ্বলে। বীভৎস হয়ে থাকে সমস্ত পরিবেশটা। অথচ তবু ভয় পেতাম না আমরা। ভয়ে ব্যথায় চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি। মুখ দিয়ে এতটুকু আর্তনাদ বেরয়নি। আসলে নতি স্বীকার করবই না, ভয়ঙ্কর অসভ্য অশালীন লোকগুলোর সামনে চোখের জল ফেলবই না। আমাদের এতটুকু দুর্বলতা ওদের অত্যাচার বাড়াবেই—এই প্রতিজ্ঞা ও উপলব্ধি আমাদের অনড় অকম্প রাখতে পেরেছিল।

আমাদের প্রতিজ্ঞা অটুট রাখার জন্যই আমরা নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতাম। আলোচনা করতাম ওরা আরও কি কি অত্যাচার করতে পারে। ওরা ভয় দেখিয়েছিল মা ও ছোট দুটো ভাইঝিকে পর্যন্ত ধরে আনবে লালবাজারে। আমরা হিসেব করছিলাম ওরা কোথায় কোথায় যেতে পারে আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। আমার বাপের বাড়ী চন্দননগরে, আমার কলেজে, সেজদির স্কুলে, জয়ের ওয়ার্কশপে, যাদের যাদের চিঠি পেয়েছে তাদের বাড়িতে। কিন্তু না, ওরা কোথাও যায়নি।

ওরা নানারকম ভয় দেখাত। সবচেয়ে হাস্যকর ছিল অমিত, আমাদের বিরুদ্ধে মামলার আই.ও.—সে মাঝে মাঝেই একটা ফাইল নিয়ে এসে দাঁড়াত।"এই যে আপনার কিছু যে বলছেন না। আপনাদের ডি.আই.বি.র হাতেই দিতে হবে দেখছি। ওরা আপনাদের চাইছে।"—অমিত কথাটা বলল কেমন রাগ আর হতাশা মিশিয়ে।

"তাতে কি হবে?" আমি জানতে চাইলাম।

"কি আর হবে! জেলায় জেলায় ঘোরাবে। তখন বুঝবেন কি হবে।" তারপর একটু থেমে বলল, 'সেটা আমাদের ডিস্‌ক্রেডিট!' আমি অবাক হলাম। খোলাখুলি ওরা বলছে সেটা ওদের 'ডিস্‌ক্রেডিট'! তার মানে ওরা হেরে গেছে!

ওরা হেরে গেছে। লক্‌-আপে বসে অনবরত হিসাব কসতাম ওরা কোথায় কোথায় হারছে আমাদের কাছে। জয় সেজদি কখনো কান্নায় ভেঙে পড়ত বাড়ির কথা ভেবে, মায়ের কথা ভেবে, সর্বোপরি ভাইয়ার কথা ভেবে। আবার ওরা শক্ত হত। আমরা আলোচনা করতাম দেশ বিদেশের অত্যাচারের কথা, কাহিনী—বিশেষ করে ভিয়েৎনামের কথা। আমরা আলোচনা করতাম কত বিপ্লবীর অমর বীরদের কাহিনী আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরদের কথা, বীরাঙ্গনাদের কথা। ইলা মিত্রের কথা বলতাম। কত বীরত্বের কাহিনী শুনেছি সৌমেনের মুখে। ওর নিজের জীবনের কাহিনীও আমাদের প্রেরণা দিত। একাধিকবার ও কি ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশী নির্যাতন আর গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেছে অত্যন্ত সজাগ বুদ্ধি আর সাহসকে কাজে লাগিয়ে। এসব কথা আমরা নিজেদের মধ্যে নাড়াচাড়া করতাম। তারপর আস্তে আস্তে গান গাইতে শুরু করতাম। সৌমেনের কাছে শেখা গান, ওর কাছে শোনা গান। ওর অনুবাদ করা আন্তর্জাতিক গানটাও গাইতাম। টুসু গান গাইতাম। ওর নিজের রচিত গানও।

রুণুদের কানে পৌঁছেছিল গানের খবর।

"নাকি গান গাওয়া হচ্ছে লক্‌-আপে?" অরুণ ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করল।—জবাব দিইনি। শুধু লালবাজারের শুষ্ক নির্মম বাঁধানো চত্বরটার ওপর থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে মেঘলা রোদে ঢাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি দু তিনটে শকুন পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে আর উড়ছে।

হঠাৎ রুণুর হুঙ্কার আমার বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে "আদিত্য, ওটা খুলে ফ্যাল্‌।"

বাঁ হাতে ছিল একটা সোনা বাঁধানো লোহা। সোনা দানা নিয়ে নাকি থানায় থাকা বারণ। আমাদের মায়ের বিশ্বাস মতো ওটা আমি খুলে দিইনি পুলিশকে, কারণ ওটা তাঁর ছেলের মঙ্গলের প্রতীক। কিন্তু রুণুরা তো তাঁর ছেলের মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গল নিয়েই ভাবিত।

কাজেই লোহাটা খুলতেই হল। সেজদি তক্ষুনি ওর ছাপা শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে এক ফালি সরু টুকরো দিয়ে আমার বাঁ হাতের মনিবন্ধে বেঁধে দিল। ঐ লোহাটা জেলে দিয়ে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ফালিটা হাতে বাঁধাই থাকত।

রুণু এর পর একদিন ওই কাপড়ের টুকরোটা দেখেও ক্ষেপে গেল। "এই ওটা খোল্"—সন্তোষকে বলল। এবার আমি খুলতে দিইনি। যেহেতু সোনা নয়, সন্তোষ আর চেষ্টা করেনি।

রুণু সব সময়েই আক্রোশে ফুটছে। আসলে তিন তিনটে সাদামাটা মেয়ের কাছে হেরে যাওয়া! হায়রে, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রুণু গুহনিয়োগী—নকশাল নিধনে সিদ্ধহস্ত রুণু গুহনিয়োগী! সবাইকেই কি হারানো যায়? আজ এই দুহাজার সালেও রুণু গুহনিয়োগী সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। আমাদের যে তৈরী করেছে সৌমেন গুহ! সেটা ভুলবে কি করে রুণু গুহনিয়োগী আর নকশালবাড়ি রাজনীতির ইতিহাস?

সেদিন ছিল জুলাইয়ের বৃষ্টি ভেজা রাত। রাত প্রায় বারেটো। আমরা ঘুমোইনি। হঠাৎ গরাদ খোলার আওয়াজ। তিনটি আধুনিকা মহিলা—প্রচুর গয়নাগাটি সিঁদুরে সজ্জিতা—সেলে ঢুকল। আমরা অবাক্। পরিপূর্ণ গৃহবধূ। জিজ্ঞাসা করলাম "আপনাদের.....?" ওরা কেমন একটু লাজুক হেসে বলল, "হোটেল থেকে ধরেছে।"

"হোটেল থেকে? কোথায়?"

"পার্ক স্ট্রীট"

"কোথায় বাড়ি আপনাদের? কেন ধরল?"

"মানিকতলায়। আসলে.....অতরাত্রে হোটেলে......এই আর কি!"

ওরা আমরা আমরা করতে থাকল। সব বুঝতে পারছিলাম। কেমন একটা ঘোর লাগল চোখে—দেশ জ্বলছে—মানুষ-মানুষী জ্বলছে আর মানুষখেকো মানুষগুলো দাঁত বের করে হাসছে—ওরা তো জ্বলে না—নখদণ্ড নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে। ঘোরের মধ্যে ভাবছি—আমরা তিনটি সাদা মাটা মেয়ে যখন মার খাচ্ছি পুলিশের হাতে তখন তিনটি মেয়ে প্রচুর অলঙ্কার আর দামী শাড়ীতে শরীর সাজিয়ে ফূর্তি করছে হোটেলে! হঠাৎ বমির আওয়াজ। তিনটি মহিলাই বমি করছে। টুকরো টুকরো মাংস ছড়িয়ে পড়েছে বাথরুমের সামনে আর মদের দুর্গন্ধ......কী কদর্য দেখাচ্ছে ওদের!

পরদিন চা খাওয়ার পরেই ওরা চলে গিয়েছিল। সাত সকালেই।

২রা অগাষ্ট এসে গেল। শেয়ালদা কোর্টের দিন। মনে এক অস্থির উত্তেজনা। চায়ের সময় সেজদিকে বললাম আজ যদি কোর্টে তোলে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলব অত্যাচারের কথা। না শুনতে চাইলে কোর্টের মধ্যেই চেঁচিয়ে বলব ওরা আমাদের কিভাবে মেরেছে। ওদের অত্যাচারের প্রমান তো শরীরে বহনই করছি। একেবারে খোলাখুলি প্রমান। তিনজনেই ভীষণ উত্তেজিত। দমদম থেকে মা আসবে। দাদা দিদিরাও আসবে।

ভ্যান আমাদের নিয়ে শেয়ালদা কোর্টে পৌছাল। আজ আর কোর্টবাবুর ঘরে না। সোজা মেয়েদের লক্-আপে ঢুকিয়ে দিল। একটামাত্র গরাদ দেওয়া দরজা—বিশ্রী স্যাঁতসেতে একতলার ঘর একটা—মেঝের সিমেন্ট এবড়ো খেবড়ো—প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। ঘরটা থেকে কোর্টের

চত্বরের খানিকটা অংশ দেখা যায়। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি.....হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো মা ওখানে দাঁড়িয়ে পাশেই বড়দা আর বড়দার উকীল বন্ধু প্রভাতদা।

মাকে দেখে কী যে লাগছিল! মা এক পা দুপা করে সন্তর্পনে আমাদের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু না, পাহারাদার পুলিশ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ধমকাল, "লক্-আপের কাছে যাবেন না। দূর থেকে দেখুন।" মা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকল—টান টান সোজা শরীরটা সাদা থানে ঢাকা। শান্ত দীপ্ত প্রতিবাদের মতো মা দাঁড়িয়ে আছে। দৃঢ়তা, ধৈর্য, ভালোবাসার এক সাদা আলোর মতো মা দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক ঋজু দিক নির্দেশ—'ভেঙে পড়ো না'।—বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকল। সেজদি জয় গারদ ধরে কাঁদছে অঝোরে।

হায় রে স্বাধীনতা! হায় রে গণতন্ত্র! একজন উকীল তার মক্কেলের কাছে যাবে আইনী ব্যাপারে তাতেও ভয়!—না প্রভাতদা ভয় পাননি। শুধু সাবধানতা নিয়েছিলেন পাছে পুলিশের থাবা না এসে পড়ে। প্রভাতদাই আমাদের জামিনের দরখাস্ত করেছিলেন। যতদিন তথাকথিত বিচারাধীন ছিলাম। প্রভাতদাই মামলা চালিয়েছেন। ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত আইনজীবী প্রভাতদা কোন পারিশ্রমিক নেননি এর জন্য। কোন রাজনীতিরই ধারে বারেই তিনি ছিলেন না। প্রভাতদাকে তো মনে রাখতেই হবে আমাদের।

মা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাগে জামা কাপড় পেষ্ট ব্রাশ সাবান তেল, কিছু খাবার। কিন্তু কিছুই দিতে দিল না। মায়ের মুখটা বেদনায় ভরে গেল। দূর থেকেও বুঝতে পারছিলাম। আমরা চেঁচিয়ে মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, "চিন্তা কোর না, আমরা ঠিক আছি।" এবার আমাদের ফেরার পালা। কাগজে কলমে কোর্টে হাজিরা লেখা হয়ে গেছে—তাই রুণুর পুলিশের তো দরকার নেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে যাওয়ার, সিদ্ধার্থ রায়ের পুলিশের দরকার হয় না এসব করার। আবার সাতদিন বাদে তারিখ পড়ল—৮ই অগাষ্ট। ভ্যানে ওঠার সময়ও মায়ের গা ছুঁতে পারলাম না, এমন ঘিরে নিয়ে চলল রুণুর পুলিশ। ভ্যানের তারের জানলা দিয়ে দেখলাম—মা কাঁদছে খুব।

আবার সেই লালবাজারী নরক। এঁদো দুর্গন্ধময় কোর্ট লক্-আপটা যেন স্বর্গস্বর্গ লেগেছিল। স্পেশ্যাল সেল দেখি বেশ জম জমাট। দুজন মহিলা ক্যানভাসার দামী দামী রঙ্দার শাড়ী খুলে খুলে পুলিশ-গুলোকে দেখাচ্ছে—প্রদীপ, শচী নেড়ে চেড়ে দেখছে শাড়ীগুলো। মহিলা দুজন গলে গলে পড়ছে। একপাশে টুলে বসে আছে অঞ্জন। আমরা ঢুকতেই গুঞ্জন শুরু হল। তারপরই রুণুমার্কা নানাবিধ অভ্যর্থনা। আমরা তিনজনেই লক্ষ্য করছি লোকগুলোকে। বিশেষ করে অঞ্জনকে। এক ভগ্নব্যক্তিত্ব তরুণ এখন। প্রাণহীন মূর্তির মতো বসে আছে। মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে রঙ মস্করা করছে মানস, অরুণ ব্যানার্জিরা। কমল, অমিত, উমাশঙ্কর আলোচনা করছে শেয়ালদা কোর্ট নিয়ে। মনে হচ্ছিল ওখানে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না।

হঠাৎ কোথা থেকে সন্তোষের উদয় হল। আমার দিকে ভেংচি কেটে বলল, 'ইঃ, দ্যাখো না, কেমন চারু মজুমদারের মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে!" বলেই একটা চেয়ার তুলে আমার দিকে এগিয়ে এল চেয়ার ছুঁড়ে মারবে বলে। ওর বীরত্বটা দেখে হাসি পেল,

হেসে ফেললাম। চেয়ারটা নামিয়ে রেখে সন্তোষ বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

জয় বসে আছে আমার পাশেই। অরুণের রসিকতা মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠেছে। অঞ্জনকে বলল, "যাতো, গৌরীর কানটা মুলে দিয়ে আয় তো।" আশ্চর্য—পরম অনুগত আজ্ঞাবাহকের মতো অঞ্জন জয়ের কানটা মুলে দিল! এরপর আমাকে দেখিয়ে দিতেই অঞ্জন লাঠি হাতে এগিয়ে এল। কাছে আসতেই আমি ওকে একটা থাপ্পড় মারব বলে যেই হাতটা তুলেছি, অরুণ বলল, "থাক্, থাক্। চলে আয়।" উঃ! ব্যর্থতা, শপথ রাখার ব্যর্থতা যে এত করুণ হয়, এত বীভৎস হয় তা অঞ্জনকে না দেখলে কোন দিনই বুঝতাম না। শপথের মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলে আঙুলেও আসলে ফাঁক থাকে অনেক সময়।

আমরা বারান্দায় এসে বসলাম। কতক্ষণে যে লক আপে নিয়ে যাবে—ওখানে একটু হাঁফছাড়া যায়। অন্তত মানুষদ্বেষী এই কদর্য লোকগুলিকে তো চোখে দেখতে হয় না। এবার শোনা গেল রুণুর গলা, "ওদের নিয়ে যা। আজ একসঙ্গে রাখবি।"

এইদিন বিকলে থেকে একসঙ্গে তিনজনে থাকতে আরম্ভ করলাম আবার। কেন যে ওর এতদিন ওকে একা রাখল। হয়ত আশা করেছিল মনোবল ভেঙে দিয়ে কথা আদায় করবে। কিন্তু ওরা জানে না, কেউ কেউ ভাঙে, সবাই নয়।

সাথী, আমি মরতে চেয়েছি

দুদিন বাদে একটি মেয়েকে ঢোকাল সেলে। পাতলা ছোটখাটো চেহারা। শান্ত, অথচ বেদনার্ত দৃঢ়তা চোখে মুখে। কিছুটা আতঙ্কের ছায়াও চোখে। অল্প আলাপেই বুঝলাম সি.পি.আই.এম.এল.এর সক্রিয় কর্মী। চমৎকার লাগল ওকে। ও পড়েছে এস.বি.র হাতে। রোজ যায় সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই। ফিরে আসে বিকেল হতেই। কিন্তু তিন চারদিনের মাথায় ও কেমন ভেঙে পড়ল।

"সাথী, আমি আর পারছি না। ওরা ভয়ঙ্কর মানসিক চাপ দিচ্ছে। অনর্গল প্রশ্ন করছে। অজস্র প্রশ্ন—অজস্র খবর। গোপন খবর। সেন্টারের খবর, সেন্টার মাষ্টারদের খবর, পার্টির নেতাদের খবর। কোথা থেকে পাচ্ছে ওরা এত সব খবর? আমি আর পারছি না।" আমি চুপ করে শুনলাম ওর আকুতি। আমাদের খুব খারাপ লাগত ওর অবস্থা দেখে। আমরা তো তবু ভাগ করে নিতে পেরেছি সমস্ত চাপ—আর ওতো একা। কত গোপন খবর এস.বি. জেনে ফেলেছে কোথা থেকে—ও বুঝতে পারছে না। ওকে এস.বি. অফিসে পৌঁছে দিলে মহা খাতির দেখাত। ওর জন্যে বাথরুমে চমৎকার স্নানের ব্যবস্থা—সাবান, তোয়ালে, পোষাক। স্নান করতেই হতো। তারপর আসত চমৎকার চা। এরপর শুরু হত প্রশ্নের পর প্রশ্ন—চারপাশে থেকে—এ ও সে। প্রধানতঃ খাসনবিশ। বাহ্যত প্রবল ভদ্রলোক। মূলত কুটীল ক্রুর। ও লক্-আপে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই খেয়ে নিয়ে গভীর ঘুমে ডুবে যেত।

সেদিন গভীর রাত। পেটা ঘড়িতে ১টা বেজে গেছে। সেজদির ধুম জ্বর। জয়ের সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে যন্ত্রণা। ওদের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কখন যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। হঠাৎ গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকছে মেয়েটি—"সাথী, সাথী, ওঠো। দ্যাখো

আমি কী করতে যাচ্ছিলাম।" আমি ধরমড় করে উঠে বসলাম। "কি? কি?" আমাকে ও টলতে টলতে নিয়ে গেল স্নানের বাথরুমে। দেখি জলের পাইপের সঙ্গে একটা কাপড়ের ফালি ঝুলছে। "সাথী, আমি গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে গিয়েছিলাম," মেয়েটি ফোঁপাচ্ছে।

সুতি-সিন্থেটিক শাড়ীর আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে দড়ির মতো করে ঝুলে পড়েছিল। পুরনো শাড়ী—ছিঁড়ে গেল দড়ি। গায়ে কোথাও লাগেনি তেমন—বেশ উঁচু থেকে পড়েনি বলে। ভয়ে বেদনায় মেয়েটি বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঘরের আবছা আলোতে ওকে আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সেলের এক কোনায় গিয়ে ওকে নিয়ে বসলাম। সেজদি জয়ও উঠে পড়েছে। স্তম্ভিত আমরা। ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম ওরে চাঙ্গা করার জন্য। অভয় দিলাম একথা আমরা কারুর কাছে প্রকাশ করব না। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—চাপের মুখে পড়ে কোনরকম নতি স্বীকার—এমন কি স্বেচ্ছামৃত্যুর অর্থ হচ্ছে পরাজয়। ওকে মৃদু তিরস্কারও করলাম যে ওর মৃত্যু ঘটলে পুলিশ কি আমাদের ছেড়ে দিত সহজে! ও যে কী ভীষণ মানসিক চাপে এটা করতে গিয়েছিল—তা যে আমরা বুঝেছি—সেটাও ওকে বারবার বললাম ওর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য।

পরদিন সকালে দেখলাম বেশ গভীর দাগ পড়ে গেছে গলায়। ওকে পরামর্শ দিলাম গলায় বেশ ভালো করে শাড়ীর আঁচলটা জড়িয়ে নিতে। এস.বি. অফিসে বললেই হবে গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে। পরে বিকেলে ও ফিরে এলে শুনলাম কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। কদিন পরে ওর জেল হাজত হয়ে গেল। যেন বাঁচল। সবাই তাই বাঁচে। থানা হাজত থেকে জেল হাজত অন্য নরক। জেলে গিয়ে ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। ওকে বেশ ভালো লাগত আমার। নানা গুণ মেয়েটার। ও ধরা পড়ার আগে ওর স্বামী পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিয়েছিল। তার জন্যও হয়ত তার ওর প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল আমার। ওর সঙ্গে বহু বছর আর দেখা হয়নি।

কদিন বাদে অমিত মজুমদার দুজন কনস্টেবল্ সঙ্গে নিয়ে আমাদের তিনজনকে হাজির করল ডি.সি.ডি.ডি. বিভূতি চক্রবর্তীর ঘরে। ডি.সি. নাকি চাক্ষুস দেখবে আমাদের। প্রথমে নাম ধাম, তারপর এটা ওটা জিজ্ঞাসাবাদ—প্রধানত আমরা নকসালবাড়ি রাজনীতি করি কিনা। তারপর আচমকাই—'

"আপনার বাড়িতে অনেক মার্কসবাদী বই পাওয়া গেছে!"

"তাতো যাবেই। আমার পড়ানোর বিষয়ই তো রাষ্ট্রনীতি'

"আপনি মার্কসবাদ পড়ান?"

"হ্যা পড়াই"

"কি পড়ান মার্কসবাদে?"

আমি শুরু করলাম বলতে মার্কসবাদ কি। সবে এক্সপ্লয়টেশন নিয়ে বলছি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ডি.সি. সাহেব।

"আপনি তো এক্সপ্লয়েট করেন ছাত্রীদের!"

"আমি?" হতবাক্ হয়ে বললাম।

"হ্যা, হ্যা। আপনি তো কলেজ কামাই করেন।"

"আমাকে যেদিন গ্রেপ্তার করেন সেদিনও আমি কলেজে গেছি।"

ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছে পুলিশকর্তা। খ্যাক্‌খ্যাক্ করে করে অমিত মজুমদারকে বলল, "যান, নিয়ে যান ওদের।"

অমিত সেখান থেকে নিয়ে এল রেকর্ড সেকশানে। ডি.সির ঘর লালবাজার স্ট্রীটের ওপর, অর রেকর্ড সেকশন লালবাজার রাধাবাজারের মোড়ে। রেকর্ড সেকশনে আমাদের মাপ জোক হল—গায়ের রঙ, উচ্চতা, বিশেষ চিহ্ন সব লেখা হল। ছবি তোলা হল। সে ছবি আজও নিশ্চয়ই বোঝা যাবে সেগুলো কিছু কিছু। লালবাজার স্ট্রীট তখন সরগরম। শতশত অফিসযাত্রী বা ব্যবসায়ী যে যার কাজে ব্যস্ত। রাধাবাজার স্ট্রীটের শত শত ঘড়িতে সময় বাঁধা পড়ে নেই। সময় হাঁটছে। সময়ের স্রোতে ভেসে গেল এই সত্যটা যে লালবাজার পীড়ন করে, কিন্তু সে পীড়নের রেকর্ড কোথাও থাকে না।

আমাদের যখন ফিরিয়ে নিয়ে এল লক্-আপে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের বাদ্যযন্ত্রের দোকানে নানা যন্ত্রের ছাড়া ছাড়া মিষ্টি আওয়াজ ট্রামের ঘরঘড়ানিতে বা কলাওয়ালার 'কেলা' 'কেলা' হাঁকে মুছে যাচ্ছিল। তবু কান পেতে রেখে শুনেছি—সঙ্গীত জেগে আছে, জেগে থাকে 'অধরা মাধুরী' নিয়ে। লাল বাজারের লালবাড়িটির একধারে শতশত ঘড়ি সময়কে বেঁধে রাখতে পারে না, অন্যধারে সঙ্গীত কিন্তু শাশ্বত ধ্বনি বয়েই চলেছে। এই দুই সত্যের মাঝে আমাদের দিনগুলি ইতিহাস তৈরী করছে লালবাড়িটার কোটরে কোটরে—পুলিশের ব্যর্থতার ইতিহাস আর আমাদের বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকার ইতিহাস।

এটাই লালবাজার

সেদিন শেষ দুপুর। একফালি রোদ স্কাইলাইট ভেদ করে এসে পড়েছে সেলের মেঝেতে। মাছি এসে বসছে রোদটার ওপরে। দেখছি ওদের ওড়া বসা। শুনতে পেলাম গরাদ খোলার আওয়াজ। সেলে ঢুকল এক কুড়িবছরের তরুণী ও তার বৃদ্ধা মা। হায়, এত বৃদ্ধাও বন্দী হয়! তরুণীর নাম দূর্গা। ও বলল ওর বড়দাদাকে ধরেছে। ওর ছোড়দাকে খুঁজতে পুলিশ দুপুরে বাড়ি হানা দেয়। নক্সাল ছোড়দাকে না পেয়ে ওদের ধরে এনেছে। মা-কে টেনে হিঁচড়ে আনতে গেলে তিনি নর্দমায় পড়ে যান। কাপড়টা কাদায় মাখামাখি। স্পেশ্যাল সেলে দাদা বোনকে মারধোর করেছে। মাকে শাসিয়েছে ছোট ছেলের খোঁজ না দিলে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করবে এই ছেলে মেয়েকে। বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা হয়ে বলে উঠলেন, "দূর্গা, বলে দিইরে ওদের.....নইলে তোদের যে মেরে ফেলবে!" আশ্চর্য দীপ্তিময়ী দূর্গা ধীরে দৃঢ়তায় বলল,"ফেলুক। কক্ষনো বলব না।" বিশ বছরী দূর্গা আমার সশ্রদ্ধ স্মৃতিতে আজও জেগে আছে।

যত রাত বাড়ে বৃদ্ধার কী ছটফটানি। না, ছাড়া পাওয়ার জন্য নয়। শুধু একটুখানি খৈনি বা দোক্তাপাতার জন্য। বহুকালের নেশা যে। কিন্তু কোথায় পাবে এই হাজতে? অনেক কাকুতি মিনতির পর পুরুষ ওয়ার্ডার গরাদের ফাঁক দিয়ে একটু খৈনি পাচার করলে বৃদ্ধার পরম শান্তি হল যেন। পরদিন বিকালে ওরা আর ফিরল না। হয় জেল হাজত, নয় জামিন

হয়েছে হয়ত। এই নরকের চাইতে দুটোই মহা বাঁচোয়া।

৮ই অগাষ্ট এসে গেল। কোর্টের দিন। স্পেশ্যাল সেলের বারান্দায় বসে আছি। সরকার বলল "আজ আপনাদের জে.সি. হয়ে যেতে পারে।" জে.সি মানে জেল কাষ্টডি—তাই মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। শেয়ালদা কোর্টে নিয়ে গিয়ে ঘন্টাখানেক বাদেই আমাদের তোলা হল একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে। আমরা অবাক। কালো টিনের ঘেরাটোপে খাঁচা ভ্যানের বদলে এই সমাদর কেন তা আজও বুঝিনি। সঙ্গে পাহারায় 'দাঁত ভাঙা' শচীন—ওকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমাদের আলিপুর কোর্টে নিয়ে গিয়ে নতুন একটা কেস দেওয়া হচ্ছে। পরে জেনেছিলাম, শেয়ালদা কোর্টে জামিন হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখে ওরা তড়িঘড়ি সেদিনই একটা নতুন কেস দিল আলিপুর কোর্টে। আহা কী আইন ব্যবস্থা! তাজ্জব বনে যেতে হয়। আর পুলিশের কী গণতন্ত্র! যাকে খুশি যেমন খুশি যখন খুশি ধরে আনা যায়, পেটানো যায়, খুনও করা যায়, আবার নানা কেসের মামলায় অসহায় বন্দীকে সাজানোও যায়—যাতে অনেকদিন ধরে পি.সি.বা পুলিশ কাষ্টডিতে আটকে রাখা যায়। চমৎকার!

আলিপুরে কোর্টবাবুর অফিসের মধ্যেই মেয়েদের কুৎসিত লক্-আপ। লক্-আপে তখন একজন বিধবা মহিলা আসামী ছিলেন। বছর চল্লিশ বয়স মনে হল। সাদা থান কাপড়ে মাথায় স্বল্প ঘোমটা। মহিলার কেমন কুণ্ঠিত লজ্জিতভাব। টালিগঞ্জের এক বস্তীতে বাড়ি। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘরে। উপার্জন নেই। তাই দারিদ্র্য হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল সন্ধ্যার ছায়ায় মায়ায় ময়দানের আনাচে কানাচে, বলে দিল, "তোর গতর তো আছে।" কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ মহাজনের মনে হল এ ভীষণ বেআইনী আর মহা অনৈতিক! সুতরাং—অতঃপর থানা,—থানা থেকে আজ কোর্টে। সম্ভবতঃ আজই খালাস পেয়ে যাবে। মহিলার এটি প্রথম অভিজ্ঞতা—তাই কুণ্ঠিত ভাব। আমরা স্তম্ভিত। লালবাজার কত কি দেখিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন বিকেলে ফিরে স্পেশ্যাল সেলের বারান্দায় দেখলাম বেঞ্চে বসে আছে বিষন্ন এক যুবক—দোহারা লম্বা ফর্সা, ঝাক্‌রা চুল, স্বপ্নিল বড় বড় চোখ। ওরা ডাকল স্বদেশ বলে। দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড অত্যাচার হয়েছে ওর ওপর—কী বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে ওকে। এমন সময় সেই ছোঁড়াটা এসেছে চা নিয়ে। আদিত্য আমাদের দেখিয়ে চা দিতে বলল। যথারীতি প্রত্যাখ্যান করলাম। ছেলেটা চা নিয়ে চলে যাচ্ছে—এমন সময় স্বদেশ বলে উঠল, "আমি একটু চা খাবো"। আদিত্য একবার ওর দিকে বাঁকাভাবে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেল সোজা। স্বদেশের অপমানিত বেদনার্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন মোড়ে দিয়ে উঠল! তাকিয়ে দেখলাম জয় সেজদিরও খুব কষ্ট হয়েছে। এই স্বদেশকে লালাবাজারে অনেকদিন আটকে রুণুরা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। এই স্বদেশই ছিয়াত্তরে প্রেসিডেন্সী জেল ভাঙার সময় সব কমরেডদের বের করে দিয়ে নিজে সব শেষে বেরতে গিয়ে জেলরক্ষীর গুলিতে মারা যায়। শুনেছি স্বদে. এক গভীর আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই স্বেচ্ছায় এই আত্মাহুতি বেছে নেয়। প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে ও নাকি কিছু গোপন তথ্য বলতে বাধ্য হয়েছিল। স্বদেশের কথা ভাববে আজও মনটা খারাপ হয়ে যায়। অজস্র প্রশ্ন খোঁচা মারে—

অন্তহীন অন্তঃসারশূন্য তাত্ত্বিকতায় সব জবাবই ঝাপসা হয়ে যায়।

ভারী মন দিয়ে লক্-আপে ফিরে এলাম। স্বদেশে চা চেয়েও পায়নি। আমাদের জে.সি.তো হলই না, উপরন্তু একটা মামলা জুড়ে দিল। আবার পাঁচদিন বাদে আলিপুরে নিয়ে যাবে। সেদিন আবার কি হবে কে জানে।

স্পেশ্যাল সেলে নিয়ে যায় প্রায়ই রোজই। একঘেয়ে প্রশ্ন-টুকটাক অত্যাচার চলেই। এ সব ব্যাপারে প্রায় সব সময়ই কমলই সক্রিয়। কিন্তু কে এই কমল? রুণুর একান্ত স্নেহধন্য বোঝা যায়, কিন্তু লালবাজারের নিয়মিত কর্মী ও নয়, ও একটা বিশেষ ধরনের রিক্রুট। শুনেছি ও ইছাপুরে সি.পি.আই.এম. এল-এর লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারি ছিল। এখন অত্যাচারী রুণুর অত্যাচারী "সোনেকা হাথ্"। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে তুলতে কমল কখন যেন রুণুর দাসানুদাস। নিউ মার্কেটে রুণুর এক বেনামী জামাকাপড়ের দোকানের দায়িত্ব নাকি এই কমলের ওপরেই ছিল। অঞ্জনের কথা ভাবলেই মনে হত ও-ও কি শেষে কমলের মতো অত্যাচারী বা বরানগরের পুতুলের মতো 'ইনফরমার' হয়ে উঠবে? নানা প্রশ্ন খোঁচা মারে। কিন্তু ভারী ভারী তাত্ত্বিক বাগাড়ম্বর ও ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যাহীন নজির আউড়ানো আসল জবাবকে ঝাপসা করে দেয়। বিশ্রী লাগে। আমরা নেতা নই, নেতাদের স্তাবক ভক্তও নই। তাই সরাসরি স্পষ্ট জবাব না পেলে বিশ্রী লাগে। একটা মতাদর্শকে ভালোবাসতাম। তাকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যা না পেয়ে আমাকে বিষন্ন হতেই হয়েছে। সৌমেনকেও এই বিষণ্ণতা ছেয়ে ফেলছিল জেলখানাতে। ওর বিষন্নতা আরও গভীর, আরও তিক্ত। কারণ ও অনেক বেশি দেখেছে, অনেক গভীরে দেখেছে। আজও মেলাতে পারিনি অনেক হিসেব। আজ যখন রুণুকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তখন নাগরিক মানবিক অধিকার রক্ষার কিছু সুপরিচিত ধ্বজাধারী ভণ্ডামির মোড়কে রুণুরই স্বার্থসেবা করে চলেছে এবং সমাজ তা সহ্যও করছে কেন? দিনে দিনে চাপ বাড়ে।

লক্-আপে মাঝে মাঝে তিনজনে একসঙ্গে গান গেয়ে উঠি—"মুক্তির যে সংগ্রামে লড়ছে ভিয়েৎনামে........." গান এক সময় থেমে যায়। হঠাত কখন বিষন্নতার অঙ্কুরটাকে টের পেয়ে আলোচনা করতে বসি ঃ কেন এমনটা হয়? কে কেন আমাদের ধরিয়ে দিল? আমার নাম করে কেন পুলিশ অফিসার আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল? পুলিশকে কে বলেছিল আমার নাম? আজও একটারও সঠিক জবাব পেলাম না।

অবশেষে সেদিন ১৩ই অগাষ্ট। আলিপুর কোর্টের দিন। ভাবছি আজও কি পি.সি. টানবে? স্পেশ্যাল সেলের বারান্দায় বেঞ্চে একটুও জায়গা নেই। বসে পড়লাম দরজার পাশে মেঝেতেই। লক্ষ্য করলাম পুলিশগুলোর রকম সকম অন্য দিনের মতো নয়। বড় পুলিশগুলোর কেমন রাগ রাগ ভাব। চুনোপুঁটিগুলোর ভাব—"যাঃ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।" পরম ভদ্র ভদ্র ভাবগম্ভীর মানস ব্যানার্জি কয়েকবার দরজার বাইরে এসে আমাদের তিনজনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। শেষে একবার বেরিয়ে প্রায় দাঁত কিড়মির করে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, "কিছু বলল না, কিছু বলল না।"—আমি আর সেজদি পরস্পরে হাসলাম শুধু। হঠাৎ দেখি রুণু বারান্দার ও প্রান্তের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এদিকে বীরদর্পে এগিয়ে

আসছে। আমার কাছে এসেই বলল, "এই যে সৌমেনকে ধরেছি"—বলেই নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। চমকে উঠলাম আমি। বুড়ো ধরা পড়েছে!

পরে জেলে গিয়ে বেশ কিছুদিন বাদে শুনলাম সৌমেন ঠিকই ধরা পড়েছে। পাঁচই অগাষ্ট বাঁকুড়া রেল স্টেশনের কাছে দিনে দুপুরে। ও যে সেদিন ওখান দিয়ে ওই সময়ে বেশ কিছু 'শ্রেণী সংগ্রামের দেশব্রতী' নিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যাবে তাও নিজে আর দু একজন ছাড়া জানার কথা নয়। আজও এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি কি করে পুলিশ সেটা জানতে পারল?

আগামী প্রায় তিন বছর

১৩ই অগাষ্ট। অবশেষে আলিপুর কোর্ট। বড়দা, মানদা, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রভাতদা ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক আনাগোনা করছেন। এর আগের দিন ওকালতনামা সই করিয়ে নিয়েছিলেন আমাদের দিয়ে। আলিপুর কোর্টে জামিন হয়ে গেল। কিন্তু শেয়ালদা কোর্ট থেকে সবুজ সংকেত আসেনি। শেষ পর্যন্ত জে.সি.ই হল। রুণুর পুলিশ শেষ চেষ্টা করেছিল যদি পি.সি.টানা যায় আরও কদিন। আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত, আচ্ছা ওদের একঘেয়েমি লাগে না এইসব বোকামি করে? ওরা কি বুঝতে পারছিল না যে আমাদের আটকে রেখে সত্যিই ওদের কোন লাভ হবে না। আসলে ওরা শুধু খারাপ নয়, ওরা মূর্খও বটে। রাসেল একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, মূর্খরাই খারাপ হতে পারে। অন্ততঃ স্পেশ্যাল সেলকে দেখে স্বতঃই মালুম হয় খারাপ হতে হলে মূর্খ হতে হয়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ছোট্ট এঁদো কুঠরিটাতে আমরা তিনজন ছটফট করছি। শুনলাম প্রিজনভ্যান ব্যাঙ্কশাল, শেয়ালদা কোর্ট থেকে বন্দী তুলে তবে এই কোর্টে আসবে। তাই দেরি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বন্দীর কালো রথ এল। লক-আপ থেকে বের করে আমাদের তিনজনের হাতে দুখানা করে লুচি আর খানিকটা করে সুজির দলা শাল পাতায় জড়িয়ে দিল। জেলে যখন পৌঁছব তখন আর খাবার পাবো না—তাই এই সুবিবেচনা। ভ্যান ছেড়ে দিল। বড়দা চেঁচিয়ে বলল, "কাল জেলে দেখা করব।"

লালবাজারে আমাদের কালো দুঃস্বপ্নের দিন শেষ। লালবাজারের কোথাও কোনও রক্তিমতা নেই। লাল রঙ তো জীবনের রঙ। রক্তের রঙ। কিন্তু লালবাজার যে কী ভয়ঙ্কর নীরক্ত। হৃদ্‌পিণ্ড নেই তার। নীরক্ত সে। তাই নির্মম। তাই বিনা বিচারে কত বন্দীর ওপর নিপীড়ন চলে, চলে হত্যা। কত মানুষকে অমানুষ করে। আর আইন ও শৃঙ্খলরক্ষার নামে সমস্ত সমাজকে করে প্রবঞ্চনা।

পুলিশ নামক গুণ্ডাবাহিনী সাতাশ দিন আমাদের আটকে রেখেছে। এই সাতাশ দিন আমরা আক্ষরিক অর্থে এক কাপড় এক পোষাকে কাটাতে বাধ্য হয়েছি। পুরো সাতাশ দিনে একবারও কোন মেয়ে পুলিশের মুখ দেখিনি রুণুর স্পেশ্যাল সেলে। এই সাতাশ দিন ওরা শুধু অত্যাচার করবে বলেই আটকে রেখেছে আমাদের।

লালবাজার অত্যাচারের প্রতিষ্ঠান। ভারত তথা বাংলার গণতন্ত্রী ব্যবস্থার আবশ্যিক অঙ্গ এই প্রতিষ্ঠান। এখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত নেই। বৃক্ষপত্রে হাওয়া দোল দেয় না। পাখির কাকলি

ভ্যানের চাকার তলায়, বেতের লাঠির আওয়াজে পিষে পিষে স্তব্ধ হয়ে যায়। লালবাজারের বাঁধানো চওড়া চত্বরের ওপরে—অনেক অনেক ওপরে চক্রাকারে শুধু শকুন ওড়ে। শুধু পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে থাকে শকুন, আবার নেমে আসে। অনন্ত ওদের ওঠা নামা। ওরা লালবাজারকে ভালোবাসে।

লালবাজারের অন্ধকার পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। বুকটা তোলপাড় করছে। পেরেছি। হ্যাঁ পেরেছি আমরা। মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। অন্ধকারের কাছে হার মানিনি। এখনও আরও পথ হাঁটতে হবে। আরও দিন গুণতে হবে। হাতে আলা জ্বেলে নিয়েছি। শপথের আলো। কিছুতেই হার মানব না। ওদের অন্ধকার আমাদের ঔজ্জ্বল্য উজ্জ্বলতর করেছে। গরাদের অন্ধকার আমার আলো কেড়ে নিতে পারল না। আলো কেড়ে নিতে পারল না। আলো হল উজ্জ্বল হাতিয়ার। তাই নিয়ে আজও চলেছি। সাথে রইল সৌমেন। আজও।

ভ্যান এসে দাঁড়াল প্রেসিডেন্সী জেলের দরজায়। সন্ধ্যা তখন রাত হয়ে নেমে এল।

# রক্ত

বীরেন্দ্র দত্ত

সন্তর্পিত কড়া নাড়ার শব্দ হল।

শব্দটাকে আমল নিল না বিমলা। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। এই মুহূর্তে যেন আরও বেশি দামাল। তাই সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছে শোয়ার আগে। দরজায় খিল। কঠিন। যা বলে গেছে সন্ধে থেকেই এমন খিল এঁটে রাখতে। লোহার ঝোলানো শিকল আর কড়া নাড়ার শব্দ নিশ্চয়ই বাতাসের ধাক্কার। এখন কারোর আসার কথা নয়। সন্ধে থেকেই তো মায়ের কাজ। মা আসতেই পারে না। তবে?

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। যেন বা কপাটে মৃদু ধাক্কাও। এবং কিছুটা দ্রুত।

বিমলা তবু শুয়ে থাকে মেঝের বিছানায়। পাশ ফেরে। জানালার সরু ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর আলো হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে। এতগুলো বি. আর. এস্-এর ইউনিটের মাঝখানে মাঠ। ঘেরা ঘরদোর ঘুমে নিঝুম। অন্তত এই একতলার নিচেই পুরু অন্ধকার সিঁড়ির ওপাশের ফ্ল্যাট থেকে কিছু শব্দ তো পেতো!

বিমলা উৎকর্ণ হয়। হ্যারিকেনের পলতেটা জ্বেলে বেশ কমিয়ে শুয়েছে বিমলা। মায়ের নির্দেশ। আলোটা এবার কিছুটা বাড়ায়। বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। এখানকারই কেউ দেখা করতে এসেছে কি? ভয়ে কুঁকড়ে বিছানার ওপর বসে। ধীর, স্থির। একটু বা গলা শুকনো হতে থাকে। সকালে আসার সময় এখানকার একটি ছেলে কিরকমভাবে যেন দেখছিল ওদের! তাকে চিনিই না। সে কে? শ্বাস বন্ধ হয় ওর।

আবার দরজায় শব্দ। বাইরের তুমুল বাতাসের ঝাপটায় শব্দটা আড়াল হয়ে যায়। শব্দ অনেক জোর। মুষলধারে বৃষ্টির শুরু। কে এলো?

'কে?' বিমলা রাতের শাড়ি-জামার পোষাক ঠিক করে অন্যমনস্কতার মধ্যে।

এবার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ আরো জোর।

বিমলা নিজের মত করে কিছু ভাবল। একতলার এই ফ্ল্যাটটার চারপাশে, সেই দূরের বড় রাস্তা পর্যন্ত গাছপালা, ঘন ঝোপঝাড়। ঢোকার মুখে বাঁশের বেড়া-দেওয়া জায়গায় ফুলের বাগান। সব মাসির সাজানো। মাসছয়েক আগে হঠাৎ মারা যাবার পর আর যত্ন নেওয়া হয়নি। এখন তা এক অন্ধকার জঙ্গল। বিমলা কি জানালা খুলে রেখে দরজা খুলবে? কিন্তু আজই তো প্রথম এখানে এলো। মা ওর দরকার মত সমস্ত গুছিয়ে চলে গেছে। কাউকেই ও চেনে না! তার ওপর এই ঝড়জলে জানালা একবার খুলে যদি বন্ধ করতে না পারে! একা। দু'চোখে জল এলো।

এবার যেন পা দিয়ে দরজা ঠেলছে কেউ!

'কে!' বিমলা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে মাথার কাছে রাখা হ্যারিকেনের শিখা বেশ বাড়ালো। সারা ঘর উদ্দীপ্ত আলোর শিখায় দপদপ করে কাঁপছে। দাঁড়ানো বিমলার ছায়া দেয়ালে অতিকায় দৈত্যের মত। এগিয়ে এলো দরজার কাছে। এবার অস্ফুটে বলল, 'কে?' কিছু সময় নিথর, যেন বা সাহস সঞ্চয়ের অপেক্ষা। ঘরের কোণে রাখা আনাজের বঁটিটার দিকে একবার চকিত দৃষ্টি দেয়। সদ্য-কেনা ধারালো বঁটিটা সজীব শ্বাপদের মত। ওর ভয়ার্ত অসহায় চোখ রাখে বিমলার বড় বড় দৃষ্টির সামনে।

এই মুহূর্তে দরজার বাইরে আর কোন শব্দ নেই। শুধু ওর এই একতলার ফ্ল্যাট থেকে এক প্রাগৈতিহাসিক দুর্যোগের অন্ধকার পাক খেয়ে চলেছে অফুরন্ত।

বিমলা বন্ধ খিল সরিয়ে ওপরের ছিটকিনি টানল।

দু'পাল্লার দরজা সামান্য টানতেই বাইরের বাতাসের ধাক্কায় একেবারে উদোম হয়ে যায়।

বিমলা সামনে তাকাতেই থ।

ওর বুক লক্ষ্য করে এক ঝকঝকে রিভলবার।

'সরে যাও। একদম চেঁচাবে না। চেঁচালেই—'। কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বিমলাকে প্রায় ঠেলেই ঘরের মধ্যে চলে এলো এক বলিষ্ঠ যুবক। গলা চাপা। ফিরে বিমলার পিছন দিকে রিভল্‌ভার স্থির রাখে। হঠাৎ যেন চাপা ধমক দিল, 'তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর।' বলেই যুবকটি একটি এগিয়ে এসে বিমলার পিছন ফিরে দেখা মুখে ঠোঁটের সামনে রিভলভার তাক করে রাখে। উত্তেজনায় হাত কাঁপে।

বিমলা দরজা বন্ধ করে, খিল দেয় যন্ত্রচালিতের মত। হাত থর থর করে কাঁপে ওরও। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকেনের আলো আচম্‌কা নিভে যায়। এতক্ষণ দরজা দিয়ে ঢোকা পাক-খাওয়া বাতাসে পলতে বাড়ানো আলোটা দপ দপ করছিল।

'ঘরের কোণে চলে যাও। কুইক।' যুবকটির হাতের রিভলভার বিমলাকে তাক করে ঘোরে। 'আলো জ্বালো।' যুবকটির হাতের টর্চ জ্বলে ওঠে।

'ঘরের ইলেকট্রিক আলো নেই', বিমলার স্বর যেন কঠিন শীতে কাঁপে। অন্ধকারেই চেনা ঘরের কোণটায় সরে সরে যাচ্ছিল। এখন পিঠে দেয়াল ঠেকে।

'জানি।' টর্চের আলো বিমলার মুখে ফেলে। 'তোমার বিছানার কাছে দেশলাই আছে। নাও।'

বিমলা নড়ে না। দু'চোখে বিস্ময় স্থির। 'আপনি জানেন আমাদের আলো নেই!' গলায় ভয়ংকর ভয়ের উত্তেজনা।

'একেবারে চুপ। আগে আলো জ্বালো।'

বিমলা দেশলাই নিতে ঝোঁকে, যুবকটি এগিয়ে আসে বিমলার কাছে। ওর মুখ আলোয় ভরিয়ে দেয়। 'শোন, এত জোরে কথা বলবে না। গলা ফিসফিস। আমার অসুবিধে আছে। কোনভাবে চেঁচাবে না। আবার বলছি।'

যুবকটি কাছে আসে। ভয়ে বিমলা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কি চায় ও? এখনি চীৎকার

করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'কি চাও তুমি!' বলতে পারে না।

হাতের লাইটার জ্বালে যুবক। 'নাও, এটা দিয়ে হ্যারিকেনটা জ্বেলে নাও, জ্বালার পর একেবারে ওই কোণে গিয়ে বসে থাকবে।'

বিমলা আলো জ্বেলে জ্বালানো লাইটারটা যুবকের হাতে ধরিয়ে দেয়। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই অসহায়ভাবে বসে পড়ে।

যুবকটি বিমলার বিছানার পায়ের দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। কাঁধের ভারি ব্যাগটা মেঝেয় নামায়। হাতের রিভলভার প্যান্টের পকেটে ঢোকায়। একটি সিগারেট ধরায়। যেন অনেক পথ হাঁটার ক্লান্তির পর সুখ টানে চোখ বুজোয়।

ধারালো ছোরাটা যুবকটির সামনে পড়ে থাকে। যেন অবহেলায়।

একসময়ে টর্চটা সারা ঘরের দেয়ালে ঘোরায়। ঘরের কোণে কোণে। 'আমার নাম রাজেন। তোমার নাম কি?'

বিমলার কোন কথা নেই। বুক টিপ টিপ করতে থাকে। মাথা নিচু।

'বল তোমার নাম কি?'

'বিমলা।'

'কবে এখানে এসেছ!'

'আজ সকালে।'

'হুঁ।' রাজেন কি ভাবে 'কাল রাতেও তাই দেখিনি!'

বিমলা মুখ তোলে। 'আপনি এসেছিলেন?'

'আমি নয়, আমরা।' রাজেন আবার একটা সিগারেট ধরায়। 'আমরা কজন রাতে আসি মাঝে মাঝে। রাতেই চলে যাই।'

'কেন!'

'সে তুমি বুঝবে না।' রাজেন বিমলাকে লক্ষ্য করে। 'আমরাই তো এ ঘরের আলোর লাইন কেটে দিয়েছি!'

'এ ঘরের চাবি তো মায়ের কাছে!'

'আমরা আর এক সেট চাবি বানিয়ে নিয়েছি।'

'এখানে এসে কি করেন?'

রাজেন হাসল। বিমলাকে কেমন সহজ সরল মনে হল। 'তুমি বুঝবে না। সেটা আমাদের ব্যাপার।'

বিমলা বুঝি বা নিজের মধ্যে এক ঘোরে আত্মসমর্পণের কথা ভাবে। 'আপনারা কি ডাকাত?'

'চুপ। আবার এত জোরে কথা বলছ?' রাজেন সোজা হয়ে বসে। 'হ্যাঁ, আমাদের টাকার খুব দরকার।'

হঠাৎ বিমলা ডুকরে কেঁদে ওঠে। 'এখান থেকে চলে যান। এখনি।' ককিয়ে ওঠে গলার স্বরে।' আমার কাছে কিছু নেই। কিছু না।'

রাজেন যেন খেলা পেয়ে যায়। 'কিছু না পেয়ে তো যেতে পারি না। কিছু পাওয়ার ব্যবস্থা করতেই তো এখানে আমরা জড়ো হই।'

বিমলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। 'আরো আসবে!'

'আসতেও পারে।' রাজেন ঝকঝকে ছোরা হাতে ধরে নাচায়।

বিমলা ঘরের অন্ধকার কোণে দৃষ্টি ফেলে। ওখানে দু'টো টিনের সুটকেস। একটা বড়—জামা-কাপড় রাখার। আর একটা ছোট। কি ভেবে হঠাৎ উঠে সুটকেসের কাছে চলে আসে।

রাগী সিংহের মত রাজেন আচমকা লাফিয়ে বিমলার সামনে আসে। হাতের ছোরাটা যেন শ্বাপদের লকলকে জিভ। 'খবরদার। চুপ করে বসে থাক। কোন কিছু করলেই একেবারে শেষ করে ফেলব। এখানে কি?' রাজেন টর্চের আলো সুটকেস দু'টোর ওপর ফেলে রাখে। 'এখানে কি করবে?'

'সুটকেস খুলব।'

'না।' রাজেনের গলায় চাপা গর্জন। হিংস্র। 'কি আছে এতে?' একটু থামে। রাজেনের স্বর উত্তেজনায় দমক খায়। 'তুমি বুঝি পুলিশের চর। আমাদের ধরার জন্যে ওরা তোমাকে এখানে রেখে গেছে! সত্যি করে বল।'

বিমলা একটু আগে পর্যন্ত এরকম পরিস্থিতির কথা ভাবেইনি। রাজেনের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। 'না, না।' বার বার মাথা নাড়ে। দু'চোখ ভেসে যায়।

'সুটকেস দুটো খোলো।'

বিমলা সুটকেস খুললে রাজেন হাতের ছোরাটা দিয়ে সব পোষাক তন্ন তন্ন ভাবে ওলট পালট করে। কিছু নেই।

রাজেন একটু যেন শান্ত হয়। একভাবে বিমলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ বিমলা অগোছালো কাপড়-জামার আড়াল থেকে একটা ভারি পুঁটলি বের করে। ছুঁড়ে ঘরের কোণে ফেলে দেয়।

রাজেন তার ওপর টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে যায়। বসে পড়ে। 'এটা কি?'

বিমলা বুঝিবা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। 'আমার মায়ের রেখে যাওয়া গয়না। সব আছে। আপনি সব নিন।' গলা কঠিন করে। 'টাকার তো দরকার। নিয়ে এখনি এ ঘর থেকে চলে যান। এখনি, এখনি।' যেন রাজেনের দিকে পিছন ফিরে দেয়ালে মাথা খোঁড়ে।

রাজেন পুঁটলিটা লক্ষ্য করে। পুঁটলির আড়াল থেকে কিছু কিছু জ্বলন্ত সোনার গয়না রাজেনকে অবাক করে। স্থির বসে থাকে রাজেন কয়েক মুহূর্ত। রাজেনের মধ্যেও যে ভয়টা ছিল কেটে গেছে।

'এই শোন', বিমলার দিকে তাকায়। 'পুঁটলিটা তুলে রাখ। এতে অনেক গয়না আছে!'

বিমলা মুখ ফেরায়। 'বিশ্বাস করুন আমার কাছে আর কিছু নেই। শুধু মায়ের দেওয়া কয়েকটা টাকা আছে!'

'আগে এটা তুলে সুটকেসে রাখ। ঠিক যেখানে ছিল সেখানে।'

গলার স্বরে এমন এক আদেশ ও শাসন ছিল, বিমলা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'নেবেন না?'

'না।' রাজেন ভয় পায়। আজ রাতে একটু পরেই যদি পুলিশের লোক আসে। ধরে নেবে আমি এটাই নিতে এসেছি। 'তোলো এখনি।'

বিমলার গয়নার পুঁটলিটা সমেত দুটো বাক্স গুছিয়ে নিল। ওর বুকের চাপা কষ্টটা এখন অনেক হালকা। রাজেন তা হলে কি চায়?

রাজেন এবার নতুন করে সিগারেট ধরাল। টর্চটা জ্বেলে বিমলার মুখের ওপর ফেলে রাখে। দুজনে চুপচাপ। বাইরে মাতাল বাতাসের বিরাম নেই। সিগারেট টানতে টানতে একসময়ে গলা নামিয়ে কথা বলে রাজেন, 'এত গয়না তোমায় কে দিল?'

'আমার মা।'

'মা কি করে?'

বিমলা মাথা নিচু করে থাকে। নিশ্চুপ।

'পুলিশের ওখানে কাজ করে?'

বিমলা কথা বলে না।

'কথা বল?' রাজেন একভাবে লক্ষ্য করে। ঠাণ্ডা গলা।

'মাকে সারা রাত জাগতে হয়।'

'সারা রাত!' রাজেনও অবাক হয়। 'কি কাজ?'

'জানি না। আমাকে মা কিছু বলে না।'

'সন্ধ্যে থেকে দরজায় বুঝি দাঁড়াতে হয়?' গলায় শ্লেষ লেগে থাকে রাজেনের।' তুমি বুঝি বেশ্যার মেয়ে?' রাজেন বিমলাকে এবার খুঁটিয়ে দেখে।

বিমলা রাজেনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে। ছেলেটা কি অন্য কিছু চায়? এমন করে দেখছে কেন! বুঝেছে এই সুযোগেই তো আমার মত মেয়েকে পাওয়া কত সোজা!

রাজেন দৃষ্টি সরায় না। সুন্দর দেখতে বিমলা। মাথায় দীর্ঘ চুল। স্বাস্থ্য জীবনের দীপ্তিতে অটুট। টর্চের আলোয় চোখ-মুখ-নাক-চিবুক নিটোল। ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী। বিমলার প্রতি কেমন মায়া হল রাজেনের। অন্যমনস্ক।

বিমলা ওর মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে এক অদ্ভুত ছলনায় নিজেকে সহজ করল। এক মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে আর এক মৃত্যুর খেলা। ঠেস দিয়ে বসেছিল বিমলা। কাপড় দু'হাঁটুর ওপর উঠে এলো। উর্ধাঙ্গের আঁচল খসে গেছে। গ্রীবা টান টান। দু'বাহু মাথার ওপর তুলে মাথাটা দেয়ালে শুইয়ে রাখল। চিবুক তৃষ্ণার্ত পাখির মত যেন বা নীল আকাশের আশায় উন্মুখ। কোমরের নাভির নিচে শাড়ি শিথিল। বিমলা জানে এসব যা ওকে শেখায়নি কোনদিনই, কিন্তু ওকে তো এখন বাঁচতে হবে।

ঐ দৃশ্য এতক্ষণ রাজেনের চোখে পড়েনি। গভীর অন্যমনস্ক ও। হঠাৎ বিমলার বিচিত্র ভঙ্গি চোখে পড়ল রাজেনের। সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিভিয়ে দিল।

'বিমলা!' গম্ভীর গলা রাজেনের। 'ভালভাবে বসো।'

বিমলা যেন শুনতেই পায়নি।

'তোমার মা বুঝি এইসব শিখিয়েছে?' আরও সময় নিচ্ছে দেখে রাজেন উঠে দাঁড়াল। বাইরে আবার যেন নতুন করে বৃষ্টি নামল।

বিমলা এবার ভয় পেল। ভয় মা ওকে বাঁচাতেই তো মৃত মাসির এই ঘরে রেখে গেছে! এবার থেকে এখানেই থাকবে। এতদিন স্কুলে পড়িয়েছে ওর চারপাশে কঠিন আড়াল রেখে! এখন কি করবে ও?

রাজেন বাইরে বেরুবার দরজার সামনে এল। খিল, ছিটকিনি ঠিক মত বসানো আছে কিনা আলো ফেলে দেখল। সোজা চলে গেলো বাথরুমের কাছে। পাশে ছোট রান্নাঘর। ওপাশে একটা ঘেরা বারান্দা। বারান্দায় যাবার দরজা ভেজানো। যদি হঠাৎ পুলিশ আসে, বা আর কেউ? পালাবার বা লুকোবার জায়গাগুলো দেখে নিল। কি ভেবে আবার এ ঘরে এলো। হ্যারিকেন জ্বলছে। হাতের টর্চ নিভিয়ে রাজেন বলল গলা নামিয়ে, 'তুমি এবার ঘুমোও, রাত অনেক হল।'

বিমলা পোষাক পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। 'আমার ঘুম আসছে না।'

'আমার ভয়ে?' রাজেন টর্চের আলো জ্বেলে নিভিয়ে দিল। 'আমি জেগে আছি।' কি ভাবল রাজেন, 'ঠিক আছে, কথা বলতে বলতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়।'

বিমলা কোন কথা বলল না। রাজেন নিঃসাড়। সারা ঘর থমথমে। বাইরে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলসানি আর মেঘের গর্জন।

রাজেন হঠাৎ ডাকল, 'বিমলা, ঘুমিয়ে পড়েছ।'

'না।'

'তোমার মা কি ইউনিয়ন করে?'

'ইউনিয়ন আবার কী?'

'কতদূর পড়াশুনো করেছ?'

চুপ করে থাকে বিমলা। 'হায়ার সেকেণ্ডারি চলছে।'

'তা হলে ইউনিয়ন বোঝ না?' সিগারেট টানার ধোঁয়ায় কাশি আটকে খুক খুক করে হাসল রাজেন। 'তোমরা তো এখন বেশ্যা নও, যৌনকর্মী! একটা শ্রেণীর খেতাব পেয়েছ! জাতে উঠেছ।'

'মা আমাকে ওসব বলে না।'

'তোমাকে বলে না মিছিলে যেতে? যৌনকর্মীদের দাবি-দাওয়ার মিছিলে?'

বিমলা যেন কিছু ভাবে। 'দরকার হলে মা নিয়ে যাবে বলেছে।'

'দল ভারি করতে?' রাজেনের স্বর ভাঙে। 'তোমাদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি হয়েছে। এতে তোমাদের সুবিধে কি জান?'

বিমলা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে রাজেনের দিকে।

'যৌনকর্মী যখন তখন বেশ্যা হওয়াটা আইনি অধিকার পেয়ে গেল! কি অদ্ভুত ব্যবস্থা। মানুষকে মানুষ টানে বলে রিকসাওলাদের কাছে তা অপমানের। তাই তাদের অন্য কাজ

দিয়ে পেশা বন্ধ করতে চাইছে। আর,' রাজেনের গলায় চাপা রাগ তৈরি হয়। 'আর বেশ্যারা হল স্থায়ী। ব্যবসায় নানাধরনের লাভ!' রাজেন পাশের দেয়ালে থুথু ছেটালো।

'মা তো তা বলে না!' বিমলা ওর মায়ের কথা ভাবে।

'ব্যবসায় লাভ নয়। রাজনীতির লোকেরা ভোট পাবে। দলবাজির শিকার। দালালরা আরও বহাল-তবিয়তে থাকবে। তোমাদের খদ্দেররা আইনি সাহসে, তার ফাঁক-ফোকরে দেদার মজা লুটবে। বেশ্যাদের তো কর্মী হতে থানায় জানাতে হয়। সে সবের ব্যাপারেও অবাধ ব্যবস্থা হবে লুটেরাদের মত। শুধু তোমাদের ব্যবসার ওপর মাইনে বাদে লেখাপড়ার ব্যবস্থা দিয়ে যৌনকর্মী নামটায় ভাল ব্যানার দেবে।' থেমে যায় রাজেন। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড কথাটার মানে জান বিমলা?'

'শুনেছি, মানে জানি না।'

'কোন পার্টি করা নিষিদ্ধ হলে দলের ছেলেদের লুকিয়ে পড়া। বৃটিশ আমলে স্বদেশীরা, এমন কি স্বাধীন হওয়ার পরেও কোন কোন দলের পার্টিকর্মী তোমাদের পাড়ায় লুকিয়ে থাকত। পুলিশ ভাবতেই পারত না। আর এখন?' শহরে চাপা উত্তেজনা ক্রমশ ঠেলে ওঠে।' এখন তো লুকোনোর নামে তোমাদের ডেরায় রথ দেখা আর কলা বেচা একই সঙ্গে চালিয়ে যায়!'

বিমলার চোখে ঘুম আসছিল। রাজেনের কথাগুলো একেবারে নতুন বলে ভাল লাগছিল না। ক্লান্তির ঘুম জড়িয়ে ধরছিল দু'চোখে।

রাজেনের কথা থামছিল না। একের পর এক সিগারেট টেনে চলেছে চাপা এক অজানা আক্রোশে। কখন যেন চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে রাজেনের! বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ। বিমলার কোন নড়া-চড়ার শব্দ নেই। একবার টর্চ জ্বালল। বিমলা এখন ঘুমে বিভোর। টর্চ নেভানো। একটু বা চোখ বোজাতে চাইছে রাজেন। হাতঘড়ি দেখল লাইটারের আলোয়। রাত আড়াইটা। আর ঘণ্টাদেড়েক বাদেই ওকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। এখন শুধু প্রতীক্ষা ওর সঙ্গীদের জন্যে। সেই সঙ্গে পুলিশের ইনফর্মেশনটা যাচাই করতে সাবধান থাকতেই হবে। পকেটে একবা রিভলবারটায় হাত বুলোল। ডান হাতের মুঠোয় ধারালো ছোরার হাতল আলগা করল না।

আচমকা তন্দ্রার মত ঘোরটা ধাক্কা খেল রাজেনের। এমন দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে স্পষ্ট কানে এলো দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। সঙ্গে বাইরে মেঘের দিগন্ত পার হওয়া বিকট গর্জন। দ্রুত সোজা হয়ে বসল। উৎকর্ণ। আবার দরজায় ধাক্কা।

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাজেন। দ্রুত পায়ে বিমলার সামনে চলে আসে। 'বিমলা!' এ ডাকে সাড়া নেই ওর। রাজেন নিচু হয়ে বিমলার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিমলা। বুক টিপ টিপ করছে ওর। 'কি? কি?' বিছানায় বসে থেকেই তাকিয়ে থাকে রাজেনের দিকে।

'দরজায় ধাক্কা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াও।'

'কে এল?'

'আমার কয়েকজন সঙ্গী এসেছে মনে হয়। খুব সাবধানে দরজা খোল।'

'কয়েকজন!' বিমলার স্বর ভয়ার্ত, রুদ্ধশ্বাস।

'জন পাঁচেক।'

বিমলার মাথাটা যেন ঘুরে গেল। মাকে মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনা। ফুটপাথের ঝুপড়ি থেকে যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া...পাঁচজন শক্তসমর্থ মানুষ...মায়ের হাত পা ছোড়া...মুখ বাঁধা অবস্থায় কাতরোক্তি...ভোরের দিকে প্রায় মরার মত ঝুপড়ির কাছে ফেলে যাওয়া...আমার মড়ার মত মা...

'না!' বিমলা চীৎকার করতে চাইল। 'আপনি বেরিয়ে যান।' হাত দিয়ে প্রবল ধাক্কা দেয় রাজেনকে।

মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রাজেন বাঁ হাতে। তীব্র প্রতিবাদে ছটফট করতে থাকে বিমলা। ডান হাতের ছোরাটা আচমকা বিমলার কোমরের কাছে আলতো ঘষে যায়। ফিন্ দিয়ে রক্ত ঝরে। 'উঃ' শব্দ করে কেমন বিমলার শরীর কুঁচকে যায়।

'কোন শব্দ করবে না।' রাজেন তখন এত বেপরোয়া। রাজেনের গলায় কঠিন শাসন। 'একেবারে শেষ হয়ে যাবে।' ঝাঁকানি দিল চাপা মুখ ধরে মাথাটা। রাজেনের দু'চোখ জ্বলছে। বিমলার শরীর বেয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে। ওর কাছে তুচ্ছ।

বিমলা অনড় তাকিয়ে থাকে রাজেনের দিকে।

'যাও!' ফিসফিস করে বলে। 'ওরা না হলে পুলিশও আসতে পারে। পুলিশ বসতে চাইলে বসাবে। আমি ভেতরে লুকোচ্ছি। যাও।' দ্রুত রাজেন ভিতরের ঘরে ঢোকে। বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখে। সারা ফ্ল্যাট অন্ধকার সমাধির মত থমথমে। যেন মৃত্যু এটাকে ঘিরে রেখেছে। রাজেনের কাছে বন্দুক, হাতে ধারালো ছোরা, বাইরে হয়ত সেই পাঁচজন, বা পুলিশ।

বিমলা পোষাক সামলায়। দরজায় এবার শব্দ মৃদু হলেও তা বিরামহীন। দরজা খোলে বিমলা। সামনে টর্চ হাতে এক সশস্ত্র পুলিশ।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘরে ঢোকে। 'দরজা বন্ধ কর্। কিছু কথা আছে।'

বিমলা ফ্যাল ফ্যাল চোখে পুলিশকে দেখে। দরজা বন্ধ করে আগের মত।

'ঘরে আলো নেই। এত রাতে কি চাই?' বিমলার গলায় রাগ, বিরক্তি, প্রতিবাদ।

'তুই যে মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিস, আমি জানি।'

'তাতে কি?' বিমলা যেন বা তৈরি হয়।

'কেউ কি তোর ঘরে আজ এসেছিল?'

'কেন?'

এসেছিল কিনা বল্।'

'না।' একটু থামে। 'আজই তো মা-আমি প্রায় এখানে এসেছি।'

'আজ ওদের আসার কথা ছিল।'

'কাদের!' বিমলার স্বরে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়।

'যারা এ ঘরে বসে ডাকাতির ছক কষে।'

'আমরা তো জানি না।'

'ওরাই তো তোদের আলোর লাইন কেটে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ওরা যে আসে, আমাদের কাছে সে খবর আছে। মদ খায়। রাতে ঢোকে রাতেই বেরিয়ে যায়।'

বিমলা বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

'বাইরে গাড়ি নিয়ে আমরা ছিলাম।' টর্চের আলো ফেলে এদিক ওদিক দেখে। 'এখন আর কেউ আসবে না।' আলো জ্বেলে রেখেই বলে, 'বলা রইল, এর পর কেউ এলে ঢুকতে দিবি না। আমরা আসব। খবর নিয়ে যাব।'

পায়ের ভিজে জুতো খোলেনি। বসে পড়ে পুলিশ মেঝেয়। হঠাৎ এক কোণে কয়েকটা পোড়া সিগারেট দেখে। 'এত সিগারেট খেল কে? তুই?'

'আমার মা।'

'ও!' বিমলার দিকে তাকায়। 'হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দে তো।'

'কেন?' দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দেয়।

'বোস। তোকে দেখি। নতুন এসেছিস তো!'

বিমলা ওর বিছানার এক পাশে বসে। দেয়ালে ঠেস দেয়।

'বেশ দেখতে সুন্দর তো তুই!' টর্চের আলো বিমলার সারা শরীরে বুলোয়। 'আমাকে ভয় পাচ্ছিস?' মুখে কেমন নির্লিপ্ত হাসি।

বিমলা স্থির তাকিয়ে থাকে পুলিশটার দিকে। আগে বেশ কয়েকবার দেখেছে বিমলা ওর মায়ের কাছে এইভাবে পুলিশ আসতে। মা এদের ঘেন্না করত। তাড়ালেও যেত না। বসে থাকত।

'দেখলে তো আমার ঘরে কেউ নেই। যাও।'

'এত কষ্ট করে এলাম, একটু বসব না?'

'না।' বিমলা কাঠ হয়ে বসে থাকে।

পুলিশটা বসে থেকেই আস্তে আস্তে এগোতে থাকে বিমলার দিকে।

পাশের ঘর থেকে কিছু নড়ার শব্দ কানে এল। দ্রুত টর্চের আলোটা পুলিশ পিছন ফিরে পাশের ঘরের দরজায় ফেলল।

রাজেন বাথরুমের দরজায় আড়াল।

'কিসের শব্দ রে?'

'আমরা তো ছিলাম না। কোথা দিয়ে বেড়াল ঢোকে জানব কি করে?'

আবার পুলিশটা বিমলার মুখের ওপর আলো ফেলল। তারপর শীতের শরীরে উত্তাপ মাখানোর মত টর্চের আলো দৃষ্টির আরামে বোলাতে থাকে। জ্বলন্ত অবস্থায় আলোটা পাশে রেখে বিড়ি ধরায়।

বিমলা ওর দৃষ্টি একবারও সরায় না। পুলিশটা আবার একটু নড়াচড়া করতেই যেন ধমক দেয়, 'যাও। না গেলে আমি এখুনি চেঁচাব।'

পুলিশ ওর কথায় ওঠবার, না আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল—বোঝা যাচ্ছে

না। হঠাৎ বিমলার সামনে গড়ানো রক্ত দেখে চমকে ওঠে। 'এত রক্ত কিসের?'

বিমলা সন্ত্রস্ত হয়। ওর সামনের মেঝের ছড়ানো-ছিটানো তাজা রক্তের যেন বিস্তৃত জলছবি। দ্রুত হাতে পেটের ওপরের দিকের ছড়ে যাওয়া অংশটা নাভি সমেত ঢাকা দেয়। পিঠ বুক আঁচল দিয়ে ঢাকে। লোকটি কি বুঝতে পারবে ওর পেটের ওপর ছোরা চালিয়েছে কেউ? মাথা নিচু করে বসে থাকে। যেন নিজেকে লুকোয়।

'কেউ কি তোকে মারতে গিয়েছিল? এত রক্ত?'

গলা আরও নামায় বিমলা। ভঙ্গি লজ্জায় আরও অবনত। 'আমার রক্ত...খারাপ...'। থেমে যায়।

পুলিশটা কিছু ভাবে।

'এখনি যাও। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।' মুখ তোলে না বিমলা।

পুলিশটা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দরজা খোলা। হাওয়ায় কপাট শব্দ করে কাঁপছে।

বিমলা সহজভাবে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে। ছিটকিনি আঁটে।

রাজেন সামনে এসে দাঁড়ায়। বিমলার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসে। 'পুলিশ তোমার দিকে আর একটু এগোলেই শেষ করে দিতাম।'

বিমলা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে রাজেনের দিকে।

হাত ধরে টানে বিমলাকে। বিছানার সামনে আনে। 'চিত হয়ে শোও।'

'কেন! না।' বিমলা হাত ছাড়িয়ে নেয়।

রাজেন হাতের ছোরাটা ওর সামনে নাচায়। 'কথা শোনো। এবার আমি চলে যাব। কথা না শুনলে বাকি কাজটা তোমার ওপর দিয়েই হবে।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে বিমলার চোখে চোখ রেখে। 'তাই চাও?'

বিমলা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। কান্নায় দু'চোখ ভিজে যায়। কোন কথা না বলে চিত হয়ে স্থির হয় বিছানায়।

বিছানায় হাঁটু মুড়ে ওর পাশেই বসে রাজেন। একে একে বিমলার পেটের ওপর ফার্স্ট এডের সব কাজগুলো এক এক করে সারতে থাকে। সব শেষে উঠে দাঁড়ায়। 'উঠে বসো।' হাতঘড়ি দেখে, 'আমাকে এখনি চলে যেতে হবে।'

'তোমরা সব ডাকাত! এ ঘরে বসে কি করতে?' বিমলা শান্ত গলায় বলে। 'এত মদ খেতে বোতলগুলো পর্যন্ত বাইরে ফেলে দেবার সময় পেতে না!' উত্তরের অপেক্ষায় বিমলা নিশ্চুপ থাকে।

'সে আমাদের গোপন ব্যাপার। আগেই বলেছি তো, কাউকে বলা যাবে না।' সিগারেট ধরায়। 'চলি, উঠে দরজা বন্ধ করে দাও।'

বিমলা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'থামো, এখন যাবে না।' কোন কথা বলে না। একে একে ওর স্কুলে যাওয়ার সুতির সাইড ব্যাগটা কাঁধে ঝোলায়। টিনের সুটকেস খুলে কিছু জামা-কাপড় ব্যাগটায় ভরে নেয়। টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস। তালা চাবি। সোনার গয়নার

পুঁটলিটা ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। 'চলো।' শেষ হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেয়।

'কোথায় যাবে?'

'তোমার সঙ্গে।'

'কেন?'

বিমলা যেন আদেশ করে। দরজার দিকে এগোয়। 'এসো। তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।' একেবারে দরজার বাইরে চলে যায়।

রাজেন বাইরে আসে। চলায় দ্বিধা। দরজা আস্তে টেনে বিমলা তালা দেয়।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। থমথমে মেঘ, মাঝে মাঝে স্বচ্ছ নীল। সারা রাত অমাবস্যার অন্ধকারে চরাচর ঢাকা ছিল। তার মধ্যে চলে আদিম ঝড়-বৃষ্টির দাপট। এখন বৃষ্টি নেই। ভোরের দিকে চাঁদ দেখা দেওয়ার রাত। চারপাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়। এসবের আড়ালে যেতে যেতে একসময়ে দূরে বড় রাস্তা।

'আমরা কিন্তু অনেকদুর চলে যাব!'

'তোমরা সকলে?'

'হ্যাঁ।' রাজেন থামে। দুজনে হাঁটায় সন্তর্পিত।

বিমলা রাজেনের কাঁধে কাঁধ মেলায়। 'আমিও যাব।'

'ভালই!'

'কিসের ভাল?' বিমলা পাশ ফিরে দেখে রাজেনকে।

'আমিও তো বেশ্যার ছেলে।'

বিমলা থমকে যায়। 'তাই?'

'অবাক হচ্ছ?' থেমে যেন দম নেয়। 'জামিনে ছাড়া পেলেও থানার মানুষগুলো আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করত।'

বিমলার গলায় স্বর নেই। শ্বাসরুদ্ধ করে শুনতে থাকে।

'আমার মা এবাড়ি ও-বাড়ি রান্না-বাসন মাজার কাজ করতে করতে একদিন বেশ্যা হয়ে যায়। বাড়ির বাবুরা নিজেরাই নিজেদের খদ্দের বানিয়ে তোলে তাকে।' রাজেনের গলা থরথর করে কাঁপে। বিমলার বাঁ হাত কেন যেন শক্ত মুঠোয় ধরে।

একটু থেমে নতুন শ্বাস নেয়। 'আমাদের দুজনের রক্তের মিল।' কি ভেবে নিশ্চুপ। 'জান, রক্তের কোন জাত নেই, নেই কোন রঙের হের-ফের। একই স্বাদ নোন্‌তা। কিন্তু আমাদের চারপাশ কখনো পচা রক্তে বিষ ছড়ায়। আমরা দুজন সে সব থেকে মুক্ত। বিমলা,...' কি বলতে গিয়ে আচমকা থেমে যায় রাজেন।

রাজেনের এসব কথায় বিমলার কোন পুষ্ট বোধ আসে না।

দুজনে এরপর সব কথা ভুলে যায়। হলুদ চাঁদ ওদের ভোরের বৃষ্টির কুয়াশা মাখায়।

বিমলার এক অনুভব, ওর শরীর থেকে একটু আগের এত রক্ত বেরিয়ে গেলেও ওর সঞ্চয় শেষ হবে না কোনদিন।

# মানবসম্পদ

সুরঞ্জন প্রামাণিক

পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘড়ি থেকে ছড়ানো মিউজিক আধো ঘুম-আধো জাগরণে থাকা শমিতের মগজে ঢুকে পড়ল। চোখ মেলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখল না। তার দেওয়ালেও ঘড়ির কাঁটার সরে-সরে যাওয়ার শব্দ, হৃৎপিণ্ডের তালে বাঁধা। মিউজিক থেমে যেতে সে কান পাতল—এক-দুই...গুনতে থাকল—বারোটা!

অথচ কদিন আগেও, খেয়ে বিছানার ওপর শরীর ছড়িয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা'র মশারি টাঙানোও সে বুঝতে পারত না। এখন পাশের ঘরে যাঁতিতে সুপুরি কাটার শব্দ শুনতে-শুনতে তার দুখী মার বসে থাকা, পান সাজা সবই কল্পনা করতে পারে। আর ওই কল্পনার ভেতর একসময় সেই লোকটা ঢুকে পড়ে।

একটা দৃশ্য—একেবারে স্থির।

তাদের গলিপথ বড়রাস্তায় যেখানে মিশেছে, ঢুকতে ডান হাতে ফুটপাত আর রায়বাড়ির ঝুলবারান্দার নিচের চাতালে, লোকটাকে দেখেছিল শমিত। জবুথবু বসে আছে। ফুটপাতের ভিখিরিরা যেমন থাকে। পাশে একটা বোঁচকা। এক ঝলক মুখটা দেখেছিল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তার মানে মাঝে মধ্যে দাড়ি কামায়! টেকো মাথায় ঝালরের মতো চুল, এলোমেলো। টাকের সঙ্গে টাকার সত্যিই কি কোনো সম্পর্ক আছে? কী একটা গান—আজ যে রাজ-অধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়—এরকম কী যেন—লোকটা কি সেরকম কেউ? শমিতের তখন মনে পড়ছিল আর একজনের কথা, তখন সে কলেজে পড়ে, এক বন্ধুকে সী-অফ করতে গিয়েছিল, ট্রেন চলে যাওয়ার পর, অনেকক্ষণ সে একা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, তখন একজন, পরণে প্যান্ট-শার্ট, তার সামনে এসে বলেছিল, একটা টাকা দেবেন ভাই। ইফ পসিব্‌ল্! অবিশ্বাস্য! তবু সে লোকটাকে জরীপ করেছিল। সেই নির্বাক মুহূর্তে লোকটা আবারও বলেছিল, ইফ পসিব্‌ল্! ভিখারী? না। মনে হয় না। মনে হলেও মেনে নেওয়া যায় না। মাত্র একটাকা! শমিতের পকেটে হাত ঢুকে পড়েছিল। এমন অভিজাত চেহারা! কথা বলার ভঙ্গিটা কত চমৎকার! হাত একটা মুদ্রা তুলে নিয়ে এল নির্ভুল। হতবাক শমিত টাকাটা দিতেই শুনল, মনে থাকবে।

আশ্চর্য! ধন্যবাদ নয়। মনে রাখবে। লোকটা আর একমুহূর্ত দাঁড়ায়নি। লোকটার হেডে কি নোংরা জমেছিল? বছর দশেক আগের ঘটনা—বছর দশেক পর, সেই মানুষটা কি এত বুড়িয়ে যেতে পারে?

এরকম কী সব ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরেছিল।

এই যে আমাদের বাড়িটা, একসময় বনেদী চেহারার ছিল। ছিল যে তার আভাস পাওয়া

যায়। পলেস্তার খসে পড়ছে, তবু। জানলার শিকে জং, ক্ষয়; বিবর্ণ কপাটের কারুকাজ তবু বাপঠাকুর্দার রুচিকে মনে করায়। সেরকমই কিছু চিহ্ন যেন সেই লোকটার চোখে মুখে।

শমিত কল্পনা করতে পারে লোকটার যৌবন কিংবা তারও আগের সময়। বাল্য থেকে যৌবনের শুরু—খুব একটা অসুবিধা হয় না। যৌবনের শুরু থেকে—সেই যুবককে সে প্রেমিক ভাবতে চায়, তখন একজন প্রেমিকা—প্রেমিকা কল্পনা করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না, তবে প্রেমকে সে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। অনিবার্যভাবে তখন বিদিশা এসে পড়ে। শমিত অন্ধকারে কথা ছড়িয়ে দেয়, না, তোমাকে কোনো দোষ দেবো না।

চাদ্দিকে এত প্রলোভন—আদর্শবান মানুষেরাই আদর্শ ভুলে যাচ্ছে! ভালোই করেছ! আমি এখন পাড়ার 'ফাইফরমাস' খাটার মানুষ—ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল জমা, গ্যাস বুকিং থেকে এল-আই-সি-র প্রিমিয়াম দেওয়া সব—সব, অফিস-আদালতের নানান কাজ—এই আমার জীবিকা—মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছে নেই। সিনেমা দেখি না—সিনেমা যেন একটা স্বপ্নরাজ্য, সিনেমার প্রেম দেখলে মন খারাপ হয়—কেবল ক্লাবঘরে ডিসকোভারি চ্যানেলটা দেখি—জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখতে খুব ভালো লাগে। পশুদের প্রেম দারুণ!

দীর্ঘশ্বাস শূন্য বুক নিয়ে শমিত শুয়ে থাকে। লোকটাকে নিয়ে কল্পনা আর ছড়ায় না।

লোকটাকে দেখার আগে, বিদিশাকে তেমনভাবে মনে পড়ত না। তারও আগে, জীবন থেকে বিদিশার চলে যাওয়ার প্রথম দিকে সিনেমায় প্রেমের দৃশ্য দেখতে-দেখতে পর্দায় বিদিশাকে ফুটে উঠতে দেখত, দুএকবার ভিসিপিতে দেখা নীলছবিতেও—তাতে এক অদ্ভুত কষ্ট, সমস্তটাই শারীরিক—এবং একসময় অনুভূতিটা খুবই ভোঁতা হয়ে গেছিল—ওই সব—যদি আনন্দ বলো আনন্দ, যদি মজা তো মজা—সবার জন্যে না—এরকম ভাবনায় মাঝে মধ্যে ওই কারণে তার পশু হতে ইচ্ছে করে। যদি হওয়া যেত!

কিংবা যদি মেয়েমানুষের বাজারে ঢোকা যেত!

হয়ত যায়।

না, যায় না। অন্তত, যদ্দিন মা আছেন।

আমার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মার মৃত্যু পর্যন্ত। মা প্রতিনিয়ত নিজের মৃত্যুকামনা করে। মাকে যদি আমার আমৃত্যু বাঁচিয়ে রাখা যেত যদি, কোনো অ্যাক্সিডেণ্টে আমার মৃত্যু আগে হয়? এরকম ভাবনার শেষে আর কোনো ছবি থাকে না। ভাবনাও চলে যায়। রাতের নিজস্ব শব্দ আবহে মাঝেমধ্যে ভো-ও-ঔ-উ—যেন কান্না—কুকুরেরাও একা হয়ে যাচ্ছে খুব—তখন সেই লোকটাকে মনে পড়ে আবার...

এইভাবে, শুতেই যার ঘুম এসে যেত, তার বারোটা বেজে যাচ্ছে ইদানিং, আজও—পাশ ফিরে শুয়ে ভাবল, লোকটাকে নিয়ে এত ভাবছি কেন? দরকারটাই বা কী? তারপর গম্ভীরভাবে নিজেকে শোনালো, না, কোনো দরকার নেই, ঘুমিয়ে পড়ো!

মিউনিসিপ্যাল অফিসে একটা বার্থ সার্টিফিকেটের ব্যাপারে তদ্বির ছিল। লোকটা ঘোরাচ্ছে খুব। আজকাল রেগে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও যেন শমিত হারিয়ে ফেলেছে। অথচ

কিছুদিন আগেও, কোনো কাজে 'পয়সা লাগবে'—এরকম আভাস পেলে সে রেগে যেত, মনে-মনে গজরাতো, কেন? এই কাজটি করার জন্যই তো তুমি মাইনে পাচ্ছ—পয়সা দেবো কেন?

অবশ্য কখনও বলতে পারেনি। একই রকমের কাজ নিয়ে বার-বার আসতে হবে—এখন অফিসের অনেকেই তাকে দালাল মনে করে, তুমি মাল খিঁচছো—বখরা দেবে না তাই কখনও হয়?

কিংবা, তুমি তো আমাদের দেবে বলেই পার্টির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছো—সবটাই ঝেপে দেবে?

ভাবুক। কী-ই বা এসে-যায়!

আজ সে বাবুটিকে বলল, এই নিয়ে তিন দিন—ফিরে যাচ্ছি—

স্বরে যেন একটু 'থ্রেট' ফুটে উঠল। কী করার মুরোদ আছে তোমার?

পরক্ষণেই অনুনয় ঝরিয়ে বলল, কবে আসব—আপনিই বলুন!

বাবুটি তার মুখের দিকে তাকালো।

দেখুন! হতাশাদীর্ণ গর্তে ঢোকানো দুচোখ, ভাঙা চোয়াল। কোথাও কি কোনো ধূর্ততা আছে?

করুণা জাগছে কি?

বাবুটি বলল, নেকস্ট উইক—শেষদিকে আসুন একবার!

শমিত একেবারে গলে গেল, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ স্যার!

অফিস থেকে একটু ফুরফুরে মনেই বের হল—মানুষকে বিশ্বাস করতে এখনও ভালো লাগে—লাগছে, ধরে নেওয়া যায় আগামী সপ্তাহের লাস্ট ওয়ার্কিং ডে—কাজটা হয়ে যাবে। বার্থ সার্টিফিকেট যা সাহাবাবুরা পেলে তার প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে যাবে। সেটাই তার লাভ।

আগেকার সাইন বোর্ডগুলোতে প্রায়ই লেখা থাকত—সততাই আমাদের মূলধন—আমি বিশ্বাস বেচে খাই, এরকম কি ভাবা যায় কিংবা আস্থাই আমার মূলধন—এরকম ভাবতে-ভাবতে প্রায় দুটো স্টপেজ সে হেঁটে মেরে দিল। তার মানে মিনিমাম বাস ভাড়া সে আয় করল—আমার পথ চলাতেই আনন্দ! এবার ইলেকট্রিক অফিস, পাঁচখানা বিল জমা দিতে হবে। তার আগে একটু চা—চা-চা করছে আমার প্রাণ—ফুটপাত ধরে হাঁটছিল। ক্যাসেটের দোকানো পুরনো দিনের হিন্দি গান, কিয়া হুয়া তেরা ওয়াদা—একটু থমকালো শমিত। সুর না কথা কে জানে, অদ্ভুত এক জাদু, রক্তের ভেতর না কোথা দিয়ে, কে জানে, কী রকম একটা হয়ে যায় বুকের ভেতর, তখন বিদিশা—বুকের ভেতর উথাল-পাথাল—প্রেমের গান শুনলেই—আজও, থমকে থাকল কয়েক মুহূর্ত—সাঁ-সাঁ ছুটে যাচ্ছে ছোটগাড়ি, গা-গা ভূতল পরিবহন বাস-ট্যাক্সি—তার মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে স্পষ্ট শুনতে পেলো ভুলে গা ওদিন জিস দিন তুমহে, ওদিন জিন্দেগীকা আখরী দিন হোগা...

কী মিথ্যে সব! ভুলে যায়। যেতে হয়। আরও-আরও দিন পড়ে থাকে। ধুৎ!

দিন। আরও-আরও দিন—কতদিন—মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত! এরকম পথ হাঁটতে-হাঁটতে একদিন, নির্বান্ধব একা—পথ শেষে—সেই লোকটার মুখ...

স্যরি!

ব্যাহত গতির লোকটা রাগত দৃষ্টিতে তাকালো, যেন বলল, গাঁইয়াগুলো যে কেন শহরে আসে?

কাউন্টারের সামনে বেশ লম্বা লাইন। আপাতত শমিত শেষ জন। তার দুজন সামনে এক বৃদ্ধ, থুত্থুরে—একটু কুঁজো, হাতে লাঠি—মুখের এক পাশ সে দেখতে পেয়েছে—এরকম বুড়ো মানুষকে কেন যে পাঠায়!

কী ভাবে এলেন উনি? কাছাকাছি থাকেন বুঝি?

বৃদ্ধ একবার পেছন ফিরে তাকালেন। সম্পূর্ণ মুখ। বয়সের আঁক কাটা—ভাঁজগুলো যেন কষ্টে আরও গভীর, ক্লান্ত ঘোলাটে দৃষ্টি, ফুলো ফুলো চোখের কোল, ভুরু ঝুলে পড়েছে—কী দেখলেন কে জানে। শমিত ওই মুখ দেখতে-দেখতে সেই ভিখিরি লোকটাকে ভাবল। বলা ভালো ওই মুখ তাকে মনে করালো। তারপর ওই মুখটাকে সে ভিখিরি সাজালো।

মানুষ নাকি সম্পদ—মানবসম্পদ—মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটা দপ্তর আছে—তার জন্য মন্ত্রী এবং সে সম্পদ রপ্তানীও করা যায়—তাহলে মানুষ কখন ভিখিরি হয়—সমস্ত মানব-অধিকার হারানোর পর?

মানুষের অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে? সে জন্যই কি মানবাধিকার কমিশন—পশুদের জন্য অভয়ারণ্যের মতো?

দাদা এগোন!

শমিত দেখল তার সামনে দুই-তিন মানুষ ফাঁক—তার পেছনে অনেকজন—সে ফাঁক পূরণ করল।

মানবাধিকার কমিশন তবে ওই বৃদ্ধ কিংবা সেই ভিখিরির জন্য নয়।

ভিখিরির জন্য তো নয়ই!

কারণ?

ভিক্ষা একটি বৃত্তি!

যতদিন মানুষের পুণ্য অর্জনের বাসনা থাকবে, ততোদিন এ বৃত্তি নিয়ে মানুষ বাঁচবে।

কিন্তু যাই বলো, ভিখিরির সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে! ভিখিরিদের তবু, মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকে, সেই লোকটার কিন্তু নেই—লোকটা বোধহয় সমাজ-সংসার থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন—এত নোংরা ময়লা তবু, ঠিক যেন ভিখিরি নয়, যেমন খুশি সাজো-তে সেজেছে—ডিটেক্‌টিভের লোক নয় তো? হতেও পারে। চাদ্দিকে এত সব অপকর্ম!

লোকটার সঙ্গে কথা বললে হয়!

একটু আগে তিনতলা বাড়িটার আড়ালে সরে গেল সূর্য। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতায় এখন ছায়ামাখা আলো। কালচে সবুজ। কুঁড়িরা কয়েকদিনের মধ্যে ফুটে উঠবে। তাদের গলির

মুখে দাঁড়িয়ে শমিত, এসব লক্ষ্য করল একবার। তারপর সেই বুড়োকে। এই প্রথম নজরে পড়ল বুড়ো একা নয়; তার পাশে একটা কুকুর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

কদিন আগে মিউনিসিপ্যাল অফিসে বলা-কওয়া শুনছিল—কুকুরের উপদ্রব রুখতে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা নেবে—নাগরিকদের তরফ থেকে নানা অভিযোগপত্র জমা পড়ছে—নেওয়া উচিত—পথ চলতে সত্যি ভয় করে, কখন কামড়ে দেয়—বাব্বা! নাভির চারপাশে—এখন অবশ্য ইন্টার মাসকুলার ইঞ্জেকশন বেরিয়েছে, বড্ড দাম—প্রিকশান নেওয়াই ভালো—আর ওই সময়টাতে—পথ চলাই মুশকিল, ব্যাপারটা এখন অবশ্য ততো আর সিজিনাল নেই, যখন তখন—জন্ম নিরোধক কোনো ব্যবস্থা করতে তো পারে সরকার থেকে—হকার উচ্ছেদের জন্য যেন অপারেশন সানসাইন, কুকুর উচ্ছেদের জন্য কী নাম হবে—

আচ্ছা কুকুরগুলোকে কি ধরে মেরে ফেলা হবে? বড্ড অমানবিক—কী একটা সংগঠন আছে না—কী যেন—তাহলে তো ওই কুকুরটাকেও ধরা হবে! আহারে! লোকটা একেবারে একা হয়ে যাবে!

বেঁচে থাকাটা বড্ড মুশকিল।

কুকুরগুলো যদি বিদ্রোহ করে?

হুঁ-উঃ! মানুষই বিদ্রোহ করতে ভুলে যাচ্ছে, তো কুকুর! তবু বিদ্রোহ হয়, হচ্ছে—বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলছে চাদ্দিক দিয়ে...কুকুরগুলোকে কী ভাবে ধরা হবে?

ওই প্রশ্নটাই আজ ক্লাবঘরে শুভকে জিজ্ঞেস করল। শমিত ব্যাপারটা জানে না! সে একটু অবাক। বলল, খিদে বুঝিস?

—হ্যাঁ। না বোঝার কী আছে?

—ওই খিদেই হচ্ছে, সমস্ত জীবকুলের দুর্বলতম জায়গা—উইক পয়েন্ট।

—তো?

—তো, কুকুরগুলোর সামনে ছুড়ে দেওয়া হবে, রুটির টুকরো কিংবা আস্ত একটা রুট—আ তু-তু—আয় আয়—আ তু! কত প্রাচীন ডাক বলত—ওই ডাকে কত আস্থা—জিনের অন্তর্গত রহস্যময়তায় ওই ডাক—সাড়া সে দেবেই—খিদে—যখন জিভেয় খাবারের স্বাদ, ঠিক তখন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরবে ঘাড়, তারপর—

সে সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেল। যেন তারই ঘাড় চেপে ধরা হয়েছে।

শমিত বলল, কী হল!

—বীভৎস!

—কী।

—যদি কুকুরগুলোকে মেরে ফেলা হয়?

কুকুরমুক্ত আমাদের শহর—খুব কি ভালো থাকবে!

সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকে কুকুর আমাদের সঙ্গী—সে তো বন্য ছিল, বন থেকে তুলে এনেছিলাম—সেই বনও হারিয়ে গেছে—তবু জন্ম, গাড়ির চাকায় পিষে যাওয়ার পরও

বেঁচে থাকা, জন্ম দেওয়া—মৃত্যুকে এড়িয়ে, তবু মৃত্যু!

খিদে!

আয় আ-তু! আদুরে ডাকে কী অদ্ভুত মৃত্যু বোনা যায়!

শমিতের ছোটোবেলায় তাদের বাড়িতে একটা কুকুর পোষা হয়েছিল। আয় আ-তু! ডাক শুনে ছুটে আসত টম, মুখের দিকে গদগদ চেয়ে থেকে লেজ নাড়াতো খুব। সেই ছিল বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষী—অপরিচিত কেউ এলে সে কী ডাক—

এইভাবে কোনো-কোনো কুকুরের জন্ম সার্থক হয়!

আর স্ট্রিট ডগগুলো—নেড়ির দল তারাও কি কম উপকারী—সেই যে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল ছবিটা—পরিত্যক্ত এক মনুষ্য শাবককে রাতভোর পাহারা দিচ্ছিল কয়েকটা কুকুর—সে তো ওই রাস্তার কুকুর—কী আশ্চর্য! মানুষের সঙ্গ তাদের এত মানবিক করে তুলেছিল—নাকি সব কুকুরেরাই অমন মানবিক? কে জানে!

তাহলে মানুষ কেন কুকুরের প্রতি অতো নিষ্ঠুর হবে? বন থেকে বিচ্ছিন্ন কুকুর, একদিন রাস্তার কুকুর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ, রাস্তার ভিখিরি—সংসার যার গড়ে উঠবে না কখনও, সে একদিন, মানে এই আমি, আমিও কি ওই ভিখিরির মতো হয়ে যাবো?

তখন আমার জন্য একটা কুকুরও থাকবে না এই শহরে! সব ভিখিরিদের কি আর কুকুর থাকে? থাকে। ভিখিরিদের সঙ্গে কুকুরদের দারুণ সম্পর্ক—কখনও সংঘর্ষের, কখনও বন্ধুত্বের—এ শমিতের নিজের চোখে দেখা। কিন্তু কুকুরধরা বাহিনী—কুকুরগুলোকে কি মেরে ফেলা হয়? শমিত একটা উপায় খুঁজতে চাইল, যাতে কুকুরগুলোকে বাঁচানো যায়।

অনেকটা বেলায় ঘুম ভাঙল আজ। মা তাকে ডাকেনি। ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল স্বপ্ন—দারুণ স্বপ্ন ঃ কুকুর বিদ্রোহ! যত সব রাস্তার কুকুর, গেরস্থ বাড়ির কুকুরও ছিল দুএকটা—তারা সব অরণ্য দাবী করছিল। বিকল্পে তারা দাবী করছিল মানুষের মর্যাদা। কারণ, প্রভুভক্তিতে তারা মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে; আনুগত্যেও ততোধিক—আর শমিত কুকুরের দলে ভিড়ে গেছিল।

স্বপ্নটা মজার।

ঝিমধরে বসে থাকল শমিত।

উদ্ভট।

হয়ত তাই। কিন্তু সত্যি হলে ভালো হত।

শমিত উঠল। দরজা খুলল।

—মা!

কোনো সাড়া পেল না।

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। মার ঘরের দরজাও। উঁকি মারল জানলা পথে।

মা শুয়ে। শোয়াটা কেমন যেন।

বুকের ভেতরটা ক করে উঠল। এবং তারপর তার মস্তিষ্ক দারুণভাবে কাজ করতে শুরু করল। তা হলে আমার আমৃত্যু মা আর বেঁচে থাকলেন না।

দরজাটা কী ভাবে খোলা যাবে এখন?

ভাবতে থাকল।

বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সীমায় আমি পৌছে গেছি এখন আমি একা, সম্পূর্ণ একা। কোথাও কোনো আত্মীয়-স্বজন? খবর তো দিতে হবে। সেরকম কারও কথা মনে পড়ল না। আছে। নিশ্চয়ই আছে কেউ—কিন্তু কোথায়?

আজ রাতে, আমার মশারি আমাকে টাঙাতে হবে, এবং প্রতিদিন। নাও টাঙাতে পারি—আমার শরীর ঘিরে মশাদের মহাভোজ।

শমিত তার করণীয় ভাবল...

সবার আগে, তার মনে হল, সেই ভিখারির কাছে যাওয়া উচিত।

এবং সেই মতো সে বের হল। যাক, মাকে অন্তত পথের ভিখিরি হতে হল না।

মা, আমার দুখী মা—বিয়ে করার কথা প্রায়ই বলতেন—বিদিশার কথা জানতে চাইতেন, সেই যে সেই মেয়েটি আর আসে না কেন?

শমিত কিছু বলতে পারত না।

চোখদুটো জ্বালা করছে।

লোকটা রান্না করছিল। তিনটে ইটের টুকরোর ওপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট তেরাবেঁকা হাঁড়ি—আবর্জনা জ্বালানি—ভাত ফুটছে। কুকুরটা বসে আছে—সামনের পা দুটো টান-টান। দৃষ্টি যেন ওই ভাতের হাঁড়ির ওপর। শমিত ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে।

কারও যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

—শুনছেন?

লোকটা মুখ তুলে তাকালো। কুকুরটার কান খাড়া।

—কুকুরটা কি আপনার?

—আমি ওর মালিক না—পথে আলাপ—আছি একসঙ্গে।

—আপনি কে?

—কে মানে?

—পরিচয়।

—দুপেয়ে একটা জীব মাত্র।

—আপনি ভিখিরি সেজে আছেন কেন?

লোকটা খুব নরম করে তাকালো, সাজিনি। এরকম জীবন পায় কেউ-কেউ।

—কী আশায় বেঁচে আছেন আপনি?

—বেঁচে থাকার নিয়মে।

—কার জন্য?

—এখন বলা যায় ওই কুকুরটার জন্য।

—আপনি কি জানেন, দু-একদিনের মধ্যে এই শহরে কুকুর ধরা অভিযান শুরু হবে?

—না।

—কুকুরটাকে নিয়ে, শহরের বাইরে কোথাও চলে যান!

লোকটা আবারও শমিতের মুখের দিকে তাকালো। অদ্ভুত নরম দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে মিশেছে একটু বিস্ময়। এমন কি জিজ্ঞাসাও, তুমি কে?

—আমি এমন একজন যে তার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সীমায় পৌঁছে গেছে।

লোকটার চোখে কৌতূহল।

—মানে, মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকা জরুরি ছিল—কাল রাতে কিংবা আজ ভোরে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে—ঠিক জানি না, তবে তাঁর শুয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল আর তারপর থেকেই, কী বলব—আমার করণীয় ভাবতে গিয়ে, আপনাকে অ্যালার্ট করাটাই আমার প্রথম কাজ মনে হল, মানে কুকুরটার জন্য!

লোকটা শমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই একই রকম দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিপ্রবাহে যেন বাহিত হচ্ছে বেঁচে থাকার নিয়ম, আর চারিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে—এতক্ষণে কুকুরটা শমিতের গা শুঁকলো, অদ্ভুত এক স্বর উগরে চেয়ে থাকল তার মুখের দিকে।

আবারও ডাকল ভো-ও-ঔ—

কান্নার মতো, নাকি স্বগত স্বর ঠিক বুঝতে না বুঝতেই শমিত দেখল কুকুরটা দু'পায়ে দাঁড়িয়েছে, সামনের পা দুখানা হাতের মতো তার বুকের ওপর, কুঁই-কুঁই আওয়াজ—পা দুখানা সত্যিই যেন হাত হয়ে যাচ্ছে—শমিতের হাত তাকে জড়িয়ে ধরল, একই সঙ্গে তার স্বরতন্ত্রী উগরে দিল অদ্ভুত আওয়াজ—জান্তব, কান্নার মতো কিংবা কান্নাই।

# ফাঁদ

রবীন্দ্র দত্ত

সরকারী অফিস। বিশাল ছ'তলা বাড়ির তিনতলায় আমাদের পরপর হলঘরে বিভিন্ন বিভাগ। একটা বড় ঘরের একপাশে কয়েকটি আলমারি ঘেরা জায়গায় আমাদেরপরিদর্শক শ্রেণীর অফিস। আমরা ছ'জন এই ঘরে বসি। আমাদের উপর একজন প্রধান পরিদর্শক আছেন। প্রয়োজন মত কোন তদন্তের দরকার পড়লে আমাদের কারো ডাক পড়ে। মূলত খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের আমরা অনুসন্ধান করি।

পরপর তিনটি টেবিল পাশে চেয়ার। প্রধান-পরিদর্শনের টেবিল আলাদা। রাস্তার দিকে বড় দুটি জানালা। রাস্তার উল্টোদিকে উঁচু বাড়ির আড়াল হলেও ঘরে আলো বাতাস পর্যাপ্ত আসে।

দিনের পর দিন তদন্তের কাজের জন্য অপেক্ষা করে থাকাই আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। শুভঙ্কর, প্রিয়ব্রত, সুরঞ্জনে, দীপক, ইন্দ্র সবাই যে যার চেয়ারে বসে। আমার আজ অফিস আসতে সামান্য দেরী হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদের তেজ তখনও আমার শরীর জুড়ে। অফিসারের ঘরে খাতায় সহি করে এসে সাময়িক ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করে পাখার নিচে চোখ বন্ধ করে বসে আছি। অর্নব হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আমার টেবিলে ছোট ব্যাগটা রেখে বলে—তুষার আমি একটু ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে যায়। প্রধান পরিদর্শক সমরবাবু ফাইল দেখতে দেখতে অর্নবের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেন।

—গুড মর্নিং তুষার। ইন্দ্র পাশ থেকে হাসিমুখে আমায় বলে।

আমি কোন উত্তর দিই না। এবার বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ঘরে চাপা হাসি ঠাট্টার ঢেউ উঠবে জানি, আমিও আস্তে আস্তে সেই প্রসঙ্গে যোগ দেব।

—তুষার এখনও সিগারেট ধরায় নি। সুরঞ্জন আস্তে বলে।

—আমি কি তুষারের নামে কয়েকটা চায়ের কথা বলে আসবো। সুরঞ্জন চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে।

পাশে এসট্যাবলিসমেণ্ট সেকশন্। কর্মচারীদের অনেক রকমের কথা ভেসে আসছে। চোখ খুলে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে আর একটি নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করব ভাবছি— 'আপনাকে ডেপুটি ডিরেক্টর ডাকছেন।' অফিসারের ঘরের পিয়ন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। 'যাচ্ছি।' পিয়ন চলে যায়।

ঘরে ঢুকতেই ডেপুটি ডিরেক্টর মুখ তুলে তাকা—'আপনি' আস্তে বলেন—শুনুন নিচে আমাদের সেক্রেটারিয়েটের চ্যাটার্জী বাবুর সঙ্গে এখুনি তার ঘরে দেখা করুন। আমি কোন উত্তর না দিয়ে দোতলায় নেমে চ্যাটার্জী সাহেবের ঘরে ঢুকতেই—আপনাকে ডেপুটি ডিরেক্টর

পাঠিয়েছেন তো, বসুন। টেবিলের উপর একটা অর্ডারের কাগজ বের করে আমার নাম লিখে নেন। আসনে দু'জন লোক চেয়ারে বসে। বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া কাঁধ, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, মাথাভর্তি একরাশ চুল। লোকদুটি আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

—এরা এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ থেকে এসেছেন। তুষারবাবু আপনি এদের সঙ্গে যাবেন, আমি অর্ডার করে দিয়েছি। কাজ হয়ে গেলে রিলিজ অর্ডার করে আনবেন।

লোক দুটি আমার পিছনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুশ্রী মুখের প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি লোকটি বলে—নিচে গাড়ি আছে। আপনি এখন আমাদের গাড়িতে হেড-কোয়ার্টারে যাবেন। আমি কোন উত্তর দিই না।

'আপনারা নিচে দাঁড়ান আমি সেকশনে বলে আসি।'

সমরবাবুকে সব বললাম। 'রিলিজ করে দিলে সময় থাকলে একবার আসবেন।' সমরবাবু আস্তে বলেন।

নিজের টেবিলে এসে ড্রয়ারে থেকে ব্যাগ বের করে উদগ্রীব সহকর্মীদের দিকে তাকাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রে? শুভঙ্কর উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করে।

—কাল এসে বলব। আমি আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। অ্যামবাসাডরের দরজা খুলে ভিতরে পা রেখেছি অর্নব এসে দাঁড়ায়—কোথায় চললি? এসে বলব। বলে ভিতরে সুশ্রী লোকটির পাশে গিয়ে বসি। অন্য লোকটি ড্রাইভারের পাশে। ব্যস্ত কলকাতার গাড়ি লোকজন ভর্তি রাস্তায় ড্রাইভার বেশ জোরে গাড়ি চালায়।

সামনের লোকটির গায়ের রঙ কালো, পাশ থেকে মুখের ভরাট অংশ দেখা যায় চওড়া গোঁফের কিছু অংশ। হঠাৎ লোকটি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনাদের ইন্সপেক্টরদের উপরে কে আছেন? চোখ দুটি, কিছুটা লালচে, ঠোঁটদুটি বেশ পুরু, চওড়া গোঁফ—চেহারায় ভারিক্কী ভাব গড়ে উঠেছে। গলার স্বরও গমগমে।

—একজন চিফ ইন্সপেক্টরের আণ্ডারে আমরা ক'জন ইন্সপেক্টর আছি।

—আপনাদের? আমি ছুটে চলা গাড়ির ভিতরেও বেশ গরম বোধ করি।

—হেড-কোয়ার্টারে আমরা চারজন সাব-ইন্সপেক্টর আছি। শহরে সাউথ জোনাল অফিস, যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদের হেড-কোয়ার্টারও বলতে পারেন। লোকটি বলে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

সুশ্রী চেহারার লোকটি একবারও আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বাইরে থেকে মুখ ঘোরায় না।

আমি চুপ করে যেতে লোকটি আমার দিকে একবার তাকায়। একটু লম্বাটে মুখ, গায়ের রঙ সামান্য ফর্সা। চোখ দুটি সামান্য লম্বা, দৃষ্টি প্রখর নয়। পাতলা ঠোঁট-জোড়ার উপরে চওড়া গোঁফ থাকলেও চরিত্রের কাঠিন্য খুব বেশী প্রকাশ পাচ্ছে না।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করে এখনকার কাজের হদিশ করার চেষ্টা করলাম না। সময়ের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করি।

দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে গাড়ি এসে একটা চওড়া পুরানো কাঠের দরজার

ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ে। বড় মাটির উঠান। দু'চারটে বড় বড় গাছ, তারই ছায়ায় কতকগুলো প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে। উঠানের মাঝখানে একটা সুরকি রঙের সাদামাঠা দোতলা বাড়ি। বড় বড় নীল রঙের জানালা। খয়েরী পর্দা হাওয়ায় নড়ছে। তিনজন নেমে দোতলা বাড়ির দিকে হেঁটে যাই। পুরানো আসলের চওড়া ভিতের বাড়ি। বড় দরজা, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, আশপাশের জানালা দরজাও বড়। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ওঠে, উপর থেকে ব্যস্ত মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে। একটা রোগা লোক ব্যস্ত হয়ে হাতে ফাইল নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে নিচে নেমে যায়। সিঁড়ি শেষ হয়—চওড়া করিডরের পাশে পরপর তিনটি দরজা। দুজন আমাকে পিছনে রেখে একটি পর্দাঘেরা দরজার সামনে দাঁড়ায়। দেয়ালে নেমপ্লেট—অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার কে. চৌধুরী।

—স্যার যাবো? বলিষ্ঠ চেহারার লোকটি বেশ জোরে বলে।

—কাম্ ইন। গম্ভীর গলার স্বর ভিতর থেকে ভেসে আসে।

দুজন ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আমি ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বড় ঘর-জানালার কাছে বিরাট শৌখিন টেবিল। জানালার দিকে পিছন করে একটি সমর্থ চেহারার পঞ্চাশোর্ধ লোক বসে। খয়েরী রঙের হাফ হাতা শার্ট—টেবিলে পেশীবহুল বলিষ্ঠ দুটি হাত তোলা। মাথায় কালো শাদা মিলিয়ে একরাশ চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো—সামান্য লম্বাটে মুখের কাঠিন্য বেড়েছে গোঁফের দীর্ঘ বিস্তারে। পাতলা ঠোঁটজোড়ায় ব্যক্তিত্বের ছাপ আরো স্পষ্ট। টেবিলের ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন কাচে হাতের প্রতিবিম্বের মাঝে একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখের সঠিক অবস্থান। টেবিলের একপাশে দু'চারটি ফাইল, পেন-স্ট্যাণ্ড, একপাশে তিনটি বিভিন্ন রঙের ফোন। মানুষটির উপস্থিতিই আমাকে যেন স্বস্তি দেয়। টেবিলের সামনে রাখা পাঁচটি চেয়ারের একপাশে ভারিক্কি চেহারার শাদা প্যাণ্ট শার্ট পরা বছর চল্লিশের ভদ্রলোক নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বসে। সামনে দামি সিগারেটের প্যাকেট, শৌখিন লাইটার। তার পাশে অফিসারের মুখোমুখি একটি ফর্সা তিরিশ-বত্রিশ বছরের যুবক বসে—ক্রিম রঙের শার্ট—সুন্দর পরিপাটি আঁচড়ানো চুল—নিখুঁত করে কামানো দাড়ি। মুখ থেকে রক্তাভা যেন ফুটে বের হচ্ছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে যুবকটি আমার দিকেই তাকায়।

—তোমরা যাও। অফিসার আমার সঙ্গের লোকদুটিকে বাইরে যাওয়ার আদেশ দেন। লোকদুটি দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—আপনি বসুন। আমি নমস্কার করে শাদা প্যাণ্ট শার্ট পরা লোকটির পাশে চেয়ারে বসি।

—আপনার খুব কৌতূহল হচ্ছে এখানে এসে, তাই না। অফিসারের আকস্মিক প্রশ্নে আমি অস্বস্তিবোধ করি।

—কৌতূহল তো আছেই। আমাদের অফিসার আপনার লোকদের সঙ্গে এখানেই আসতে বললেন।

—একটা লোককে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে টার্গেট করা হয়েছে। তাকে হাতে নাতে ধরার সময় আমাদের দুজন স্বাক্ষী দরকার। ওনাকে তো ব্যাঙ্ক থেকে এনেছি—আমার পাশে যুবকটির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলেন অফিসার—আপনি তো কিছুটা

শুনেছেন? যুবকটি মাথা নাড়ে। এই গোবিন্দকে একবার ডাকো। বাঁদিকে দরজার দিকে তাকিয়ে কার উদ্দেশ্যে বলেন।—চার কাপ চা তাড়াতাড়ি করে দিতে বলো।

—আপনাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের খুব ভাল সম্পর্ক জানেন তো?

আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—আমরা দুপক্ষই নিজেদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

মাথার উপরে পুরানো পাখার খসখস শব্দের সঙ্গে জমাট হাওয়ার রেশ গরমের অস্বস্তি থেকে বাঁচায়। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ, ঘাড়ের ঘাম মুছি।

—আপনাকে এই গরমের দুপুরে অফিস থেকে বের করে এনেছি তাই না?

অফিসারের আকস্মিক কথায় আমি অস্বস্তি বোধ করি। তাড়াতাড়ি বলে উঠি—না না আমার তো ডিউটি আওয়ার্স।

—থ্যাংকস্। ভদ্রলোকের গম্ভীর স্বর তার মুখের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

—আসল কথাটা আগে বলে নিই। আমরা একটা অফিসে একটি বিশেষ লোকের চারপাশে ট্র্যাপ পাতবো। বলে অফিসার প্যাকেট থেকে সিগারেট মুখে তুলে নিপুণ ভঙ্গিতে লাইটার জ্বেলে ধরান। মুখ ভর্তি ধোঁয়া বেরিয়ে এসে তাকে পাতলা আবরণে ঢেকে রাখে।

—এবার আমরা মূল বিষয়ে আসতে পারি। ব্যাঙ্কের যুবকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তখনি ট্রেতে গরম চায়ের কাপ, প্লেটভর্তি বিস্কুট নিয়ে একটি লোক বিনীতভাবে ঘরে ঢুকে সবার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে, বিস্কুটের প্লেট অফিসারের সামনে। কথা বন্ধ। পাখার শব্দ—ঘরের বাহির থেকে বিভিন্ন মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে। ঘরের একটা টিউব জ্বলে ওঠে। বাইরের গরমের দুপুরের আলো ঘরের আলোর সঙ্গে মিশে অনেক অনেক উজ্জ্বলতা তৈরী করে আমাদের চারপাশে।

কমিশনারের দুটি ভ্রূ চোখে পড়ে। নিপুণ স্বাভাবিকতায় তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিকে আরো অন্তর্ভেদী হতে সাহায্য করেছে। চায়ের কাপ বাঁ হাতে তুলে নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে আমার দিকে সোজাসুজি তাকান। উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি—কোথাও বয়সের ঘোলাটে ছায়া পড়েনি।

—সিরাজ সাহেব, তাহলে আপনি প্রথম থেকে কি করবেন মনে আছে তো?

ব্যাঙ্কের লোকটির পাশে একমুখ শাদাপাকা দাড়ি, মাথা ভর্তি শাদা চুল, কালো, গোলমুখের শাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরণে প্রৌঢ় লোকটি উঠে দাঁড়ায়। সবাই চায়ে চুমুক দিই। যুবকটি চায়ের কাপ অসাবধানে নামায়, প্লেট ও টেবিলের কাচে জোর শব্দ হয়।

—শুনুন। যে লোকটিকে আমরা টার্গেট করেছি সে অফিসের একতলার হলঘরের শেষে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসে। জানালার পর ফুটপাথ, বড় রাস্তা, সবসময় ওই ঘরে বিভিন্ন কাজে অনেক লোকজন আসে, প্রায় সব কর্মচারীকেই লোকজন ঘিরে থাকে। আমার দিকে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে বলেন—আপনি ভদ্রলোকের ডানদিকে টেবিলের পাশে ছোট টুলে গিয়ে কাজ করার অছিলার হাতে একটা ফর্ম নিয়ে বসে পড়বেন, বুঝলেন তো? এবার ব্যাঙ্কের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি বসবেন বাঁ দিকের চেয়ারে। দুজনে কাজের ভান করে ফর্ম নিয়ে বসে থাকলেও সব সময় নজর রাখবেন

ভদ্রলোকের দিকে। কেউ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নেন। এরপর কুড়ি পঁচিশ মিনিট মুখ তুলে কাউকে দেখবেন না। আবার অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে সামান্য দু'একটি কথা বলে চুপ করে যাবেন। তাই দীর্ঘক্ষণ আমাদেরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। পরপর দু'দিন আমরা এইসময় পরিকল্পিত ভাবে গিয়ে ভদ্রলোককে ধরে উঠতে পারিনি।

জ্বলন্ত সিগারেট অ্যাসট্রেতে পুড়তে থাকে। আমাদের পরিকল্পনাটা আগে শুনুন। ওই যে সিরাজ সাহেব উনি বউবাজারের একটি বড় গেস্ট হাউসের মালিক। সিরাজ সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের জন্য কয়েক মাস আগে দরখাস্ত করেছেন—সমস্ত প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর অফিসের ওই লোকটি ফাইলটা আটকে রেখেছেন। বড় পরিমাণ টাকা ঘুষ দিলে তবে তিনি লাইসেন্স অনুমোদন করবেন। ঠিক আছে সিরাজ সাহেব?

হোটেলের মালিক চেয়ার ছেড়ে কিছুটা উঠে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আবার বিনীতভাবে বসে পড়েন ভদ্রলোক।

—সিরাজ সাহেব আপনার টাকা ভর্তি খামটা দিন।

সিরাজ সাহেব শাদ লম্বা মোটা একটা খাম এগিয়ে দেন। অফিসার খাম নিয়ে ডান হাতের দু'টি আঙুল দিয়ে ভিতরের টাকার বাণ্ডিলটা বের করেন।

—এখানে পাঁচ হাজার টাকা আছে। সব একশ টাকার নোট। প্রত্যেক নোটের কোণে উনি ছোট সই করে গেস্ট হাউসের স্ট্যাম্প দিয়েছেন। নম্বরগুলি আমাদের কাছে লেখা আছে। আমাদের পরিকল্পনা ভাল করে শুনছেন তো? যুবকটির পাশে প্রৌঢ় লোকটিকে বলেন কমিশনার। লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরায়। অফিসার ডান দিকের ড্রয়ার টেনে একটা ছোট শিশি বের করে ডান হাতের দু'টি আঙুলের মাঝে শিশি ধরে আমার দিকে তাকিয়েই বলেন—এটা একটা পাউডার। ফেনালথলিন পাউডার। টাকার বাণ্ডিলের দু'পাশে সামান্য পাউডার মাখিয়ে আলতো করে লম্বা খামে ঢুকিয়ে দেন। বন্ধ খামের মুখে একটু পাউডার লাগিয়ে নিচের দিকটা সন্তর্পণে ধরে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন—আপনি ডান হাতের দুটি আঙুল দিয়ে মুখটা ধরুন। আমি দুটি আঙুল দিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল পাউডারের মিহি গুঁড়োর স্পর্শ যেন আঙুলগুলিতে, করতলে শিরশির অনুভূতি তৈরী করছে। অফিসার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলেন—একটা কাচের গ্লাসে পরিষ্কার জল দাও।

জলের গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলেন—আপনি পাউডার লাগানো দুটি আঙুল ওই গ্লাসের জলে ভাল করে ধুয়ে নিন।

জলে যেন আমার আঙুল থেকে পাউডারের গুঁড়ো মুহূর্তে মিশে গেল।

—এই গ্লাসের জলটা একটু পরে লক্ষ্য করবেন। আমি জলে একটু কস্টিক সোডা মেশাচ্ছি। ছোট ঠোঙা থেকে একটু সোডা জলে দিয়ে দেন। টেবিলের একপাশে গ্লাসটা রেখে হাত মুছে নেন।

—আপনি আমার এই ফাইলের সমস্ত রিপোর্ট ভাল করে পড়ুন। অফিসার ডান পাশের

ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দেন।

প্রথমেই সিরাজ সাহেবের গেস্ট হাউসের নাম লেখা ছাপা কাগজে দীর্ঘ অভিযোগ পত্র। লাইসেন্স না পাওয়ার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছে। একটি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসের কর্মচারীর অবৈধ আকাঙ্ক্ষার ধারাবাহিকতা লাইনে লাইনে ফুটে উঠেছে।

এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের বিভিন্ন কর্মচারীর মন্তব্য দু'তিন পাতা জুড়ে। কি লেখা আছে আমি জানি। তবু এতগুলি মানুষের সামনে বসে ফাইলে চোখ রেখে পড়ার ভান করি। পুরানো পাখার যান্ত্রিক গোলযোগের বিচিত্র শব্দ মাথার ভিতর আঘাত করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপ বাড়ছে। পাখার হাওয়া, বাহির থেকে বেয়ে আসা উষ্ণ হাওয়া মিলেমিশে সামান্য স্বস্তি দিচ্ছে। হঠাৎ মাথা তুলতেই দেখি অফিসার আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুখে হাসি লেশমাত্র নেই, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমায় যেন কাঁপিয়ে দেয়।

—সমস্ত পড়লেন তো? এবার আমরা সেই কর্মচারীর অফিসে যাবো। গ্লাসের জলের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রঙীন জলে পরিণত হয়েছে। আমি গ্লাসের জলটার দিকে তাকিয়ে থাকি। কি কাজে লাগবে এই পাউডার দেওয়া রঙীন জলে! তখনই অফিসার বলে ওঠেন—ভাবছেন তো এই রঙীন জলে নিয়ে কি হবে? আপনাদের সামনে এই জল পরিষ্কার বোতলে সিল্ করে আমাদের সকলের সহি নিয়ে গলা দিয়ে এঁটে রাখবো। ঠিক এই ভাবেই ওই লোকটির অবৈধ পথে চলে যাওয়ার সময় তাকে ধরে আঙুলে পাউডার লাগিয়ে, জলে ডুবিয়ে অনেকের সামনে সিল করে সহি নেব। কোর্টে প্রমাণ করার সময় সুবিধা হয় অভিযোগ প্রমাণ করার।

আবার একবার আমাদের পরিকল্পনাটা বলে নিই। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আপনারা দুজন দু'পাশে থাকবেন হাতে ফর্ম নিয়ে কাজের ভান করে টুলে অথবা চেয়ারে বসে। সিরাজ সাহেব টাকা ভর্তি খামটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর উল্টো করে রাখবেন। লোকটি টাকার ইঙ্গিত করলেই অনেক লোকের ভীড়ের মাঝে সিরাজ সাহেব খামটার পাউডার লাগানো দিকটা লোকটির সামনে বাড়িয়ে ধরবেন। লোকটি অবধারিত ভাবে হাতের আঙুল দিয়ে খামটা ধরবে। তারপর আমার কাজ, আমি আশেপাশে লোকজন নিয়ে ওৎ পেতে থাকবো।

অফিসার সিগারেট শেষ টান দিয়ে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়েন। মেঝে ও চেয়ারের কর্কশ শব্দ আমার কানের ভিতর ধাক্কা দেয়।

—সব ঠিকমত গুছিয়ে নাও। পিয়নকে বলেন অফিসার।

অফিসার দৃপ্ত ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগিয়ে যান ভারী বুটজুতোর শব্দ তুলে। লম্বা পর্দা অনেকটা দুলে ওঠে তার দীর্ঘ শরীরের তরিৎ নিষ্ক্রমণে। ঘরের সবাই তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। অনেক পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়িতে গমগম করে ওঠে। নিচে উঠানে গাছের ছায়ায় পরপর চারটি গাড়ি প্রস্তুত। যে-দুটি লোক আমাকে অফিস থেকে নিয়ে এসেছিল তাদের একটি গাড়িতে বসে থাকতে দেখি। ঘরের প্রৌঢ় লোকটিও একটি গাড়ির দরজা খুলে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে।

আরো কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবার গম্ভীর মুখ, চুপচাপ। কমিশনার কে কোন্ গাড়িতে উঠবে নির্দেশ দিয়ে আমাকে ও ব্যাঙ্কের যুবকটিকে নিয়ে নিজের গাড়িতে ওঠেন।—সব প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিয়েছ তো? ড্রাইভারের পাশ বিনীত চেহারার লোকটিকে গম্ভীর গলায় বলেন। আমাদের গাড়ি সামনে।—ড্রাইভার চলো।

দুপুরে রাস্তা প্রায় ফাঁকা। চারটি গাড়ি লম্বা লাইন করে চলতে থাকে। দক্ষিণ কলকাতার এইসব অভিজাত রাস্তায় দোকান কম, লোক চলাচল করে খুব কম। কাজটা কিভাবে হবে, কখন শেষ হবে, আইন শৃংখলার প্রশ্ন দেখা দেবে কি না—ভাবনার পথ ধরে আমি যেন অভিযুক্ত লোকটির সামনে চলে যাই। পরিকল্পনা মত আমি হাতে ফর্ম নিয়ে কাজের ভান করে লোকটির ডানদিকে বসে আছি। জরুরি কাজের সেক্‌শন। অনেক লোক তাদের কাজ নিয়ে ভীড় করে আছে হলঘরের বিভিন্ন টেবিলের সামনে, অভিযুক্ত লোকটির পাশেও। ঘরের বিভিন্ন শব্দের গুঞ্জনের মধে সিরাজ সাহেব প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে টাকার খামটা লোকটির সামনে বাড়িয়ে ধরেছেন। লোভ ও লালসা লোকটির শরীর থেকে উঠে হাত বেয়ে পাঁচটি আঙুলে ভর করবে। লোকটি খামটা নিয়ে নিজের টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখার মুহূর্তেই কমিশনার লোকজন নিয়ে হাত চেপে ধরবেন।

'আমি বসবো লোকটির ডানদিকের চেয়ারে' আমি মনে মনে কথাগুলি বলে নিজের অবস্থান পরিকল্পনামত করার রিহার্সাল দিই। অনভিজ্ঞতায়, উদ্বেগে, ভয়ে, উত্তেজনায় ঘটনার আকস্মিক প্রসারতায় যদি লোকটির প্রাথমিক অবস্থান অন্যরকম হয় তাহলে। আমাকে যদি পরিস্থিতি মত লোকটির বিশেষ চেয়ারে বসতে হয়!

আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। পাশে বসে থাকা কমিশনারের দিকে তাকাই। ভদ্রলোক নির্লিপ্ত অবস্থায় বাঁ হাত গাড়ির জানালায় তুলে সিগারেট খাচ্ছেন। চাকরী সূত্রে প্রাত্যহিক কাজে হয়তো এরকম অভিযান তিনি অনেক করেছেন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক কোন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে বুঝতে পারি না। রোদের তাপ যেন আরো বেড়েছে। এপথ দিয়ে তো লোকদুটি আমায় নিয়ে আসেনি। কিছু পরে গাড়ি গড়ের মাঠের চওড়া রাস্তায় ঢুকে গতি বাড়ায়। দুপুরে গাড়ি কম। দু'পাশে গাছপালা, ঘাসভর্তি মাঠ থাকলেও হাওয়ার ঝাপটায় তাপ বেশী। কিছুটা যাওয়ার পর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—সমান লাইনে পরপর চারটি গাড়ি বিরাট রাস্তা জুড়ে সমান গতিতে চলেছে।

আমি যেন অলৌকিক দৃশ্যের মুখোমুখি হই। অনেক দৃশ্যই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তারা যেন চিরটাকাল ভেসে বেড়াবার জন্য মন ও ইন্দ্রিয়ের কোষে কোষে বাসা বেঁধে আছে।

বর্ষার দুকূল উপচে পড়া নদী। দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলা সরা নৌকাগুলি থেকে জেলেদের ঝপঝন করে মাছধরা জাল পড়ে। নদীর টান স্রোতে ভেসে থাকে কেবল কালো রঙের শোলার ভাসমান বিন্দুগুলি। একগাছি জাল আর কতটা নদীর প্রশস্থতা ঘিরতে পারে! পরপর নৌকা এগিয়ে এসে ঢেউএর তালে জাল ফেলে অদৃশ্য মাছেদের নিজেদের কুক্ষীগত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এক্‌সময় নদীর পাড় থেকে দেখা যায়—প্রশস্থ, হাওয়ায় উত্তাল নদী জেলেদের পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে শক্ত ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে গেছে।

## আমার কলমের ডগায়

সরিৎ শর্মা

আমার কলমের ডগায় হাজারো মানুষকে আমি দেখতে পাই—
কলম যখন চলে...

মুখ...মুখের ভিড়...ঘরের...পরে...পথের মানুষের...
নিজের মুখ মুখের ভিড়ে...নিজের ঘরে নিজের মুখ...
কলমের ডগায় দর্পণ মানুষের...আমারও...ভেতর-বাইরের...

নিজেরই কাছে দায়বদ্ধ আমি—বোধপ্রেক্ষাপটে সত্য-অসত্যের উদ্‌ভাসে—
জানতে অজানতে...যখন বা মানুষ থাকি...যখন কম মানুষ...
যখন মানুষের কাছে মানুষ থাকার অঙ্গীকার আমার...
অবিবেকী সুখের আহ্লাদে ভাসি সময়ের চোখের শাসন এড়িয়ে যখন—
আমার কলমের ডগায়...

আমি তো সে-ই একটাই মানুষ একটাই সময়ে দাঁড়িয়ে—
প্রাক-ইতিহাস থেকে ইতিহাসের রাস্তায়...ঘরের ইতিহাসে...
উত্থানে পতনে দ্বন্দ্বে উত্তরণে
কলমের ডগায় শাসক হাজারো মানুষ...সময়...আমি—অনাদ্যন্ত একজন ক্রমিক মানুষ...

আমার কলমের ডগা চায় কম-বেশী দু'শো বছর উচিয়ে থাকতে—
সময়কে ধরে রাখতে...দেখাতে...সময়কে সঠিক ঘোরাতে...পৌঁছে দিতে আর এক সময়ের হাতে—

সময়ের সঙ্গে ভিড় করে চলে অজস্র মুখ—ঘরের...পরের...পথের...নিজের—
অবিবেকী সুখের আহ্লাদে ঘৃণ্য ছাপ...অঙ্গীকৃত বিবেকের উজ্জ্বলতা...
সময়ের চোখের শাসন
আমার কলমের ডগায়...

## দুর্দিন

### শিশির সামন্ত

আর কোন প্রয়াস নেই নিরাময়ে 'নৈরাশ্য'
শব্দের মতো প্রতিবন্ধী ক্রমশ লাঠি ঠুকে ঠুকে
অন্ধতার চেয়ে তীব্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দিনে
পৌঁছে যায়। এরপর জলকল্লোল,
এই মুখমণ্ডল বলে দেয় আর নেই
বাঁচার প্রয়াস, কীভাবে বাঁচবে এই মানুষ?

ভয়ংকর পিঙ্গল দুর্দিন ছেয়ে যায়।

## ঘোর

### অজিত বসু

অনেক অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে
তিনি যেন আরো কী দেখবার ব্যাকুলতায়
টর্চের আলো নিয়ে ঘুরছেন,
অন্ধকারের একটুখানি আলোকিত জায়গায় ছায়ামূর্তি

চলতে চলতে চলতে
হঠাৎ আলোতে কে ও, অপরিচিত?
তাকে স্পষ্ট শরীরীভাবে খুঁজতে গিয়ে
অস্পষ্টের ঝাপসা শরীর
ম্লান হতে হতে নিশ্চিহ্ন...

টর্চের আলোয় যে খুঁজছে
এক ঘোর ওর পিছনে পিছনে ঘুরছে!

## চক্র

পুড়ছে!
　অবশিষ্ট নাভি, গঙ্গাজল, হাঁড়িফাটানো
　　　উল্টোমুখে ফিরে আসা—
এই সব ঘটনা ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর
মাথাখারাপমত একটা লোক বললে, বাকী!
শবযাত্রীদের একজন বললে, কী বাকী?
লোকটা বললে, ঐ যে...হারিয়ে যাওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে...
শুনছ না আওয়াজ?

## মণিকার

**পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত**

অল্প অল্প ক'রে ঢুকবো তার পা পর্যন্ত
অল্প অল্প ক'রে ঢুকবো তার ভূমণ্ডলে,
ভোরবেলা সে গুনগুন করে গান গাইবে,
আমি তার পা বেয়ে নাভিতে বসবো।
সন্ধ্যায় সে যখন গুনগুন করে গান গাইবে
আমি তার তরল অন্ধকারে বসবো।

আমি তার পত্রকীট, আমি তার পরাগকেশর,
কেটে ঘষে পরিষ্কার করে দেবো ঝাঁকা।

## ফলন

**শ্যামল সেন**

আজ আমার মন নেই কবিতায়,
অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস পড়ি। দেখি, পাড়া-বেপাড়ায়
কারা তোলে নিয়মিত রেশনদোকান
কারা শোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কোন দেশ যুদ্ধ করে অপুষ্টি ঘোচাতে
কোথায় প্রেমিক পায় প্রেমিকার অফুরাণ
সময় যাপন। কোন দেশে নীল পাখি
শিস দিলে হাতে এসে বসে,
কোন নারীকে ভাসায় চোরাজলে।

এইসব ইতিকথা এলোমেলো উড়ে বসে
বেকার মগজে। কে আর খোঁজে
খুঁজে দেখে কবিতার হাড়-মাংস কবির ঠিকানা।

আজ বৃষ্টি হলে, কাল মাঠে ধান রোঁয়া হবে
তারপর কবিতা-ফলন হবে নবান্ন উৎসবে।

## দ্বিতীয় ঠোঁটে

### মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

রিসিভারে চুমু দিলে
ঠোঁট থেকে বয়ে গেল
নদীটির নোনতা স্বাদ
নদীকে ভীষণ বকি
এবার ভেবেছি ওকে
পাঠিয়ে দিতেই হবে
ও এখন যুবতী যে
পাখি পাখি, যদি পারো
রিসিভারে চুমু নিয়ে

আমার দ্বিতীয় ঠোঁটে
একা একা ময়ুরাক্ষী
অগত্যা পরখ করি
বকেছি এতই দেখো
সামলাতে পারছি না আর
একান্তে তোমার কাছে
নীল ধনেখালি শাড়ি,
সামলিও ওর ইচ্ছে
আজ এ দ্বিতীয় ঠোঁট

আজ
নদী
নিজেই
চুপ
শোনো
গুছিয়ে
চোখ
টুকু
উন্মাদ

## বাণপ্রস্থ

### অরবিন্দ ভট্টাচার্য

আজকাল থাকি অনুপস্থিত
কবিতার ক্লাসে, আড্ডাখানায়, খবর-কাগজে।
বাণপ্রস্থ? হয়তো বা তাই—
হম্বিতম্বি, কিছু বাতচিৎ
কান ছুঁয়ে যায়, ঢোকে না মগজে।

স্বীকার করছি—অনেক কথাই
সরলীকরণে অনর্থ হয় ঃ
আগুনে পুড়িয়ে খোলস ছাড়িয়ে
তারিয়ে তারিয়ে
সে রসগ্রহণে আমার ভাবনা সমর্থ নয়।
বরং এখন দূরদর্শন দর্শকাসন
স্বস্তিদায়ক ঃ
দেখছি সিনেমা ম্যাজিক যাত্রা শুনছি ভাষণ
লিখছি পড়ছি,
স্বপ্নপুরীতে নয়ন-জুড়ানো স্টুডিও গড়ছি—
রোজ মুহরৎ—কাহিনী আমার আমিই নায়ক।

## ৯ই এপ্রিল, দুহাজার

### মুক্তিপ্রকাশ রায়

তবু চোখ চায় সে সাগর ছুঁয়ে যেতে
কান ছুঁতে চায় পুরোনো শব্দমালা
স্বপ্নের সেই রাজবাড়ি ঘিরে ধরে
মনখারাপের অগণিত গাছপালা।

হাত বাড়াতেই ঢেকে নিল দুই দীঘি
উদাসীনতার মলিন কচুরিপানা
এই ফাল্গুনে পোড়া দেহমন নিয়ে
কোনখানে যাব সে কথাও নেই জানা।

এখন তো আমি তারাদের চিঠি লিখি
শব্দে কেবল গাঢ় দীর্ঘশ্বাস
একই শহরের মাঝে সাত মরুভূমি
তার দুই পারে আমাদের বসবাস।

তুমি কি এখনও মেঘ হয়ে যেতে পার?
ঢালতে পার কি সেই মঙ্গলবারি?
তাহলে এখনও আমি এই মরুভূমি
শব্দফসলে ভরিয়ে তুলতে পারি।

## লাল

দুলাল ঘোষ

আমি লালকে লালই বলি
মায়ের সিঁদুর
বোনের আলতা
এসব কথার মারপ্যাঁচে নেই

একবার শুধু
সূর্যকে লাল বলেছিলাম
মুহূর্তেই ঝল্‌সে গিয়েছিলো
আমার মুখ
গায়ে ছোপ ছোপ দাগ

সেই থেকে
আমি লালকে লালই বলি
রক্তকেও লাল বলি না কখনো

## নির্মাণ

নৃপেন চক্রবর্তী

মাটি ধুয়ে গেলে
ভাবলেশহীন পড়ে থাকে
নির্মাণের কাঠামো—নিথর।
মেঘ ছুঁয়ে থাকে নদী;
শূন্যঘরে নৈঃশব্দে জেগে থাকে একা।
সময়ের শরীর ভাঙে একান্ত গোপনে,
ভাঙে আকাশ ও নদীর শরীর...
ভাঙুক।
একেই নির্মাণ বলে
নির্মাণের গোপন কৌশল।

## সকালের শ্লোগান

### সুদীপ চক্রবর্তী

রাত্রি নিস্তব্ধ হলে দু-চারজন মানুষ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়
গাছগাছালির ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়
জোনাকি জ্বলে, উষ্ণতা মিশে যায় বাতাসে, বাতাসে উষ্ণতা বাড়ে
দু'চারজন মানুষের নাগরিক মধ্যাঞ্চল জুড়ে
ঝরা পাতা, আর পৌর জঞ্জালের স্তূপ
কোথাও মৃত্যুকবলিত প্রান্তরে পোড়ে সুগন্ধী ধূপ।

পৃথিবী পাল্টে দেবে এই বলে যারা যুদ্ধে যেতে রাজি
আগুনের বুক ছুঁয়ে জীবনকে বাজি
রেখে নদীকে জানায় লাল সেলাম
একদল প্রখর রৌদ্র-বয়সি বসন্ত প্রেমিক গেয়ে যায় আলোকিত গান।
রাত্রির অন্ধকার দেওয়াল কারা যেন ভেঙেচুরে ফ্যালে
ফলে নিষিদ্ধ মগজের টবে বাড়ন্ত চারা গাছে জোনাকির আলো জ্বলে।

রাত বাড়ে। মধ্যবিত্ত নাগরিকের সোনালি স্বপ্নে কলকলি
হঠাৎ রক্ত চলাচলে শোনা যায় ফায়ার ব্রিগেডের করতালি
পোড়খাওয়া অন্ধকারে শুরু হয়ে যায় আগুনের চিত্রকলা প্রদর্শনী
আধপোড়া আলো ছায়ায় দুটি বুলেট বুকে রেখে ঘুমোয় কচ ও দেবযানী।

পরিচ্ছন্ন নাগরিক সুখ উবে যায় ভেঙে যায় সন্ত্রস্থ রাত্রির আকাশ
দু-চারজন নিশাচর খোঁজে স্বাধীনতার আধপোড়া লাশ,
খরা ও প্লাবনে এইভাবে বাঁচে সুখী গৃহস্থ শহর, শ্যামলিমা গ্রাম
তবু এই অন্ধ রাতে দেওয়ালে দেওয়ালে জন্ম নেয় সকালের শ্লোগান।

## বিষ

### সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্তের ভিতর বেড়ে উঠছিল সে—
অশরীরী ঝাউবন; তোমার পাঁজরে
ধুম লেগেছিল নির্জন সন্ধ্যাগুলিতে।

মনে পড়ে গর্বিত হওয়া তোমার মুখ,
যে কেন্দ্রে জলোচ্ছ্বাস সকলকে ভরিয়ে
তুলেছিল নতুন এক কোরকের গানে।
এরপর যা হবার তা পূর্ণ হয়নি—
দূর থেকে অনুমান করি তোমার সে
দাহ—ভেঙে পড়া গানের টুকরো রেশ—
দূর থেকে নষ্ট জ্যোৎস্নার কথা ভেবে
সারারাত একা জেগে থাকি অন্ধকারে।
অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হতে বুঝি
সেইসব সন্ধ্যার মৃত আত্মারা যেন
তুমুল নাচাচ্ছে তোমাকে থৈ থৈ তাতা থৈ!
নিহত স্বপ্নের জন্য কোনো নীরবতা
রাখনি। তোমার সমস্ত প্রদাহ আজ
অক্ষমের কুটিল অপমানবোধে।

## দিনলিপি

### সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

জলভ্রম ও দোলকের ভেতর থেকে
তুমি উঠে আসছ নিঃশব্দে
থিরথির করে শরীর কাঁপছে
মন্ত্রের মত ফণার ঘুমন্ত চলনে
খসে পড়ছে হলুদ রেণু
নিয়ন্ত্রণ জানো না
আসলে ভাঙতে চাইছো
সহ্য করতে পারছ না বাঁশির সুর
হেলানো মাথার ঝিমঝিম
বাসী চামড়ার অলঙ্কারের তলায়
জমে ওঠা সাদা দাগ
তবু দেখতে চাইছো
ঝলসানো পর্দার ভেতর দিয়ে খুঁজছো
আরো ক্ষুধাতুর কাউকে পাও কিনা।

## কাচের গ্লাস

কালিদাস সমাজদার

জুলেইখা, জানো অন্ধকারে
অবিশ্বাস থাকে, থাকে সীমারেখা,
থাকে গুপ্ত আগুন। জ্বলে তিনদিকে,
থাকে তিনমাত্রা পৌঁছে দিতে নরকে।
জুলেইখা, জানো, এরও তুমি এক অংশ।
গ্রামে ছিলাম কিছুকাল নরম আলোয়
ষষ্ঠীচরণের ভিটেয়। মুরগীর ছানা,
চড়ুইয়ের লাফালাফি আর কচি পালং
সেতু তৈরি করেছিল আমি এখন যা
আর আমি আদতে যা—তার মধ্যে।
পঞ্চান্ন সালে আমার ঠাকুরদা
কি পঁচাত্তর সালে আমার মা
কি এই দুহাজার একে যে আমি—
আমাদের দিনযাপনে বিতর্ক নেই।
কোন এজেণ্ডায় ওঠে না তা
তুমি জানো জুলেইখা।
কারণ তুমি আগুনের মাত্রা জানো,
কারণ তুমি জানো কমলার দোকানের পাশে
কেন ও কিভাবে বিবশ দেহের ভিড়
ও ঝগড়া ওঠে কাচের গেলাস ঘিরে।
উদ্দাম কমলা তার কাচের গেলাস ছোট।
শীতলা জুলেইখা তোমারও কাচের গেলাস ছোট।
প্রশ্ন নিজেকে কর জুলেইখা কিংবা কমলা—
অতৃপ্তি কথাটার মানে কি?
'কে দায়ী' কথাটার মানে কি?

# এক অপরিচিত রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয়নি। অথচ, মাথা ঘামালে যে একটা নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া যায় পবিত্রকুমার সরকারের আলোচ্য বইটি তার প্রমাণ। পবিত্রর হিসেব অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কালপর্ব মোটামুটি ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এই সময়টা তিনি টানা সম্পাদনা করেন নি। মাঝে মাঝে বাদ গেছে। সব মিলিয়ে তেরো বছরের মতো সম্পাদক-রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা : ১. সাধনা (অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্তিক ১৩০২), ২. ভারতী (২২ বর্ষ, ১৩০৫), ৩. বঙ্গ দর্শন (বৈশাখ ১৩০৮—বৈশাখ ১৩১৩), ৪. ভাণ্ডার (বৈশাখ ১৩১২ থেকে আষাঢ় ১৩১৪) এবং ৫. তত্ত্ববোধিনী (১৩১৮—১৩২২)। একই সঙ্গে দুটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা কালেই 'ভাণ্ডার'-এর দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন।

যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত মহৎসৃষ্টির ভাবনায় নিবেদিত তিনি এতটা সময় এদিকে দিয়েছেন ভাবলে বিস্ময় লাগে। কিন্তু এর প্রতি যে একটা আকর্ষণ তাঁর চিরকালই ছিল তা বোঝা যায়। নামে না হলেও কাজে আরও কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ঠাকুর পরিবারের হাউস-ম্যাগাজিন 'বালক' পত্রিকার তিনি কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার ছিলেন অন্যতম উপদেষ্টা। সুধীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তা জানিয়েও ছিলেন, "অবশেষে সবুজপত্র বাহির হোলো। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলবার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম সে কথা তোমাদের জানা আছে।" এমনকি, "পরিচয়" কীভাবে চালানো বাঞ্ছনীয় তা সম্পাদককে জানানোর জন্যও তিনি ব্যাকুল, "দুঃসাহসে ভর করে তুমি "পরিচয়" ত্রৈমাসিক বের করেচ। এটিকে কী মূর্তি দিলে মন খুসি হবে সেইটি জানাবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম।"

বোঝাই যাচ্ছে যে, তিনি পত্রিকা ছাড়লেও পত্রিকা তাঁকে ছাড়ে না। সব সময় সম্পাদকের কাজে যে তিনি সফল তাও নয়। 'ভারতী' পত্রিকা এক বৎসর চালিয়েই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' শীর্ষক প্রতিবেদনে তিনি লেখেন, "এক বৎসর 'ভারতী' সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল ত্রুটির যত কিছু কৈফিয়ৎ প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত।" এর পরে তিনি যা লেখেন তা আজকের দিনের অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরও মনের কথা, "ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই, সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়।...আমাদের

সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প অথচ চাল বিলাতী, নিয়ম অত্যন্ত কড়া—সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।"

এরকম অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যখন তাঁকে বারে বারে পত্রিকার কাছেই যে ফিরে যেতে হয় তার কারণ মনে হয় প্রধানত দুটি। এক, সমসাময়িক সম্পাদকদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। দুই, সম্পাদনার একটি উচ্চমান তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি দিন তিনি সম্পাদনা করেছিলেন নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাবটি এইভাবে ব্যক্ত করে দেন, "আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি; ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়।" সাহিত্যে যে সব কথা বলা সম্ভব হয়নি, তা বলবার জন্যই তাঁর পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের হাতেখড়ি হয়েছিল কিশোর বয়সে 'ভারতী'-তে। 'সাধনা' থেকে তিনি পত্রিকার পাতায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার ও বিশ্লেষণ করতে থাকেন। তবে তাঁর স্বদেশভাবনামূলক প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে'। এখানেই ব্যাধি ও প্রতিকার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশী সমাজ, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, অবস্থা ও ব্যবস্থা, বিজয়া সম্মিলনী, পথ ও পাথেয়—প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছে। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে তিনি এটিকে 'কেজো কাগজ' করতে চেয়েছিলেন। এখানেই প্রথম সমসাময়িক গুরুগম্ভীর বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করা সুরু হল। আবার 'ভাণ্ডার'-এর অন্যতম আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল এর প্রশ্নোত্তর পর্ব। বেশিরভাগ প্রশ্ন তুলতেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রথম সংখ্যাতেই অংশ নিয়েছিলেন দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া ক্রমশ অংশ নেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। এই বিভাগেই সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন বা রাজনীতিকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট।

সম্পাদনা-র মান নিয়ে যিনি এত মাথা ঘামিয়েছেন সম্পাদকদের তিনি কিন্তু ছেড়ে কথা বলেন নি। তাদের নিয়ে কখনও পরিহাস করেছেন, পরিহাস মাঝে মাঝে তীব্র শ্লেষে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'সম্পাদক' গল্পে জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রাম এই দুই গ্রামের জমিদার পরস্পরকে গালাগাল দেওয়ার জন্য দুটি পত্রিকা বের করেছিল। তাদের লাঠিয়ালদের জায়গা নিয়েছিল দুই সম্পাদক। একজন সম্পাদকের স্বীকারোক্তি, "আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।" 'তাসের দেশ' নাটকে তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক গোলাম সবরকম নতুনের বিরোধী। তাসদ্বীপের অতি সনাতন কৃষ্টির রক্ষক হিসেবে বাইরের জগতের ছোঁয়া থেকে সকলকে বাঁচানোই তার কাজ। তাই এঁদের স্রষ্টাকে যখন নিজেকেই সম্পাদকের কলম হাতে নিতে হয় তখন বোঝাই যায় যে, তিনি একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে চাইছেন।

পবিত্রকুমারের গ্রন্থের পাঠক এইসব মূল্যবান এবং কৌতূহলজনক তথ্যের সন্ধান পাবেন।

এক অপরিচিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হবে। নিজে প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক বলেই এদিকে লেখকের নজর পড়েছে আর তাই এই গবেষণাকর্মে তিনি সফল। আর এর জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তবে একজন সতর্ক পাঠকের বোধহয় দুএকটি কথা বলবার থাকে। অধ্যায়গুলি কিছুটা এলোমেলো ভাবে সাজানো। মনে হয়, পৃথক পৃথক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশের জন্য এগুলি প্রথমে রচিত হয়েছিল। তাছাড়া পাঁচটি পরিশিষ্ট জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্যদের রচনা পুনর্মুদ্রণের কারণটিও অস্পষ্ট। হয়তো রবীন্দ্রনাথের আমলে পত্রিকাগুলিতে লেখার মান ও বৈচিত্র্য কতটা উন্নত ছিল তা লেখক বোঝাতে চেয়েছেন। তাহলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। আশি পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "অবশ্য এর পরেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেন নি। বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, তত্ত্ববোধিনী, শান্তিনিকেতন পত্রের সম্পাদনার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন।" আবার একশো তেত্রিশ পাতায় জানানো হল, "শান্তিনিকেতন পত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই কারণ নামে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না।" শেষের তথ্যটিই ঠিক। পরবর্তী সংস্করণে এটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে। তবে এগুলি সামান্য ব্যাপার। সব মিলিয়ে পাঠকের প্রাপ্তি বিপুল ও অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্র-গবেষক মহলে তো বটেই সাধারণ পাঠকের কাছেও গ্রন্থটি আদৃত হবে আশা করা যায়।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

---

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। পবিত্রকুমার সরকার। বিশ্বকোষ পরিষদ। ৬০ টাকা।

## এক কিংবদন্তী-প্রতিম নাট্যব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

জীবিত শম্ভু মিত্র যতটা প্রশংসিত প্রায় ততটাই সমালোচিত। বিশেষ করে কখনো কখনো তাঁর তথাকথিত রাজনৈতিক অবস্থান প্রগতিশীলদের কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে। আবার প্রয়াত শম্ভু মিত্র সম্পর্কে অধিকাংশই উচ্ছ্বাস, তাঁকে কেন নীরব অভিমানে চলে যেতে হল সেই অপ্রিয় সত্য উদঘাটনে অনেকেই আগ্রহী ছিলেন না। মোহাচ্ছন্ন স্তাবকতা এবং ব্যক্তিগত তিরস্কারের মধ্যবর্তী পর্বে সমালোচনার একটি স্তর থাকে। সেটি হল মোহমুক্ত অথচ শ্রদ্ধাসমন্বিত বিশ্লেষণ। কবি-প্রাবন্ধিক অজিত বসুর আলোচ্য গ্রন্থটি এরই উদাহরণ। শম্ভু মিত্রকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাঁকে যখন তিনি 'বাংলা রঙ্গ মঞ্চের তৃতীয় সম্রাট' বলে অভিহিত করেন তখনই বোঝা যায় যে, ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচারে তাঁর আগ্রহ। গিরিশচন্দ্র এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পর শূন্য সিংহাসনটির দাবীদার যে একমাত্র শম্ভু মিত্র তাঁর এই সিদ্ধান্তে ভুল নেই। গুরু শিশিরকুমারের কাছ থেকে শম্ভু মিত্র গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার কথা শুনেছিলেন, আর স্বয়ং শিশিরকুমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি নিজেই জানিয়েছেন, "তাঁর নাট্য প্রযোজনায় তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গিতে, তাঁর উচ্চারণে আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টত অনুভব করলুম।" আবার নাট্যাচার্যের 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি দৃশ্যের মঞ্চসজ্জা যে তাঁদের নবান্ন-র প্রথম দৃশ্যের

কল্পনায় সাহায্য করেছিল তা-ও শম্ভু মিত্রই প্রথমে আমাদের জানিয়ে দেন, "এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম তাহলে 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হতো না, একথা অনস্বীকার্য (সন্মার্গ সপর্যা)।"

শম্ভুবাবু যে জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নাট্য প্রযোজনায় নেমেছিলেন অজিত নানা উদাহরণ দিয়ে সেই সত্যটি আমাদের জানিয়েছেন। এইটে তাঁর আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রবীন্দ্রনাটক যে শুধু পাঠ্য নয় তাকে যে সফলভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করা যায় 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা তা প্রমাণ করে দিল। শম্ভু মিত্র স্বীকারই করেছেন, "'রক্তকরবী' করবার সময়েই ক্রমশ মনে হতে থাকল যে, ভারতীয় নাট্যপ্রকাশের একটা ধরন যেন আমরা দেখতে শিখলুম।...এবং সেইদিনই আমাদের বোধ হয়েছিল যে বাংলা-নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে তবেই যেতে হবে। ওকে এড়িয়ে হবে না।" প্রগতিশীল নাট্যবিশারদদের এই সত্যটি বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। এমন কি রক্তকরবী-র যে বিখ্যাত মঞ্চসজ্জা তার মূলেও ঠাকুরবাড়ির প্রভাব। "শম্ভু মিত্র লক্ষ্য করেছিলেন যে, ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জায় নাটক অনুযায়ী প্রেক্ষাগার ও মঞ্চ একসঙ্গে সাজানো। এই ঘরানার দৃষ্টান্ত থেকেই তিনি 'রক্তকরবী' ও অন্যান্য নাটকের মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা করেছেন।" (পৃঃ ২৫) এইভাবে অজিত শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনার মূল সূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দেন। বিদেশী নাটক, মতবাদ ও মঞ্চসজ্জার প্রবল স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্রের এই একক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্য-ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি তাই গ্রন্থের মর্যাদাটিকে বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থে চারটি অধ্যায় আছে ধরে নিতে হবে। কারণ, বিস্ময়কর ভাবে কেবল 'তৃতীয় অধ্যায়' শিরোনামটি ছাপা হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয় বা চতুর্থ ভাগের শিরোনামে অধ্যায়ের কোনো উল্লেখই নেই। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কোনো সূচীপত্রও নেই। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি শুধরে নেওয়া হবে আশা করা যায়। যেটি দ্বিতীয় অধ্যায় হতে পারত তার শিরোনাম 'গণনাট্য আন্দোলন, বহুরূপী ও শম্ভু মিত্র'। এটিই আয়তনে সবচেয়ে দীর্ঘ, নিঃসন্দেহে এটি ঐতিহাসিক দলিল। কিন্তু এখানে অজিতের নিজস্ব মতামত প্রায় নেই, সুযোগও ছিল না। তাছাড়া বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র বা তথ্যের আলোচনা আছে। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সম্পর্ক, তাঁর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা, 'বহুরূপী' গড়ে তোলা, পরবর্তী কালে তাঁর কিছু বিতর্কমূলক ভূমিকা—এ সমস্ত পুরনো কথা আবার অজিতের গ্রন্থটি মনে করিয়ে দিল। অধ্যায়টির শেষে শম্ভু মিত্র সম্পর্কে লেখকের কিছু কিছু মন্তব্য আছে; যেমন, (ক) 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বামপন্থার প্রতি অনুরাগ না জন্মালেও দক্ষিণপন্থী অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতাশীল নেতার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল; (খ) 'বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীদের সাহচর্য তাঁকে নানা দিক থেকে দীপ্ত করলেও কখনোই রাজনৈতিক সংগ্রামের রাস্তায় তিনি যান নি'; (গ) 'মানুষের নিকট সম্পর্কে আসা সম্বন্ধে তাঁর বেশ অনীহা ছিল।' ইত্যাদি।

অভিযোগগুলির সবকটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যায় না, কিন্তু কিছুটা অতিসরলীকরণও ঘটেছে। শম্ভু মিত্রের মতো সৃজনশীল স্রষ্টাকে এতটা ধরাবাঁধা ফরমুলায়

বিচার না করাই বোধহয় ভালো। বিশেষ করে অজিত তো তাঁর মূল বৈশিষ্ট্যকে সঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন, "বস্তুত সত্যকে নানা দিক থেকে দেখে তার বৈচিত্র্যময় বহমান ধারাকে শম্ভু মিত্র চিনে নিতে চেয়েছিলেন। এ সত্য শাশ্বত—এ সত্য জীবনের সমস্ত ভাঙনের মধ্যে দিয়ে কঠিন, দুর্বার এবং অমোঘ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।" যিনি যথার্থ জীবনসত্যের সন্ধানী তাঁর চলার পথে তো কিছুটা ওঠানামা থাকবেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে (কবিতার অপরূপ কণ্ঠশিল্পী শম্ভু মিত্র) আবৃত্তিকার শম্ভু মিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য অজিত তুলনামূলক আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র। বস্তুত এই বিষয়ে এত বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা এর আগে কখনো পড়ি নি। শেষ অধ্যায়টিও (এক নির্লিপ্ত প্রস্থান) অনবদ্য। এখানে যুক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগের যথার্থ মিশ্রণ ঘটেছে। মৃত্যুর কদিন আগে ডিলিরিয়মের মধ্যে শম্ভু মিত্র নাকি বলে উঠেছিলেন, 'এত অপমান'। এ ধিক্কার কাদের উদ্দেশ্যে কে জানে? কিন্তু অজিত যে এই জিজ্ঞাসার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এটিই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। আগামী দিনে শম্ভু মিত্র সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনা বা গবেষণায় গ্রন্থটি অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

---

শম্ভু মিত্র ঃ রঙ্গমঞ্চের বিস্ময়। অজিত বসু। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭৩। পঞ্চাশ টাকা।

# মৃগাঙ্ক রায়ের কবিতা

মৃগাঙ্ক রায় বহুপ্রসূ কবি নন, তাঁর কবিতার সংখ্যা তাই বেশি নয়। ১৯৫৩ সালে মৃগাঙ্ক রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্রকন্যা' প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের 'সময়' কবিতাটি পড়তেই স্মৃতি আলোড়িত হতে থাকে, তখন "...সময় হল/গানের, সময় হল, ধানের/সময় হল।" কবিতাটির নির্মাণ সেই সময়কার গণনাট্যের গানের এক আবেগ ও আমেজ তুলে ধরে, গানের ধুয়োর মত বার বার এসেছে উপরে উদ্ধৃত পঙক্তিগুলি। কিন্তু কবিতার শরীরে কোথাও সরকারী আশাবাদের স্পর্শ লাগে না, এখানেই কবিতাটির বিশিষ্টতা।

একলা চলার সময় তখন নয়, আমি নয় আমরা—তাই পরবর্তী সময়ের কবিতায় স্বার্থপর 'আমি' একান্ত হয়ে ওঠে না—"...তুমি উঠে এলে/যূথবদ্ধ ছায়া উঠে এল, দাঁড়াল মাঠে মাঠে/আকাশে মাটিতে, চারিদিকে গর্জিত হল/রোমশ স্বেদাক্ত ছায়ার হাতের হ্রেষা।।" তা বলে একান্ত কবিতা যে নেই এমন নয়; কিন্তু সেখানেও "আমার হাত প্রবাহিত হবে/ তোমার হাতে/আমি তোমার মধ্যে ক্ষরিত হব/দিনান্তরজনী।।"

যদিও কবি বলেন, "ফিরে আসব আবার/পাখি নয়, ফল নয়, ঘাস নয়/প্রার্থনার পাথর নয়—/মাটি হয়ে ফিরে আসব আবার।" তবু তাঁকে বার বার যেতে হয়েছে প্রেমের কাছে তুমি-র কাছে—

"সেইখানে যেতে হবে ফের/ তোমাকে আমাকে ভালোবাসার কথা জেনে নিতে/ভালোবাসা হারিয়ে গেলে এই তুমুল তিমিরে।।"

তবু মনে হয় প্রেমের মধ্যে থেকে যাচ্ছে "বিষাক্ত ফলের কোটর—" তাই কবি বলেন, "...তার চেয়ে/উদ্ভিদস্বভাবা নারী ভালো, বছরে বছরে যার অন্তঃসার/পরিপূর্ণ মঙ্গলকলস, ঘর ভ'রে সন্তানসন্ততি দেবে।।"

অনেক কবিতা পুরোপুরি উদ্ধার করলে তবে মৃগাঙ্ক রায়ের কবিসত্তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দামাল দিনের কবি হয়েও মৃগাঙ্ক রায় বিশিষ্ট হয়ে আছেন কবিতার নিজস্বগুণে, কারণ তাঁর কবিতার পরতে পরতে মিশে আছে সময়ের দীর্ঘচ্ছায়া—"পালালেই কেউ পালাতে পারে না—/শুধুই নাচের মুখোশ পাল্টায়।।" কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলেন, "প্রিয়নাথ, সারা দেশটা বড় দুলছে, সারাদিন সারারাত বেসামাল নৌকোর মতো দুলছে।।"

মৌলিক কবিতা ছাড়াও 'নির্বাচিত কবিতা'-য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একটি কাব্যনাট্য এবং অনুবাদ কবিতা। 'অভিমন্যু' কাব্যনাট্যটি কি আমাদের অসহায় ব্যক্তিসত্তার, বলা যায় ব্যক্তিমানুষের প্রতীক হয়ে ওঠে না? "হিংসা নয়, আমাদের হাতে আজ/হিংসার উত্তর।..." কিন্তু সেই উত্তর দেবার আগেই মৃত্যু বরণ করতে হলো তাঁকে—সেই মৃত্যু তো মৃত্যু নয়— "...এ যে হত্যা ঃ/এ যে হত্যা!" মৃগাঙ্ক রায়ের 'নির্বাচিত কবিতা' পড়তে পেয়ে শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে তাঁর সমগ্র কাব্য সংগ্রহ দেখার সৌভাগ্য হবে না হয়ত আমাদের আর।

কার্তিক লাহিড়ী

---

নির্বাচিত কবিতা। মৃগাঙ্ক রায়। অরুণা প্রকাশনী। ৪০ টাকা।

## অক্ষরের আবাহন

সমালোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীঅরুণ ঘোষ একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিক হিসেবে সবিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। তিনি কলকাতার একাধিক নাম-করা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, বিশেষ করে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের পত্তনকাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটিকে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যে সুসংগঠন ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক পরিষেবাঋদ্ধ করেছেন তাতে সঙ্গত কারণেই তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ", কারণ তাঁকে "লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম" করতে হয় এবং "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা গেছে শ্রীঘোষের কর্মজীবনে। তাঁর গ্রন্থবোধ তাঁকে শুধু পাঠকের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে পারঙ্গম করেনি, তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিষয়বিশেষের পঠনপাঠন ও গবেষণা উপযোগী দীর্ঘকালীন সহায়ক সটীক গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করতে। এই রকম গ্রন্থপঞ্জি তিনি বেশ কয়েকটি প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার

সুবাদে তিনি তাঁর চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরেও আহূত হয়েছেন কয়েকটি নতুন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে, আহূত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার তথা তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে যোগদান করতে। এবং যে সব গুণে একজন অধ্যাপক সুনামের অধিকারী হয়ে থাকেন সেই সব গুণে অরুণ ঘোষও অধ্যাপকরূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, ছাত্রদের প্রিয় হয়েছেন।

শ্রীঘোষের এই যে কৃতিত্ব, তার চালিকাশক্তি হয়েছে তাঁর বুদ্ধিযুক্ত ও চিন্তাশীল মন। একথার সাক্ষ্য—তাঁর রচিত বর্তমান গ্রন্থ। এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় গ্রন্থাগারিকদের রচিত যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে তা হয় পাঠ্যপুস্তক স্তরের, নয় তো পঞ্জি কিংবা অভিধানজাতীয়। তাও আবার পঞ্জির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় পঞ্জিভুক্ত গ্রন্থ বা নথিসমূহের বিষয় সম্পর্কিত কোনো টীকা বা পরিচয় থাকে না, যার ফলে প্রণীত বস্তুর চরিত্র পঞ্জি না হয়ে নিছক তালিকা হয়ে ওঠে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে অরুণ ঘোষের 'অক্ষরের আবাহন অথবা পরিবর্তমান গ্রন্থাগার ভাবনা' গ্রন্থটি এক ব্যতিক্রমী প্রকাশন। লেখক নিজে তাঁর গ্রন্থের শিরোনামে 'ভাবনা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাস্তবিক, শ্রীঘোষের গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি তাঁর নিজস্ব ভাবনায়, মননে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধগুলি সংখ্যায় দশ, এবং তিনটি বিভাগে শ্রেণীকৃত। প্রথম বিভাগ 'গ্রন্থাগার ভাবনা'য় আছে তিনটি প্রবন্ধ—'সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ কিছু ভাবনা', 'পরিবর্তমান সমাজ ও চিরায়ত গ্রন্থাগার', 'উৎপাদনশীলতা ও তথ্য'। প্রবন্ধ তিনটিতে লেখকের গ্রন্থাগার-ভাবনার সার কথা ব্যক্ত হয়েছে—গ্রন্থাগার হবে মানুষের আত্মবিকাশের, চেতনাবৃদ্ধির সহায়ক, তথ্যপরিষেবা-সর্বস্ব নয়। তিনি তাই টি. এস. এলিয়টকে স্মরণ করেছেন—

Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

দ্বিতীয় বিভাগ 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা'-য় আছে চারটি প্রবন্ধ—'সমাজবিজ্ঞান তথ্যব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক', 'ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ', 'গ্রন্থাগারে অগ্রন্থ', 'গ্রন্থাগার সহযোগিতা ঃ এদেশে-বিদেশে'। এখানে লেখক তাঁর আলোচনা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার মূল অঙ্গ, অর্থাৎ গ্রন্থাদির সংগ্রহ, এই প্রসঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সংগ্রহ সংরক্ষণ করার কলাকৌশলের ব্যাপারটা উহ্য রেখেছেন। (অবশ্য কম্প্যুটারের সাহায্য নিলে সংরক্ষণের কলাকৌশল দরকার করে না)। লেখক নিজে দীর্ঘকাল সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হবার দরুণ এই জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, পরিসর ও সমস্যা সঠিক চিহ্নিত করতে পেরেছেন। বুঝেছেন, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির নথিপত্র সংগ্রহ করার গুরুত্ব। অগ্রন্থ, অর্থাৎ গ্রন্থব্যতিরিক্ত তথ্যাধার বা তথ্যবস্তুর প্রকারভেদ ও সমাজবিদ্যা গ্রন্থসংগ্রহে তার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশদ করেছেন। এই বিভাগের শেষ প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার সহযোগিতা ঃ এদেশে-বিদেশে'-তে বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে লেখক বিদেশের তুলনায় আমাদের গ্রন্থাগার পরিষেবা যে কতোটা জাড্য ও অনীহা-পরিকীর্ণ তা তির্যকভাবে তুলে ধরেছেন।

এখানে একটি কথা। 'অগ্রন্থ' কথাটি ইংরেজি Non-book material কথাটির বাংলা

প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে দেখছি। কিন্তু প্রতিশব্দটি জুতসই বলে মনে করি না। ইংরেজি 'নন্-বুক' কথাটি বিশেষণ, বাংলায় তাকে বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতে গিয়ে কথাটাকে অসম্পূর্ণ রাখছি। আমার তো মনে হয় 'অগ্রন্থ' অপেক্ষা 'গ্রন্থব্যতিরিক্ত তথ্যাধার বা তথ্যবস্তু' প্রশস্ততর প্রতিশব্দ।

তৃতীয়, অর্থাৎ শেষ বিভাগের তিনটি প্রবন্ধের প্রথমটি 'ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ'-তে যেমন আছে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কথা, তেমনি কিছু কাজের কথাও আছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ কেনার সময় কীভাবে সংগ্রহের মূল্য নির্ধারণ হবে তার কথা বলা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রহ দান হিসেবে গ্রহণ করার সময় দেখতে হবে দানগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঐ সংগ্রহের সংগতি আছে কিনা, তা না হলে "বিনা পয়সায় পাওয়ার লোভ পেয়ে বসে এবং গ্রন্থাগারের চরিত্র নষ্ট হয়।" দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'জীবনকথার কথা'-তে জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব, বৈচিত্র্য এবং গ্রন্থাগারে তার বর্গীকরণ বা শ্রেণীবিন্যাসের প্রথা আলোচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই লেখক বলেছেন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত জীবনীসাহিত্যের একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হওয়া প্রয়োজন, যে গ্রন্থপঞ্জিতে জীবনীগ্রন্থ ছাড়াও সংকলিত হবে সেইসব বইপত্র যাদের মধ্যে জীবনীমূলক রচনা বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান থাকে, যেমন চিঠিপত্র, স্মারকগ্রন্থ, সাময়িকপত্রের বিশেষ সংখ্যা (জীবনীনির্ভর), বিষয়-অভিধান অথবা বিশ্বকোষ ধরণের গ্রন্থ। সমালোচ্য গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ, 'এক গ্রন্থাগার কর্মীর কথা'-য় বিধৃত হয়েছে গ্রন্থাগারিক শ্রীঘোষের স্মৃতিচারণ। তাঁর বিনম্র কথনে বাঙ্ময় হয়েছে এই সত্য—গ্রন্থাগার পরিষেবা যখন আনন্দের সঙ্গে সাধিত হয় তখন গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে সুধী পাঠকের একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্বতঃই স্থাপিত হয়।

শ্রীঘোষের লেখার হাত আছে। সাবলীল ভাষায় প্রকাশভঙ্গী মনোগ্রাহী, এবং একটা সূক্ষ্ম পরিহাস-রসিকতায় সংপৃক্ত। উদাহরণত, তাঁর লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করছি—"রবীন্দ্রনাথ অনুযোগ করেছিলেন যে আমরা কাজ শুরু করি কিন্তু শেষ করি না। স্পর্ধার মত শোনালেও বলতে দ্বিধা নেই যে তাঁর সে পর্যবেক্ষণ যথার্থ ছিল না—কেননা, আমরা কাজ শুরু করার পর অচিরেই তা 'শেষ' করি, অথবা শুরুই করি না।" (পৃঃ ২৩)।

বইটি সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত। স্পষ্টতই, প্রকাশক বেশ যত্নের সঙ্গে বইটি ছেপেছেন। মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ে না। শুধু এক জায়গায় (পৃঃ ৭৩) মুদ্রিত হয়েছে, "কম পক্ষে ২৫ বা ৪৯ পৃষ্ঠা"; কথাটা হবে 'কম পক্ষে ২৫ পত্র (leaves) বা ৪৯ পৃষ্ঠা'।

পরিশেষে একটি কৌতূহলজনক প্রশ্ন। লেখক তাঁর এমন আধুনিক ভাবনায় ভাবিত গ্রন্থের নামকরণে অমন এক পুরনো রীতির প্রদর্শন ঘটালেন কেন? বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগে গ্রন্থের শিরোনামে প্রায়শঃই 'অর্থাৎ' 'অথবা' কথাগুলো ব্যবহার করে গ্রন্থের আখ্যা বিশদ করা হত।

আদিত্য ওহদেদার

---

অক্ষরের আবাহন অথবা পরিবর্তমান গ্রন্থাগার ভাবনা। অরুণ ঘোষ। সেরিবান, ২০০০। কলকাতা। ৮০.০০।

# উপন্যাসের দর্পণে সময়ের মুখ

সুগবেষক ও কথাসাহিত্যিক সত্যপ্রিয় ঘোষ-এর গল্প উপন্যাসগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন লেখকের নামের সঙ্গে তাঁর জীবনবোধের সাদৃশ্য কতখানি প্রত্যক্ষ। 'সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি' তিনি তাঁর অর্ধশতাব্দীকাল বিস্তৃত সাহিত্যজীবনে একমুহূর্তের জন্যও প্রশ্রয় দেন নি। জীবন সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সত্যপ্রিয় ঘোষের সাহিত্যিক নির্মাণগুলি যে শানানো সে বিষয়ে পাঠকমাত্রই সচেতন। সহস্রাব্দের শেষপ্রান্তে রচিত তাঁর সাম্প্রতিক দুটি উপন্যাস 'বহু বাসনায়' এবং 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' তাই সত্যপ্রিয় বাবুর পূর্বেকার সৃষ্টিগুলির মতনই সকল শিল্পসৃজনতা নিয়েই হয়ে উঠেছে বাঙলার দুটি বিশিষ্ট যুগের দর্পণ—যে যুগ ও সময়কালের দায়বদ্ধতা একজন সৎ লেখকরূপে সত্যপ্রিয় ঘোষ এড়িয়ে যেতে পারেননি। পারেন না।

'বহুবাসনায়' উপন্যাসের ঘটনাকাল ষাটের দশক; 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' উপন্যাসের পঞ্চাশের দশক। দুটি কাহিনীরই মূল বিষয় জীবনসংগ্রামে ছিন্নভিন্ন মানুষ, তাদের দিবারাত্রির কাব্য, বেদনা এবং মূলতঃ স্বপ্নদেখা ও স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু তারা পরাজিত নয়—দুর্নিবার আশাবাদ তাদের বুকের পাঁজরে যেন রাবণের চিতার মতন জ্বলে। 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' বইটি যদিও পরে প্রকাশিত (নভেম্বর, ১৯৯৯) তবুও ঘটনাকালের বিচারে এরই কথা প্রথমে বলা যাক্।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগের এক স্বপ্নাহত নাটক-পাগল মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও দীর্ঘশ্বাসের এক সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' উপন্যাস। বরিশাল জেলার বানারিপাড়ার শিক্ষিত যুবক রমানাথ এর লেখাপড়া শিকেয় উঠেছিল ১৯২৭ সালে কলকাতায় এসে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি দেখে। পরের বছর রসায়নের ছাত্র রমানাথকে দেখা গেল কলেজের ক্লাস, ল্যাবোরেটরী বরবাদ করে চারণকবি মুকুন্দদাসের প্রেরণায় বরিশালের পথে পথে সাইমন-কমিশন বিরোধী মিছিলে স্বদেশী গান আর শ্লোগান দিয়ে বেড়াতে। এবং তার পরের বছর থেকেই বানারিপাড়ার বিখ্যাত থিয়েটার দলের সর্বময় কর্তা হয়ে গ্রামের মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াতে থাকলেন তিনি। বড়দের নাটক 'প্রতাপাদিত্য' ছোটদের নাটক 'চাঁদসদাগর' নামিয়ে দিলেন ঘোষবাড়ির পাকা স্টেজে। ব্যাস্, সেই শুরু। সেই যে নাটকের রোগ রমানাথকে ধরেছিল আন্দোলন—দাঙ্গা—দেশভাগ—স্বাধীনতা—পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে কলকাতায় এসে উদ্বাস্তু জীবন—কোনো বিপর্যয়ই আর তার নাটুকে অসুখ ছাড়াতে পারে নি। এমনকি সাধনার আত্মনিবেদন ও অনুরাগ উপেক্ষিতই হয়েছিল। রমানাথের পক্ষে এ জীবনে আর বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি। তবে এর পশ্চাতে শুধু নাটকের জন্য রমানাথের ক্ষ্যাপামিকে সবটা দায়ী করলে ভুল করা হবে। দেশবিভাগ—উদ্বাস্তু জীবনের নিষ্ঠুরতা—পারিবারিক বিপর্যয় কোনটাই বা কম দায়ী? তবে বিবাহরূপ বন্ধনে ধরা না পড়লেও অন্য কোন এক বন্ধনে রমানাথ সাধনা—কেশব—তাঁদের সন্তানদের আর অর্চনার এই দিনগত পাপক্ষয়ের বাস্তুহারা অথচ যূথবদ্ধ জীবনযাপনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে। এই মোহময় বন্ধন সে স্বীকার করতে চায় না, আবার অস্বীকারই বা করে কোন জোরে।

এরই মধ্যে জীবনের এই পড়ন্তবেলায় রমানাথ একদিন অকস্মাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে। বিস্মৃতির অতল থেকে তার চোখের সামনে উপস্থিত হয় সুদূর অতীত থেকে উঠে আসা আর এক স্বপ্নতাড়িত মানুষ চাঁদসদাগর—যার সব গেছে, সর্বস্ব গেছে কিন্তু কী যেন এক অমোঘশক্তিতে সে দু'হাতে সরিয়ে দিতে চাইছে সমস্ত প্রতিকূলতা, সকল বিঘ্ন-বাধা। রমানাথ নিভে যাওয়ার আগে যেন শেষবেলায় জ্বলে ওঠে প্রদীপের সলতের মতন। ঠিক করে শিশুদের নিয়ে আবার সে মঞ্চস্থ করবে চাঁদসদাগর। দুই যুগ পরে কলকাতার মানুষদের রমানাথ দেখাতে চায় বানারিপাড়া থিয়েটারের ম্যাজিক। সে দেখাবে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষগুলির সর্বস্ব হয়তো গেছে কিন্তু এখনও তাদের মগজে মননে চেতনার গোপনে লুকানো আছে অনেক কিছু—যা তাদের গর্ব তাদের অহংকার। স্বপ্নতাড়িত রমানাথ কি পেরেছিল সেই পবিত্র অহংকারের মর্যাদা রাখতে? না-কি আবারো ব্যর্থতার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ডুবিয়ে দিয়েছিল রমানাথের ভাসানো স্বপ্নডিঙ্গা? একালের চাঁদ সদাগর কি তবে রমানাথ?

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষের জীবন, তাদের প্রতিদিনকার বাঁচার লড়াই, তাদের ক্ষোভ, তাদের সুখ, বেদনা-আনন্দ-প্রেম-বিরহ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় পরখ করেছেন ঔপন্যাসিক। সেই অভিজ্ঞতার ছবি তিনি এঁকেছেন 'দ্বিতীয়জন্ম' গল্পগ্রন্থে এবং অন্যান্য উপন্যাসে নিপুণভাবে। এদিক থেকে তিনি বোধহয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী। 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে মাত্র চৌষট্টি পাতায় সীমায়িত না রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করলে (অন্তত 'শ-সোয়া'শ পৃষ্ঠা) বহু পাঠকের অতৃপ্তির নিবৃত্তি যে ঘটতো তাতে সন্দেহ নেই।

'বহু বাসনায়' উপন্যাসটি পক্ষান্তরে ষাটের দশকের একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ (এবং সম্ভবতঃ একমাত্র) সাহিত্যরূপ। এটিকে নিঃসন্দেহে গণআন্দোলনেব—সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত করা চলে। এই কাহিনী যে শ্রমিক পরিবারটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তারা অবশ্য উদ্বাস্তু নয় পশ্চিম বাঙলারই আদি বাসিন্দা। চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা অঞ্চলে একটি গ্রামে তাদের ছোট্ট নিবাস। পিতাপুত্র দুজনেই রেলের কর্মচারী, কেরাণীর পাকা চাকরি। কিন্তু অভাব দারিদ্র্য সংকট তাদেরও পিছু ছাড়ে না। কিন্তু গরীবের মেয়ে বিজয়া সেই সংসারেই বউ হয়ে এসে স্বামী শ্বশুর আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার স্নেহ-মমতা-প্রেমের সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল দিন আনা দিন খাওয়ার প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামকে। সকল ঝড় ঝাপ্‌টা তুচ্ছ করে কোনো এক উজ্জ্বল স্বপ্নপূরণের পথে হয়তো গড়িয়ে চলতো এই রেল কর্মচারী পরিবারটির জীবনযাপন। বিজয়া-নারায়ণের সন্তানরা জন্মদিনের আনন্দ উপভোগ করতো; হারমোনিয়ামে গলা সাধতো মেয়েরা; হয়তো বছরে একবার রেলের পাশে বেড়িয়ে আসা যেত পুরী কিংবা মধুপুর; দিনগত পাপক্ষয়ের ইতিবৃত্ত মুছে ফেলে গৃহকর্তা আশুতোষও হয়তো বা আরও দুটি বছর এক্সটেনশন নিয়ে একঘর নাতি-নাতনীর সঙ্গে সম্মানজনক নিরাপত্তায় কাটাতে পারতো অবসরকালীন ও মনুষ্যজীবনের শেষ কয়েকটা বছর। সবই হয়তো হত। অন্তত স্বপ্নটা এরকমই ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য পুনরাবৃত্তি বারংবার ঘটে এসেছে ঘটে চলবে। ১৯৬০ আর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ফারাকটা

কোথায়?

'বহু বাসনায়' সত্যপ্রিয় ঘোষ অঙ্কন করেছেন চল্লিশবছর পূর্বেকার এক ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনীর নিখুঁত চিত্ররূপ জীবনের ক্যানভাসে। গ্রন্থটির পশ্চাৎমলাটে মুদ্রিত প্রকাশকের কয়েকটি কথা তুলে ধরা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"১৯৬০ সালের ১২ জুলাই সারা ভারত জুড়ে আঠারো লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী পাঁচদিনের যে ধর্মঘট করেছিলেন তা বিশ শতকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হয়ে আছে শ্রমিক সংহতির ব্যাপকতা ও সাফল্যের জন্য। অর্ডিন্যান্স জারি করে ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করে বা পুলিশ ও সেনাবাহিনী দিয়ে ধর্মঘটীদের উপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে, তাঁদের পারিবারিক জীবন তছনছ করেও ধর্মঘট বানচাল করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই ধর্মঘটের অবসান ঘটেছিল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত এক যুবক, তার স্ত্রী ও পিতা এবং পরিবারের চার নাবালক সেই ধর্মঘটের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছিল।"

এই নিষ্পেষণ এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতিরোধ করে শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধতা ও মানবতার উদ্বোধনের কাহিনী একটু একটু করে উন্মোচিত সত্যপ্রিয় বাবুর সংবেদনশীল লেখনী এবং নিখুঁত বর্ণনাময়, কথকতাধর্মী, ব্যতিক্রমী ভাষাশৈলীতে। পেশাগত কারণে সুদীর্ঘকাল বাঙলার রেলশ্রমিক কর্মচারী, তাদের জীবন যাপন আচার আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, উদারতা-সংকীর্ণতা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন ঔপন্যাসিক। ১৯৬০-এর ১২ জুলাই আন্দোলনের তিনিও একজন শরিক। সুতরাং তাঁর কলমে কংগ্রেসী রাজত্বের অত্যাচারী রেল অফিসার ও পুলিশ কর্তাদের বর্বরতা শ্রমিকনেতা অরুণের লড়াকু মেজাজ এবং ধর্মঘটে অংশ না নেওয়া 'দালাল'দের অপরাধ-মনস্তত্ব ও বিবেকদংশন সঞ্জাত দোদুল্যমানতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহিনীর নায়কচরিত্র নারায়ণ রাজনীতির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না বউ-বাচ্চা আর বেড়াচাঁপার কাছে সদ্য আবিষ্কৃত চন্দ্রকেতুগড়ে দুই হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন বাঙলাদেশের অতীত সভ্যতার রহস্য খননেই যে ছিল অধিক আগ্রহী সেও কিভাবে গণআন্দোলনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, পরিণত হয় একজন লড়াকু শ্রমিক নেতায় তার মানসিক বিবর্তনের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী এই উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে। পাশাপাশি নারায়ণের প্রায় বৃদ্ধ, সময়ের নানা নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত পিতা আশুতোষ যিনি শুধুমাত্র ছেলে বউমা-নাতি-নাতনিদের একটু গ্রাসাচ্ছাদনের তাড়নায় চাকুরি রক্ষার তাগিদে 'লয়াল ওয়ার্কার'-এর তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন তিনিও নিদারুণ আত্মগ্লানিতে শিউরে ওঠেন যখন দেখেন বিদেশী শাসকদের স্থান গ্রহণ করে বর্তমান দেশীয় শাসকগোষ্ঠী স্বদেশের শ্রমজীবী মানুষদের উপর কতই না নারকীয় পদ্ধতির দমন-পীড়ন-নির্যাতন নামিয়ে আনতে পারে। রেলকর্মচারীদের আন্দোলন-সংগ্রাম সঞ্জাত পরিস্থিতি সেই শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল বৃদ্ধ আশুতোষকেও নতুন জীবন দিয়েছিল—অরুণ, নারায়ণের মতন তিনিও হয়ে উঠেছিলেন একজন বিপ্লবী। কনিষ্ঠতম নাতনিকে বুকে ধরে তিনিও পা মিলিয়েছিলেন সংগ্রামী মানুষের মিছিলে।

আজ যাঁরা পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক জীবনধারা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বাস্তুহারা আন্দোলন বা বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক গবেষণা' ইত্যাদি করছেন তাদের উদ্দেশে বিনীত নিবেদন সত্যপ্রিয় ঘোষদের মতন প্রগতিপথের পথিক অগ্রণী সাহিত্যিকদের সৃজনশীল সাহিত্য গল্প-উপন্যাস-কবিতাকে বাদ দিয়ে তা করা উচিত কিনা ভেবে দেখবেন। তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে উপাদান রূপে যদি সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্রকে যুক্ত করা না হয়, তবে সমাজবিজ্ঞানের এ জাতীয় নীরস গবেষণাগুলি নিরর্থকই হয়ে উঠবে। 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' বা 'বহুবাসনায়'-এর মতন উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই। দুটি উপন্যাসকেই সময়ের দর্পণ রূপে চিহ্নিত করা যায়।

সবশেষে বলি, গ্রন্থদুটি প্রকাশ করে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রত্যয় প্রকাশনের পক্ষে সুরেশ ভদ্র মহাশয় পালন করলেন সেজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থদুটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন যথাক্রমে বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমনাথ ঘোষ। বিশেষ করে 'বহুবাসনায়' বইটির প্রচ্ছদ, বাঁধাই ও মুদ্রণপারিপাট্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

সুস্নাত দাশ

---

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। সত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রত্যয়। ২৪/১ বি ক্রিক রো, কলকাতা-১৪। নভেম্বর, ১৯৯৯। ২০ টাকা।

বহু বাসনায়। সত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রত্যয়। ২৪/১বি, ক্রিক রো, কলকাতা-১৪। এবং ডি/১০৬, বাঘা যতীন, কলকাতা-৩২। মার্চ, ১৯৯৯। ৬০ টাকা।

# গণেশ রাঠীর কবিতা

রাণীগঞ্জ-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক ডাঃ গণেশ রাঠীকে আমরা মানবদরদী সেবাব্রতী বলেই বরাবর জেনে এসেছি, কিন্তু তিনি যখন মাঝে মাঝে স্থানীয় কবিসম্মেলন গুলিতে কবিতা পড়তে সুরু করলেন, তখন তাঁর নোতুন পরিচয় পেলাম। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব দেরীতে, তাঁর চিকিৎসক-স্বরূপের তুলনায়, তাই সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু যখন পর পর দুটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর বেরিয়ে গেল, স্থানীয় কবিরা ও সাহিত্যবোদ্ধারা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, তখন বিস্মিত হলাম। তাঁর কবিতাগুলো ভালো করে পড়ে চমকে গেলাম, মুগ্ধ হলাম। তিনি প্রায় অসাধ্য-সাধন করেছেন—বৃত্তির বৃত্ত ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে এক শক্তিশালী প্রকাশ-মাধ্যমকে আয়ত্ত করেছেন। সহজ ভাষায় খাঁটি কবিতা লিখেছেন।

ডাঃ রাঠী তাঁর প্রথম কাব্য "অন্ধকারের কবিতা"র ফোল্ডারে দুটি সংশয় প্রকাশ করেছেন—বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয় বলে তিনি খাঁটি বাংলা লিখতে পারছেন কিনা—আর

তাঁর লেখাগুলো কবিতা হচ্ছে কিনা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, তাঁর সংশয় অমূলক। মাতৃভাষা বাংলা না হলেও ভাষাকে ভালোবাসতে পারলে তা মাতৃভাষা হয়ে যায়। প্রমাণ—আবু সয়ীদ আইয়ুব। ডাঃ রাঠীর ভাষা মাতৃভাষার মতই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, কেউ ধরতেই পারবে না যে এ তাঁর মাতৃভাষা নয়। তাঁর লেখা যে কবিতা হচ্ছে—তা যে কোনো কবিতাপ্রেমীই বুঝতে পারবেন। আধুনিক কবিতার পরিধি সঙ্কীর্ণ নয়, তার মধ্যে বহু কিছু বিষয়ই ধরে যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় জোর গলায় বলে গেছেন আধুনিক কবিতার ছত্রছায়ায় বহু বিচিত্র বিষয় স্থান পেতে পারে। তথাকথিত 'কাব্যিক' বিষয়বস্তু ছাড়া যে কবিতা লেখা যাবে না, এমন নয়। প্রকরণের দিক থেকেও ডাঃ রাঠীর সংশয় বোধ করার কিছু নেই। খাঁটি গদ্যও আজ কবিতার বাহন। তাছাড়া, তাঁর কবিতা তো ভাব ও আবেগের স্পন্দনে ছন্দিত।

তাঁর কবিতা পড়ে, তাঁর তিনটি প্রধান চিন্তাসূত্র আমাকে নাড়া দিয়েছে। (১) কবি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের সমাজ, আমাদের জগৎ বার বার ভুল করছে, পথ হাতড়াচ্ছে, অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তবু আলোর দিকেই সে যেতে চাচ্ছে। আলো কোথায়, প্রকৃত পথ কোথায়, তা ঠিকমত জানা নেই—আমরা বোধহয় কেউই জানি না, তবু আমাদের খোঁজার বিরাম নেই। একদল বলছে এ পথে এসো, অন্য দল বলছে ও পথে যাও। সকলের ধারণা—তারাই ঠিক, অন্যরা বেঠিক। এই ভাবেই হয়তো সমাজ আরো বহু কাল চলবে, তারপর প্রকৃত পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। (৩) কবি শিবিরায়নে বা regimentation এ বিশ্বাসী নন, ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী। সমাজে যেখানেই তিনি এই ধরণের ছাঁচে ঢালা মানুষ গড়ার প্রয়াস দেখেন, সেখানেই তাঁর আত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। টোটালিটারিয়ান শাসনব্যবস্থায় শাসককুল মনে করে যে তারাই ভালো, তারাই সৎ, তারাই যথার্থ মানবকল্যাণকামী, তাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থই হল—মানবতাবিরোধী কাজ করা। এই যুক্তি থেকেই তারা তাদের বিরোধীদের সরিয়ে দিতে চায়, তাদের সরানোকে অপরাধ বলে মনে করে না। পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেওয়া যেমন পুণ্যকর্ম, এও যেন তেমনি মানবহিতকর কাজ। কবি এই অপযুক্তিকে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করেছেন। (৩) কবি যদিও সোচ্চার নারীবাদী নন, অর্থাৎ পুরুষবিরোধী নন, কিন্তু গভীরভাবে নারীপ্রেমী। আমাদের সমাজে মেয়েরা যে আজও নানাভাবে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত —তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশ্চর্যের কথা, এই শোষণ ও বঞ্চনাকে আমরা বেশীর ভাগ মানুষ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিই। কবি এর প্রতিবাদ করেছেন। 'পাঞ্চালী' শ্রেণীর কবিতায় কবির ধিক্কার মর্মভেদী হয়ে উঠেছে। লাঞ্ছিতা মানবীদের প্রতি সমবেদনায় কবির মন আপ্লুত হয়েছে, পাঠকও তার সমভাগী হয়ে পড়েন।

তাঁর কয়েকটি কবিতা থেকে দু-এক পঙ্ক্তি উদ্ধার করি, 'সূর্যসন্ধান' কবিতায় তিনি বলছেন 'যারা/সূর্যোদয়ের তল্লাসে/হেঁটে চলেছে/তারা হাঁটতে থাকবে/হাঁটতেই থাকবে/কেন না/এ পথ তো সূর্যোদয়ের পথ না।/' 'বলি' কবিতায়, ভ্রূণহত্যা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—'নূতন বেশে নূতন সাজে/কাপালিকদেরও আর চেনা যাচ্ছে না।/ কিন্তু/আজও কোনো না কোনো

ভাবে/শিশুবলি ঠিক তেমনিই হয়ে চলেছে।' 'তিন কন্যা' কবিতায় কবি ইতিহাসের তিন যুগকে বেছে নিয়েছেন মেয়েদের অসহায়তা বোঝাবার জন্য—তৈমুরী জমানার অত্যাচারে 'ফালা ফালা হয়ে/আমার একটা মেয়েও পড়েছিল।' জহর ব্রতের সময়—'জ্বলন্ত গলন্ত/আমারও একটি মেয়ে ছিল।' আধুনিক যুগে—'আর আমার তৃতীয় মেয়েটাতো/এখন দুলছে।/আধখোলা জানলার ফুরফুরে হাওয়ায়/ছাদের আংটায় বাঁধা দড়িটা গলায়।'

কমলেশ লাহিড়ী

---

১. অন্ধকারের কবিতা। গণেশ রাঠী। বিশ্বস্তান।
২. হে ঈশ্বর । গণেশ রাঠী। মেদিনীপুর বুক ডিপো।

# রোমাণ্টিক আর্তির কবিতা

পরিমিত পরিধিতে কিছু কিছু কবিতা হয়ে ওঠে মগ্ন ও নির্বাক ঘাসফুল। আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার পাওয়া না-পাওয়ার দিন লিপি লেখা থাকে নম্র আলোয়, আবছা অক্ষরে। কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই বেদনার আঘাতে মন কেমন করে ওঠে। কিছু না পাওয়ার কাতরতা হয়ে ওঠে সুরেলা। কোমল ব্যথিত চোখ তুলে কবি দেখেন, যে ফুলের গায়ে "তোমার" নাম লেখা ছিল, সেই ফুল কে যে তুলে নিয়ে গেছে। ভালবাসার সময়ে নামে অসময়ের অন্ধকার। থাকে তৃষ্ণা. যার নিবৃত্তি নেই।

অথচ বাঁচার ইচ্ছা, ফুটে ওঠার নিবিড় যন্ত্রণা বিদ্ধ করেই চলে। আদপে এইভাবে অবিরত বিদ্ধ হয়েই চলেছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। 'বালিশে স্বপ্নের দাগ' সেই অপ্রাপ্তি, সেই কোমল যন্ত্রণার দিনলিপি। "নিঃসূর্য এখন আকাশ, মৃত,/স্বপ্নের শব নিয়ে একা/রাত জাগি!"

এই রাত জেগে বাঁচার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে না-বাঁচার বা না-বাঁচাতে দেওয়ার কীট। স্বপ্নের ভিতর থাকে স্বপ্নের ভাব। ছোট ছোট বাক্যবন্ধনীর ভিতর। তরুণের হালকা তুলির টান, রঙের কাজ, অব্যর্থ। চীনা ছবির কথা মনে আসে। আতুর রোম্যানটিক বেদনা-যা আজকের এই হিংস্র বাঁচার বাস্তবতা থেকে উঠে আসছে। স্বপ্নের ভিতর থেকে উঠে আসে স্বপ্নহীনতার জল্লাদ। "দুপুরের খররোদে বালিশ পুড়িয়ে,/পুনরায় রাতে শুই;/পোড়া স্বপ্নেরা তবু জেগে ওঠে জিঘাংসায়/অবিনাশী ছারপোকা যেরকম/নিদ্রিতের রক্ত ভালবাসে।" (বালিশে রক্তের দাগ ১) যে চলনের ঝংকার ছিল মৃদু ও তন্ময়, যে আর্তি ছিল আলো আঁধারির সন্ধিক্ষণ, তা যেন 'ছারপোকা' এই শব্দটি ব্যবহারে একটা চিৎকার করে থেমে গেল। আপাতদৃষ্টিতে একে সুরভঙ্গের অভিশাপ বলে মনে করলে কিন্তু, আমার মনে হয়, অবিচার করা হবে। অনেক সময় সুরের ঝংকার কানে বাজতে থাকলে অসতর্ক পাঠক যাতে ভেসে না যান, তার জন্য অকস্মাৎ রূঢ় কর্কশ অকাব্যিক বাক্যপ্রয়োগ শুধু দরকার হয় না, হয় অপরিহার্য যাতে আমাদের তন্দ্রা ভেঙে যায়।

জেগে উঠি বাস্তবতায়। কারণ "ছারপোকা"টা তো প্রতীক হয়ে রয়েই গিয়েছে। রয়ে

গেছে, অবিনাশী ছারপোকা যে রকম। নিদ্রিতের রক্ত ভালবাসে। (বালিশে স্বপ্নের দাগ)। ছারপোকা বালিশ, লালা, ব্যবহারিক জীবনের বিবর্ণ শব্দগুলির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তরুণ হয়তো বুঝিয়ে দিতে চান যে তিনি এবং তাঁর কবিতা বাস্তব, অবাস্তব এবং পরাবাস্তবের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্থিত। স্বপ্নের ভুবনডাঙায় দেখা হয়েছিল যার সঙ্গে একদিন, অবুঝ কাঁচা রোম্যানটিক হলেও সেই "স্বপ্ন বণিক" কবিতাটাও মনে লাগে। হয়তো অনুভবের খর তীব্র-তার জন্যই মন কাড়ে।

স্বপ্ন সকলেই দেখে। থাকে স্বপ্ন ভাঙার হাহাকার। আবার, স্বপ্ন ভাঙার প্রতিবাদে হারিকিরিও করে। তরুণ এখনো সন্দিহান। প্রশ্ন করেন,—"নাকি স্বপ্ন ভাঙার প্রতিবাদে হারিকিরি করে সেই স্বপ্নের তলোয়ারে?" (স্বপ্ন ভাঙার প্রতিবাদে) স্বপ্ন এখন স্বপ্নেরই ঘাতক। স্বপ্ন এখন স্বপ্নের সান্ত্বনা। "নিয়মের মধ্যে অনিয়ম তোলে প্রতিবাদের তর্জনী" (অনিয়ম) । নিয়ম, অনিয়ম, প্রতিবাদের মধ্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতেও, জীবন কিন্তু অত সহজে পথ করে দেয় না। দগ্ধ হতেই হয়। অভিমানী কবি আরও বেশি দগ্ধ হন। "চক্রব্যূহ"-এ অভিমন্যু তিনি। কিভাবে সময় কাটছে, কাকে বলি/কিভাবে জীবন কাটছে, কাকে বলি/চোখ বুজলেই/স্মৃতি, স্বপ্ন হাহাকার/চোখ খুললেই/বিরহ, বিষাদ, শূন্যতা/কিভাবে তিলে তিলে দগ্ধ হই/কি নিজেকেই মারি প্রতিদিন (চক্রব্যূহ) প্রতিদিনের দিন যাপনের গ্লানি অসন্তোষ, দগ্ধ হন কবি। "পথে বেরোলেই/ডাস্টবিন, কৌতূহল, সুবিধাবাদ/ঘরে ফিরলেই/কান্না, ক্লান্তি, স্বপ্নহীন ঘুম/" (চক্রব্যূহ) লিরিক্যাল রোম্যানটিক কবি বাকরূপ দিয়ে যান তাঁর ক্রমপ্রসারিত ভাবলোকের বা সাবজেকটিভিটির। এই প্রসরণ দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যক্তিক বোধ পায় সামগ্রিকতায় পরিণতি। এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসাধনার আরও একটা বড় লক্ষণ হল আবেগই হয়ে ওঠে চিন্তা ও অভিজ্ঞতা। হিংস্র প্রতিযোগিতায় রক্তাক্ত, যা আগামী দিকে আর সুতীক্ষ্ণ, সুচারু ও শাণিত হতে যাচ্ছে, এই সামাজিক-মানসিক পটভূমিতে তরুণ বলেন—"দেখা যাবে, একটি গাছের চেয়ে দ্রুত আমার উত্থান/কেন না ডারুইন আত্মস্থ করে আমি/যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনে অগ্রগামী,/এবং তোমাকে মেরে আমার বেঁচে থাকা—" (অভিব্যক্তিবাদ)। অবশ্য তরুণের কবিতার চলন দেখে আমার ধারণা হয়েছে এ হল অতি-বেদনাহত কবির অসতর্ক উপস্থাপনা। এই রীতি তার সাধারণ মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও আজকের বাঁচার অসহ্য আঁচ তাকে কতখানি দগ্ধ করেছে, এই কবিতা তার একটা সাক্ষ্য। এই অসহায় আতুরতা হয়ত "জীবনানন্দকে" কবিতায় মর্মান্তিক মনে হয়। জীবনানন্দের মুখে নিজেই কথাই বসিয়েছেন, ব্যক্ত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত আর্তি। এবং কোমল লিরিক্যাল রোমান্টিক বলেই দুঃখের গভীর গভীরতর। অথচ বাক্‌রূপ স্বার্থ করে সহজেই ".... তারপর অন্ধকার আর ঘাস/ঘিরে ধরে মৃতদেহ—ঘুচে যায় সব লেনদেন/জীবনে আনন্দ নেই। হেসে বলে বনলতা সেন।" এত মর্মান্তিক উক্তি করছে বনলতা সেন—কিন্তু হেসে। এই হাসি অসহ্য ও শাণিত। তরুণ যেন বলতে চান, জীবন মানুষ জগৎ সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে আজকের এই মারাত্মক 'সিভিল সোসাইটি'-তে। এবং এই সর্বনাশা অন্ধকার কথার অভিজ্ঞতা কবি বললেন অনেকটা শান্ত নির্লিপ্তিতে।

এই ভাবে জীবন যায়। এই ভাবে "নিঃশেষ প্রদীপ পোড়ে। আমি পুড়ি। পুড়ে যায় আমার লাইব্রেরী।" (অন্তিম মুহূর্তে) আর কবি থাকেন, "একলা থাকি করুণাহীন/আকাশে চোখ মেলে।" (সিসিফাস)

মনে হয় তরুণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জীবন হল সিসিফাস আর স্বপ্ন জীবনের ব্যথিত স্থপতি।

রাম বসু

---

বালিশে স্বপ্নের দাগ। তরুণ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যলোক। ৩০ টাকা।

# গ্রামশি-চর্চা ঃ একটি মূল্যবান সংযোজন

বিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে বলা যেতে পারে গ্রামশি-পুনরাবিষ্কারের পর্ব। মার্কসীয়। দর্শনচর্চার ইতিহাসে আনতোনিও গ্রামশি এমনই এক স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল যেখানে মার্কসবাদের ফলিত ও বৌদ্ধিক অভিজ্ঞানের পরিসরে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি নতুন আলোকে নতুন ধারায় উজ্জীবিত হয়েছে। ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-সমাজতত্ত্বের এক প্রকৃষ্ট মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিষয়বস্তুগত ব্যাপ্তি ওগভীরতার যে মাত্রাকে আমরা গ্রামশিতে অনুধাবন করি, তা যেকোন ধরণের যান্ত্রিকতার বিরোধী। সমসাময়িক বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের সঙ্গে (যেমন, রোজা লুকসেমবুর্গ, বুখারিন ও লুকাচ) গ্রামশির বৌদ্ধিক আদানপ্রদান মার্কসীয় দর্শনের তাত্ত্বিক কাঠামোটিকে যেমন নিয়মতান্ত্রিকতা ও দৃষ্টবাদী বক্তব্যের শৃঙ্খলমুক্ত করার লক্ষ্যে চালিত হয় ঠিক তেমনই গ্রামশির নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার বিশিষ্টতার নিরিখে নতুনতর ধারণা ও জটিলতাকে আশ্রয় করে প্রসারিত হয়। আবার গত সত্তর দশকে Reading Capital গ্রন্থে লুই আলথুসের গ্রামশির মার্কসবাদকে 'এক ধরণের আত্মবাদ ঘেঁষা মানবতাবাদ যা একধরণের ইতিহাসবাদেরই নামান্তর' বলে আক্রমণ করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রামশি বহুলাংশে আত্মবাদী হলেও 'দার্শনিক স্তরে ছিলেন ভাববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী'। গ্রামশির ইতিহাসবাদের ধারণা জার্মান ইতিহাসবাদের থেকে ভিন্ন। গ্রামশির ইতিহাসবাদের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ধারণা এবং তার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইতিহাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারণাটি। একটি বিশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সুনির্দিষ্টতাকে স্বীকার করে গড়ে উঠেছে গ্রামশির ইতিহাসগত সামূহিকতার (totality) ধারণা যা স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করেছে আত্মবাদী সামূহিকতার ধারণাটিকে। ঠিক তেমনই আবার ইতিহাসকে অসংখ্য টুকরো টুকরো, বর্ণময় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দেখার গ্রামশির এই দৃষ্টিভঙ্গীকে উত্তর-আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে। খণ্ডীকরণ ও বিনির্মাণের ধারণাকে অবলম্বন করে সামূহিকতার ধারণাকে খারিজ করার মাধ্যমে উত্তর আধুনিকতা যে ক্ষমতাবিরোধী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরম একপেশে

প্রতিবাদমুখী দর্শন হাজির করে গ্রামশির ভাবনায় কিন্তু তার কোন প্রতিফলন নেই।' গ্রামশির তত্ত্বভাবনাকে প্রধানতঃ লুকাচ ও কর্শ-এর চিন্তার নিছক একটি সংশ্লেষ বলে গণ্য করাও সঠিক নয়। কারণ গ্রামশির তত্ত্বভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছিল "চেতনা ও অস্তিত্বের অনুপুঙ্খ স্তরকে সংস্কৃতি ও মতাদর্শের নিরিখে বোঝার প্রশ্নটি'। এটি কোন লুকাচীয় সামূহিকতার ধারণা নয়। বস্তুত অবয়ববাদী কিংবা উত্তরআধুনিক ভাবনাবৃত্তের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে গ্রামশির তত্ত্বভাবনার কেন্দ্রে ছিল শ্রমজীবী মানুষের চেতনা ও অস্তিত্বের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এক বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি যার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সংগ্রাম সমাজের প্রতিটি স্তরে, একেবারে নিচের তলা থেকে যার শুরু। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে এক বিকৃত কিন্তু অখণ্ড ও অভিন্ন বিশ্বভাবনার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় যে পুঁজিবাদী আধিপত্য, তারই বিপ্রতীপে শ্রমজীবী মানুষের বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয়, খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধের অভিজ্ঞতাকে এক সূত্রে গেঁথে তুলে এক বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল গ্রামশির তত্ত্বভাবনার প্রাণকথা।

এই প্রসঙ্গে ফ্রাংকফুর্ট ঘরানার সঙ্গে গ্রামশির ভাবনার বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। গ্রামশির সমকালীন মার্কসবাদের প্রচলিত ধারণায় উপরিকাঠামোর স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা দেখা যায়, ফ্রাংকফুট ঘরানার তত্ত্বগত অবস্থান ছিল তার বিরোধী। পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদী প্রভুত্ব ও স্থায়িত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রাংকফুট ঘরানার বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মুনাফা ও ভোগবাদের স্বার্থে ব্যবহার করে শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয়তা ও সজীবতাকে যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত করছে যার পরিণামে আসে অনন্বয়ের (alienation) সমস্যা। সাধারণ ভাবে প্রযুক্তিকেই অনন্বয়ের প্রধান কারণ হিসাবে দেখার মধ্যে প্রকট হয় ফ্রাংকফুট ঘরানার প্রযুক্তিবিরোধী-বিজ্ঞানবিরোধী মানসিকতা। গ্রামশির কিন্তু এ ধরণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিরোধী অবস্থান কখনও ছিল না। বরং নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কিভাবে বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, গ্রামশির ভাবনা এদিকেও চালিত হয়েছে।

খণ্ডীকরণের ধারণার প্রেক্ষাপটে ও অধিবিদ্যক ভাববাদের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে গ্রামশির কারারচনায় তাই বার বার উঠে এসেছে ইতিহাসে নিম্নবর্গের ভূমিকা সংক্রান্ত টুকরো টুকরো বিভিন্ন মন্তব্য। ইতিহাসের প্রান্তদেশে থাকা মানুষকে ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসাই যদি হয়ে থাকে মার্কসের চিন্তার অন্যতম দিশা, তবে গ্রামশি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এই দিশাকে আত্মস্থ করেছিলেন। সার্দিনিয়ার প্রান্তদেশ থেকে উঠে এসে ইতালীর কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অভিজ্ঞতা গ্রামশিকে নিম্নবর্গের সংগ্রামের গুরুত্বকে মূল্য দিতে শিখিয়েছিল। এই নিম্নবর্গের ধারণা মার্কসের শ্রেণী ধারণারই পরিপূরক। কারণ কেন্দ্র ও প্রান্তের বিভাজনরেখাকে লুপ্ত করে দিতে পারে সংকাট ও সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান পরিধি। যেমন মার্কসও ভেবেছিলেন প্রান্তসীমার মানুষও হয়ে উঠতে পারে বিশ্ব ইতিহাসের অঙ্গ। তাই একদিকে যেমন নিম্নবর্গের সংগ্রাম সার্থকতা পায় সামূহিকতার বিশ্বজনীন এক ভাবনায়, অপরদিকে তেমন সামূহিকতার ভাবনাও নিম্নবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

মার্কসীয় দর্শন চিন্তার সুবিস্তৃত ঐতিহ্যধারায় লেনিনের পরে গ্রামশিই সম্ভবতঃ সেই বিরল চিন্তাবিদ যার মধ্যে নিবিড় তাত্ত্বিক অনুশীলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন এক বিশিষ্ট সৃজনশীল স্বকীয়তার জন্ম দেয়। গ্রামশি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক সংকটের চাপেই ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল রূপায়ণের জন্য পরিণত ধনতন্ত্রের উপস্থিতির আবশ্যিকতাও যে জরুরী নয়, তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের পরে। যাকে গ্রামশি বলেছিলেন The Revolution Against 'Capital'। দেশে অপরিণত ধনতান্ত্রিক কাঠামো এবং রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্যের ঘাটতির কারণে যেভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়েছিল, তাকে লেনিন বলেছিলেন ইতিহাসের অপ্রত্যাশিত সব মোচড়ের মধ্যে সবথেকে আকস্মিক এক গতিবদল। কিন্তু ইতালীর যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গ্রামশির প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তা বিপ্লবপূর্ব রুশদেশের মত নয়। আবার পশ্চিম ইউরোপের পরিণত বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্রও উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্র থেকেই স্বতন্ত্র। এই তিন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ সূত্রের মত গ্রামশির ভাবনায় অবস্থান করছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে উত্তরণের প্রসঙ্গটি। এই প্রসঙ্গেই বিচার্য গ্রামশির সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সম্পর্কের বিষয়টি।

গ্রামশির নেতৃত্বের ও ১৯২৬ সালে লিঁয় কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় স্বার্থে বৃহত্তর গণমোর্চা গড়ে তোলার ধারণার প্রতি বুখারিনের নেতৃত্বাধীন কমিণটার্নের সমর্থন ছিল। কিন্তু স্তালিনের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও ১৯২৯ সালে কমিণটার্ন থেকে বুখারিনের অপসারণের পরিণতিতে এই নীতির পরিবর্তন হয়, যা পি সি আই-কে ঠেলে দেয় কমিণটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) আদলে বাম সংকীর্ণতার দিকে।

ওই পর্বে কমিনটার্নের বক্তব্য ছিল একক ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই পুঁজিবাদ ও ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব। কিন্তু গ্রামশি এই অতিবাম কল্পনাবিলাসকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ভাবনায় ছিল এক সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের রণকৌশল, তৎকালীন ইতালীর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক নতুন ধাঁচের কমিউনিস্ট পার্টির কথা, মতান্ধতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গণতন্ত্রপ্রেমী সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে আপাতত একটি গণতন্ত্রী ব্যবস্থা কায়েম করা। গ্রামশির মনে হয়েছিল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ইতালীতে অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণেই তিনি ফ্যাসীবাদী ইতালীর অন্তিমপর্বের মন্ত্রিসভা ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে, এমনকি প্রথম গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল কি হবে, তা নিয়েও ভাবিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গ্রামশির তত্ত্বভাবনার গুরুত্ব এইখানেই। কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অতিবাম সংকীর্ণতাবাদের প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক অতি দীর্ঘ কালপর্ব জুড়ে ভারতীয় কমিউনিস্টরাও কমিনটার্ন প্রভাবিত

রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারাই মূলতঃ চালিত হয়েছেন। ব্যতিক্রম ছিল না যে তা নয়। এমনকি কমিনটার্ন অতিবাম সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক কাটিয়ে ওঠার আগেই ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একাংশ এ-দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণে এবং কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভূমিকা নির্ণয়ে সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গ্রামশি তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলেন। এই অপরিচয়ের দূরত্ব থেকে ক্ষতি যা হয়েছে, তা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই। কারণ গ্রামশির আধিপত্যের ধারণা এবং নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের তত্ত্ব ইতালীর মত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্বর্কে অবহিত থাকলে, ঔপনিবেশিক শাসন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আরও সদর্থক হতে পারত। ঠিক যেমন পুঁজিবাদী আধিপত্যের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষের বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গ্রামশি-কথিত রণকৌশল বর্তমান ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরীক্ষিত হওয়া জরুরী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অধ্যাপক, ডঃ শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত 'আনতোনিও গ্রামশি ঃ বিচার-বিশ্লেষণ' প্রবন্ধ সংকলনটি বাংলা ভাষায় গ্রামশি-চর্চার ক্ষেত্রে একটি অতি মূল্যবান প্রচেষ্টা। বস্তুত এই সংকলন গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় গ্রামশি-চর্চার সাবালকত্বের প্রমাণও বটে। একজন আন্তর্জাতিক মানের গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর দক্ষতা অনেকদিন ধরেই জনস্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিগত তিন দশকের গ্রামশি-চর্চার যে রূপরোখা তিনি নির্মাণ করেছেন, তা বাংলা-ভাষী পাঠকের কাছে আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রামশি-চর্চার ক্ষেত্রটির দুয়ার উন্মুক্ত করবে।

শুধু তাই নয়, সুনির্বাচিত প্রবন্ধগুলি ডঃ শোভনলাল দত্তগুপ্তের সম্পাদকীয় মুনশীয়ানা ও নিরপেক্ষতার পরিচয়ও বহন করছে। রোমের গ্রামশি ইনস্টিটিউটের বর্তমান অধিকর্তা জ্যুসেপ্পে ভাক্কা লিখেছেন "জেলখানার নোটবই-তে আধিপত্য ও আত্মনির্ভরতা" যেখানে তিনি দেখিয়েছেন বিকল্প রাজনীতির ধারণা আধিপত্যের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রাজনীতিতে যোগ করে এক নতুন মাত্রা। এই সংকলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ আরেকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস-এর অধিকর্তা ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত ঃ গ্রামশি ও মিশেল ফুকো"। নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে 'কারারচনায়' গ্রামশি প্রচলিত মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে অন্য শব্দ চয়ন করেছিলেন—যেমন, প্রলেটারিয়াট-এর জায়গায় সাবঅলটার্ন কিম্বা 'হেগেমনি'-র ধারণা। আবার মার্কসবাদের জায়গায় 'প্র্যাক্সিসের দর্শন'। কিন্তু গ্রামশির চিন্তার জটিলতা ও অভিনবত্বে তাঁর চয়িত শব্দগুলি নতুন ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত হয়েছে। সাবঅলটার্ন ধারণাটিকে গ্রামশি প্রচলিত প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহার করেছেন, এটা ঠিক। কিন্তু শুধু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন যেখানে এর অর্থ নিছকই আর শিল্পশ্রমিকের ধারণার সঙ্গে একাত্ম থাকে না। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে

সামন্তশ্রেণীর প্রভুত্ব ও কৃষক শ্রেণীর অধীনতার চরিত্র ব্যাখ্যায় গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' কৃষকশ্রেণীর স্বতন্ত্র চেতনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রভুত্ব-অধীনতার বিরোধিতার সম্পর্ক যেভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তা ইউরোপীয় মার্কসবাদী চর্চার ঘরানায় একটি বিশিষ্ট মাত্রা সংযোজন করেছে। তৎকালীন ইউরোপে গ্রামশিই একমাত্র চিন্তাবিদ "যিনি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর সম্পর্কের প্রশ্নটিকে বলশেভিক বিপ্লবের ছকের বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছিলেন"। একটি কেন্দ্রীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণার বদলে গ্রামশি জোর দিয়েছিলেন এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের উপরে, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষস্তরে নয়, বরং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে শ্রমিকশ্রেণী তার বিকল্প সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রিক চরিত্রের এই ধারণার সঙ্গেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় মিশেল ফুকোর বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয় ক্ষমতার ধারণাটির এক ধরণের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অজিত রায় লিখেছেন 'গ্রামশি ও লেনিন'। তাঁর বক্তব্য চিন্তা ও কর্মের পটভূমির ভিন্নতার প্রেক্ষাপটেই গ্রামশি ও লেনিনের বৈসাদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অসমের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই 'ভারতে আধিপত্যের রূপরেখা' প্রবন্ধে গ্রামশির চিন্তায় আধিপত্যের ধারণাটির বিচার করেছেন বর্তমান ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত রণকৌশলকে বোঝার পরিপ্রেক্ষিতে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অশোক সেন লিখেছেন 'সার্দিনিয়ার প্রান্ত থেকে ধনতন্ত্রের সীমান্ত' নিবন্ধটি। নিষ্ক্রিয় বিপ্লব, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অনুপুঙ্খ ও একত্রীভূত অভিব্যক্তি, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের টানাপোড়েন ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্ত। পেরী অ্যাণ্ডারসনের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'গ্রামশির চিন্তায় বিরোধাভাস'-এ আছে গ্রামশির আধিপত্য ধারণাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তারই সম্প্রসারণে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব চিন্তার আলোচনা। লুই আলথুসের 'মার্কসবাদ কোন ইতিহাসবাদ নয়' প্রবন্ধে আছে গ্রামশির তত্ত্বভাবনা সম্পর্কে অবয়ববাদী মার্কসীয় চিন্তার প্রতিফলন। ভারতে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ও কেরালার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী পি গোবিন্দ পিল্লাই রচিত 'আনতোনিও গ্রামশির কারারচনা প্রসঙ্গে' নিবন্ধটিতে মার্কসবাদের বিকাশে গ্রামশির গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণার বিশ্লেষণ আছে এবং প্রয়োজনে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক সেই আলোচনা আছে।

প্রবন্ধ সংকলনটির অনুবাদ কর্ম অত্যন্ত উচ্চমানের। বঙ্গানুবাদ করেছেন অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন ভট্টাচার্য। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ আছে। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ গ্রন্থটির গাম্ভীর্যের সঙ্গে মানানসই। মার্কসবাদের বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে এই উচ্চমানের সংকলন গ্রন্থটি বাংলাভাষী মানুষকে নতুন করে আবিষ্ট করবে।

অজেয়া সরকার

---

আনতোনিও গ্রামশি ঃ বিচার-বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় খণ্ড) সম্পাদনা—শোভনলাল দত্তগুপ্ত। পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৬। মূল্য ১১০ টাকা।

# বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ একটি সৃষ্টিশীল পরিবার

ঠাকুরবাড়ির কথা বাদ দিলে যে পরিবারটি উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা তথা বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে একদা জ্বলজ্বল করে জ্বলেছিল তা অবশ্যই রায় পরিবার। সাহিত্য-চর্চায় উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও সত্যজিৎ,—শুধু এই তিন পুরুষের সমবায়েই বাঙালির চিত্তে যে বিপুল প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। এঁরা ছাড়াও এই পরিবারের আরও অনেকেই সাহিত্যচর্চায় সুনিশ্চিত চিহ্ন রেখেছেন,—তাঁদের কথা বিশদভাবে আমরা অনেকেই জানি না।

রায়-পরিবারের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে সুকুমার রায়ই (১৮৮৭ খৃ.—১৯২৩ খৃ.) বোধ করি সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। যথার্থ বয়স্ক অথচ নবীন, প্রাজ্ঞ অথচ কৌতুকে পূর্ণ মনের অধিকারী সুকুমারের প্রপিতামহ লোকনাথ রায়। মৈমনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রাম এঁদের আদি বাসস্থান। লোকনাথের ছেলে কালীনাথ সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত। এতটাই যে, 'মুনসী শ্যামসুন্দর' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। এঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় কামদারঞ্জনকে দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী দত্তক নিয়ে 'উপেন্দ্রকিশোর' নাম রাখেন। পরিবারের অন্য সকলে 'রায়' লিখলেও এঁর পদবী যে 'চৌধুরী'-যুক্ত, তার কারণ এই। উপেন্দ্রর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদারঞ্জন ও তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন বিখ্যাত অধ্যাপক ও ক্রীড়াবিদ্। চতুর্থ কুলদারঞ্জন শিশু-সাহিত্যিক ও ফটো-আর্টিস্ট। ছোটভাই প্রমদারঞ্জন বনবিভাগের আধিকারিক। 'বনের খবর' এঁর বিখ্যাত বই। এঁর কন্যা বাংলা শিশুসাহিত্যের খ্যাতনাম্নী লেখিকা লীলা মজুমদার।

উপেন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার। তার আগে কন্যা সুখলতা। সুখলতা রাও-এর ছোটদের ছোটছোট গল্প অল্পবয়সে কে পড়েন নি? সুকুমারের ছোট দুই বোন পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। পুণ্যলতার ('ছেলেবেলার দিনগুলি'র লেখিকা) কন্যা নলিনী দাসও ছোটদের লেখিকা ও 'সন্দেশ' পত্রিকার একদা সম্পাদিকা। সুকুমারের মেজভাই সুবিনয় ও ছোটভাই সুবিমলও 'সন্দেশ'-এর পাতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ রায়।

লেখক, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, ছাপাখানা ও ছবিতোলার বিজ্ঞানে অগ্রদূত উপেন্দ্রকিশোর যে-পরিবারের কর্তা, সেখানে মনের দরজা জীবনের প্রারম্ভেই খুলে যায়। রায়-পরিবারের সদস্যরা ফলে নিজনিজ পথে নিজেদের প্রতিভাকে বিকশিত করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ধার্মিক নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সৃষ্টির আনন্দে ও চিন্তায় বাড়িটা যেন সর্বদা হাসত।

এই হাসি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছিল উপেন্দ্র, সুকুমার ও পরবর্তীকালে লীলা-মজুমদারের সাহিত্যে। নিউস্ক্রিপ্ট-প্রকাশিত পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-তে লেখিকা বলছেন "বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন, ছবি আঁকছেন। মা সেলাই করছেন, ঘরের কাজকর্ম করছেন। আমরা খেতে বসেছি...কিংবা কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য হৈচৈ করে তৈরী হচ্ছি।" (পৃ. ৯) "বাবার এক বন্ধু বলতেন "এ বাড়ির মানুষগুলি সব সময়ই হাসছে।" (পৃ. ১২৮)

বর্তমান গ্রন্থে এহেন পরিবারের কয়েকজনকে বেছে নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা

হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, সুবিনয় ও সুবিমল-এর রচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদে। এর আগে অবশ্য 'উপেন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা শিশুসাহিত্য', 'উপেন্দ্রসমকালীন বাংলা শিশুসাহিত্য' ও 'রায় পরিবার' নিয়ে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখিকা। এছাড়া পরবর্তী স্তরে এই পরিবারের 'অন্যান্য লেখকবৃন্দ' এবং 'বাংলা শিশুসাহিত্যে রায় পরিবারের (অব) দান' নিয়েও বিশদ আলোচনা আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে।

তবে যথার্থ গবেষণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে তিনটি 'পরিশিষ্ট' অংশে। এখানে যথাক্রমে 'সন্দেশ পত্রিকার ইতিহাস', 'রায় পরিবারের বংশলতিকা' ও এই পরিবারের লেখকদের 'নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী' স্থান পেয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীটি সম্পূর্ণ নয় বলেই 'নির্বাচিত' বলেছেন গবেষক। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ হয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করলেও ক্ষতি ছিল না। বরং তাহলেই বইটির বিশেষত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতো। ভবিষ্যতেও বার বার পরবর্তী গবেষকের দল বইটির শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতেন।

সামাজিক প্রয়োজন তথা নীতিশিক্ষাদানের বাহ্যিক কারণে জন্ম-নেওয়া বাংলা শিশুসাহিত্য রায়-পরিবারের সাহিত্যচর্চার দৌলতে কীভাবে আন্তরিক রসসাহিত্যে রূপান্তরিত হল, তা গবেষিকার প্রথম পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণেই পরিষ্কার।

রায়-পরিবারে রক্ষিত 'কীটদষ্ট' খাতা দেখে তবেই লেখিকা 'রায় পরিবার'-এর ব্যক্তিত্বগুলিকে খুঁটে খুঁজে নিয়েছেন, তাদের পারস্পরিক অন্বয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছেন, শুধু বই পড়ে নয়। প্রশান্ত মহলানবিশকে লেখা সুকুমার রায়ের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি দেখে তবেই তিনি সুকুমার রায় নামক চরিত্রটিকে বিচার করতে চেয়েছেন,—এসবই লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয়। মৌলিক উপাদান ঘেঁটেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন। তবে দু-একখানি বইয়ের অনুল্লেখ পাঠকের সন্ধানী মনকে বিস্মিত করে। যেমন 'সুকুমার রায়' পরিচ্ছেদের শেষে সহায়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকার উল্লেখ নেই। বিশেষত কথাশিল্প প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'প্রস্তুতিপর্ব' সম্পাদিত অতি মূল্যবান 'সুকুমার রায় বিশেষ সংখ্যা'র সহায়তা নেওয়া বোধহয় খুবই দরকার ছিল।

লেখিকার গ্রন্থ-পরিকল্পনার মধ্যে একটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছক আছে। যুক্তি ও তথ্যকে তিনি সেই অনুসারে সাজিয়ে নিয়েছেন। গবেষণা করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে বিশেষ কোন জট-জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তথ্য ও যুক্তি মাঝে-মাঝে দুদিকে টান মারে লেখকের সচেতনতাকে। এখানে সেরকম কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ব্রততীকে। তাঁর ভাষা ও শব্দব্যবহার সচেতন, স্বচ্ছন্দ ও ঝরঝরে। তবু সমালোচনাকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে পুনর্বাসিত করতে পারেননি তিনি। সাহিত্যের 'অন্তেবাসী' হয়ে রইল তাঁর এই বইটি। কিন্তু বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডে আলো ফেলার জন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে রইলেন।

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

---

বাংলা শিশুসাহিত্য চর্চা ঃ রায়পরিবার ।। ব্রততী চক্রবর্তী ।। দে বুক স্টোর।। কলকাতা।। ১২০ টাকা।

# জীবন যেমন

যাপিত জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে মানুষ এমন অনেক ঘটনা, জীবন ও লোকের সংস্পর্শে আসে যারা মনের উপর রেখে যায় গভীর ছাপ। কেউ কেউ সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আলোড়িত বোধ করেন, আবার কারো মনের গভীরে সেই ছাপ তখনকার মতো চাপা পড়ে থাকে, অনেক পরে যা নিজেকে প্রকাশ করে ভিন্নতর ভঙ্গিতে। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনাই হয়ে ওঠে সমাজচিত্র। যখন অভিজ্ঞতার বর্ণনা, দেখা ঘটনাকে সরাসরি কোন না কোন মাধ্যমে প্রকাশ না করে পারে না, তখন বহু ক্ষেত্রেই সেটা হয়ে ওঠে রিপোর্টাজ। আর যা অনেক পরে নানা রসে জারিত, নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পায় তা হয়ে পড়ে কাহিনী, কখনো আবার নিছক আত্মকথন, স্বগতোক্তি বা 'সলিলকি'। শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরীর 'মেয়ের নাম যন্ত্রণা' হলো দেখা জীবন থেকে ছেঁকে তুলে আনা কিছু ঘটনার, জীবনের চিত্র, যাকে রিপোর্টাজ বললেই হয়তো তার সঠিক চরিত্র বোঝা যাবে। আর নরনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি' নামেই জানিয়ে দেয় দ্বিতীয় গোত্রের রচনা।

শ্রীমতী দীপ্তি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন তাঁর লেখাগুলি গোড়ায় 'নির্যাতনের সহজ শিকার নারী' শিরোনামে অধুনালুপ্ত একটি দৈনিকে পরপর কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীমতী রত্না মিত্রের উৎসাহে। কয়েকটি প্রকাশ করেছিলেন শ্রীমতী জয়া মিত্র তাঁর সম্পাদিত একটি সাময়িক পত্রে। তারপর অনেকের তাগিদে তাদের থেকে একটা সংকলন হলো 'মেয়ের নাম যন্ত্রণা'। আমাদের সমাজে নারী এই একুশ শতকের গোড়াতেও যে কান্না, যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ নিয়ে বেঁচে আছে, কিম্বা বেঁচে মরে আছে, যাদের অনেকের কাছেই মরণ হলো মুক্তি, তাদেরই কথা এই 'মেয়ের নাম যন্ত্রণা'। আপাতঃ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে তারা অনেকেই যে 'মেয়েদের অনেক কিছু সইতে হয়' কথাটির জীবন্ত প্রমাণ হয়ে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে, এই গ্রন্থের 'কাহিনী'গুলির মধ্যে পাঠক সেই অভিজ্ঞতা আরেকবার ঝালিয়ে নিতে পারবেন। কিছু কাহিনী এখানে আছে যা আমাদের অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির মধ্যেই ধরা পড়ে। খবরের কাগজের পাতাতেও তার কথা পড়ি আমরা। এই তো দিন কয়েক আগে পড়া গেল শিলিগুড়ির কাছে সেই অভাগা মায়ের কথা, যে নিজের বছর খানেকের শিশুসন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে দত্তক দিয়ে হারিয়ে গেছে, বহু মানুষের চোখের সামনে থেকে। সেই নারী যদি আত্মহননের পথ নিয়েও থাকে, তবু এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারবে নিজের সন্তানকে সে সাধ্য মতো বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তা না করতে পেরে নিজের সন্তানদের মেরে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে এমন কথাও আমরা পড়ি খবরের কাগজের পাতায়।

কিন্তু কোন দুঃখী মা এবং বাবা, যারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনে অপত্যস্নেহে একটু সুখের মুখ দেখার কথা ভেবেছিল, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই যাদের মন বদলে যায়, তেমনই এক দম্পতির করুণ কাহিনী বইয়ের 'অনামিকা'। সন্তান একটি কন্যা, তার উপর গন্নাকাটা। গরিবের ঘরে মেয়ে যে বোঝা ছাড়া কিছু নয়, তার উপরে গন্নাকাটা হলে কেবল তার নয়, গোটা পরিবারটার জীবনই দুর্বিষহ

হয়ে উঠবে। তাই বাড়িতে নিয়ে এসে সেই অসহায় শিশু যাতে অতি দ্রুত জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়, তার জন্যে যা করার সবই করা হলো। মাতৃস্তনের অমৃতস্বাদ না পেয়ে, শুধু কাঠের উপরে পড়ে থেকে চরম অবহেলায় কেবল রেখে গেল মাত্র কয়েক দিনের অবাঞ্ছিতের ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আর্তনাদ। তারপর সব শেষ। সেই গন্নাকাটা মেয়েটা তার বাবা মায়ের কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কোন স্নেহস্পর্শ, কোন আদরের ডাক শোনেনি। তাই যথার্থই সে অনামিকা হয়ে চলে গেল।

'সুন্দর মাসিমা' হলো আরেক নারীর কাহিনী, যাকে ডাকা মাত্র স্বামীর সোহাগ সহ্য করতে হয়েছে, তা সে প্রায় পরিণত গর্ভাবস্থা কিম্বা আঁতুর ঘর যে কোন অবস্থাতেই হোক। সেই অপরিমেয় প্রেমের মাশুল দিতে হয়েছিল সুন্দরমাসিমাকে ক্রমাগত গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব কিম্বা গর্ভপাত করতে করতে সূতিকা রোগ আর রক্তশূন্যতায় মরে।

আরতি বৌদি কিম্বা অনিমারা অনেক অনেক দিন স্বামীর অত্যাচার কিম্বা অবহেলা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে ঘর ছেড়েছে। কেউ হয়তো জোটাতে পেরেছে আরেকজন কোন পুরুষকে ঘর বাঁধার আশায়, আবার কেউ শুধুই হারিয়ে গেছে। অশোকা এক বিরাট ধনী পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা হিসেবে জন্ম নিয়ে পনের দিনের মধ্যেই মাতৃহারা হয়। তারপর এক নিঃসন্তান দম্পতির স্নেহে আদরে বড় হয়ে ওঠে কিন্তু পিতৃগৃহের দরজা তার কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ে হয়ে যায় এক ধনী, সুদর্শন সখের অভিনেতা এক যুবকের সঙ্গে, যার আরো একটি স্ত্রী আছে। সেই নারী বন্ধ্যা। তাই স্বামীর অন্য নারীতে আসক্তিতে আপত্তি করেনা, বরং তারা গর্ভবতী হলে সেই সন্তানকে বংশধর বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সন্তানের মায়ের ঠাঁই হয়েছে বার-বাড়িতে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। ভোক্তা যুবকটি একই নারীতে বেশিদিন ভোগসুখ না পেয়ে মাঝে মাঝেই পুরানোদের তাড়ায় নিয়ে আসে আরেকজন, যার ঠাঁই হয় সেই বার-বাড়িতেই। তাই অশোকা বিতাড়িত হয়, শেষ পর্যন্ত এক যাত্রা দলের অধিকারীর হাতে পড়ে, অভিনয়ে সুযোগ পাওয়ার আশায়। তারপর নানা অধিকারীর হাত ঘুরে হারিয়ে যায়।

ডান হাত কাটা সুধা নিজের পাঁচ সন্তান নিয়ে অকাল মৃত স্বামীর শূন্যস্থান পূর্ণ করে নেমে পড়ে কঠোর জীবন সংগ্রামে। তার হার মানতে মানা। স্বামী পরিত্যক্তা বন্ধ্যা সাবিত্রী রাজগীরে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সেবাকুণ্ডে স্নানার্থী মেয়েদের সাহায্য করে দিন গুজরাণ করে। সে স্বামীকে দোষ দেয় না, দোষ দেয় ভাগ্যের, কারণ ভাগ্য তাকে মা হতে দেয়নি। স্বামীগর্বে গরবিনী কল্পনা স্বামী নির্ভরতা কতোটা মর্মান্তিক হতে পারে বোঝার আগে পর্যন্ত মনে করতো রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে, ইচ্ছামতো কেনাকাটি করে তারা স্বামী-স্ত্রী যে টাকা ওড়াতো, কল্পনার ধারণা ছিল তাকে খুশি করার জন্যেই তার স্বামী সেই বেহিসেবী খরচ করে। এবার নিজের ইচ্ছায় সামান্য কটা টাকা মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির সদস্য হতে গিয়ে সে শোনে স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন টাকা খরচ করার অধিকার তার নেই। তখনই কল্পনা বোঝে তার স্বামী গরবিনী রূপটা আসলে স্বামীর খাস পছন্দের একটা পোষাক, তার নিজের কিছু আপন জিনিস নয়। রীণা বিয়ে না হওয়া অপবাদ ঘোচানোর জন্যে এক প্রৌঢ়ের স্ত্রী হতে আপত্তি করে না, যিনি বৃদ্ধা মা আর এক জড়বুদ্ধি দিদির দেখভালের জন্যে লোক না পেয়ে শেষে

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজী হয়েছেন। তরুণী রীণার যে জগৎটা ছিল রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দকে নিয়ে দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকার দায় এড়াতে তাঁদের নির্বাসন দিয়ে সে বেছে নেয় কার্যতঃ এক সেবিকার জীবন। নিঃসন্তান, সঙ্গীহীনা রাণীদি আশ্রয়হীনা অবস্থায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করে মুখোমুখি হয় এক ধনী বৃদ্ধের যিনি খুঁজছিলেন তাঁর বার্ধক্যে একজন নারীর সাহচর্য, যে স্ত্রীর মর্যাদা না পেয়েও তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে রাজী হবে। শৈলবালা রক্তের সম্পর্কহীন এক দম্পতির মাসোহারার আশায় পথের ধারে বসে থাকে। গ্রামের লোককে মান বাঁচাতে বলে তার মেয়ে- জামাই মাসে মাসে টাকা পাঠায় তার ভরণপোষণের জন্যে।

তুহিনা বিয়ে করেছিল শুভ্রকে, একেবারে 'মেড ফর ইচ্ আদার' দম্পতি। একটা বাচ্চাও হয়েছিল তুহিনার। তারপরই শুভ্র যায় দুবাই চাকরি করে টাকা আনতে। তারপরই বেপাত্তা। অনেক বছর পরে শুভ্র ঘরে ফেরার খবর পাঠায়। তার আগেই তুহিনা জেনেছিল শুভ্র দুবাইয়ে আরেকটা সংসার পেতেছে। সেই পাট চুকিয়ে যখন সে ফেরে তখন শুভ্র বেকার। এদিকে তুহিনা নিজের মতো করে জীবনটা ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করে সফলও হয়েছিল। শুভ্র এসে দাবি করে তার ছেড়ে যাওয়া স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক জোড়া লাগাতে। তুহিনার সবচেয়ে আপনজন যারা, যারা তাকে এই সময়ে পাশে থেকে সাহায্য করেছে, তারা চায় শুভ্র যখন ফিরেই এসেছে তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা আবার চালু করাই সঙ্গত শোভন হবে। তুহিনা মন থেকে মানতে পারেনি, নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে সেই অর্থহীন সম্পর্কটা অস্বীকারও করতে পারেনি। তখনই প্রতিরোধ এসেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে তুহিনার ছেলের কাছ থেকে। সে তার বাবার ছবিটা চেনে। এক অনিন্দ্যকান্তি যুবক তার বাবা। তার বদলে সে দেখে এক মাথাজোড়া টাক, অ্যালকোহলিক ফ্যাটে বিশাল বপু এক অকর্মণ্য মানুষকে, তুহিনার উপর স্বামীত্ব ফলাতে চায়। ছেলে প্রতিবাদ করে ওঠে খবরদার আমার মায়ের গায়ে হাত দেবে না তুমি।

মোট এই পনেরটি কাহিনী শ্রীমতী দীপ্তির নারী জীবনের অসহায়তার একটা মর্মস্পর্শী দলিল হয়ে থাকবে। অতি কথন, অতি রঞ্জন বর্জিত এইসব এটাই দীপ্তির কৃতিত্ব, যা মমতায়, সমবেদনায় একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ, পৈতৃক কর্ম ছিল গুরুগিরি। তবে 'কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি' গ্রন্থের লেখক নরনারায়ণ ভট্টাচার্যের পিতা তাঁদের পারিবারিক ধারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন অন্য ভুবনে। সেখানে উচ্চশিক্ষার পর সরকারি চাকরির বদলে, সরকার বিরোধিতার অবৈতনিক রাজনৈতিক চাকরিতে স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন। ফলে যা জোটার তাই হলো জেল, নিগ্রহ, দারিদ্র। একটা সময়ে নেশা ও পেশার তাগিদে এসেছিলেন অভিনয়ের জগতে। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অতীতটা ম্লান হতে হতে নিজের নামটাও কেমন আড়ালে পড়তে সুরু করে। সাধু প্রকৃতির এই সর্বার্থে পরার্থপর মানুষটির নাম হয়ে যায় মহর্ষি। পুরো নাম 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মহর্ষি নাম শিশির ভাদুড়ির দেওয়া হঠাৎই তাঁর 'সীতা' নাটকে মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করে শিশিরবাবুকে দারুণ অসুবিধা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে।

নরনারায়ণ বাবু ভূমিকায় বলেছেন, দাদা শঙ্করনারায়ণ তাঁর "নীরজা" বই ছাপিয়ে ছিলেন

মহেশ ভরদ্বাজ নামে। সুতরাং তিনি নরনারায়ণ নিঃসংশয়ে কেশব ভরদ্বাজ। এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে যা কিছু মুদ্রিত তা লেখকের 'আপন মনে কথা বলা'। তাই এর নাম হওয়া উচিত 'সলিলকি'। সার্থক এই নামকরণ। এটা একান্তভাবে স্মৃতিচারণ নয়। বহু মানুষের সাহচর্য, সংস্পর্শ অজস্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তিলে তিলে কিভাবে এক দুরন্ত, প্রাণরসে সজীব কিশোরকে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌছতে অবদান রেখেছে তারই মনে পড়ে জাতীয় কাহিনী। তাই কাহিনীর পরম্পরায় তারিখ গৌণ, কাহিনী বিশেষ করে তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গই মুখ্য। এইসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখকের একটা বিশেষ জীবন দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। সেটা হলো কেবল পরিবার, স্বজন পরিজন নয়, 'কত শত অচেনা, অজানা মানুষের প্রসারিত হাতের সাহায্যেই গড়ে ওঠে মানুষের জীবন' কথাটা মনে রাখার মতো। সেই মুহূর্তে সেই সাহায্যের হাত ধরতে না পারলে হয়তো অনেকের জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারতো অভাবনীয় দিকে।

যেমন 'টিপ্‌স্' কাহিনীর আদ্যান্ত সাহেব মিঃ ব্যানার্জী যিনি ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাশ কামরার যাত্রী হিসেবে বেয়ারা, ওয়েটারদের টিপ্‌স্ দিয়ে কাজ করানোয় অভ্যস্ত, যিনি খাবার না পেয়ে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ার মুখে লেখকের সহায়তায় সেই বেয়ারা-ওয়েটারদের খাবারের ভাগ পেয়ে সুস্থ বোধ করেন, তাঁর কাছে এই ঘটনা কোন মানবিক মূল্যবোধের অভিধা হয়ে আসেনি। গোড়ায় তাঁর মনে হয়েছিল পয়সা দিয়েই এটা কেনা যায়, তাই টিপ্‌স্ দেওয়ার প্রস্তাব। সানাতনী'র কাহিনী আরো আকর্ষক। রীতা নামের এক আধুনিকার বাবা নিতান্ত আটপৌরে, ছা-পোষা চেহারার মানুষ মেয়ের নামের সঙ্গে নিজের ব্রাহ্মণ পদবি যুক্ত না করে, নিজের সনাতন নামকেই পদবি করে দিয়েছিলেন। জাতপাতের লড়াইয়ে প্রথম চিহ্ন এই পদবি যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে সাধারণ মানুষের এই সব ছোটখাটো পরিবর্তন প্রয়াস হয়তো অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। গুরুগিরি কাহিনীতে একজন বৃদ্ধার গুরুবংশের কাউকে সেবা করে পুণ্য সঞ্চয়ের আকুল আগ্রহ মিটিয়ে এবং আরেকবার গুরুবংশের পুণ্যের জোরে পুলিসের পেটানো থেকে রেহাই পেয়ে জীবনের অভিজ্ঞতায় একটা মানবিক দিক আরেকটা নির্মল কৌতুকের দিক দুটোই ফুটে উঠেছে। ঋণ হলো সেই ধরনের আরেক কাহিনী, যা অনেকের জীবনেই ঘটতে পারে, যেখানে অজানা কোন মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজনকে বাঁচায়. তারপর নিজের কোন পরিচয়ের ঠিকানা না রেখে একেবারে হারিয়ে যায়। এই ঋণ চিরস্মরণীয় কিন্তু অপরিশোধ্য।

মার খাওয়া, হনুমান টুপি, রক্তের দোষ এমন সব কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনী যা পড়ার সময় মনে দাগ কেটে যায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া দিন মনে করিয়ে দিয়ে। কোন মিনারে তো অনবদ্য সেই একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যখন নারী তার প্রথম 'সরম সুখদ রজনী'তে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেয় তার পুরুষের কাছে। প্রকাশদা, এবং মায়া, দুলাল, দাদা কাহিনীগুলি জীবনের অভিজ্ঞতার এমন কিছু দিক, যা কোন দুটি মানুষের জীবনে একইভাবে ঘটে না। এদের মানবিক আবেদন, মূল্যবোধের শরিক হয়তো আরো অনেকে হতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তির জীবনে ও মনে তার যে একান্ত নিজস্ব অনুরণন তা স্বতন্ত্র, ব্যক্তিক হয়ে থাকতে বাধ্য। তবু স্বীকার্য নরনারায়ণ বাবু আমাদের সেই অনুভবের কিছুটা স্বাদ দিতে

পেরেছেন।

আশীর্বাদ অংশটি গ্রন্থের সেই চরিতার্থতার স্বাক্ষর বহন করছে, যা নরনারায়ণকে কেশব ভরদ্বাজের সার্থকতায় পৌছে দিয়েছে। বাবা, মা, কাকা, কাকীমা চারজন মানুষ অথচ চিরকাল মনে হয়েছে তাঁরা যেন শুধুই দু'জন বাবা আর মা। লেখক ও তাঁর খুড়তুতো ভাইরা সবাই মনে করতেন তাঁদের পিতৃমাতৃদায় চারবার পালন করতে হবে। তাঁরা করেও ছিলেন তাই। একদা কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা এক যুগেরও বেশি সক্রিয় কর্মী, এখন কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও রয়ে গেছেন মনে-প্রাণে একান্ত কমিউনিস্ট। তাঁর দুরন্ত পার্টি জীবন সুরু হতেই পারতো না বাবা মা, কাকা কাকীমার সমর্থন না থাকলে। দুঃখ সুখে মানুষের পাশে নিজের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ নিয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বাড়ীতে তাঁর গুরুজনদের প্রসন্ন অনুমোদন আর আশীর্বাদে। মাতৃশ্রাদ্ধে মহর্ষির এক কীর্তি উল্লেখ করা যেতে পারে।

মা মারা গেলে ব্রাহ্মণ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শ্রাদ্ধ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী মাতৃশ্রাদ্ধে যথাসাধ্য ব্যয় করাতেও সামাজিক সম্মতির চেয়ে বেশি ছিল সামাজিক চাপ। তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের ডেকে বলেন আমার সঞ্চিত অর্থে তোমাদের সকলের অধিকার আছে। তোমরা রাজী হলে আমি সব সঞ্চয় মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করতে পারি। সকলে একবাক্যে সমর্থন করার পরে তিনি এক লিস্ট বের করে পড়ে শোনালেন তাঁদের সব দুঃস্থ আত্মীয়দের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের অবস্থা বিচার করে শ্রাদ্ধের সব টাকা সাহায্য বাবদ পাঠিয়ে দিতে চান। আর শ্রাদ্ধের দিন কেবল এগারো জন ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে নিয়মমাফিক।

নরনারায়ণবাবুর কাকা যিনি ছিলেন তাঁর বাবা মহর্ষির অর্ধেক জীবন, এক রাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে রাত এগারোটা নাগাদ ট্রাঙ্ককলে খবর আসে তিনি আর নেই। সারা বাড়ী যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে, মহর্ষি ধীর পায়ে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে এক প্যাকেট তাস টেনে নিয়ে পেশেন্স খেলতে বসেন। চোখে, মুখে খরা, মরুভূমির হাহাকার থমথমে হয়ে রয়েছে। পেশেন্স খেলে তিনি সামলাবার চেষ্টা করছেন সেই দুঃসহ শোক।

বাবার কাছে নরনারায়ণ পেয়েছিলেন সেই শিক্ষা যা মানুষকে সাচ্চা পথে চালায়, সকলকে ভালোবাসতে শেখায় যথাসাধ্য করার কথা বলে, কারণ সেটাই মানবধর্ম। এর বাইরে আর কিছু নেই। ঈশ্বর বেচারা নানা জনের নানা কথা রাখতে রাখতে পরস্পর বিরোধী প্রার্থনায় জেরবার হয়ে ক্লান্ত। তাকে ছুটি দেওয়া দরকার।

'কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি' এক ভিন্নস্বাদের বই, ভিন্ন মাত্রার কথা, যাকে স্মৃতিচারণ, স্বগত সংলাপ ঠিক কোন একটা পর্যায়ে খাপ খাওয়ানো যায় না। এই বই এই দুয়ের মিশ্রণ ছাড়া, আরোও কিছু যা লেখকের মুন্সীয়ানায় ফুটে উঠেছে। নরনারায়ণবাবু জীবন ও সমাজকে দেখেছেন নিজের জীবনের জান্‌লা থেকে। তাতে যতোটা দেখা যায়, ততোটাই দেখেছেন। কোথাও দাবি করেননি জীবনের সমগ্রতা ধরার সামান্যতম চেষ্টা তাঁর আছে। পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, জীবনের সেই জান্‌লাটা তাঁর যথেষ্ট বড়ো, সবটা না হলেও অনেকটাই সেখানে জান্‌লার ফ্রেমে ধরা পড়ে। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের যে বিরাট বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের

জীবন প্রবাহ চলেছে, তার একটা কালপর্বের কিছু চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি অভিজ্ঞতায় জীবন চেতনায়। কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি সেই কাজ অনেকটা করেছে বলে মনে হয়।

শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরীর 'মেয়ের নাম যন্ত্রণা' আর নরনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি' দুটোই সমাজের দর্পণ, তবে স্বতন্ত্র মাত্রার। পাঠক সাধারণ তাদের মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতার নানা খণ্ডচিত্র খুঁজে পাবেন অনায়াসে।

বাসব সরকার

---

দীপ্তি রায়চৌধুরী—মেয়ের নাম যন্ত্রণা, সপ্তাহ পাবলিকেশন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, দাম ঃ ২৫ টাকা

নরনারায়ণ ভট্টাচার্য—কেশব ভরদ্বাজের সলিলকি, সুচেতনা, দাম ঃ ৮০ টাকা।

# কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার কেন প্রাসঙ্গিক একালে

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হওয়ার ১৫০ বছর পরে ১৯৯৮ সালে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করার দু'টি মাত্রা আছে। ১৯৮৯-৯১ সালে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, তাকে শুধু সোভিয়েত মডেলের বিপর্যয় না বলে যারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান পর্বের সূচনা বলে চিহ্নিত করতে চান তাঁদের কাছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৫০তম জয়ন্তী উদ্‌যাপন অর্থহীন, অবান্তর। কারণ মার্কসবাদ বাতিলের দলে তাদের মনে হয়। সেই দিক থেকে ম্যানিফেস্টোর প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা হবে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় প্রত্যয় ঘোষণা। আরেকটি দিক হলো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৫০ তম জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা, যেখানে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মূল প্রতিপাদ্য অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে বিগত দেড়শ বছরের কালগত পরিবর্তনে কোথায় কোথায় সংযোজন, বিয়োজনের ভিত্তিতে তার সমকালীনতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার আলোচনা মূল লক্ষ্য। অরুণাভ ঘোষ সম্পাদিত "সার্ধশতবর্ষে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার-এর প্রাসঙ্গিকতা" এই দ্বিতীয় ধরণের আলোচনা।

এই গ্রন্থের আলোচকরা আমার জানা মতে প্রায় সবাই মার্কসবাদী। প্রায় বলার কারণ যে, দু'একজনকে তাঁরা মার্কসবাদী কিনা জানি না, তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি তাঁরা সদর্থক ভাবেই মার্কসশাস্ত্রী। গোড়াতেই বলা দরকার আমার অজ্ঞানতাবশতঃ যাঁদের মার্কসশাস্ত্রী বলে মনে করছি, তাঁরাও মার্কসবাদে অঙ্গীকার করেই, অর্থাৎ মার্কসবাদ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য, এজাতীয় মানসিকতা থেকে সহস্র যোজন দূরে থেকেই আলোচনা করেছেন।

সমস্ত নিবন্ধকার যাঁরা সমগ্রভাবে ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই এমন কি সংকলনের মুখবন্ধে জ্যোতি বসুও বলে নিয়েছেন, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বেদ, কোরাণ বা বাইবেল নয়, যে একান্ত ধর্মীয় আনুগত্য থেকে তার প্রতিটি শব্দ কিম্বা পংক্তি

অভ্রান্ত, তাদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য হবে মার্কসবাদী চরিত্রের সঠিক প্রকাশ, এই ধরণের ধারণা ও বক্তব্য বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ মার্কস ও এঙ্গেলসের সমকালীন ইউরোপ ও পরিচিত দুনিয়া এই ১৫০ বছর পরে একই রকম থাকতে পারে না, থাকেও নি। যদি থাকতো তাহলে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অন্যতম প্রধান একটি সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যেত। ইশ্‌তেহার তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতো। কারণ ইশ্‌তেহারের প্রথম অধ্যায়েই মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র আলোচনায় জোরের সঙ্গেই বলেছেন 'Change is the only constant'. এই সমাজে পরিবর্তনই হলো একমাত্র অপরিবর্তনীয় ধারণা। বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কোন কিছুকেই 'ossify' করে না, টিকে থাকতে দেয় না। সুতরাং ইশ্‌তেহারের সিদ্ধান্তগুলি এই নিরন্তর পরিবর্তনীয়তার প্রেক্ষিতেই নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা।

ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হওয়ার পঁচিশ বছর পরে ১৮৭২ সালে প্রকাশিত এক জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় পারী কমিউনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন, ম্যানিফেস্টোর মূল কাঠামো ও ধারণাগুলি অপরিবর্তিত রেখে অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে রদবদল দরকার। শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনায় সেই তিনটি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন ইশ্‌তেহার কোন অনড়, নিশ্চল রচনা নয়। তাঁর মতে ইশ্‌তেহারের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে এটির "পাঠপ্রক্রিয়া" উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নিরুপম সেন তাঁর 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার ও আমাদের দেশ' শীর্ষক আলোচনায় এই প্রসঙ্গ তিনটি আলোচনা করেই দেখাতে চেয়েছেন প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে দেশের ইতিহাস, ঐতিহাসিক বিকাশের পর্ব ও পর্বান্তর এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বুঝে ও বিশ্লেষণ করেই তার কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে। ইশ্‌তেহারে সব দেশে সব কালে অনুসরণীয় কোন লাইন দেওয়া নেই, যা ধরে এগিয়ে গেলেই বিপ্লব ঘটবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সাফল্যকে নিজের কাজে ব্যবহার করে বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজে সংকট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করে। একাজে তার এযাবৎ সাফল্যও এসেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পুঁজিবাদ সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। একটা সংকটের তৎকালিন মোকাবিলা শেষ হতে না হতেই দেখা দিচ্ছে নতুন সংকট। পুঁজিবাদের এই সংকট জর্জর স্বরূপ মার্কস ও এঙ্গেলস ইশ্‌তেহারের বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছিলেন সংকট থেকে স্থায়ী মুক্তি পুঁজিবাদ কোনদিনই লাভ করতে পারবে না। এই বিশ্বায়ন, এক মেরুকৃত পৃথিবীতে বিশ্ব পুঁজিবাদ নিশ্চিন্ত হওয়ার বদলে অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে পড়েছে। রাধারমণ চক্রবর্তী সেই দিকটাই আলোচনা করেছেন 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার : বর্তমান অনিশ্চিত দুনিয়ার প্রেক্ষিতে' আলোচনায়। অনিল বিশ্বাস 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার : ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা' শীর্ষক আলোচনায় ম্যানিফেস্টোর কালজয়ী ঐতিহ্য উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন বিশ্ব পুঁজিবাদের জীবনে সংকটের ধারাবাহিকতা বন্ধ করার কোন ক্ষমতা, কোন যাদুমন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে নেই। এই বিশ্বায়ন পর্বও তাকে শক্তিশালী করতে, পারছে

না এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে। তার সংকট ঘনীভূত করতে তাই দরকার শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধের আন্তর্জাতিকীকরণ বলেই তিনি মনে করেন। 'শতাব্দী অন্তের পুঁজিবাদ ও কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' আলোচনায় রতন খাসনবিশ বুর্জোয়া শ্রেণী কিভাবে শ্রমের সংজ্ঞা ও শ্রমিকের ধারা বদলে দিয়ে 'সেবাশ্রম' নামের আড়ালে শোষণের নতুন প্রক্রিয়া চালু করতে চায়, তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই অপকৌশল সময়ে ধরতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলনকে তার মূল্য দিতে হবে।

দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার ও মানবমুক্তি' নিবন্ধে ম্যানিফেস্টোর সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন যে, মার্কসবাদ সর্বজনীন মানবমুক্তির ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ গড়তে চায় 'যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ পরিণতি লাভ করবে সকলের স্বাধীন বিকাশে'। তাই যতোদিন তা না হচ্ছে ততোদিনই থাকবে ইশ্‌তেহারের প্রাসঙ্গিকতা। গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর "সূর্য যখন ওড়ালো কেতন অন্ধকারের প্রান্তে" শীর্ষক এক আবেগদীপ্ত নিবন্ধে বলেছেন, ইশ্‌তেহার ইতিহাসের সন্তান। মানবমুক্তির বাকি ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত ইশ্‌তেহারের প্রাসঙ্গিকতা অপরিবর্তিত থাকবে। অশোক মিত্র'র 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার-এর মৃত্যু নেই' আর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার : মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি' তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত। তার মধ্যে অশোক মিত্রের মন্তব্য 'সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যা ঘটেছে, তা সম্ভব হয়েছে কেন্দ্রিয় নৈতিকতার অনুশাসনহেতু', কথাটা ভাবার মতো। হীরেন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন ইশ্‌তেহার প্রসঙ্গে স্তালিনের সেই মন্তব্য, এটা হলো "The Song of Songs of Marxism", যা মানুষকে প্রাণিত করবে চিরকাল। সংকলনের দুটি নিবন্ধ রামকৃষ্ণ দে রচিত "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার : প্রসঙ্গ পরিবার" আর সোমনাথ চক্রবর্তীর "ম্যানিফেস্টোর ধর্মসমীক্ষা" নতুন ধারার নিবন্ধ। এই আলোচনার পরিসরে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। আর তার সঙ্গে রয়েছে এই আলোচকের ক্ষমতার প্রশ্ন।

সম্পাদক অরুণাভ ঘোষ মূল্যবান কাজ করেছেন। সুস্নাত দাশ 'ম্যানিফেস্টো রচনার রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট' নিবন্ধে সাধারণ পাঠকদের ইশ্‌তেহার পাঠের প্রারম্ভিক অসুবিধা দূরীকরণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বলেই মনে করি। সম্পাদক অরুণাভ'র সাধু সংকল্প এবং তার সার্থক উদ্‌যাপন বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সব শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সংকলন সমাদৃত হবে বলে মনে করি। তবে ইশ্‌তেহারের শততম জয়ন্তীতে বিশিষ্ট মার্কসবাদী ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তার সঙ্গে একালের তুলনামূলক আলোচনা একটি থাকলে ইশ্‌তেহারের প্রাসঙ্গিকতা আরো ভালো ভাবে যাচাই করা যেত। যেমন ল্যাস্কি, পল সুইজি, জি.ডি.এইচ., কোল ও টেইলরেরআলোচনা পরবর্তী সংস্করনে আশা করি সম্পাদক সেদিকে নজর দেবেন।

বাসব সরকার

---

অরুণাভ ঘোষ সম্পাদিত : সার্ধশতবর্ষে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার-এর প্রাসঙ্গিকতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দাম ঃ ৮০ টাকা।

# ইতিহাসে : অঞ্চল, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

"দেশের মুক্তি সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান যে কোথায় একথা নিজে বাঙ্গালী হইয়া উচ্চারণ করিলে আমার অবিনয়ের অপরাধ স্পর্শিবে। কিন্তু এই বঙ্গদেশের মাঝখানে হাওড়া জেলার নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে আর কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার বিগত ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই একথার সত্যতা বুঝিবেন।" কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সনের ২৪ জুলাই বঙ্গবাণী পত্রিকায়।

'স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা' গ্রন্থে লেখক দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী গভীর আন্তরিকতায় বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে শরৎচন্দ্রের এই উক্তির যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২৬, একটানা হাওড়া জেলায় বাস করে তার সমস্ত গঠনমূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব দিয়ে শরৎচন্দ্র জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যে কথা বলতে পারতেন খুব লোকেরই সেকথা বলার অধিকার ছিল। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অহিংস গান্ধীবাদী শরৎচন্দ্র যেমন কংগ্রেস আন্দোলন তেমনই জেলার বহু সংখ্যক জাতীয় বিপ্লবী সমিতি ও গোষ্ঠীর তৎপরতার সঙ্গেও পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন। ফলে জাতীয় আন্দোলনের দুই ধারা হাওড়া জেলায় যখন সমান্তরালভাবে চলেছে কিম্বা প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে, তখনও শরৎচন্দ্র নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন একটা মিলিত শক্তি হিসেবে তাদের সক্রিয় রাখতে।

হাওড়া জেলায় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস কেবল ঘটনাবহুল নয়, তা যথেষ্ট পুরানো। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের শৈশব থেকে তার পরিণত রূপ যখন যেভাবে মোড় নিয়েছে, তার মডারেট থেকে চরমপন্থী পর্ব, তার কংগ্রেস পরিচালিত গণআন্দোলন থেকে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী আন্দোলন, ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন, এই জেলার রাজনীতি ও শ্রেণীসচেতন জনগোষ্ঠী তাতে নিজের মতো করে সাড়া দিয়েছে। এমন কোন বড়ো মাপের ঘটনা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এই প্রদেশে ঘটেনি যাতে হাওড়া জেলার মানুষ অংশগ্রহণ না করে সরে থেকেছে। দেশের বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে হাওড়া জেলার সম্পর্ক মোটেই একমুখী ছিল না। রাজধানী কলকাতার আন্দোলনের ঢেউ যেমন হাওড়া জেলাকে আন্দোলিত করেছে তেমনি তার জেলা স্তরে শুরু হওয়া নানা আন্দোলনও শহর কলকাতাকে স্পর্শ করেছে। বিপ্লবী আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীরা অনেক সময় রাজধানীর অদূরে গ্রামবাংলার ছোঁয়া লাগা এই জেলাকে বেছে নিতেন তাদের গোপন আস্তানা, প্রশিক্ষণ শিবির গড়তে যেমন করেছিলেন চট্টল বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগে। তাতে নিরাপত্তা রক্ষা আবার প্রয়োজন মতো অন্যত্র তৎপরতা চালাতে সুবিধা হতো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাওড়ার বালী এলাকার যেসব শিক্ষিত যুবক চাকরির সূত্রে কলকাতায় নিত্যযাত্রী হয়, প্রধানত তাদের কেন্দ্র করেই জেলায় রাজনৈতিক চেতনা ও

তৎপরতার সূচনা ও বিস্তার ঘটে। সেটা বালী অঞ্চলেই আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়ে সারা জেলায়। সন্দেহ নেই গোড়ার দিকে সেই সব রাজনৈতিক তৎপরতা একেবারে নিয়মতান্ত্রিক ধারাতেই শুরু হতো। ঘটনার চাপে দেশের অন্যত্র এই নিয়মতান্ত্রিক ধারা যতোই জঙ্গী হয়ে উঠতে থাকে, বোঝা যায় আবেদন নিবেদনে শাসকদের টলানো যাবে না, তখনই ধীরে ধীরে হলেও প্রতিবাদী আন্দোলন জঙ্গীরূপ গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়। এক কথায় সারা দেশে রাজনৈতিক চেতনার স্তর পরম্পরা যেভাবে বিকশিত হয়েছে, হাওড়া জেলা তার ব্যতিক্রম নয়।

দুঃখহরণবাবু, সিপাহী বিদ্রোহ (?) যাকে বলা হয় প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ সেই সময় থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়ে দেশভাগের সময় পর্যন্ত হাওড়ায় যতো ধরণের আন্দোলন হয়েছে, শ্রমিক আন্দোলন, মাঝি-মাল্লাদের ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি যথাসাধ্য তাদের বিবরণ, কুশীলবদের কাহিনী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। কাজটা বড়ো মাপের, গভীর নিষ্ঠা ও ভিতর থেকে তাগিদ না এলে পেশায় শিক্ষক একজন প্রবীণ মানুষ এহেন দুরূহ কাজে হাত দিতে ভরসা করতেন না। গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে, অপেশাদার ঐতিহাসিক হিসেবে দুঃখহরণ বাবু যা করেছেন, অনেক পেশাদার ঐতিহাসিক সেটা করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করতেন। পেশাদার ঐতিহাসিকদের এখন কাজ হবে এই গ্রন্থে সংকলিত তথ্যসমূহ তাদের পেশাদারি দক্ষতা, পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সংযোজন দরকার হলে বিয়োজনের ভিত্তিতে হাওড়া জেলায় জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রামান্য ইতিহাস রচনা করা।

হাওড়া জেলায় জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক সূত্রপাত স্বদেশী যুগ থেকে। তার সংগঠকরা অধিকাংশই ছিলেন জাতীয় বিপ্লবী। এক কথায় তাকে জাতীয় বিপ্লবী ধারা বলা যায়। সেই প্রথম পর্ব শেষ হয় গান্ধী যুগের অসহযোগ আন্দোলনে। তার আগে জাতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতায় হিংসা না অহিংসা, এই নিয়ে কোন মতভেদ ছিল না। দ্বিতীয় পর্বে গান্ধী যুগে অহিংস আন্দোলন মুখ্য হয়ে উঠলেও বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বিপ্লবীরা পরীক্ষামূলকভাবে গান্ধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তার গণরাজনীতির চেহারা দেখে। তাঁরা সেই আশা পুরণের লক্ষণ তার মধ্যে দেখতে পাননি বলেই নিজেদের পথও ছাড়তে পারেননি। বিশের দশকের শেষ থেকে এই প্রদেশে যখন বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা হয় তখন তাঁদের অনেকেই একে একে সেইসব আন্দোলনে সামিল হন। সেটা হাওড়া জেলায় জাতীয় আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব। দুঃখহরণ বাবু তাঁর আলোচনায় এই জেলায় বামপন্থী দল ও আন্দোলনের শিকড় বিস্তারের প্রাথমিক কিছু তথ্য যোগান দিয়েছেন।

হাওড়া জেলার জাতীয় আন্দোলনে যে সব ব্যক্তিত্বের নাম নানা সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন শরৎচন্দ্রের মামা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, রাসবিহারী বসু, বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঘাযতীন ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ এবং তরুণ বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম, যিনি পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভূমিকা সমৃদ্ধ হাওড়া জেলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে

গিয়ে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব কর্মীরা অধিকাংশ, বোধহয় সকলেই এসেছিলেন সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত স্তর থেকে। হাওড়া জেলার মোট জনসংখ্যায় তখন এবং এখনও সমাজের নিম্নবর্গ, হয়তো বা নিম্নবর্ণের মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং আছে। জাতীয় আন্দোলন কি ব্যাপকভাবে তাদের স্পর্শ করতে পারেনি? তাছাড়া যাঁরা রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম, বিশেষতঃ জীবন সংগ্রামে কি কোন ভূমিকা ছিল না? এই দু'টি দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যাতে এই গ্রন্থের পরবর্তী কোন সংস্করণে লেখক কিছু তথ্য ও বিশ্লেষণ যোগ করেন। লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আশা করি সাধারণ পাঠক এবং একালে আঞ্চলিক ইতিহাসের মনস্ক পাঠক বইটি পড়ে উপকৃত বোধ করবেন।

'এম. এন. রায়, বিপ্লবী, রাজনীতিক ও দার্শনিক' শ্যামলেশ দাশের এই গ্রন্থটি এক অসাধারণ চরিত্রকে একালের মানুষ, বিশেষতঃ তরুণ প্রজন্মের সামনে গভীর নিষ্ঠায় তুলে ধরার এক সার্থক প্রয়াস। লেখকের ভূমিকায় গোড়াতেই বলে নেওয়া হয়েছে এই বই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমগ্র জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত একটি সর্বাঙ্গীন আলোচনা গ্রন্থ নয়। এটি আবার চট্‌জলদি পাঠের উপযোগী কোন অতি সরলীকৃত আলোচনা গ্রন্থও নয়। জীবনের শেষ পর্বে মানবেন্দ্রনাথ যখন রাজনীতি থেকে সরে এসে দার্শনিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম বা 'নবমানবতাবাদী' তত্ত্ব রচনা ও প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন শ্যামলেশ বাবু তরুণ বয়সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই 'নবমানবতাবাদ' আজ একুশ শতকের সূচনার আগেই কেন এদেশে এবং বিদেশে প্রায় বিস্মৃত, তার প্রবক্তা কেন কার্যতঃ উপেক্ষিত, সেই জিজ্ঞাসা থেকেই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। এই প্রজন্মের তরুণ সমাজকে তাদের আত্মমগ্ন জীবনে এই বাংলারই এক বিরাট ব্যক্তিত্বের জীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দার্শনিক প্রত্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আত্মবিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করতেই লেখকের এই প্রয়াস। গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো লেখকের প্রয়াস সার্থক, তবে তাঁর আশা পূরণ হবে কিনা সেটা অন্য কথা।

শ্যামলেশ বাবু মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে তাঁর বইয়ে মোট চারটি অধ্যায়ে সব আলোচনা করেছেন, রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিপ্লবী রায়, রাজনীতিক রায় এবং দার্শনিক রায়। প্রতিটি অধ্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এযাবৎ প্রকাশিত তথ্যসমূহ যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন, পড়াশুনা করেছেন, তাঁদের কাছে নতুন করে জানার তেমন কিছু নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে হবে রায় সম্পর্কে যাঁরা এযাবৎ আলোচনা করেছেন, যাঁদের বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ, বক্তব্য ছিল, শ্যামলেশবাবু দক্ষতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নানা জনের নানা মতের উপস্থাপন, সময় বিশেষে তুলনামূলক বিচার করেছেন। তাই ছোট আকারের এই বইটিতে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা জনের মতামতের একটা সার সংক্ষেপ, এই বইয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। বোঝা যায় মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন, একালের পাঠকদের মানবেন্দ্রনাথ মনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির অবশ্যই বিরাট গুরুত্ব আছে।

এই আলোচক বইটি পড়ে কয়েকটি জিজ্ঞাসার তাগিদ অনুভব করছে বলেই শ্যামলেশ বাবুর মতো একজন মানবেন্দ্রনাথ রায় জীবনীকারের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরার চেষ্টা করছে। মানবেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু ছিলেন না। তাঁর ৬৪/৬৫ বছরের জীবনে মাত্র ১৫/১৬ বছর কেটেছে দেশের বাইরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী ও ইউরোপের অন্যত্র। বাকি সবটাই এদেশে। রায়ের বিপ্লবী জীবনের সাফল্য যা কিছু ঘটেছে সেটা মেক্সিকোয়। যে ভারত বিপ্লবের সন্ধানে তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন, সেই দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর শিকড় কি সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়েছিল বলেই ১৯৩০ সালে দেশে ফেরার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থেকেও তিনি মাটির সঙ্গে সংযোগ আর স্থাপন করতে পারেন নি?

বিপ্লবী আন্দোলনের রীতি প্রকরণের সঙ্গে আকৈশোর যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে গণরাজনীতির রীতিপদ্ধতির যে বিরাট ফারাক, তিরিশের দশকে দেশে ফেরার আগে মানবেন্দ্রনাথের কাছে তা অজানা ছিল। সেই রীতিপদ্ধতি আয়ত্ত করে রায়ের পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। মানবেন্দ্রনাথ বিদেশে থাকা কালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গণ আবেদন উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি গান্ধীর বিকল্প হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে সেই গান্ধী নেতৃত্বকে মেনেই তাঁকে কাজ করতে হয়। সেই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। জহরলাল কিম্বা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রায়ের মনে কোনদিনই উচ্চ ধারণা ছিল না। এক ধরণের Superiority complex নিয়েই এদের সঙ্গে কাজ চালানোর মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। অথচ গান্ধীর পর এই দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার সঙ্গে একটা সমীকরণ করতে না পারলে, সেটা সহযোগিতা কিম্বা বিরোধিতা যাই হোক না কেন, তখনকার কংগ্রেস আন্দোলনে কারো পক্ষে নেতৃত্বের প্রথম সারিতে পৌছানো সম্ভব ছিল না।

কমিণ্টার্ণ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও রায়ের আশা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য, সোভিয়েতের অবস্থান সমর্থন প্রভৃতি কথাবার্তা তাঁকে আবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে পুনর্বাসন দেবে। ১৯৪৩ সালে স্তালিন কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর এই ধারণা বদলায়নি। কিন্তু সেটা যখন আর হয়নি তখনই রায়ের কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। আরো বলা দরকার ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে লড়ে যদি বিপর্যস্ত না হতো, যদি তিনি সদলে বেশ কিছু আসন জিতে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারতেন তাহলে শেষ জীবনের যে মানবেন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ মানুষ হিসেবে দার্শনিক প্রত্যয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে, সেই মানবেন্দ্রনাথকে আমরা পেতাম না। তাহলে তাঁর দলহীন গণতন্ত্রের তত্ত্বও জন্মাত না।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো এক বিরাট মাপের বিপুল জ্ঞানের অধিকারী মানুষ, যিনি রাজনীতিতে প্রথম সারির নেতা হতে পারতেন, অনায়াসে না হলেও অন্যসব প্রথম সারির নেতাদের মতো, তাঁর ব্যর্থতা ইতিহাসের ট্র্যাজিক পরিণতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শ্যামলেশ বাবু এইসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তাঁর ছোট বইয়ে করবেন, সেই প্রত্যাশা থেকে বলছি না। এই প্রজন্মের তরুণদের কাছে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, রায়ের জীবনের সেইসব বিতর্কিত অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা এবং সেই প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতির প্রাসঙ্গিক বিচার লেখকের লক্ষ্য পূরণে বেশি সহায়তা করতো বলেই মনে করি। তবে তিনি যে কাজটুকু হাতে নিয়েছেন সেখানে তাঁর সার্থকতা শতকরা একশ ভাগ।

বাসব সরকার

---

দুঃখহরণ চক্রবর্তী : স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা, শরৎ বুক হাউস, দাম ঃ ১০০ টাকা

শ্যামলেশ দাস : এম. এন. রায়, বিপ্লবী, রাজনীতিক ও দার্শনিক, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, দাম ঃ ৫০ টাকা

পরিচয়
শারদীয়
১৪০৮

শৈলেন দাস

পীযূষকান্তি সরকার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

# VICTORIA MEMORIAL HALL

(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 QUEEN'S WAY, KOLKATA-700 071
PH. : 223-1889-91/5142, FAX : 223-5142

**A. Sound and light shows at Victoria Memorial Ground on Pride and Glory—The story of Kolkata :**

Show Times :

**October to February :** From 6.15 P.M—7 P.M. (Bengali Show)
From 7.15 P.M.—8 P.M. (English Show)

**March to June :** From 6.45 P.M—7.30 P.M. (Bengali Show)
From 7.45 P.M.—8 30 P.M. (English Show)

Rate of Tickets : Rs. 10/- and Rs 20/-. Students · Rs. 10/-
Children Above Three Years—Full Tickets
Ticket Counter opens at 12 Noon/12.30 P.M.
For block booking please contact—Education Unit-in-Charge

**B. Travelling Exhibition :**

**Oriental Scenery—Yesterday & Today** to be held in four Metro Cities below
**Bangalore**—08.12 2001 to 31.01 2002 (Karnataka Chitra Kala Parishat)
**Chennai**—15.01.2002 to 05.02 2002 (State Museum)
**Hyderabad**—15 02.2002 to 05.03.2002 (Salar Jung Museum)
**New Delhi**—15.03.2002 to 1st week of April 2002 (IGNCA)

**C. Recent Publications :**

| No. | Title | Price |
|---|---|---|
| 1. | Charles D'oly's Calcutta—Album I and II | Rs. 40.00 each |
| 2. | J.B Fraser's Calcutta | Rs. 35.00 |
| 3. | Calcutta in the eyes of Thomas Daniell | Rs. 35.00 |
| 4. | Indian in the eyes of Daniells' | Rs 40.00 |
| 5. | India as seen by Simpson | Rs. 40.00 |
| 6. | Select views of India | Rs. 40.00 |
| 7. | Picture Post Card Set—D | Rs 10.00 |
| 8. | Picture Folio No. 2 | Rs. 1.00 |
| 9. | Picture Folio No. 3 | Rs. 2.00 |
| 10. | Ceramic Tiles (views of St. Andres's Church) | Rs. 32.00 |
| 11 | Chakraborti. Hiren : An Urban Historical Perspective for The Calcutta Tercentenary | Rs. 35.00 |
| 12. | Greig, Charles : Landscape Paintings in the Victoria Memorial | Rs. 150.00 |
| 13. | Gopa, Choudhuri and Bhaskar Chandra : A Comprehensive Catalogue of Water colours, Pencil Sketches and Pen and Ink drawings in the collection of Victoria Memorial | Rs. 15.00 |
| 14. | Urdu Guide Book | Rs. 5.00 |
| 15. | Ganguly, K K. : Modern Masters | Rs. 35.00 |
| 16. | Catalogue of busts and statuary | Rs 2.50 |
| 17. | Calcutta Gallery—India's first City Gallery | Rs. 50.00 |
| 18 | Contemporary Art of Bengal | Rs. 375 00 |
| 19. | Victori Memorial 2000 Natural History Painting @ Album Series 1—3 | Rs. 90 00 |
| 20. | Hillscape of India | Rs. 70.00 |
| 21. | Victoria at Night | Rs 5.00 |
| 22. | National Leaders Portrait Gallery | Rs. 1.25 |

# বালি পৌর প্রতিষ্ঠান

৩৮৪, জি. টি. রোড, বালি, হাওড়া

বর্তমান ঠিকানা ঃ ৫, গোস্বামী পাড়া রোড, বালি, হাওড়া

"যে জাতি পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্স জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে— আমি সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শিকাগো ধর্মসভা

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

অরুণাভ লাহিড়ী
উপ-পৌরপ্রধান
বালি পৌর প্রতিষ্ঠান
বালি, হাওড়া

কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা
পৌরপ্রধান
বালি পৌর প্রতিষ্ঠান
বালি, হাওড়া

# পানিহাটীর সমস্ত জনগণের কাছে একটি ঘোষণা

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত পানিহাটীর গঙ্গার পাড়ে ছাতুবাবুর বাগানবাড়ী "গোবিন্দকুমার হোম" এর সংস্কার প্রকল্পে পানিহাটী পৌরসভা, জেলাশাসক উত্তর ২৪পরগনা এবং উত্তর ২৪পরগনা জেলা পরিষদ উদ্যোগ গ্রহন করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে এবং সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গেছে। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী ইমারত পানিহাটীর গৌরব বহন করে চলার পথে পানিহাটীর সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করি।

পানিহাটী পৌরসভা
পানিহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার
পৌরপ্রধান

# পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতি

## পুরশুড়া ঃ হুগলী

।। আমাদের অঙ্গীকার
আমাদের কর্মসূচী।।

- সাক্ষরতা, প্রবাহমান শিক্ষা
- আই. এস. পি
- যৌথ নদী জল উন্নয়ন প্রকল্প
- পুরশুড়া বিদ্যাসাগর ভবন (বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র)
- পার্থেনিয়াম নির্মূলকরণ ও পরিবেশ সচেতনতা।

পুজোয় সাজুন তন্তুশ্রীর সাজে
নব রঙে-রূপে নব অনুভবে
তন্তুশ্রী
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
সাধ্যের মধ্যে সাধপূরণ

# মহেশতলা পৌরসভা

## মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

### উন্নয়নের চিত্র (আগষ্ট ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০১ পর্যন্ত)

| ক্রমিক নং | কাজের নাম | প্রকল্পের পরিমাণ/সংখ্যা | অনুমিত ব্যয় | কাজ শেষ হয়েছে | প্রদত্ত অর্থ | সম্পূর্ণ মূল্যমান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জল সরবরাহ— | | | | | |
| | ক. ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন | ৫৫১৪ মি. | ২৯৬৮৯০৬.০০ | * | | |
| | খ. জল সরবরাহের স্থায়ী স্তম্ভ | ৩৩৯ টি | ৪৫৬৬৩৩.০০ | ২৭০টি | ২১০৯২৫.০০ | ২১০৯২৫.০০ |
| | গ. নলকূপ | ৩৬টি | ২০৪০৬১১.০০ | ১০টি | ৯৬৯৯৮.০০ | ৪৬৩১০.০০ |
| ২ | রাস্তা— | | | | | |
| | ক. পিচ রাস্তা | ৮৪৭২৯ মি. | ১৬১৫৮৮৩০.৫০ | ১৮৯৯৪.৯৭ মি. | ৫২০৫১৪২.০০ | ৪৩১৩৪৬৮.০০ |
| | খ. সিমেন্ট ঢালাই রাস্তা | ২৩৬১৪ মি. | ৫৪৭৮৮৬৮.০০ | ১৫৪১৮.৪৭ মি. | ৩৭৭১৮২৫.০০ | ৩৬৪৭১৮২.০০ |
| | গ. ইট বিছানো রাস্তা | ১৭৯১১ মি. | ২৫৭৬০৩৭.০০ | ৭৪৮৭.১২ মি. | ১১৮৭৯২১.০০ | ১১৮৭৯২১.০০ |
| | ঘ. গার্ড ওয়াল | ৪৩৭৭.৮০ মি. | ১০৭০৩১৬৫.০০ | ২১০০.৯৩ মি. | ৪৮০৩৪০০.০০ | ৪৭৫৩৩৮৬.০০ |
| ৩ | পয়ঃপ্রণালী | ২৬৪২২.০০ মি. | ২৪৬২৭৫৪৩.০০ | ৪৮৮৩.০৪ মি. | ৫১১৫৭৯১.০০ | ৪৪৮৪৯৭৫.০০ |
| ৪ | রাস্তার আলো | ২১২৭টি | ২৫৪৩২৬৩.০০ | ৬৮০টি | ৬১৩৫০৭.০০ | ৫৫৮২০৩.০০ |
| ৫ | গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ | ১৯৯টি | ৪১২৬২৪৮.০০ | ৬৬টি | ১৫১০০৩২ ০০ | ১৪৮৯৭০৩.০০ |
| ৬ | বিদ্যালয়কে সাহায্য | ৭০টি | ২৮৫৪৬৭৬.০০ | * | ১২৬৯১০.০০ | ৩৯৮১২.০০ |
| ৭ | অন্যান্য কাজ | | ১৭১৩৬৬৮৯.৭০ | * | ৫৫৮১২৪৩.০০ | ৫২৭২০২৩.০০ |
| | মোট | | ৯১৬৭১৪৪০.২০ | | ২৮২২৩৬৯৪.০০ | ২৬০০৩৯০৮.০০ |

* কাজ চলছে

তারিখ-০৩/০৭/২০০১

কালী ভাণ্ডারী
পৌর প্রধান
মহেশতলা পৌরসভা

## অনুকৃতি

*সম্পাদনা : উদয়নারায়ণ সিংহ* ৬৫.০০

অনুবাদ কর্মশালায় জাত এই সংকলনটি কবিতাপ্রেমী পাঠকদের উপহার দেবে সাম্প্রতিক মৈথিলী কবিতার অনবদ্য বর্ণিল জগৎ।

## আধুনিক কন্নড় কবিতা

*সম্পাদনা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়* ৬০.০০

## শ্রীরাধা

*রমাকান্ত রথ। অনুবাদ : কালীপদ কোঙার* ৪০.০০

এই গ্রন্থের সব কবিতার উপজীব্য রাধা। পুরাণ কিংবা কিংবদন্তীতে প্রসিদ্ধলাভ না-করা এক রাধা আর না-দেখা, চিত্রকল্প আর অননুকরণীয় কল্পনা দিয়ে কবি যাঁকে গড়ে তুলেছেন।

## স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা

*সংকলন ও সম্পাদনা : অনুরাধা রায়* ১৫০.০০

## সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন

*অনুবাদ ও সম্পাদনা : সুহৃদকুমার ভৌমিক* ১১০.০০

## শব্দের আকাশ ও অন্যান্য কবিতা

*সীতাকান্ত মহাপাত্র। অনুবাদ : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়* ৪০.০০

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ শব্দের আকাশ থেকে এই সংকলনের অধিকাংশ কবিতা চয়িত বিষয় যার জীবনদর্শন, ইতিহাস, পুরাণ।

## বাংলা থিয়েটারের গান

*সংকলন ও সম্পাদনা : দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়* ৫০.০০

## কবীর বীজক ও অন্যান্য কবিতা

*সংকলন ও অনুবাদ : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়* ৮০.০০

---

সাহিত্য অকাদেমি

জীবনতারা, ২৩এ/৪৪ একস্, ডায়মণ্ড হারবার রোড

কলকাতা ৭০০০৫৩, দূরভাষ ৪৭৮১৮০৬

প্রাপ্তিস্থান ।। অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, ঊষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

# আসুন গড়ি এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং সুন্দর কলকাতা

কলকাতা—আশা আর আনন্দের নগর,
যেখানে স্বপ্ন প্রাণ পায়

কলকাতা—এক কোটিরও বেশি মানুষের
যেখানে বসবাস

কলকাতা—তিনশো বছরেরও বেশি পুরোনো
ইতিহাস যেখানে প্রাণ স্পন্দন

কলকাতা—শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে
দেশ, কালের সীমানা নেই

কলকাতা আমাদের আশা
আমাদের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে

## গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

ICA 3806/2001

# পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ২০০১
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮
১-৩ সংখ্যা ৭১ বর্ষ

প্রবন্ধ



স্মৃতি-আলেখ্য



রম্যরচনা



গল্প

প্রচ্ছদ ঃ দীপ্ত দাশগুপ্ত




সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# ত্রিবেণী সংগম

## অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যখন ১৯৩৫-৩৬ সালে কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম ছিলুম তখন একদিন ট্রেনে একই কামরায় ভ্রমণ করি সেকালের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কবীরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বুলবুল পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, আমি পড়েছি। আপনার মতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হতে আরও পাঁচশো বছর লাগবে। সত্যিই কি এতদিন লাগবে? চলুন আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে। আমার নতুন বাড়ি তিন রকম ধারায় তৈরি হয়েছে। একটা প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ধারা, একটা মধ্যযুগের মুসলমান ধারা, আর একটা আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ধারা। এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী সংগম আমাদের আদর্শ।'

তিনি তাঁর পুত্রদের নামকরণ করেছিলেন হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গির কবীর, শাজাহান কবীর ও আলমগীর কবীর। দেশ যখন ভাগ হয়ে যায় তখন তিনি ছিলেন না। তখন তাঁর পরিবারও দু-ভাগ হয়ে যায়। হুমায়ুন কবীর ও জাহাঙ্গির কবীর থেকে যান স্বাধীন ভারতে। শাজাহান কবীর ও আলমগির কবীর চলে যান পাকিস্তানে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন তো দূরের কথা, কবীর পরিবারের মিলনও বজায় থাকল না।

তবে তাঁর যা আদর্শ সেটাই ছিল ঠিক আদর্শ। একদিন না একদিন সকলে সেটা স্বীকার করবেন। তিনটি ধারার ত্রিবেণী সংগমই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। তার জন্য কে জানে কত কাল লাগবে! পাঁচশো বছরও লাগতে পারে। এখন এক ভাইয়ের বিপদে আর এক ভাই ছুটে যেতে বা ছুটে আসতে পারে না—পাসপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে।

ভারতে যেমন হিন্দু মুসলমান, ইউরোপে তেমনই ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট। ইউরোপেও সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ ভাগ হয়ে যায়, ঝগড়া বেধে যায়। তার থেকে আসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে লোকে চায় সব দল মিলিয়ে ইউরোপের জন্য একটা ইউনিয়ন। সবচেয়ে প্রবল দুই শত্রু ফ্রান্স ও জার্মানি এখন ইউনিয়ন গঠনের জন্য সবচেয়ে তৎপর। একটা ইউনিয়ন গঠন করলে পর সকলের অর্থনৈতিক লাভ হবে। ইউনিয়নে যোগদান করার জন্য একদা কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিও প্রার্থী হয়েছে। তুরস্ক তো মুসলমানদের দেশ। তার বেশির ভাগ অংশ ইউরোপের বাইরে এশিয়াতে অবস্থিত। দু-একটা বিষয়ে তুরস্কের রাজধানী এখনও ইউরোপে আছে। সেই সুবাদে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে বিশেষ ব্যাকুল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তারা ত্যাগ করেছে। তুরস্ক এখন একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ। এই নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা বিতর্কের পর এখন একটা আপস হয়েছে। এ যদি হয় ইউরোপের অবস্থা, তবে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভুটান মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা এই সাতটি দেশ মিলে একটি ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে না কেন?

অর্থনীতি একদিন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই সুদিন যখন আসবে তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনা কার্যকর হবে। আমরা কলকাতায় বসে পেশোয়ারের আঙুর আর সিলেটের কমলালেবু খেতে পারব। তেমনই ওরাও এখান

থেকে ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবে। আশা করি এই সুদিন অবিলম্বে আসবে। তা নইলে পেশোয়ারের আঙুর ও সিলেটের কমলালেবু ক্রেতার অভাবে পচে যাবে।

পার্টিশনের আগে আমি যখন ময়মনসিংহে গেলুম তখন আমার জন্য পেশোয়ার থেকে আঙুর, মোনাকা, পেস্তাবাদাম আসত ডাকের পার্সেল-এ। পার্টিশনের ফলে এখন আর সে রকম সুযোগ আমি পাইনে। সেই সুযোগ আবার আমি পেতে চাই। আজকের দিনে ধর্মের চেয়ে অর্থ আরও প্রভাবশালী। অর্থনীতি চায় এক প্রকার ইউনিয়ন যেমন ইউরোপে তেমনই ভারতীয় উপ-মহাদেশে। এটা একদিন-না-একদিন সম্ভব হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু আমাদের সন্তান সন্ততিরা দেখে যেতে পারবে।

# ধনিকশ্রেণীর বিশ্বায়ন ও মানবদুর্গতি

অমিয়কুমার বাগচী

## মানুষের মঙ্গল কোথায় পৌঁছতে পারে

আজকের দিনে নরনারীর হাতে যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ও সামাজিক প্রবুদ্ধির অসীম সম্পদ জমা হয়েছে, তা দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নারী ও নরের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন সম্ভব। প্রায় প্রতিটি নারী আশি বছরের উপর এবং প্রতিটি পুরুষ ৭৫ র বা তার বেশি আয়ুর অধিকারী হতে পারে। 'শতায়ু হও' এই আশীর্বাদ বহু দেশেই শুধু আর স্বপ্ন থাকছে না। এই দীর্ঘ জীবন অস্বাস্থ্যে দষ্ট হবে না এই প্রতিশ্রুতিও ডাক্তারী-শাস্ত্র দিতে পারে। আমরা সকলেই পরিষ্কার জল ও বাতাসের সুবাস পেতে পারি। আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাষায় সাক্ষর হতে পারি। আজকের প্রযুক্তি দিয়ে অল্প শক্তিচালিত সুষ্ঠু যানবাহন, দূষণমুক্ত কারখানা, সবুজ ঘেরা শহর, শ্যামল-বনলালিত আবহাওয়া দিয়ে মানুষ (এবং মানুষের বহু প্রজাতির) মঙ্গল সাধন সম্ভব।

পৃথিবীর সম্পদ যদি সমভাবে বণ্টিত হয় তা হলে সম্পদের অধিকার নিয়ে মারামারি, কাড়াকাড়ি প্রায় লুপ্ত হতে পারে। সারা পৃথিবীতে আজ যে বহু ঘোষিত ও অঘোষিত যুদ্ধ চলছে তার অবসান হতে পারে। নানা সামাজিক অপরাধ লালনের বীজাণু গোড়াতেই নষ্ট করা যায় যদি শিশু বড় হয় বড়দের স্নেহের মধ্যে, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে, সুচিকিৎসা ও সুশিক্ষায় লালিত হয়ে এবং সেই শিশু যৌবনে উপনীত হলে সে যদি মানুষের উপযোগী কাজে নিযুক্ত হতে পারে। যখন প্রতিটি নারী শিক্ষিত হয়ে সমাজে সম্মানিত স্থান পাবে তখন সে নিজের ইচ্ছা অনুসারে ঠিক করবে যে সে সন্তানের মা হতে চায় কিনা। এই অবস্থায় উপনীত হলে দেখা যাচ্ছে বহু মেয়ে সন্তানধারণ করতে চায় না, এবং যারা চায় তারাও দুটি-তিনটির বেশি সন্তান চায় না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর জনসংখ্যা একটা জায়গায় এসে আর বাড়বে না। আজকের পৃথিবীতে কমবেশি ৬০০ কোটি মানুষের বাস। পৃথিবীর আজকের খাদ্যোৎপাদন ক্ষমতা দিয়ে আরও ৪০০ কোটি মানুষের অন্নসংস্থান সম্ভবপর। পৃথিবীর জনসংখ্যা ১০০০ কোটিতে গিয়ে স্থিতাবস্থা পেলে সেই মানবগোষ্ঠীর সামাজিক প্রবুদ্ধি সম্বল করে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে সকলের ভরণপোষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও শিল্পীমনের স্ফুরণের জন্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আওতায় এসে গেছে। এই রকম স্থিতাবস্থার মধ্যেও কিছু মানুষ আলাদা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ চাইতে পারেন। তাঁদের জন্যে চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ বা আরও দূরান্তরের গ্রহে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে ভারত সন্তানরাও মঙ্গলময় জীবনের আস্বাদ পেতে পারেন। ভারত, পাকিস্তান, চীন, রুশদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাকার রাষ্ট্রের অক্ষৌহিনী প্রমাণ সৈন্যসামন্ত এবং বীভৎস অস্ত্র সম্ভারের প্রয়োজন লুপ্ত হতে পারে। আণবিক অস্ত্রের যে বিশাল পাহাড় আজ সমস্ত মানুষের মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে, সেই পাহাড়কে মহাশূন্যে, পৃথিবী থেকে বহুদূরে—ধরা যাক গ্রহাণুপুঞ্জের কাছাকাছি পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এই পৃথিবীতে নারী যখন পুরুষের মতোই স্বাধীনতা ও সম্মানের অধিকারী হবেন তখন নারীর সংখ্যা সবদেশেই পুরুষদের চেয়ে বেশি হবে, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই মহিলারা পুরুষদের চেয়ে দীর্ঘতর আয়ুর অধিকারী। জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছে গেলে, এবং সাধারণ মানুষের গড় আয়ু আশি বছর বা তারও বেশি হলে কিশোর কিশোরীর তুলনায় ষাটের ওপরের লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু সেই বৃদ্ধরাও স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, তাঁরা সত্তর বৎসর অথবা তার চেয়েও বেশি বয়স অবধি সক্রিয় থাকবেন, এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের শ্রম নিয়োগ করবেন। শ্রম সকলের পক্ষেই হবে অনেকখানি স্বেচ্ছাদত্ত এবং সকলেই সপ্তাহের দুইদিন বা আরও বেশি সময় বিশ্রাম ভোগ করবেন। সেই ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিষ্টান, নাস্তিক, অসমীয়া, বাঙালী, মৈথিলী, মালয়ালি শান্তিতে বাস করবেন, কারণ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভিত্তিক দাঙ্গার জাগতিক ও মানসিক শেকড়গুলোতে আর জল পড়বে না।

## মানুষের মঙ্গলসম্ভাবনা কীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

আমরা যদি চাই যে, আমাদের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনিদের ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমানের চেয়ে ভালো হবে, তা হলে আমি যে স্বপ্নরাঙা পৃথিবীর ছবি অক্ষমভাবে তুলে ধরলাম, তার কাছাকাছি ছবি আমাদের মনোজগতে ভেসে উঠবে। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে এই স্বপ্ন, স্বপ্নই—তার বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা নেই। ধনিকশ্রেণীর বিশ্বায়নের রূপে যে অশুভ শক্তির সমন্বয় গরিব মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্ট করছে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের কল্যাণের স্বপ্নকে মনের মধ্যে জীইয়ে রাখা সত্যিই কষ্টসাধ্য। কিন্তু স্বপ্ন জীইয়ে না রাখতে পারলে মানুষ আণবিক সংহার ও পরিবেশদূষণের শিকার হয়ে এমন এক প্রাণীতে পরিণত হবে যার স্মৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, প্লেটো অ্যারিস্টটল্, বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট, মুহম্মদ, আকবর, কার্ল মার্ক্স, রবীন্দ্রনাথ এসব নামেরও কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের দুর্দশার চেহারাটা বোঝাতে গেলে মহাভারত-প্রমাণ বইয়ের দরকার হবে। কয়েকটা পরিসংখ্যান দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার হবে। সারা পৃথিবীর কমবেশি ৬০০ কোটি লোকের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের Food and Agriculture Organization-এর এক হিসেব অনুযায়ী অন্তত ৮৪ কোটি অপুষ্টির শিকার। অনেকের মতে এই সংখ্যা আরও বেশি : ভারত, বাংলাদেশ মিলিয়েই হয়ত ৭০-৭৫ কোটি লোক পাওয়া যাবে যাদের দুবেলা পেটভরা পুষ্টিকর খাবার জোটে না। আর সাম্প্রতিক এক হিসেবে বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে ২০ কোটি লোক উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী। এই সংখ্যা ১৯৮০ সালে ছিল ৪ কোটি। অর্থাৎ গত কুড়ি বছরে উদ্বাস্তুর সংখ্যা পাঁচগুণ বেড়েছে, আর এই সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনও আশু সম্ভাবনা নেই। ভূতপূর্ব যুগোস্লাভিয়া, সোমালিয়া, কংগো, সুদান, সিয়েরা লিওন, রুয়াণ্ডা ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন), আফগানিস্তান ইত্যাকার দেশ থেকে যাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাঁরা বছরের পর বছর শরণার্থী শিবিরে কাটাচ্ছেন, এবং অপুষ্টিতে, রোগে তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানরা অকালে মৃত্যুবরণ করছেন। আর এই অবস্থায় ধনী দেশগুলো এই শরণার্থীদের মুখের ওপর তাঁদের দেশের দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। চোরাপথে কিছু শরণার্থী সেখানে ঢুকতে গিয়ে সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়ে, চোরাকারবারির ট্রাকে শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে, মার্কিন সেনার গুলিতে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন অথবা জখম হয়ে পুলিশ হেফাজতে দিনযাপন করছেন।

এই সঙ্গে বেড়েছে বিশ্বব্যাপী অপরাধ। বহু যুগ ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকার বড় শহরগুলি অপরাধের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমাদের দেশের বড় শহরগুলিতে যেখানে এক লক্ষের মধ্যে বৎসরে ৩/৪ জন খুনের শিকার হন, শিকাগো, ডেট্রয়েট, লস অ্যাঞ্জেলস্, সাও পাউলো, রিয়ো ডি জেনিরোর মতো শহরে সেখানে প্রতি বৎসর খুনের শিকার হন লাখে ৩০/৪০ জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯০-এর মাঝামাঝি প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে ৬১৯ জন কারারুদ্ধ ছিলেন। তুলনায় বলা যেতে পারে ভারত জাপান থেকে শুরু করে ফ্রান্স, জার্মানি পর্যন্ত দেশে এই সংখ্যাটা ছিল লক্ষে ২৩ থেকে ৯০-এর মধ্যে। কিন্তু রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরে সেই দেশ এখন দুনিয়ার অপরাধ রাজধানী হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ এবং মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধে সেই দেশ ছেয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়েছে পুলিশি তৎপরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার। সেদেশে এখন লক্ষে অন্তত ৬৩০ জন লোক কারাবাস ভোগ করছেন।

প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী রুশ দেশ এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি এককালে স্বাস্থ্য ও গড় আয়ুর উন্নতিতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই দেশগুলির অধিকাংশ দ্রুত অধোগতির জন্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে : রুশ দেশে পুরুষদের গড় আয়ু গত দশ-এগারো বছরে পাঁচ-ছয় বছর কমে গিয়েছে এবং মহিলাদের গড় আয়ু তিন-চার বছর কমেছে। এইড্স, যক্ষ্মা, মাদকদ্রব্যের অপরিমিত ব্যবহার, মানসিক চাপজনিত হৃদ্‌রোগ, মানসিক রোগ এবং নানা ধরনের হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের মতে AIDS-এর প্রকোপ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে সেই দেশে। সেদেশে ইতিমধ্যেই পুরুষদের গড় আয়ু ভারতীয় পুরুষদের গড় আয়ুর নীচে চলে গিয়েছে। ১৯৯৯-এর হিসেবে দেখা যাচ্ছে রুশ দেশে মৃত্যুহার হাজারে ১৪ আর জন্মহার মাত্র আট। অর্থাৎ সেই সাড়ে চৌদ্দ কোটি লোকের দেশে জনসংখ্যা প্রতিবৎসর সাড়ে সাতলক্ষ করে কমে যাচ্ছে। জন্মহার কমে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ এই যে বাবা-মারা তাঁদের সন্তানের কোনও ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে করছে না। কতকগুলি অসৎ নেতার প্ররোচনায় তাঁরা সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে যে সাধের বাজারি অর্থ ব্যবস্থাকে আলিঙ্গন করলেন, সেই অর্থব্যবস্থা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো তাঁদের সমস্ত মঙ্গল সম্ভাবনাকে চূর্ণ করে দিচ্ছে।

ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রী দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থাই শুধু উত্তরোত্তর সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাই নয়, আফ্রিকা মহাদেশের এই বিশাল অংশ জুড়ে অপুষ্টি, যক্ষ্মা, AIDS, যুদ্ধ এবং নিরন্তর হানাহানির দৌরাত্ম্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বহুদেশে গড় আয়ু গত কুড়ি বৎসরে পাঁচ থেকে দশ বৎসর কমে গিয়েছে। সাহারা মরুভূমি ও তার আশপাশের দেশগুলিতে বাস করে চৌষট্টি কোটি মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসী সংখ্যার শতকরা দশ ভাগের মতো লোক। কিন্তু তাদের আয় সমগ্র মানবজাতির আয়ের শতকরা ১ ভাগেরও কম। আর সারা পৃথিবীতে এইড্স্ বা HIV আক্রান্ত লোকের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী। এমনিতেই এইড্স্ বা HIV আক্রান্ত লোকের অধিকাংশের বাস পৃথিবীর গরিব দেশগুলোতে (আমরা ভারতীয়রা যদি মনে করি যে এইড্স্ আমাদের দেশে তেমন ছড়াচ্ছে না, তাহলে আমরা বোকার বেহেস্তে বাস করছি)। ১৯৯৯ সালের এক হিসেবে

দেখা যাচ্ছে যে সে বৎসর যে শিশু জন্মাচ্ছে সিয়েরা লিওন, নাইজার, মালাউই, জিম্বাবোয়ে, উগাণ্ডা, মালি, জাম্বিয়ার মতো দেশে তার গড় আয়ু ২৯ থেকে ৩৪ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ যে গড় আয়ুতে আমাদের দেশের ব্রিটিশ প্রভুরা পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের রেখে গিয়েছিলেন।

## বিশ্বায়নে সাধারণ ভারতীয়র হাল

১৯৯০-এর দশকে— যে দশকে ধনিকশ্রেণীর বিশ্বায়ন প্রচেষ্টার ঘূর্ণীতে আমাদের দেশ আবর্তিত হচ্ছে—ভারতবাসীর অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? সাধারণ মানুষের চেষ্টায়, গণতন্ত্রের চাপে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির কিছুটা সহায়তা পেয়ে শম্বুকগতিতে আমাদের দেশে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাক্ষরতার হার বেড়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার সঙ্গে তাল দিয়ে বেড়েছে, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের অপুষ্টির হার কিছুই কমেনি, সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় কমেছে বই বাড়েনি এবং সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাবোধ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষ কোনও দিন সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল না : তথাকথিত নেহেরুপন্থী সমাজতন্ত্র সোনার পাথর বাটি। গোটা আর্যাবর্তে জমিদার, সামন্ত, উঁচুজাত, পুরুষের প্রাধান্য নেহরুর আমলে, ইন্দিরা গান্ধীর দীর্ঘ শাসনকালে বা রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় কমানোর এতটুকু চেষ্টা হয়নি। কিন্তু শাসকশ্রেণীর নিজেদের স্বতন্ত্র নীতিনির্ধারণের দিকে একটা প্রবণতা ছিল। সেই প্রবণতা খানিকটা সহায়তা লাভ করত সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব থেকে। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল থেকেই শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে উত্তরোত্তর মার্কিনী প্রসাদ লাভ করার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এই স্ববিরোধ সত্ত্বেও কিছুটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে, কিছুটা অধিক উৎপাদনশীল গম ধানের চাষের প্রসারের ফলে, কিছুটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রামীণ বিস্তারের ফলে এবং কিছুটা 'গরিবি হটাও' প্রকল্পসম্পৃক্ত বিনিয়োগ সৃষ্টির ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে মোট জনসমষ্টিতে দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষের অনুপাত বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকের 'আর্থিক সংস্কারের' কৃপায় ভারতের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের অনুপাত কমেনি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই অনুপাত ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। শহরাঞ্চলে অনেকক্ষেত্রে দরিদ্রজনগোষ্ঠীর অনুপাত কমলেও সার্বিকভাবে ১৯৯০-এর দশককে দারিদ্র্যবৃদ্ধির দশক বলে চিহ্নিত করা যায়।

সরকারি পরিসংখ্যান দিয়ে কাদের ঠিক দরিদ্র বলা যাবে আর কাদের বলা যাবে না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যেখানে বিতর্কের অবকাশ নেই তা হল অপুষ্টিদীর্ণ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে। এবং এই অপুষ্টি এবং অপুষ্টিজনিত রোগ-বৃদ্ধির জন্যে সরাসরিভাবে তথাকথিত বৈষয়িক উদারীকরণের নীতিকে দায়ী করা চলে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। এই বৎসর (এবং গত বৎসরও) ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার গুদামে জমা আছে সাড়ে চারকোটি থেকে ৫ কোটি টন গম, চাল এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য। এমনিতেই নানা ধরনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বাধার জন্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে (এক কেরল ছাড়া) গরিব মানুষের অধিকাংশ লোক রেশনব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তার ওপর দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের নানা কায়দাকৌশল করে নরসিংহ রাও সরকার এবং

বাজপেয়ী সরকার গরিব মানুষের আরও বড় অংশকে রেশন ব্যবস্থার ছত্রছায়ার বাইরে ফেলে দিয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকি কমানোর নাম করে চিনি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য রেশনবণ্টিত ভোগ্যসামগ্রীর দাম বাজারের দামের সঙ্গে সমান করে দিয়েছে। অন্যদিকে আমদানি কৃষিপণ্যের ওপর বাধা নিষেধ তুলে নেওয়ার জন্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তুলো, ধান ইত্যাদি ফসলের চাষীরা এত কম দাম পেয়েছেন যে বেশ কিছু চাষী ইতিমধ্যেই চাষের খরচ জোগাতে না পেরে এবং তজ্জনিত ঋণশোধ দিতে অপারগ হওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। গুদামজাত খাদ্যশস্য গরিবের মাঝে বণ্টন করার, এবং সরকারি খাতে কৃষিপণ্য ক্রয়ের ও সঞ্চয়ের খরচ তুলে আনার উপায় হচ্ছে সারা দেশে রেশনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসংস্থানের প্রকল্পকে জোরদার করা। কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগ উদারনীতির পরিপন্থী বলে কেন্দ্রীয় সরকার সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। উল্টে অদ্ভুত যুক্তি ব্যবহার করে ভরতুকি দিয়ে গুদামজাত খাদ্যশস্য বিদেশের বাজারে বিক্রির হুকুম দিয়েছে। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর এতৎপ্রকার বুদ্ধি কবিগুরুর কল্পনাতেও আসত কিনা সন্দেহ।

কেন্দ্রে যখন নতুন আর্থিক নীতি প্রবর্তিত হল, তখন দাবি করা হয়েছিল যে আর্থিক প্রগতির হার অনেক বেড়ে যাবে : আমাদের তথাকথিত 'হিন্দু' হারে অগ্রগতির জায়গায় মাথাপিছু প্রতি বৎসর আয় বাড়বে বৎসরে শতকরা ৬-৮ হারে। প্রথমেই তা ধাক্কা খেল, ১৯৯১-৯২-তে শিল্পে দারুণ মন্দা দেখা দিল। তার পরের বছরে মনে হল শিল্প গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধির হার প্রায় প্রতি বৎসর কমে যাচ্ছে, আর একেবারে সাম্প্রতিক কালে সেই হার শূন্যেরও নীচে নেমে গেছে। আবার কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনবৃদ্ধির হার ১৯৯০-এর দশকে ছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের যে কোনও দশকের চেয়ে কম। তৎসত্ত্বেও সরকার যে দেখিয়ে যাচ্ছে যে বৎসরে শতকরা ৫ থেকে ৬ হারে, তার ভিত্তি কী? তার ভিত্তি হচ্ছে তথাকথিত পরিষেবা-ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি। এর মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যবহৃত সফ্‌ট্‌ওয়্যারের অগ্রগতির হার ২০০০ সালের শেষ পর্যন্ত বেশ চড়া হারে ছিল। এবং সেই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আয়ও ছিল অন্য ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সফ্‌ট্‌ওয়্যার-জাত আয় জাতীয় আয়ের শতকরা একভাগের বেশি পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। আর এবছরের শুরু থেকেই সেখানে তীব্রভাবে মন্দা দেখা দিয়েছে। পরিষেবার ক্ষেত্রে বাকি থাকে ব্যাংক, মহাজনী কারবার, প্রচার ও তথ্যসঞ্চালন মাধ্যম, পরিবহণ ব্যবস্থা। এসবের মধ্যে ফিন্যান্স অর্থাৎ মহাজনী কারবারের কিছুদিন বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল, ফাটকাবাজদের মুনাফা অনেক বেড়েছিল, কিন্তু হর্ষদ মেটা, ভূপেন দালাল, কেতন পারেখ, দীনেশ গোয়েঙ্কারা সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক বা ইউনিট ট্রাস্টের কর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসে শুধু যে নিজেদের ধন খুইয়েছে তাই নয়, বহু মধ্যবিত্তের সর্বনাশ করেছে।

পরিষেবা ক্ষেত্রে আয়ের বাকি অংশ হল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পোৎপাদন, পরিবহণ, খুচরো ব্যবসা, রাস্তার ট্রেনের ফেরিওয়ালা। এদের আয়ের হিসাব অনেকখানিই মনগড়া। যেমন যেমন লোকসংখ্যা বাড়ে, সংগঠিত ক্ষেত্রে যেটুকু কর্মসংস্থান হয়, আর যে সংখ্যক লোক সরকারি পরিসংখ্যানে বেকার বলে দেখানো যায়, তাদের বাদ দিয়ে বাকি সব লোককেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ধরে নেওয়া হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে তারা ভাগ্যবান কতিপয়ের মতোই রোজগার করছে। অনাহার-ক্লিষ্ট তাঁতী, শীর্ণ রিক্‌শওয়ালা, আধপেটা খাওয়া কারখানার

মিস্ত্রির জায়গা আয়ের সরকারি পরিসংখ্যানের মধ্যে নেই। তাদের আয় স্ফীত করে দেখিয়ে আমরা 'হিন্দু' শ্লথগতির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি দেখানো হয়। এই কারচুপিতে কর্তাদের মন ভরলেও কোটি কোটি ভুখা ভারতবাসীর পেট ভরে না।

ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ (বলা যায় জনসংখ্যার সিংহভাগ) জুড়ে জমিদারি ও জাতপাতের অত্যাচার সাধারণ মানুষকে নিপীড়িত করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সেই নিপীড়নের শিকার হচ্ছে মেয়েরা। কন্যাভ্রূণহত্যা সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে। সেই ভ্রূণহত্যা পাঞ্জাবে এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে শিখ জাঠেদারদের আলাদা করে ফতোয়া দিতে হচ্ছে যে ভ্রূণহত্যার দায়ে পাপীকে শিখসমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু পাশাপাশি পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশে এক জাতির মেয়ে আর এক জাতির ছেলেকে বিয়ে করলে তাদের বাড়ির লোকেরাই বহুক্ষেত্রে তাদের খুন করছে। শিখ সমাজে বিখ্যাত নেত্রী বিবি জাগির কাউর তাঁর অমতে তাঁর কন্যা বিয়ে করার অপরাধে তাকে হত্যা করিয়েছেন এই অভিযোগে তিনি আদালতের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তার সঙ্গে চলছে ধর্ষণ, বধূহত্যা, রাস্তাঘাটে মেয়েদের অসম্মান ও লাঞ্ছনা। একদিকে জমিদারিপ্রথা লোপ, অন্যদিকে মেয়েদের শিক্ষা, সম্পত্তি ও উপার্জনের ক্ষেত্রে সমান অধিকার সমাজে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান ঘটবে না।

সারা বিশ্বে এই বিকৃত বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে মানুষের শুভবুদ্ধি অনেকখানি মানবাধিকার রক্ষা করতে পারে তার উদাহরণ স্বদেশ এবং বিদেশ দুই ক্ষেত্রেই আছে। আমি শুধু দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করব। কেরল ভারতের অঙ্গরাজ্য। মাথাপিছু গড় আয়ের দিক থেকে কেরল ভারতের অনেক রাজ্যের পিছনে পড়ে আছে : পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এসব রাজ্যেই মাথাপিছু গড় আয় কেরলের চেয়ে বেশি (তার মানে এ নয় যে সেখানে সাধারণ মানুষের আয় বেশি : তার মানে এই যে সেখানে অনেক বড়লোক আছে, এবং তাদের মধ্যে কেরলের বড়লোকদের চেয়ে বেশি বড়লোক অনেক আছে)। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গড় আয়ু সবদিক থেকে কেরলের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষের সব অঙ্গরাজ্যের ওপরে বিরাজ করছে। কেরলের এই শ্লাঘ্য অবস্থার পিছনে বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি ক্রিয়মাণ। কিন্তু তার পিছনের দুটো প্রধান কারণ এই যে, উঁচুজাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীনারায়ণ গুরু এবং অন্যান্য সমাজবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত নিচুজাতের লোকেরা দাঁড়াতে পেরেছিল। এর সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর কালে যোগ হয়েছে কেরলের শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে কেরলে জমিদারি প্রথা লোপ পেয়েছে, এবং সাধারণ মানুষ সরকারি সহায়তায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিষেবার সমান সুযোগ পেয়েছে। মেয়েরাও প্রায় পুরুষদের সমান শিক্ষা পাওয়াতে সমাজে তাদের স্থান উন্নীত হয়েছে (যদিও কেরলেও এখন মেয়েপুরুষের সামাজিক অবস্থানে অনেক ফারাক থেকে গিয়েছে)। এসবের ফলে শিশুমৃত্যুর হার ভারতের অন্য সব অঞ্চলের তুলনায় নেমে গিয়েছে, সূতিকাগৃহে মায়ের মৃত্যুর হারও অনেক কমে গিয়েছে এবং মায়েরা ও বাবারা সুস্থ শিক্ষিত সন্তান-পালনের আশ্বাস পাওয়াতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন এবং সেই জন্মহারও এখন তথাকথিত উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ে নেমে গিয়েছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ কিউবা। কিউবার সমাজতন্ত্রকে নিঃশেষ করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্মমুহূর্ত থেকেই অর্থাৎ চল্লিশ বছরের ওপর সবরকম

প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পতনের পর কিউবার ওপর মার্কিনী আগ্রাসন আরও হিংস্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর সর্বৈব স্তরে আর্থিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানবউন্নয়নের সমস্ত সূচকের দিক থেকে লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানের সবদেশের শীর্ষে রয়েছে। শিশুমৃত্যুর হার, গড় আয়ু, শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার হারে কিউবার অবস্থান উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এই জায়গায় কিউবা পৌঁছেছে প্রচণ্ড বাধার মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে।

সারা পৃথিবীতে আজ যে প্রায় দুর্লংঘ্য আর্থিক সংকট নেমে এসেছে তার জন্যে প্রধানত দায়ী কয়েকটি ধনী দেশ, সেদেশের মাটিতে গড়ে ওঠা বহুজাতিক ব্যাংক ও অন্য ব্যবসায় সংস্থা এবং তাদের অনুগত তৃতীয় বিশ্বের ধনিকশ্রেণীর বড় অংশ। বিশ্ববাণিজ্যসংস্থার ফতোয়া মেনে যে সারা বিশ্বে গরিব চাষী, কারিগর ও কারখানা-শ্রমিকের রুজি ধ্বংস করা হচ্ছে শুধু তাই নয়, বহু পুরোনো ও নতুন প্রযুক্তির ওপর বিশ বছরের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে তথাকথিত মেধাস্বত্ব আইনে। এই আইনের বলেই বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলো ও মার্কিন সরকার থাইল্যাণ্ড, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে এইড্সের ভয়াবহ ফল বিলম্বিত করে এরকম ওষুধ ঐ পেটেন্টের মালিক কোম্পানি ছাড়া অন্য কেউ বিক্রি করতে পারবে না সেই ফতোয়া জারি করেছিল। কিন্তু কিউবা, আমাদের দেশের সিপ্লা কোম্পানি একই ওষুধ বহুজাতিকদের পেটেন্টের ওষুধের এক-চতুর্থাংশ দামে বিক্রি করতে পারে। মানুষের জীবনের দামের সঙ্গে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির লাভের লড়াই আজও চলছে। সমস্ত পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধনিক-তোষক বিশ্বায়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকেও আটকে রাখছে, এটাই প্রকৃত অবস্থা। ধনিকশ্রেণীর বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এখন সারা বিশ্বে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীয়াট্ল্, ক্যানাডার ক্যুবেক, চেক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী প্রাহা, থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক, সুইজারল্যাণ্ডের দাভোস (যেখানে সবচেয়ে বড় বহুজাতিকরা বিশ্ব আর্থিক সম্মেলন করে এবং যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী নিমন্ত্রিত হয়ে কৃতার্থ বোধ করেন) এবং ইতালির জেনোয়া শহরে সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে এবং ক্রমশ লক্ষে লক্ষে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে মেক্সিকোতে চিয়াপাস প্রদেশকে ঘাঁটি করে জাপাতিস্তাদের আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র শ্রমিকরা বহুক্ষেত্রে এককাট্টা হয়ে তাঁদের সরকারের জনবিরোধী, মার্কিনতোষণ নীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন। আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষক পোড়খাওয়া মধ্যবিত্তের সংগ্রাম সেই বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধের অংশ। ভারতবর্ষের প্রতিরোধ ব্যতিক্রম নয়, পশ্চাদমুখী নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের কুসংস্কার-পোষণ এবং পিছন দিকে হেঁটে জনগণকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টাই বিজ্ঞান ও মানববিকাশের অগ্রগতির প্রচণ্ড অন্তরায়।

# প্রয়োগের নিরিখে : পরশুরাম আর বাখতিন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর নাম বাঙালি পাঠক-পাঠিকার অচেনা নয়। তাঁর বেশ কিছু বই ও লম্বা প্রবন্ধ রুশ থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ হয়েছে (এখনও অবধি বাঙালির কাছে ইংরিজিই জগতের জানলা)। গত কয়েক বছরে তাঁকে নিয়ে বাঙলাতেও ছোটো বড় বই, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি বেরিয়েছে।

যাঁদের নিয়ে বাখতিন লিখেছিলেন—ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি ও অন্যান্য ইওরোপীয় লেখক—তাঁদের কেউ কেউ আমাদের চেনা, কিন্তু ভালোমতো জানা নন। এমনকি ফরাসি বা রুশ সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন, মূলেই পড়ে থাকেন, তাঁদের সকলেই যে ঐসব লেখকের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—এমনও বলা যায় না। এছাড়া ধ্রুপদী ও মধ্যযুগীয় লাতিন কাব্যও বাখতিন-এর আলোচনায় আসে। সে তো আরও অকূল পাথার। ইংরিজি তর্জমায় একবার বা দুবার এঁদের কিছু রচনা হয়তো অনেকেরই পড়া। কিন্তু তার ভিত্তিতে কোনো সমালোচনার মূল্য যাচাই করা যায় না (কোনো কোনো পণ্ডিত দেখি অকুতোভয়ে তা-ও করেন!)।

তবে বিবরণতত্ত্ব, narratology-র সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়, যে-কোনো ভাষার সাহিত্যপাঠকের পক্ষে বিচার করা সম্ভব। সেটি হলো বাখতিন-এর বহুস্বর (Polyphony)-তত্ত্ব।[১] গল্পে-উপন্যাসে অনেক চরিত্র আসে, তাদের মধ্যে নানা মত-অমত দেখা যায়। বাখতিন চান : প্রতিটি চরিত্রই তার নিজের মতো কথা বলুক, কোনো চরিত্রর ভিতর দিয়েই যেন লেখকের ভাবনা ফুটে না বেরয়। এরই দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছেন দস্তয়েভ্স্কি, যিনি এই রীতির সার্থক রূপকার। তাঁর চরিত্ররা স্রষ্টার নিজের ছাঁচে ঢালা নয়।

এর ঠিক উল্টো পিঠে থাকেন তলস্তয়। বাখতিন মনে করেন : তাঁর গল্পে-উপন্যাসে সবার গলা ছাপিয়ে একটি গলাই শোনা যায়। সেটি লেখকের নিজের। দস্তয়েভ্স্কি সে-দিক থেকে আদর্শ হরবোলা।

বাখতিন যে বহুস্বর-এর কথা বলেছেন তা মূলত কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে। নাটকে তো লেখকের সশরীরে হাজির হওয়ার সুযোগ থাকে না। সেখানে প্রতিটি চরিত্রই নিজের স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলবে—এমনই আশা করা যায়। গল্প-উপন্যাসের লেখক কিন্তু ইচ্ছে করলেই নিজেও মতামত জানাতে পারেন—নিজের কথায় বা কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে।

তবু নাটকের ক্ষেত্রেও একস্বর-বহুস্বর-এর তফাত করা যায়। শেক্স্পিয়র-কে যদি বহুস্বর-এর শিল্পী বলে ধরা হয় (চের্নিশেভ্স্কি তেমনই ধরেছিলেন—বাখতিনও বারবার তাঁর কথা তোলেন)[২], বার্নার্ড শ-কে ধরা যায় একস্বর-এর প্রবক্তা বলে (শ-এর কথা অবশ্য এ প্রসঙ্গে বাখতিন একবারও বলেন নি)। তাঁর নাটকে প্রায়ই একটি চরিত্র থাকে যার বকলমে শ তাঁর নিজের মত প্রচার করেন, নিজেরই পছন্দ-অপছন্দ জানান।

কথাগুলো নতুন নয়। শেক্স্পিয়র-এর ক্ষেত্রে কীট্স্-ও লক্ষ্য করেছিলেন এক নঞর্থক

ক্ষমতা (negative capability)। একই সঙ্গে খলনায়ক ইআগো আর সচ্চরিত্রতার প্রতিমূর্তি ইমোজেন-কে তিনি হাজির করতেন সমান বিষয়নিষ্ঠ (objective) ভাবে, নিজে তাদের কোনোটাই না-হয়ে।[৩]

লেখকের নিজের মতামত যত চাপা থাকে ততই ভালো, ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকেই সেগুলো বেরিয়ে আসুক—এমনই চেয়েছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্।[৪] নাটকের মতো উপন্যাসেও যে বহুস্বর থাকে, তার সবকটিই যে লেখকের নিজের নয়—এ তো স্বতঃসিদ্ধ। প্রশ্ন হলো : লেখকের গলা না-শুনতে পাওয়াই কি কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় গুণ, বা তার বিচারের প্রথম/প্রধান শর্ত?

এই প্রশ্নটিই আমরা পরখ করে দেখতে চাই অন্য এক লেখকের ক্ষেত্রে যাঁর নামও বাখতিন জীবনে শোনেন নি। তিনি পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০)। যাঁরা মনে করেন তত্ত্বের মূল্য তত্ত্ব হিসেবেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা মিলল কিনা সে-খবর না-জানলেও চলে, তাঁরা যদি এই আলোচনাটি আর না-পড়েন তাহলে অখুশি হব না। একটা তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে, তার সপক্ষে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার বাইরে তত্ত্বটি আর কোথাও খাটে কিনা—সেটাও তো যাচাই করা চাই। যদি এমন হয় যে, অন্যান্য লেখকের বেলায়ও তত্ত্বটি খাপ খাচ্ছে, তবেই বলা যায় : হ্যাঁ, তত্ত্বটির মধ্যে অন্তত কিছু সারবস্তু আছে।

পরশুরামের গল্পের ক্ষেত্রে, বহুস্বর-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে বাখতিন সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা কাটানো দরকার। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্য-সমালোচনায় সঙ্গীতের জগৎ থেকে 'পলিফোনি' শব্দটি বাখতিনই প্রথম আমদানি করেন। আদৌ ঠিক নয় কথাটা। উনিশ শতকেই Polyphoner Dialog (বহুস্বর সংলাপ) শব্দদুটি লিখেছিলেন অটো লুডভিগ। ভি. কোমারোভিচ যে বহুস্বর সঙ্গীতের সঙ্গে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের শিল্পগত সমগ্রতার তুলনা করেছিলেন—তার উল্লেখ করেছেন বাখতিন নিজেই। 'কাউন্টারপয়েন্ট' বলতে লেওনিড গ্রোসমান-ও একই ব্যাপার বুঝিয়েছেন।[৫]

দ্বিতীয় কথা, বাখতিন-এর এই তত্ত্বটিকে নামান্তরে ডায়ালজিক (dialogic) বলা হয়।[৬] এটিও অভিনব নয়, তাঁর আগেই কথাটি ব্যবহার করেছেন অটো লুডভিগ। ইংরিজিতে 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' নাম দিয়ে বাখতিন-এর একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলন বেরিয়েছে (১৯৮১)।[৭] রনে ওয়েলেক দাবি করেছেন : বাখতিন-এর নিজের লেখায় কোথাও 'ডায়ালজিক' আর 'ইম্যাজিনেশন' শব্দদুটি পাশাপাশি বসেনি। 'কল্পনা' কথাটাই তাঁর বইটিতে সর্বসাকুল্যে একবার মাত্র এসেছে।[৮] বাখতিন-এর মৃত্যুর পর তাঁর অনেককটি প্রবন্ধ জড়ো করে *সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের প্রশ্নাবলি* নামে একটি রুশ সঙ্কলন বেরিয়েছিল। তার থেকে চারটি প্রবন্ধ বেছে নিয়ে ইংরিজি তর্জমা করা হয়েছে, আর সঙ্কলনটির নাম দেওয়া হয়েছে *ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন*। এই নামকরণের দায়িত্ব বাখতিন-এর নয়, অনুবাদক মাইকেল হলকুইস্ট আর কারিল এমারসন-এর (যদিও বিস্তর লোক মনে করেন ঐ আখ্যাটি বাখতিন-এরই কপিরাইট)।[৯]

তৃতীয় কথা, বাখতিন-এর বহুস্বর-তত্ত্ব কি দস্তয়েভ্স্কির কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও খাপ খায়? যাঁরা বেশ খুঁটিয়ে দস্তয়েভ্স্কি পড়েছেন তাঁদের কেউ কেউ কিন্তু মনে করেন : শেক্স্পিয়র-এর নাটকের মতোই, দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসেও শুধু অন্যদের গলাই শোনা যায় না, লোকের মতামতও দিব্যি ধরা পড়ে।[১০] শেক্স্পিয়র যে ইআগো-র পক্ষে নন, তাঁর সহানুভূতি

ডেসডিমোনা-র দিকে—অন্তরে কালা না-হলে যে কেউই তা বোঝেন।

শেষ কথা, চের্নিশেভ্স্কি-র মত নিয়ে আলোচনার সময়ে বাখতিন নিজেই বলেছেন : লেখকের কোনো অবস্থান ছাড়াই উপন্যাস হয়—চের্নিশেভ্স্কি কখনোই এমন ভাবেন নি। *'সাধারণভাবে এমন উপন্যাস অসম্ভব।'*[১১] এই প্রসঙ্গে ভিনোগ্রাদোভ-এর একটি উক্তি তিনি সমর্থন করেছেন : উপন্যাসের গড়ন যতই বিষয়মুখী (objective) হোক না কেন, তার সবই আসলে লেখকের বিম্ব (image) গড়ারই এক বিশেষ, কিন্তু সহযুক্ত (correlative) নীতি। বাখতিন লিখেছেন : লেখকের কোনো অবস্থান নেই—এমন নয়, *তাতে এক আমূল পরিবর্তনই হলো আসল কথা।*[১২] গ্যয়টের প্রমিথিউস-এর মতো দস্তয়েভ্স্কি কিছু বোবা দাস সৃষ্টি করেন না (যেমন করেন জিউস), তাঁর সব চরিত্রই *স্বাধীন* মানুষ, তাদের স্রষ্টার *পাশে* তারা দাঁড়াতে পারে, তাঁর সঙ্গে একমত না-হতে পারে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে[১৩]—বাখতিন-এর এইসব কথাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়, চের্নিশেভ্স্কি-র মত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি ততটাই চাপা পড়ে যায়।

তলস্তয়-দস্তয়েভ্স্কির প্রতিতুলনা (আর কোনো দিক দিয়ে নয়, শুধু একস্বর-বহুস্বর-এর নিরিখে) মেনে নিলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হলো : বহুস্বর থাকলেই কি শিল্পকর্মটি আরও ভালো উতরোয়? স্রেফ ডায়ালজিক হওয়ার দৌলতে, দস্তয়েভ্স্কি কি মোনোলজিক তলস্তয়-এর চেয়ে সফল লেখক? বাখতিন নিজেও বোধহয় স্পষ্ট করে সে-কথা বলতে দ্বিধা বোধ করতেন। তবে তাঁর গোটা বইটি জুড়ে এমন একটি ধারণাই লুকোচুরি খেলে। ১৯৫৪-তেই পার্সি লাবক বলেছিলেন উপন্যাস লেখার দুটি পদ্ধতির কথা : নাটকের মতো করে আর ছবির মতো করে।[১৪] দস্তয়েভ্স্কি আর তলস্তয়কে এমন দুটি ধারার প্রতিনিধি বলে মানতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ দু-এর মধ্যে তারতম্য করে, বহুস্বর-কে 'আরও ভালো' বলতে চাইলে আপত্তি উঠবে। বহুস্বর থাকলেই যে গল্প উতরোয় না, বরং লেখকের গলা বলে কিছু না-থাকায় গল্প ঝুলে যায়—পরশুরামের রাজনীতিক গল্পগুলি তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এবার সেই আলোচনায় যাওয়া যাক। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে বাখতিন-কে টানায়, আশা করি, কোনো আপত্তি উঠবে না। তলস্তয়-এর একটি ছোটো গল্প, "তিনটি মৃত্যু" নিয়ে বাখতিন নিজেই লম্বা আলোচনা করেছেন।[১৫]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে মোট তেরোটি গল্প লিখেছিলেন পরশুরাম।[১৬] প্রতিটি গল্পই চরিত্রবহুল, সংলাপপ্রধান আর—পরিণতিহীন। স্বদেশ তথা বিশ্বের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি, শান্তির সম্ভাব্য উপায় ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা আসে। চরিত্রদের একে অন্যকে দোষ দেন, উদ্ভট সব পরিকল্পনা হাজির করা হয়। সেগুলো সবই চরিত্রদের পক্ষে মানানসই। হনুমান যেমন পরামর্শ দেন : দেশনেতারা খালি হাতে মারপিট করে হারজিত ঠিক করুন, সেনা দিয়ে লড়ে নয়। ভার্গব পরশুরাম ভাবেন : আবার কুঠার দিয়ে পৃথিবীকে—শুধু নিঃক্ষত্রিয় নয়, যাবতীয় পাপী, অকর্মণ্য ও দুর্বলদের তিনিই খতম করবেন ("গন্ধমাদন-বৈঠক")। কিন্তু কোনো ফয়সালা হয় না। ব্রহ্মা, আল্লা ও গড্-এর সঙ্গে শয়তান কোনো চুক্তিতে আসতে পারে না ("তিন বিধাতা")। গল্পগুলো যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, শেষ হয় সেখানেই এসে। দাবাখেলার পরিভাষায় যাকে বলে, 'ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান', প্রথম ঘরে ফিরে যাওয়া। গল্পের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে কিছু অসাধারণ

সংলাপ, আর কিছু নয়।

এমন হয় কেন? কারণ একটাই : সমস্যাগুলো লেখক জানেন, কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট মত নেই। কংগ্রেসি ও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা—সবকিছুরই তিনি সমালোচক। কিন্তু কানাগলি থেকে বেরনোর পথ তাঁর জানা নেই। অন্যকথায়, তাঁর নিজের কিছুই বলার নেই।

বহুস্বর সৃষ্টির জন্যে পরশুরাম বিচিত্র সব জমায়েতের আয়োজন করেছিলেন : সর্বজাতীয় সম্মেলন ("গামানুষ জাতির কথা"), সাত চিরজীবীর বৈঠক ("গন্ধমাদন বৈঠক"), পার্কের আড্ডা ("শোনা কথা"), প্রেতচক্র ("রামরাজ্য"), ঘরোয়া আলাপ ("সিদ্ধিনাথের প্রলাপ"), শীর্ষসম্মেলন ("তিন বিধাতা"), ইত্যাদি। লৌকিক-অলৌকিক, মানুষ অতিমানুষ, ঈশ্বর-শয়তান—কিছুই বাদ পড়ে নি। এত বৈচিত্র্যেও খুশি না-হয়ে তিনি দুটি খ্যাপার কথাও শুনিয়েছেন : অধ্যাপক সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্য আর ডঃ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী ("সাড়ে সাত লাখ")।

কিন্তু শেষরক্ষা কিছুতেই হয় না। প্রতিটি গল্পই শেষ হয় বক্তব্যহীন এক শূন্যতায়। অনেকে অনেক প্রস্তাব দেন, কিন্তু কোনোটাই মানার যোগ্য বলে গণ্য হয় না। 'ক'-এর কথা কাটেন 'খ', 'খ'-এর কথা কাটা পড়ে 'গ'-এর হাতে—পড়ে থাকে শুধু গোলামচোর। লেখকের নিজের অবস্থান বলতে যেহেতু কিছু নেই (এক নেতিবাদ ছাড়া), গল্পগুলিও তাই পাঠককে কোথাও পৌঁছে দেয় না, বরং ছেড়ে দেয় খোলা মাঠে। যেমন, দূরদর্শনের বিতর্কের বেলায়, তর্কের মীমাংসা হয় না। ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান।

এতেও আপত্তির তত কিছু ছিল না—যদি গল্পগুলো উতরোত। তাও তো হয় না। আসলে সমস্যাপ্রধান গল্প-উপন্যাস-নাটক থেকে যদি পরিষ্কার একটি মত বেরিয়ে না-আসে—সে-মত পাঠকের পছন্দ হোক আর না হোক তবে সংলাপ আর চরিত্রর চমক দিয়ে সে-ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

বহুস্বর তো পরশুরামের গোড়ার দিকের অনেক গল্পেই ছিল। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় কত গলাই তো শোনা যায়। কেমন উদ্ভট সব গল্প বলা হয় সেখানে! পরশুরাম বাইরে থেকে তার বিবরণ দেন, কিন্তু নিজেও অপ্রকাশ্যে হাজির থাকেন বিনোদ উকিলের মধ্যে।[১৭] অলৌকিক গল্পর শেষে সেই অলৌকিক নিয়ে ঠাট্টাও করা হয় "দক্ষিণরায়"-এর ফ্রেম গল্পে। বহুস্বরের মধ্যে লেখকের গোপন স্বরই গল্পটিকে সংহত রূপ দেয়। তাঁর পক্ষপাত যে অলৌকিকের দিকে নয়, লৌকিকের দিকে—পাঠক সেটি ধরতে পারেন অনায়াসে।

অথবা ভাবুন "মহাবিদ্যা" ও "উলটপুরাণ"-এর কথা। দুটি গল্পেই লেখক কোনোভাবেই হাজির থাকেন না, সর্বজ্ঞ বিবরণদাতা হিসেবেও নয়, কোনো মুখপাত্রস্বরূপ চরিত্রের ভিতরেও নয়। প্রথমটি পুরোপুরি সংলাপের আকারে লেখা, দ্বিতীয়টিতে তার সঙ্গে আছে নানা পত্রপত্রিকার টুকরো খবর ও সম্পাদকীয়র অংশ। অথচ লেখকের মত বলে একটা ব্যাপার আছে বলেই না বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের (ও তার ধামাধরাদের) আসল চেহারাটা অমন স্পষ্ট রঙে-রেখায় ফুটে ওঠে। 'গড্ডলিকা'-'কজ্জলী'-'হনুমানের স্বপ্ন'-র পাশে পরশুরামের পরের পর্বর অনেক গল্পই ম্লান লাগে। অনেক গলা মিলে শুধু কোলাহলই ওঠে, কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে আসে না।

রাজনীতিক গল্প ছেড়ে অন্য দুটি গল্প দেখা যাক : "ভবতোষ ঠাকুর" আর "দীনেশের ভাগ্য"।

"ভবতোষ ঠাকুর"-এ নিখিলবাবুর মধ্যে পুরনো পরশুরামকে চেনা যায়; কিন্তু তিনি এ গল্পের প্রধান কণ্ঠ নন, ভবতোষ ঠাকুর বসে থাকেন অন্য পাল্লায়। "দীনেশের ভাগ্য"-য় শেষ কথা বলেন গোলোকবিহারী, যিনি জীবনকৃষ্ণের মতো চার্বাকপন্থী নন। এঁরা দুজনেই অল্পবিস্তর অজ্ঞবাদী (অ্যাগনস্টিক)। অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি আরও দুটি গলা এখানে শোনা যায়—পরিষ্কার নেতিবাদ নয়, কেমন যেন দ্বিধা। "দক্ষিণরায়" আর "জাবালি"-র সঙ্গে কত তফাত!

তাহলে বাখতিন-এর বহুস্বর-তত্ত্ব পরখ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বহুস্বর থাকা বা না-থাকা কোনো গল্পের আসল গুণ নয়; বরং লেখক নিজে যদি বিভ্রান্ত হন, তবে গল্পও আর দাঁড়ায় না। একস্বরই হোক আর বহুস্বরই হোক, একটি গলাকে প্রধান হতেই হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো লেখকের অভিপ্রায় (intention)-র উলটোটাই দেখা দেয় (যেমন বালজাক-এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছিলেন এমিল জোলা ও এঙ্গেলস)।[১৮] কিন্তু যেটা বেরিয়ে আসে সেটাও একটা নির্দিষ্ট ধারণা, বহুধারণার টানামানিতে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নয়।

বাখতিন ধরে নিয়েছিলেন : কথাসাহিত্য থেকে একাধিক মতামত বেরিয়ে আসবে, লেখকের মতামতও তার মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সেটি (তাঁর নিজের বয়ানে বা কোনো চরিত্রের বকলমে) অন্যদের মতকে ছাপিয়ে যাবে না। দস্তয়েভ্স্কি-র উপন্যাসেই তিনি খুঁজে পেলেন (বা ভাবলেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন) তাঁর এই প্রত্যাশার সার্থক রূপায়ণ।

আসলে, বহুস্বর সঙ্গীতের রূপকটি সাহিত্যে কোনো কাজে দেয় না—বক্তব্যশূন্য আঙ্গিক-সর্বস্বতার সপক্ষে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগান দেওয়াই এর একমাত্র ভূমিকা। সার্থক শব্দ আর সঙ্গীতের স্বর এক ব্যাপার নয়। শব্দ থাকলে অর্থ থাকবেই—পরস্পরবিরোধী অর্থ হলে বাকি সব বাতিল হয়ে একটি পড়ে থাকবে—অথবা সবগুলিই বাতিল হয়ে যাবে।

তাই মনে হয় : বাখতিন-এর বহুস্বরতত্ত্ব-র আদর্শ দৃষ্টান্ত আবোল তাবোল (nonsense)-মার্কা গল্প। লিউইস ক্যারল-এর দুটি অ্যালিস-কাহিনী *(আজব দেশে অ্যালিস* আর *আয়নার মধ্যে দিয়ে)* ও সুকুমার রায়-এর *হ য ব র ল*-র কথা ভাবুন। কত না চরিত্র একের পর এক হাজির হয়—প্রত্যেকেই বাকি সকলের থেকে আলাদা, কারও সঙ্গে কারও ভাবনার মিল নেই। ক্যারল ও সুকুমার রায় কিন্তু সকলকেই সমান গুরুত্ব দেন। তবু এর ভেতর দিয়েই খোঁচা মারা হয় বিচারব্যবস্থাকে,[১৯] খোরাক হয় নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। আবার এ-ও দেখবার : নানা বয়সের নানা পাঠক-পাঠিকা নিজের নিজের মতো করে এই সব বই পড়েন ও বোঝেন : সকলের বোঝা কখনোই এক রকমের হয় না। সব ব্যঙ্গ, সব প্যারডি সকলে ধরতেও পারেন না।[২০]

মুশকিল হলো : তিনটি বই-ই বাচ্চাদের জন্যে লেখা, মজা দেওয়াই সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য।[২১] তার মধ্যেও নিশ্চয়ই বয়স্ক লোকে বিস্তর সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন (ক্যারল নিয়ে নাকি তিনশ'র ওপর ওয়েবসাইট আছে!)। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে : বই তিনটি বক্তব্যপ্রধান নয়, নিছক কৌতুকই সেগুলির শেষ কথা। তার জন্যেই ওগুলি থেকে যে যার মর্জিমাফিক বক্তব্য আবিষ্কার (বা উদ্ভাবন) করতে পারেন। কিন্তু লেখক যেখানে একটি সংহত বক্তব্য হাজির করতে চান সেখানে, হাজার সাবধান হলেও, একটি গলা আর সবার থেকে চড়া হবেই। আর লেখক যদি নিজেই না জানেন তিনি ঠিক কী বলতে চান, তাহলে

পরস্পরবিরোধী কথাগুলো পাশাপাশি সহাবস্থান করবে, কোনো ফয়সালাই হবে না—যেমন হয় না পরশুরামের রাজনীতিক গল্পে।

## টীকা

১. এ বিষয়ে বাখতিন-এর মূল বক্তব্য পাওয়া যাবে দস্তয়েভ্‌স্কি বিষয়ে তাঁর বইটিতে (১৯২৯)। ইংরিজিতে এর দুটি অনুবাদ পাওয়া যায়। আমরা ব্যবহার করেছি *Problems of Dostoevsky's Poetics,* ed. and trans. Caryl Emerson, Manchester : Manchester University Press, 1984। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে একই বছরে এর মার্কিন সংস্করণ বেরিয়েছিল (বইটিকে পরে সংক্ষেপে *PDP* বলে উল্লেখ করা হবে)।

যাঁদের পক্ষে বইটি জোগাড় করা সহজ নয়, তাঁরা Pam Morris (ed.), *The Bakhtin Reader : Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov,* London : Edward Arnold, 1994 দেখতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে Sue Vice, *Introducing Bakhtin,* Manchester : Manchester University Press, 1997-এ। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি নিয়ে চমৎকার লিখেছেন M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms,* Bangalore : Prism Book, 1993, pp. 230-32।

২. *PDP,* pp. 65-67. বাখতিন-এর বইটির প্রথম (১৯২৯) রুশ সংস্করণের এক অনুকূল সমালোচনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি (১৮৭৩-১৯৩৩)-ও শেক্‌স্‌পিয়র ও বালজাক-এর কথা তোলেন। Anatoly Lunacharsky, Dostoyevsky's "Plurality of Voices", *On Literature and Art,* Moscow : Progress Publishers, 1965, pp. 109-115 দ্র.। (১৯৬৭-তে এই প্রবন্ধটি প্রথম পড়ার সময়ে বাখতিন সম্পর্কে অবশ্য কিছুই জানতুম না)। লেখাটির অতি সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ পাওয়া যাবে *এবং এই সময়,* বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪০৩, পৃ. ১-৮-এ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, *PDP*, পৃ. ৪৫ টী ৪২-এ ইংরিজি তর্জমার ১৯৭৩ সংস্করণের উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যেন মনে না করেন ঐটিই তার প্রথম সংস্করণ।

৩. Letter to George and Thomas Keats, 21, 27 (?) December, 1817; Letter to Richard Woodhouse, 27 October 1819. Robert Gittings (ed.), *Letters of John Keats. A Selection,* Oxford : Oxford University Press, 1975, pp. 43, 157-58. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে 'Beyond Negative Capability', *Rabindra Bharati Patrika,* Annual No. 1996-97, pp. 9-18 দ্র.।

৪. Engels to Margaret Harkness, Beginning of April, 1888. Marx-Engels, *On Literature and Art,* Moscow : Progress Publishers, 1976, p. 91; Engels to Minna Kautsky, 26 November, 1885, ibid., p. 88.

৫. René Wellek, *A History of Modern Criticism 1750-1950,* Vol.

7, New Haven . Yale University Press, 1991, p. 357; *PDP.*, p. 21.

৬. Chris Baldick, *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*, Oxford and New York : Oxford University Press, 1990, p. 173 : 'it (*Sc.* polyphonic) in equivalent to dialogic.' এছাড় ঐ বই-এর **'dialogic or dialogical'**, p. 56 দ্র.। এর সঙ্গে এই আলোচনার শেষে 'পরিশিষ্ট' দ্র.।

৭. *The Dialogic Imagination : Four Essays.* trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, ed. Michalel Holquist. Austin, Texas University of Texas Press, 1981. আমি দেখেছি এর পেপারব্যাক সংস্করণ (একাদশ মুদ্রণ, ১৯৯৮)।

৮. ওয়েলেক (টী. ৫), পৃ. ৩৭০ : 'Nowhere, by the way, does Bakhtin use the phrase "dialogic imagination"—I find only one reference to imagination (348), and that in a totally different context concerning Socrates

৯. ওয়েলেক-এর রচনাটিতে (টী. ৫) Caryl নামটি প্রত্যেকবারই ভুল করে Carol ছাপা হয়েছে (পৃ. ৩৫৭, ৩৬৪, ৪৪০)।

১০. এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ওয়েলেক। টী. ৫, পৃ. ৩৫৭-৬১ ও পৃ. ৪৪০ টী. ৩ দ্র.। মনে হয়, বাখতিন কখনোই দস্তয়েভ্স্কি-র নোটবইগুলির সন্ধান পান নি। তাহলেই তিনি দেখতে পেতেন : লেখক কীভাবে তাঁর চরিত্রদের ভাব, ভাষা ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন।

১১. *PDP.* p. 67. পরের উদ্ধৃতিও একই পাতা থেকে। বাঁকা হরফ যোগ করা হয়েছে

১২. ঐ। মূলেই বাঁকা হরফ আছে।

১৩. ঐ, পৃ. ৬। মূলেই বাঁকা হরফ আছে।

জিউস আর প্রমিথিউস-এর মধ্যে বাখতিন যে-তফাত করেছেন, সে-প্রসঙ্গে গ্যয়টে-র বিখ্যাত ওড-টি মনে পড়ে। জিউস-কে প্রতিস্পর্ধা (চ্যালেন্জ্) জানিয়ে প্রমিথিউস বলেন :

এখানে বসে আছি আমি, গড়ছি মানুষকে
আমার (নিজের) প্রতিচ্ছবিতে।
এ জাতি আমারই মতো,
দুঃখ পাবে, কাঁদবে
আনন্দ করবে, খুশি হবে,
আর আমার মতোই
তোমার সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধাই (তার) থাকবে না।

অর্থাৎ গ্যয়টের প্রমিথিউস-ও, জিউস-এর মতোই, নিজের আদলেই মানুষ গড়েন—জিউস-এর থেকে তা আলাদা হলেও ব্যাপারটা মোনোলোজিক, প্রতিটি মানুষই প্রমিথিউস-এরই প্রতিচ্ছবি। Ian Kott, *The Eating of the Gods : An Interpretation of Greek Tragedy,* London : Eyre Methuen,

1974, p. 280 দ্র.। গ্যয়টে-র কবিতাটি (Prometheus') *The Penguin Book of German Verse,* ed. Leonard Forster, Harmondsworth : Penguin Books, 1957, pp. 201-03-এ পাওয়া যাবে। কবিতাটি মার্ক্স-এর মুখস্থ ছিল, জানিয়েছেন আয়ান কট।

১৪. 'The dramatic and the pictorial'. 'Scenic and Panoramic'. Perci Lubbock, *The Craft of Fiction* (1920), Bombay : B. I. Publications, 1979, pp. 71-72 দ্র.। ওয়েলেক-ও লাবক-এর কথা তুলেছেন (টী. ৫; পৃ. ৩৫৭) যদিও বিস্তৃত তথ্য নির্দেশ করেন নি।

১৫. *PDP,* pp. 69-73.

১৬. শারদীয় *অর্কিড,* ১৪০৬ ও ১৪০৭-এ যথাক্রমে পৃ. ৬৮-৮৭ ও পৃ. ১২৯-৩৩-এ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া গেছে।

১৭. *অর্কিড,* বৈশাখ ১৪০৬, পৃ. ২৯-৩৫ ও গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪০৭, পৃ. ২৮-৩৮-এ বিনোদ উকিল ও চাটুজ্যেমশায় সম্পর্কে আলোচনা-দুটি দ্র.।

১৮. René Wellek, *A History of Modern Criticism 1750-1950,* Vol. 4 (1965), Cambridge : Cambridge University Press, 1983, pp 17-18; মার্ক্স এঙ্গেলস (টী. ৮), পৃ. ৯১-৯২।

১৯. খুব ছোটোবেলায় পড়ার সময়েও বোঝা যায় : *আজব দেশে অ্যালিস* আর *হ য ব র ল*-য় যথাক্রমে রাজা ও পেঁচা বিচারের প্রহসন করে আইনকানুন ব্যাপারটাকেই খেলো করে দেয়।

২০. ক্যারল-এর লেখায় অনেক প্যারডি থাকে। তার কিছু কিছু অনেকেই ধরতে পারেন। কিন্তু ধরতে না পারলে খুবই মজাদার অবস্থা তৈরি হয়। যেমন, 'You're old, Father William' কবিতাটি সম্পর্কে জনৈক বিদ্বান্ লিখেছেন, 'এই বক্তব্যের মধ্যে তথা William-এর প্রচলিত আচার ও নিয়ম না-মানার মধ্যে ছিল ট্রাডিশনের জগদ্দল পাথর ভাঙার প্রয়াস। সামাজিক অব্যবস্থার গড্ডালিকা প্রবাহকে অস্বীকার করার সাহস' ('শিশু সাহিত্যের ধারায় সুকুমার রায়', *সুকুমার পরিক্রমা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৮৯, পৃ. ১৬২-৬৩)। লেখকের বোধহয় জানা ছিল না: এটি আদৌ কোনো এক উইলিয়ম-এর বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর নয়, রবার্ট সাদি-র একটি কবিতার 'The old man's comforts and how he gained them') ব্যঙ্গরূপ (Martin Gardner (ed.), *The Annotated Alice,* Harmondsworth : Penguin Books, 1970, pp. 69-71 দ্র.)। একজন অনামা কবিও সাদি-র ঐ কবিতাটির আরও একটি ব্যঙ্গরূপ দিয়েছিলেন (*A Nonsense Anthology* (1902), Collected by Carolyn Wells, New York : Dover Publications, 1958, pp. 22-23)।

২১. অ্যালিস-এর প্রথম গল্পটি আরও বাচ্চাদের (যাদের বয়স পাঁচেরও কম) কাছে হাজির করার জন্যে ক্যারল তার আর একটি শিশুসংস্করণ বার করেছিলেন : *The Nursery "Alice"*, London : Macmillan, 1890. পরে মার্টিন গার্ডনার-এর নতুন ভূমিকা সমেত এটির যথাযথ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে (New York : Dover

Publication, 1966)। কথার চেয়ে ছবির ওপরেই এর জোর বেশি।

**পরিশিষ্ট**

Dialogic শব্দটির এক উদ্ভট বাঙলা করা হয়েছে : 'দ্বিবাচনিক'। গ্রীক ভাষায় dia মানে 'দুই' নয়, 'মধ্যে দিয়ে', through। Dialegomai মানে হলো 'কথাবার্তা বলা'। সেটা দুজনে না হয়ে পাঁচ-দশজনে হলেও ক্ষতি নেই : '...a polyphonic novel is one in which *several different voices* or points of view interact on more on less equal terms' (Chris Baldick (টী. ৬), পৃ. ১৭৩। বাঁকা হরফ যোগ করা হয়েছে)। বাখতিন যদি দুটি মাত্র স্বরের কথা বলতেন তবে তার তর্জমা হতো duologic। Duologue শব্দটি ছোটোখাটো অভিধানেও (যেমন, *The Concise Oxford Dictionary of Current English,* 1995) পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রিঙ্কু চৌধুরী, অনুপ কুণ্ডু, সিদ্ধার্থ দত্ত, শুভেন্দু সরকার

# ইতিহাসের অমিয়ভূষণ ঃ জীবনের অমিয়ভূষণ

সুমিতা চক্রবর্তী

প্রবন্ধের শিরোনামে আমাদের ভাবনার যে দৃষ্টিকোণটি আভাসিত তার আলোচনা আমরা শুরু করব অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি প্রবন্ধ দিয়ে। ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার অমিয়ভূষণকে যতটা জানি, ততটা জানি না প্রাবন্ধিক অমিয়ভূষণকে কারণ তাঁর প্রবন্ধের সমগ্র সংকলন প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন অ-বাণিজ্যিক পত্রিকায় ছড়ানো আছে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার। অমিয়ভূষণের পাঠকমাত্রেই জানেন—তাঁকে বুঝতে কী প্রভূত পরিমাণ সহায়তা করে থাকে এই লেখাগুলি (বিশ্বাস করি, একদিন 'অমিয়ভূষণ সমগ্র' প্রকাশিত হবে—খুব দ্রুত না হলেও অত্যন্ত বিলম্বও হবে না।)।

প্রবন্ধটির নাম 'সংবিত্তি' (প্রথম প্রকাশ ঃ লা পয়েজি, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮১; পুনর্মুদ্রণ উত্তরাধিকার, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, শারদ ১৯৯৫)। শব্দটির অর্থও তিনি ব্যাখা করে দিয়েছেন ঐ লেখাতেই—"সংবিত্তি (সম্ ✓বিদ্ +ক্তিন)= Communication" ঐ প্রসঙ্গেই information শব্দটির অর্থ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন 'সংবাদ' শব্দটি। অমিয়ভূষণের প্রবন্ধটির কিছু অংশ উদ্ধার করছি—

"সাহিত্যের সংবিত্তি থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, বিদ্যা ইত্যাদি থেকে যা গৃহীত হয়, তাতে যা সংগ্রহযোগ্য থাকে তা থেকে এই সংবিত্তি পৃথক। আরও শুদ্ধভাবে বলতে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র বা বিদ্যা সংবাদ দিয়ে থাকে। ...সাহিত্যের উপাদান ধ্বনি, বিদ্যার (অতঃপর এই শব্দে দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, বিদ্যা, ইত্যাদি সবকে বুঝতে থাকব) উপাদান শব্দ।"

—এখানে অমিয়ভূষণের ব্যবহৃত 'ধ্বনি' শব্দটি যেটুকু জিজ্ঞাসা জাগায় (ধ্বনি অর্থে শ্রুতি-সংবেদ অর্থাৎ সাউণ্ড বোঝাচ্ছে কি না)—তার দ্রুত নিরসনও হয়। ধ্বনি অর্থে তিনি, সাউণ্ড নয়, ব্যঞ্জনা-ই বোঝাতে চান—যে অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করেছিলেন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্গণ। 'শব্দ' অর্থে তিনি বোঝেন অর্থযুক্ত ধ্বনি (এখানে সাউণ্ড)-সমষ্টি যা কোনো-না-কোনো বস্তু, ক্রিয়া অথবা ভাবের চিহ্নায়ক।

অমিয়ভূষণের মতে সাহিত্যের অভিপ্রায় এবং একমাত্র অভিপ্রায় (আকুলতা বললেও চলে) সংবিত্তি, সংবাদ নয়।—

"সাহিত্যে যদি সংবাদ এনে থাকে তবে তা গৌণ, কোনো কোনো সময়ে সংবাদবহুল পৃথিবীর ভ্রমোৎপাদনের জন্য; সংবাদেরই প্রাধান্য ঘটলে কলার হ্রাস, নূন্যতা ইত্যাদি ঘটতে থাকে। ...এরকম বিপত্তি সাহিত্যের পদে পদে, কেন না শব্দ একই সঙ্গে চিন্তা-যুক্তি অনুমিতি আদির প্রতীক এবং ধ্বনির কায়।"

অমিয়ভূষণের বলবার কথাটি, যাঁদের ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে,—তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য নয়। কারণ—ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও বলা হয়েছে—বাচ্য অর্থই প্রকট ও প্রধান হয়ে থাকলে তা সু-কাব্য হবে না। কাব্যকে হতে হবে বাচ্য অর্থ অতিক্রমকারী এবং ব্যঞ্জনাবাহী—যে ব্যঞ্জনা প্রকৃতপক্ষে অনির্বচনীয় কিন্তু যা বাচ্য অর্থের সাহায্যেই শ্রোতা ও পাঠকের চিত্তে রসের নিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম। অমিয়ভূষণ নিজেও প্রাচ্য

রসশাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং তার সঙ্গে স্বমতের সামীপ্য স্বীকার করেছেন।—

"বেশ কিছুকাল আগেই সাহিত্যকে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী বলা হয়েছে। এর মধ্যে সংবাদ—শব্দটা নিয়ে গোলমাল হয়। এখানে সংবাদী অর্থে সন্দেশ বহনকারী বোঝায় না, কিন্তু শব্দটার চেহারায় সেরকম প্রমাদ হতে পারে বলেই গোড়ায় নতুন 'সংবিত্তি'-কে আনা হয়েছে।"—অমিয়ভূষণের বক্তব্যটি এখানে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে উপলব্ধির সঞ্চার-শক্তিকেই তিনি বলেছেন 'সংবিত্তি'। বহুকাল পূর্বে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমক কাব্যতত্ত্ববিদ্ লঙ্গাইনুস বলেছিলেন কাব্যের প্রধান কাজ বা কাব্য হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত হল আবেগের পরিবাহন। লঙ্গাইনুস্-এর 'হ্যপসুস' বা 'অন্ দ্য সাবলাইম' গ্রন্থটি বিশ্বের সাহিত্য তত্ত্বগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। অমিয়ভূষণ সরল ইংরেজি শব্দ 'কমিউনিকেশন'-কে সংবিত্তির পরিভাষা রূপে নির্দেশ করেছেন। বলা বাহুল্য—তার প্রকৃত অর্থ হল—উপলব্ধির কমিউনিকেশন। যে-কোনো বক্তব্য বিনিময় নয়। অর্থাৎ ঐ আবেগের পরিবাহন।

এর পরেই প্রবন্ধটিতে লেখক উপলব্ধি-পরিবাহনের সর্বপ্রধান অসুবিধাটির প্রসঙ্গে চলে এসেছেন। ...."যেন সংবিত্তির প্রসারক ও গ্রহীতা হৃদয় দুটি সমান হয়, সদৃশ হয়, সমধর্মী হয়; যেন দুটি যন্ত্র সমান/এক ওয়েভ্‌লেঙথে ধরা থাকে।" সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' বাক্যবন্ধেও সংহত বাচনে বলা হয়েছে সেই কথাই।

অতঃপর অমিয়ভূষণ প্রবন্ধটিতে সংবিত্তি সম্পর্কিত বিবিধ চিন্তনের মধ্যে চলে গেছেন। তিনি বলেছেন—এক. প্রায় কোনো সময়েই ভাষা-শিল্পীর সংবিত্তি "সর্বত্রগামিনী" হওয়া সম্ভব নয়। দুই. একই রসোপভোক্তার চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন সংবিত্তি জাগতে পারে। তিন. সাধারণ গ্রহীতা ও অসাধারণ গ্রহীতা—রসোপভোক্তার চিত্তের এই প্রকারভেদ মানতে হবে। চার. একই শিল্প-সংরূপ বিভিন্ন গ্রহীতার মনে ভিন্ন ভিন্ন সংবিত্তি নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। সাহিত্য গণ-গ্রাহ্য হতে পারে না—প্রবন্ধটিতে তাঁর সিদ্ধান্ত এরকমই—"আমার তো মনে হয় হায়ার ফিজিক্স্ যেমন গণ-গ্রাহ্য করা যায় না, সাহিত্যকেও তেমন গণ-গ্রাহ্য করা যায় না। বৈজ্ঞানিক কি ভাবতে থাকেন এটা কি জনসাধারণ বুঝবে? সাহিত্যিকও কি সৃষ্টির সময়ে ভাবতে থাকবেন—একি গণগ্রাহ্য হচ্ছে?"

সৎ সাহিত্যিক তেমন ভাবেন না—এই কথাই বলতে চেয়েছেন অমিয়ভূষণ। তবু 'সংবিত্তি' সম্পর্কে তাঁর এই গভীর চিন্তন আমাদের বুঝিয়ে দেয়—সাহিত্য 'গণগ্রাহ্য' না হলেও 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' হবে—এমন একটি প্রত্যাশা ভাষা-শিল্পীর মনে থাকে। তা না থাকা খুবই অস্বাভাবিক। বস্তুত তা না থাকা—ভাষা-র অস্তিত্ব-ধর্মের বিরোধী। ভাষা-র উদ্ভবই ঘটেছে ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজনে। সে-কারণেই ভাষা এক মর্মছেঁড়া গোষ্ঠীবন্ধন। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষা বদ্‌লায়। সামাজিক গোষ্ঠীর সবলতা ও দুর্বলতার সমান্তরালে ভাষা প্রসারিত হয় অথবা বিলুপ্ত হবার দিকে চলে। কাজেই শিল্পী যখন ভাষাকে ব্যবহার করেন তখন—কোন্ শ্রেণীর গ্রহীতার দিকে ধাবিত হচ্ছে সেই ভাষার সঞ্চার-শক্তি—তা তাঁকে মনে রাখতেই হবে। খুব সচেতনভাবেই লেখকেরা তা মনে রাখেন। কেবল লেখকেরা নন। যে কোনো শিল্পী যখন তাঁর সৃষ্ট শিল্প-সংরূপকে (চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত) অবয়ব দান করতে থাকেন—তখনই তাঁর মনের মধ্যে, তাঁর ধারণা-অনুযায়ী লক্ষ্য-উপভোক্তা (টার্গেট অডিয়েন্স)-র এক সমাবেশ জেগে ওঠে। সেই সমাবেশের সদস্য সংখ্যা যত কমই হোক। এবং সেই উপভোক্তা-জন সেই মুহূর্তে বাস্তবে সামনে দু-একজনের বেশি না থাকলেও শিল্পীর

মানস-প্রবণতা তাতে অপ্রমাণিত হয় না। "অসীম সময় আছে / বসুধা বিপুল, / কী জানি জন্মিতে পারে / মম সমতুল।" ঈষৎ পরিহাসের সুর থাকলেও এই অত্যন্ত সু-সংবৃত, আত্মমর্যাদাঋদ্ধ আকাঙ্ক্ষাটি যে-কোনো সৎ-শিল্পীর মনেই থাকে। পুরোপুরি 'গণগ্রাহ্য' হবার অভিলাষ কি সত্যিই থাকে কোনো শিল্পীর? লোক-সাহিত্যে তা খানিকটা থাকে—ছড়ায়, কবিগানে, যাত্রায়, তরজায়, আর থাকে তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর চলচ্চিত্রে। ভারতের মতো দেশে—যেখানে জনসংখ্যার অর্ধাংশ বর্ণমালার অধিকার অর্জন করতে পারেননি সেখানে লেখ্য-ভাষা মাধ্যমে কাজ করেন—এমন কোনো শিল্পীর পক্ষেই গণগ্রাহ্য হবার ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারেরও আছে সেই অভিপ্রেয় পাঠকগোষ্ঠী। এবং, তাঁর লিখনশৈলীর দিকে একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে, সেই পাঠকগোষ্ঠী কেবল সুশিক্ষিতই নন, তাঁদের হতে হবে চিন্তাশীল—অথবা তার চেয়েও বেশি—তাঁদের হতে হবে সংস্কৃতিমান। অর্থাৎ যাঁরা অধীত বিদ্যাকে জ্ঞানের পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারেন, অতঃপর সেই জ্ঞানকে রূপান্তরিত করতে পারেন মনন-নির্যাসে—সংশ্লেষিত করতে পারেন চিৎপ্রকর্ষে আর মেধাবী হৃদয়োপলব্ধিতে—তাঁরাই হতে পারেন তাঁর পাঠক। বিস্ময়কর নয় যে, অমিয়ভূষণের পাঠক সংখ্যা অল্প। তিনি তা জানতেন। তাতে তাঁর কুণ্ঠা তো ছিলই না, সম্ভবত অহংকারই ছিল। পাঠক কম বলে হতাশা বোধ করেন কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে অমিয়ভূষণের সগর্ব উত্তর শুনতে পাই 'জীবন মহাশয়' প্রবন্ধে—"আমি যদি আবার জন্মাই (আবার জন্মাব কি না জানি না, প্রার্থনা করি আবার যেন জন্মাই), তবে ওই কবি আবার আমার আঙুলগুলোতে কলম ধরাবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অর্থাৎ আমার জীবনমশাই একটা সোসাইটি স্থাপন করেছে যার মেম্বার বঙ্গোপসাগর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। এই সোসাইটিতে থাকায় 'শুনবো কেন ওদের ফাঁকির কথা।" (নিষাদ-৩, অক্টোবর ১৯৭০; পুনর্মুদ্রণ ঃ বিজ্ঞাপন পর্ব অক্টোবর ১৯৮২—জানুয়ারি ১৯৮৩)।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লক্ষ্য পাঠকগোষ্ঠীর মান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হলাম। সেই পাঠকের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি সংবিত্তি স্থাপন করতে চায়—তা-ও আমরা জানলাম। এই সংবিত্তি স্থাপনের জন্য লেখকচিত্তে জাগ্রত হয় কিছু কিছু সেতুর ধারণা। অর্থাৎ তিনি সন্ধান করে নেন কিছু কিছু যোজক-উপাদান—যেগুলির সাহায্যে তাঁর সৃষ্টিকে তিনি পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করে দেবেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে সেই যোজক উপাদানগুলির অন্যতম হল ইতিহাস। যে কোনো শিল্পী প্রাপ্ত উপাদানকে নিজের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে নিজস্ব আকার ও প্রয়োগযোগ্যতা দিয়ে থাকেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারও তাঁর চিন্তন ও প্রতিভা অনুসারে এই ইতিহাস-উপাদানটিকে আশ্চর্য নমনীয়তা, সম্প্রসারণ গভীরতা, স্বচ্ছতা, বর্ণাভা ও ব্যাপ্তি দান করেছেন। তাঁর মনের ইতিহাসবোধ আমাদের পাঠ্যতালিকা থেকে উঠে আসা চেনা ইতিহাস থেকে অনেকটাই আলাদা। এই ইতিহাস ও ইতিহাসবোধকে অমিয়ভূষণ ব্যবহার করেন পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চরণের সংবিত্তি-সেতুরূপে। তাই, ছোটোগল্পে সর্বদা না হলেও, তাঁর উপন্যাসে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইতিহাস-উপাদান ইতিহাস-বোধে উন্নীত হয়ে পাঠকহৃদয়ে লেখকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংযোগ-সেতু নির্মাণে সক্ষম হয়। আমরা যেন মনে রাখি—অমিয়ভূষণ এক অতলান্ত জীবনবোধকেই স্তরে স্তরে প্রস্ফুট করে তুলতে চান; সেতুটিকেই উপন্যাস-বিষয় করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সেতুটির গঠন ও কারুকার্যের -পূর্বতায় আমাদের মনে সেরকম

বিভ্রান্তি আসা সম্ভব। তখন আমাদের মন পাঠ্য ইতিহাসের নথিপত্র থেকে পাওয়া সাল তারিখ আর বংশলতিকার সঙ্গে সব তথ্য মিলিয়ে দেখতে চায়—যা মাঝে মাঝেই পাওয়া যাবে না অমিয়ভূষণের উপন্যাসে। মনে রাখতে হবে, সেতুটি নয়, যোজক-অতিক্রান্ত মহাজীবনের অনুভবে উপনীত হবার জন্যই ইতিহাসকে নিয়ে আসেন অমিয়ভূষণ।

ইতিহাস-কে যে অমিয়ভূষণ এত গভীরভাবে অবলম্বন করেন—তার কারণও আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথম কারণ, ইতিহাস বিষয়টি স্বরূপেই অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যময়। তার অনন্ত কৌণিকতা বহুপল হীরকের মতোই অসীম অংশুমান। ফলে ইতিহাসকে দিয়ে একজন শিল্পী বহু কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তাঁর বহু অভিপ্রায়ের আকার অপেক্ষাকৃত সহজে নির্মিত হতে পারে ইতিহাসের উপাদান সহযোগে।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের নিজেরই আছে এক নিজস্ব সংবিত্তি—এক কমিউনিকেশন। মানুষমাত্রেই ইতিহাস-সচেতন। অতীতের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সংযোগে বর্তমানের অনুভবকেই বলব ইতিহাস-চেতনা। শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মনেই এই ত্রি-স্তর উপলব্ধি থাকে। ইতিহাস মানুষের গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যবোধেরও প্রধান অবলম্বন। প্রতিটি জাতি কোনো-না-কোনোভাবে নিজেদের প্রাচীন ইতিহাসকে আত্মস্থ করে এবং সেই দৃষ্টান্তে সন্ধান করতে চায় আত্ম-পরিচয়। সেই আত্ম-পরিচয় অনুভব করতে পারলে সে তৃপ্ত হয়। এ-কারণেই প্রতিটি জাতি তার পুরাণ ও মিথ্‌গুলিকে এত নিবিড়ভাবে লালন করে। ইতিহাসকে রক্ষণ করতে চায় যতদূর সম্ভব। ইতিহাসের উল্লেখেই সে নিজেকে যেন একরকমভাবে খুঁজে পায়। ইতিহাস নিজেই এক সংবিত্তি—কালের গতির সঙ্গে মানস-স্বাতন্ত্র্যের দ্বান্দ্বিকতার; জীবনের ব্যাপ্তির সঙ্গে গোষ্ঠীগত অস্তিত্বের বোধের। আমাদের মনে পড়ে—উত্তরবঙ্গ-নিবাসী অমিয়ভূষণ ইতিহাসের উপাদানকে গ্রহণ করেন যখন তখন তা সাধারণত আহরিত হয় ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে। যে-ইতিহাসকে তিনি তাঁর রক্তের ও বাসভূমির উত্তরাধিকারে আপন বলে জানেন তাকেই গ্রহণ করেন তিনি—তাতে তাঁর কমিউনিকেশন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

ভূগোলের হিসেবে অমিয়ভূষণের ইতিহাস-উপাদানের উৎসস্থলকে আমরা ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত বলে উল্লেখ করলাম। কিন্তু ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও প্রাচীনত্বে তা স্থানিক পরিসীমায় আবদ্ধ নয়। ইতিহাসের প্রাচীনতম উপাদান মিথ ও পুরাণ। দুই-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। মিথ পুরাণের চেয়ে প্রাচীনতর। একটি জাতি পুরাকাল থেকে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামের পথে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে নিযুক্ত থাকে। সেই প্রয়াসের একটি পরিচয় শৌর্য, বীর্য, দৃঢ়তায়। তাই কল্পিত হয় অসম্ভব-সম্ভবকারী, অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন নায়ক যে তার নিজস্ব গোষ্ঠীকে ত্রাণ করবে, রক্ষা করবে। অনেক সময়ে মানুষ না হয়ে কোনো ক্ষমতাধর প্রাণীও হতে পারে সেই অতিকথার কেন্দ্র-চরিত্র—কোনো অতিকায় হাতি বা মহাসর্প, কিংবা অলৌকিক কোনো জীব—ড্রাগন বা স্ফিংক্স্। এ-ছাড়া মিথ্-এর কেন্দ্রে থাকে প্রায়ই কোনো বিপুল প্রাকৃতিক সংঘটন—বন্যা, ভূমি-বিদারণ, দাবানল—আর, মানুষের কাজ বলতে যুদ্ধ। মিথ্-এর অর্থাৎ অতিকথার উপাদান—এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

পুরাণ সংকলিত হয় পরবর্তীকালে। পুরাণ অর্থে প্রাচীন কথা (গল্প)-সমষ্টি। মিথ্-এর যুগে নির্দিষ্টভাবে দেবদেবীদের রূপমূর্তি গড়ে ওঠেনি মানুষের মনে। সেই কালে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ-পশু-সরীসৃপ-মৎস্য-পর্বত-অরণ্য-সমুদ্র—সব একাকার। কিন্তু পুরাণের

কালে সমাজ পুরোমাত্রায় সুগঠিত। রাজা-প্রজা-ঋষি-পুরোহিত-ক্রীতদাস নিয়ে নিয়ম-শাসিত সমাজ। দেবদেবী-কল্পনা সুস্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে। রচিত হয়ে গেছে রীতিমতো ধর্মশাস্ত্র। মিথ-এর উপাদানগুলি পুরাণে থেকে গেছে; কিন্তু সেই মহাকায় অলৌকিক শক্তিজ্ঞাপক উপাদান ব্যতিরেকেও পুরাণে সমাহৃত হয়েছে অজস্র কাহিনি যেগুলির মধ্যে শ্রেণী-সম্পর্ক-ভিত্তিক সমাজ-কাঠামোর অনুশাসনই পরিস্ফুট হয়। গ্রিক মাইথলজি আর ভারতীয় পুরাণগুলি এই জাতীয় গল্প-সমাহার। এগুলিকে আধা-কাল্পনিক, আধা-ঐতিহাসিক বলতে পারি। কাল্পনিক, কারণ গল্পগুলি অনেক ক্ষেত্রে বানানো; ঐতিহাসিক, কারণ অনেক গল্পের বীজরূপে সত্য ঘটনা থাকা সম্ভব। তা-ছাড়াও—কাল্পনিক গল্পের সাহায্যে সেই সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরা হয় পুরাণে—যা ঐতিহাসিক সত্য। এই পুরাণকাহিনিগুলিই মহাকাব্যের উপাদানরূপে গৃহীত হয়।

পৌরাণিক ইতিহাসের সংবিত্তি-গুণ অসামান্য। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মিথ ও পুরাণ শ্রুতিবাহিত মৌখিক উত্তরাধিকাররূপে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে যায়। এক একটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কোন্ মানসিকতা ও সমাজসত্য পরিস্ফুটিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন হয় না। পুরাণকাহিনির আভাস ও উল্লেখে তা সঞ্চারিত হয়ে যায় শ্রোতা ও পাঠকের মনে। অগণ্য শতাব্দীর সঞ্চিত সংস্কারপুঞ্জ ও উপলব্ধি-স্তর পরিবাহিত হয়ে যায় পাঠকের মানস-অভিজ্ঞতায়—যা অন্য কোনোভাবে ঔপন্যাসিকের বোঝাবার ভাষায় যথার্থ প্রেক্ষণ-বিন্দুটি পেত না।

পুরাণ-কাহিনির উপরিস্তর থেকে গণমানসেও কিছু কিছু আদর্শ সঞ্চারিত হয়ে যায়। সেগুলি প্রায়শই একমাত্রিক। প্রশ্নবিহীন পরম্পরাবাহিত ধারণা—যেমন সীতার সতীত্ব, রামরাজ্যের সুখ-শান্তি, পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্যত্যাগের মহত্ত্ব, কর্ণের দানশীলতা, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, সপ্তরথীর অভিমন্যু-বধ—এই কথাবৃত্তগুলি থেকে উঠে আসা ন্যায় ও অন্যায়ের ধারণাসমূহ সাধারণ মানুষের মনে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই পাঠককুল—যাঁরা যাত্রা, তরজা, কবিগান, লোককথায় এই ধারণাগুলির প্রকাশ সন্ধান করেন এবং পৌরাণিক উল্লেখমাত্রেই শিল্পরূপের লক্ষ্যটি বুঝে নেন—ঠিক তাঁদের উদ্দেশে রচিত নয় অমিয়ভূষণের উপন্যাস। মিথ ও পুরাণের উপাদান সংযোজনার মধ্যে দিয়ে তিনি সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত, সূক্ষ্ম উপলব্ধি-প্রবণ শিল্প-উপভোক্তার অনুভবের স্তর-পরম্পরাকে উদ্বেজিত করতে চান। বিপুল জীবনের মহারহস্যবোধ সঞ্চারিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর। প্রাচীন মিথ ও পুরাণ থেকে ছেঁকে নেওয়া ঐতিহাসিক সংবিত্তি ব্যতীত পাঠকের চিত্ত গভীরে অন্যভাবে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না।

একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে জল। সৃষ্টির আদিলগ্নে বিপুল জলরাশির মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিল মৃত্তিকা আর প্রাণ। জল বিহনে যেমন প্রাণ সম্ভব নয়, তেমনই জল আর মাটির মানুষের মধ্যে যেন আছে এক আদিম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। জল ও মাটির মানুষের সখ্য না হলে সৃষ্টি অসম্ভব কিন্তু জলের সেই আদি, আদিম, নিঃসঙ্গ, একক প্রাধান্যময় মহাশক্তি মাঝে মাঝেই ফুঁসে ওঠে, গ্রাস করতে চায় মৃত্তিকালগ্ন জীবনের আপাত-তুচ্ছতাকে। সেই করুণাবিহীন মহা-সর্বনাশকে প্রতিরোধ করে, অতিক্রম করে মানব-সভ্যতা পরিণত হয়। মানুষের ক্ষমতা কম। তবু তারও মনের মধ্যে অনপণেয় হয়ে থাকে মহাবরষার রাঙাজলকে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা। প্রলয়পয়োধি জলের উচ্ছ্বাসের মধ্যে মানুষ ও তার জ্ঞানভাণ্ডারকে

রক্ষা করবার কাজ করেছিলেন ভারতীয় অতিকথার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। বাইব্‌ল্‌-এ কাজটি করতে দেখি নোয়াহ্‌-কে। রামায়ণে সমুদ্র-বন্ধনের কথাবৃত্তটি জলকে বশ মানানোর এক ছবি। পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্যে অপার, অগাধ ও দুরন্ত জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বণিকের নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই জল-মানুষ দ্বন্দ্বের মিথটি অমিয়ভূষণের দুটি প্রধান উপন্যাসের অন্তঃসত্য। কঠিন সেই সংগ্রাম। মানুষ সেই লড়াইয়ে হারে, এবং হারে না। উপন্যাসদুটি হল 'গড় শ্রীখণ্ড' এবং 'চাঁদ বেনে'।

'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের পটভূমিতে আমাদের অনতিদূর অতীতের খুব সুস্পষ্ট নথিভুক্ত এক ইতিহাস আছে। উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৫৭ সাল; উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্ব, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন, দেশবিভাগও অনিবার্য। মন্বন্তর ও দাঙ্গার চিহ্ন সর্বত্র। উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতার দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর, যাকে বলব উপরিস্তর—তার ঐতিহাসিকতার পরিমাপ করা খুবই সহজ। সেই স্তরে উপন্যাসটি পাঠ্য-গ্রন্থ বিশ্লেষণে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলতে যা বোঝায় তার নির্ভুল উদাহরণ। উত্তরবঙ্গের পদ্মা-তীরবর্তী এক ভূখণ্ডের ভূগোল ও জনবিন্যাস এই জটিল সময়কে কীভাবে ধারণ করেছিল তারই উপাখ্যান 'গড় শ্রীখণ্ড'। চরিত্রগুলি ইতিহাস-সম্ভাবিত। আসন্ন দেশ-ভাগের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের রূপরেখা ঐতিহাসিক সত্য। সর্বস্তরের জনশ্রেণী (জমিদার, হিন্দু ও মুসলমান কৃষক, হতদরিদ্র তথাকথিত 'অপরাধপ্রবণ' আদিবাসী, নায়েব, দারোগা ইত্যাদি চাকুরিজীবী, দেশকর্মী, ছোটো ব্যবসায়ী, রেলের খালাসি) কীভাবে এই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আলোড়িত—তার আবহমণ্ডলের স্পন্দন যথাযথ।

কিন্তু 'গড় শ্রীখণ্ড' কেবল এই কারণেই পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। তার পূর্ণ ঐতিহাসিকতা গিয়ে পৌঁছয় প্রাচীন অতিকথালোকে—যেখানে জল ও মানুষ সখ্যে ও দ্বন্দ্বে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা।

ভাঙনের উপন্যাসে দুর্দমনীয় ভাঙন-প্রতীক পদ্মা। মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠে, আবার ভেঙেও পড়ে। ভাঙাটা গড়ার চেয়ে কম সত্য নয়। ভাঙনকে রোধ করতে চেষ্টা করে মানুষ। উপন্যাসের শুরুতেই অমিয়ভূষণ বলেছেন—"বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে, 'বিরিজ' বলে লোকভাষায়।" পদ্মাকে বাঁধার মতোই মানব-সম্পর্ককে বাঁধার কত না প্রয়াস। সান্দার উপজাতির সব হারানো মেয়ে সুরতুন-কে আশ্রয় দিয়েছে রেল-খালাসি মাধাই মায়েন। কিন্তু মাধাইয়ের কামনা পূর্ণ করে তার ঘরনি হতে রাজি নয় সুরতুন। স্বেচ্ছাবিহারিণী সুরতুন চলে আসে মাধাইকে ছেড়ে। তার পর পদ্মার রোষ যখন মাধাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন মানবিকতার টানে আবার মাধাইকে খুঁজতে আসে সে। তখন জল অনর্গল। ভেসে গেছে মাধাই। পায়ের তলায় মাটি নেই। সেই বানভাসা কাদামাটিতে দাঁড়িয়ে সুরতুন নতুন সম্পর্কে বাঁধা পড়ে ইয়াজের সঙ্গে। চাষি রামচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী নতুন করে বাঁধা পড়ে পুত্রোপম যুবকের টানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহননেই নিজেকে শেষ করে।

দেশ ভাঙে, সম্পর্ক ভাঙে, জমিদারি ভাঙতে থাকে, ধর্মে হানাহানি শুরু হয়, মাটির ক্ষুধায় মাটিও ছিন্ন-ভিন্ন হয়। এই ছোটো ছোটো ভাঙনকে গ্রাস করে পদ্মা-র মহাবন্যা। জল সরলে আবার নতুন করে গড়ে উঠবে সংসার ও সমাজ। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ—

"বন্যা থেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার আবার পাশ ফিরলো কি না—এটা তার প্রসাদ কিম্বা রোষ। থেকে থেকে পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে তখনো, ফুলে

ফুলে উঠছে তার বুক। উপরে ড ড ড করে মেঘ ডাকছে। পুরাণটা যদি জানা থাকে হয়তো কারো মনে পড়তে পারে, কেউ যেন অন্য কাউকে বলছে ঃ দয়া করো, দয়া করো।''— পুরাণের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখই করে দিয়েছেন অমিয়ভূষণ।

সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র-প্রসারিত পদ্মা-ই এই উপন্যাসের প্রকৃত ইতিহাস। ''কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাদের একটা গন্তব্য স্থান ছিল, এখানে এসে সেটা মিলিয়ে গেছে। এখন সব কিছুই পদ্মা। আকাশে দ্যাখো, সেখানে পদ্মা প্রতিফলিত।...জীবন কী? এটাও যেন পদ্মার মত একটা কিছু। না থাকলে কিছুই থাকে না, থেকেও শুধু ভয় আর বেদনা।'' মিথিক্যাল ইতিহাস থেকে জীবন-উপলব্ধিতে এইভাবে পৌঁছে যান লেখক জল ও মানুষের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের প্রকৃত ইতিহাস এরই মধ্যে।

জলের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধে ভূমি এক প্রধান অবলম্বন। মানুষ জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচাতে চায় তার জমিটুকু। এই মাটির মমত্ব-মাখা যে কৃষকচরিত্রটি এই উপন্যাসে ভাস্বর—তার নাম রামচন্দ্র। কৃষি-বিস্তারের নায়ক-প্রতীক রূপেও শ্যামবর্ণ রামকে কল্পনা করেন কেউ কেউ। পৌরাণিক নায়কের প্রতিভাস এই ভাবেই ধারণ করে অমিয়ভূষণের চরিত্ররা।

জল ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-বিন্যাসের অপরূপ মহাকাব্য 'চাঁদ বেনে'। চাঁদ সওদাগর আমাদের চেনা মনসামঙ্গলকাব্যের নায়ক। কিন্তু অমিয়ভূষণের চাঁদ বেনে মনসামঙ্গলকাব্যগুলি থেকে গৃহীত নয়। মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গলকাব্যের কবিরা যে চন্দ্রধর-কে এঁকেছিলেন সে শিবভক্ত বণিক; মনসাদেবীর পূজায় অনিচ্ছুক। তার আসল দ্বন্দ্বটা মনসার সঙ্গে। প্রথমেই চমক লাগবে এই দেখে যে, অমিয়ভূষণের 'চাঁদ বেনে' উপন্যাসে সর্পের উল্লেখ থাকলেও মনসা-র চরিত্রই নেই। নেই বেহুলাও। বেহুলা-লখিন্দরের যে কথাবৃত্তটি মনসামঙ্গল কাহিনিগুলির অন্যতম আকর্ষণ তার চিহ্নমাত্র নেই এই উপন্যাসে। এরকম সিদ্ধান্তে আমরা যেতেই পারি—অমিয়ভূষণের উপন্যাসের নায়ক—বণিক চন্দ্রশেখর বসু আদৌ মনসামঙ্গল কাহিনিমালা থেকে গৃহীতই হয়নি। আরও গভীরে গিয়ে আমরা বলতে পারি—যে-অতিকথা-র নায়কের আদর্শে কিছুটা পরিকল্পিত মনসামঙ্গলের নায়ক— সেই অতিকথা থেকেই সরাসরি অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসের নায়ককে নামিয়ে এনেছেন। মনসামঙ্গলের মাধ্যমটি তিনি বর্জন করেছেন। এমন এক অমিত শক্তিধর মানব যে শাসন করতে চেয়েছিল অনন্ত জলরাশিকে। জলের সঙ্গে যার নিত্য দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্ক। রামায়ণের রামের সেনাবাহিনী সমুদ্র বেঁধেছিল পাথর দিয়ে; ইহুদি পুরাণের মোজেস্-এর চলার পথে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে পথ করে দিয়েছিল তাঁকে; মহাপ্রলয়ের জলে নৌকো ভাসিয়ে বেঁচেছিলেন পুণ্যাত্মা নোয়াহ্। রূপকথার রাজপুত্রেরা পক্ষীরাজে চেপে পার হয়ে যায় সাত সমুদ্র, তেরো নদী। গ্রিক মহাকাব্যের রাজা ওডিসিয়ুস জলপথে পৃথিবী পরিক্রমা শেষে ফিরেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত পত্নী ও পুত্রের কাছে। এই বিপুল জলযাত্রার অভিজ্ঞতায় জীবনকেই আত্মস্থ করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। গ্রিক পুরাণের জেসন সমুদ্রপথ অতিক্রম করেছিল অলৌকিক বীরত্বের সঙ্গে। তাই সে জাতীয় নায়ক। জলযাত্রায় জীবন-অনুভবের এই মোটিফ্ আধুনিক কালেও প্রবাহিত—বোদল্যের-এর, র‍্যাঁবো-র, রবীন্দ্রনাথের, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। জীবনানন্দের 'অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা'র চকিত উল্লেখে—'জীবনের সমুদ্র সফেন'-এর উপলব্ধিতে।

অমিয়ভূষণের চাঁদ বেনে-রও ঐ একই পরিচয়। সে এমন এক অতিকথার নায়ক যে জলরাশিকে শাসিত রাখতে চায়। জলের প্রকৃত শক্তির প্রবল প্রতাপের সঙ্গেই তার নিত্য-

সংঘাত। এই কাহিনিতে তাই মনসা, বেহুলা-রা নিষ্প্রয়োজন। চাঁদের পুত্রেরা অবশ্য আছে। এই সংগ্রাম তো এক প্রজন্মের নয়।

এইভাবে 'চাঁদ বেনে' উপন্যাসটিকে দেখলে আরও একটি জিজ্ঞাসার নিরসন হয়। মনসামঙ্গলের কাহিনিকাল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দ প্রধানত। কিন্তু অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসকে রেখেছেন অষ্টম-নবম খ্রিস্টাব্দের পটভূমিতে। অর্থাৎ 'মনসামঙ্গল' কাহিনির সময়-পট এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মনসা-কাহিনির প্রাক্-ইতিহাস অথবা বাংলার বণিকের জলপথ-বিজয়—দুইয়েরই পূর্বসূত্র পাওয়া যাবে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকেরও বহু আগে।

জলপথকে অধীনে রাখতে চায় বণিক। বণিকেরাই সভ্যতার প্রকৃত রণনায়ক। রাজার সেনাবাহিনীর কাজ পররাজ্য আক্রমণ ও স্ব-রাজ্য রক্ষণ। সেই যুদ্ধ সভ্যতাকে এক পা-ও এগিয়ে দেয় না, বরং প্রতিপদে পিছিয়ে দেয়। কিন্তু বণিক তার জাহাজ সাজিয়ে অথবা দুর্গম দস্যু ও অরণ্যবহুল স্থলপথে শকটযাত্রী হয়ে যখন বাণিজ্যযাত্রা করে তখন সে সম্পদ সৃষ্টি করবার লক্ষ্যে অভিযান চালায়। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সবল রাখে বণিকেরাই। ভারতে খ্রিস্টজন্মের আগেই বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কাল থেকে ইতিহাসের গতিপথে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব প্রধানত বণিকদের সমর্থনের জোরেই নিজের ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠ-করতে পেরেছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবস্থার প্রসারের জন্য দেশে শান্তির বাতাবরণ প্রয়োজন হয়। খানিকটা সে-কারণে, কিছুটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অধিকার বিস্তার রোধের জন্য বণিকেরা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন। কাজেই খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে উত্তর-পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে—যাকে অমিয়ভূষণ সমতট বলেছেন (কিছুটা কাল্পনিক এই অঞ্চলটির বিস্তার)—তা কোনো দিক থেকেই অসত্য নয়। তখন বাংলার বণিকের সমৃদ্ধির কাল।

কীভাবে সমুদ্রকে নখদর্পণে নিয়ে আসতে চায় বণিকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখর বসু—তার বহু উল্লেখ আছে উপন্যাসটিতে—আর, সে-সবই চন্দ্রশেখরের উক্তিতে—

"তুমি কি জানো, পক্ষধর, সমুদ্রে নানা পথ? তুমি এই বঙ্গোপসাগরের বৃত্তচাপ অনুসরণ করে কূলবাহী হয়ে মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বুজ, আন্নম, চম্পাকে বেষ্টন করে করে মহাচীনের কিওচাওকে স্পর্শ করতে পার।"

"কিন্তু অন্য পথও আছে সাগরের বুকে। মহাচীনের উপকূল থেকে সরে সোজা দক্ষিণে নেমে যবদ্বীপের মধ্যবিন্দুকে স্পর্শ করতে পার। এপথে অবশ্য কূল-উপকূল চোখে পড়ে না। সমুদ্রস্রোত আর আকাশের মানচিত্রই সহায়।"

"সুমাত্রার দক্ষিণপ্রান্ত অথবা যবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্ত থেকে সিংহল যেমন একটি জ্যা, সুমাত্রা ও যব-র সেই বিন্দুগুলো থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত তেমন আর একটি জ্যা।"

"পশ্চিমমুখে চলতে সুমাত্রার আরও উত্তরে সিংহলমুখী স্রোতটাকে ধরতে হয়। কিন্তু এখনই সে স্রোত পাবে কোথায়। তা শীতের উত্তর-পূর্বী বায়ুতে জন্মায়।"

চাঁদ বেনে ও সমুদ্রের প্রতিস্পর্ধিত্ব উপন্যাসের কাহিনি অনুসরণে বার বার চলচ্চিত্রায়িত হয়। চাঁদ সমুদ্র-যাত্রা করে; সমুদ্রের ঝড়ে পত্নী সনকাকে হারায়; আবার ফিরে পায়; বার-বার ফিরে আসে চাঁদের জাহাজডুবির বর্ণনা—তা এক মিথের অবয়ব নিতে থাকে; বজ্রাহত

চাঁদকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়। চাঁদের পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র বা লখাই সমুদ্রযাত্রা করে। অর্ধদগ্ধ চাঁদ সুস্থ হয়। কিন্তু সে তখন সর্বস্ব-হারা ও একা। সনকাও তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে তার মধুকর জাহাজ নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সমুদ্রের বুকে। তার সম্পদ সে ভোগ করবে না আর। কিন্তু জলের সঙ্গে সেই আদিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনির্বাণ থাকে।

এই উপন্যাসে জাহাজের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আছে সপ্তডিঙার বর্ণনা। বিশেষ করে মধুকর ও মধুলিট জাহাজদুটি যেন চাঁদের ক্ষমতারই দুই পক্ষ বিস্তার। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র বানাতে শিখেছে সভ্যতার অগ্রগতির নিয়মে। 'গড় শ্রীখণ্ড'-তে পদ্মার 'বিরিজ' স্মরণীয়। এখানে জাহাজ। অর্জুন যেমন পৃথিবীর বুকে তীর বিঁধে জলধারা তুলে এনেছিল পিতামহ ভীষ্মের শেষ জলপিপাসা মিটিয়ে দেবার জন্য।

চাঁদ চরিত্রের রূপায়ণে মিথিক্যাল হিরো-র এই পুনঃনির্মাণ আরও তাৎপর্য পায় মহাভারতের ভীষ্মের প্রতিতুলনায়। চম্পকনগরে একই সঙ্গে কয়েকজন সম্পন্ন বণিকের আবির্ভাব হয়। লোকমুখে তাদের প্রবাদ-ছাঁকা অভিধা হয় অষ্টবসু। চাঁদ সেই অষ্টবসুর কনিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। যেমন মহাভারতের অষ্টবসুর কনিষ্ঠ ছিলেন ভীষ্ম। যাঁর ছিল স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার। বহু দুর্যোগের মধ্যেও চাঁদের দুর্জয় হয়ে ওঠা আর ফিরে ফিরে আসা-র মধ্যে এক মৃত্যুঞ্জয়ত্বও সূচিত হয়। ইচ্ছামৃত্যুর প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে চাঁদের ক্ষেত্রে।

'চাঁদ বেনে' উপন্যাসে আমরা খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর পূর্ব-ভারতীয় সভ্যতার সমকালীন সমাজের ইতিহাসও নিখুঁতভাবে পাব—যেমন পাব 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে ১৯৪৫-৪৭ সালের ভারতীয় ইতিহাসকে। বণিক-বাংলার ইতিহাস ছবির মতো ভাসে চোখের সামনে। জলপথে বহির্বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন; কোথায় কোথায় কীসের বাণিজ্য হত তার বিবরণ, বাণিজ্য-পথের বাধা-বিপত্তি, কেমন হত জাহাজের গঠন তা সমুদ্রপোত নির্মাণের খুঁটিনাটি দেখিয়ে বিবৃত করা হয়েছে উপন্যাসে। সমৃদ্ধ নগরীর সুরম্য বর্ণনা; বণিকদের গৃহ, পানভোজন-বিলাসের বিবরণ; বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতির হিসেব; সর্প-পূজক আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন; তন্ত্র-উপাসনা ও ভৈরবীর উল্লেখের মধ্যে দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণের ইঙ্গিতও অনুভব করা যায়।

ইতিহাসও এই উপন্যাসে এই ভাবে দুটি স্তরে বিন্যস্ত। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত সংকেত—প্রকৃত কমিউনিকেশন—এই উপন্যাসে চাঁদ চরিত্রের অতিকথার আভাবলয় দীপ্ত মহানায়কের জীবনবোধের উপলব্ধিতে। যে-মহাজীবনের বিস্তারে লীন হতে চায় অমিয়ভূষণের সৃষ্টির অভিমুখীনতা। চাঁদ বণিক বলে—

"মৃত্যু নেই, সুতরাং মৃত্যুভয় নেই। মন যাকে মানুষের মৃত্যু বলে তা আর ভবিষ্যতে যাবে না এমন এক বর্তমান মুহূর্তের চিরস্থায়িতা। কেন না যখন বলি কারো মৃত্যু হচ্ছে, সে তো তখন জীবিতই। সে জীবিত থাকতে মৃত্যু আসে না।"

মিথ ও পুরাণ-সম্ভব ইতিহাস নিয়ে এই দুটি মহাকাব্যোপম উপন্যাস লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ—বিশেষ করে 'চাঁদ বেনে' যেখানে মিথকে পুনর্নির্মাণ করাই অভিপ্রায় ছিল তাঁর। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পরিসরে, স্থানকালের একটা পরিসীমার মধ্যে রেখে ইতিহাসকে রূপ দিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। সেখানে ইতিহাসের রূপ ও প্রয়োগ আলাদা—সংবিত্তিও আলাদা। 'মধু সাধুখাঁ' তেমনই একটি উপন্যাস। ইংরেজ পর্যটক র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌-কে এখানে উপন্যাসের চরিত্ররূপে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং সময় ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ—তা স্পষ্টভাবে বলে

দেওয়া হয়েছে। অনতিপরিসর উপন্যাস। এক বাঙালি বণিকের বাণিজ্য বুদ্ধি এবং বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ উপন্যাসটির অবলম্বন। বাঙালির বাণিজ্য ষোড়শ শতকে কেমন ছিল—সেই ইতিহাসই এখানে কথিত। প্রাসঙ্গিকতায় এসেছে ষোড়শ শতকের বাংলার সমাজচিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধু সাধুখাঁ বা আঞ্চলিক উচ্চারণে মদু সা—আপাতভাবে এক বণিক-প্রতিনিধি হলেও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। এই বণিক-সন্তান এক মেধাবী, বিশ্লেষণী বুদ্ধিসম্পন্ন, পরিশ্রমী, দূরদৃষ্টির অধিকারী, যুক্তিবাদী, জীবনবিলাসী মানুষ। তার জীবনদৃষ্টিই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

বণিক চরিত্রের প্রতি অমিয়ভূষণের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। তাঁর ইতিহাসবোধের অন্যতম অবলম্বনই হল বণিক ও বাণিজ্য। একটি দেশের ইতিহাস যে প্রধানত তার বাণিজ্যের—তথা অর্থনীতিরই ইতিহাস—তা-ই যেন বলেছেন তিনি বারবার।

বণিকেরা দেশকে কেবল সমৃদ্ধিই এনে দেয় না; স্থানিক আবদ্ধতা কাটিয়ে বিভিন্ন দেশ, ভাষা, সংস্কৃতির সঙ্গে নিত্য যোগযোগের ফলে তাদের মন সহজেই কাটিয়ে উঠতে শেখে রক্ষণশীল সংস্কারের বন্ধন। মানুষকে উদার জাগতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করবার শিক্ষা তার হয়ে যায় আপনা থেকেই। লোকচরিত্রজ্ঞান, মানুষের রুচি ও প্রয়োজন সম্পর্কে বাস্তব ধারণাশক্তি না থাকলে একজন সফল বণিক হওয়া সম্ভব নয়। মধু সাধুখাঁর চরিত্রে ছিল সব কয়টি গুণের সমাহার। কায়স্থ বংশোদ্ভূত সন্তান মধু সাধুখাঁ—পারিবারিক ধর্মে বৈষ্ণব কারণ নাকে টানা সূক্ষ্ম রসকলি। কিন্তু তার নৌকোয় ব্রাহ্মণ পাচক থাকলেও ফিরিঙ্গি পর্যটক আছে—যাকে সে ডাকে বলা—তার সঙ্গে একত্রে খেতে তার কোনো আপত্তি নেই। যে ক্রীতদাসটি বিগত চার বছর যাবৎ তার পরিচারক—কারণ তখনও তাকে বিক্রি করা যায়নি—সেই বদর হল মুসলমান। খ্রিস্টান-মুসলমান-হিন্দু (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, এবং মাঝি মাল্লারা সম্ভবত তথাকথিত নিম্নতর বর্গ) সমভিব্যাহারে এই নৌকাযাত্রায় কোনো সদস্যেরই কোনো আপত্তি দেখা যায় না।

মধু সাধুখাঁ বাণিজ্যে চলেছে—বাংলার পূর্বপ্রান্ত থেকে—ধরলা, মানসাই পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র ধরে বরেন্দ্রভূমির কামতা-রাজ্য তার গন্তব্য। যাত্রা-পথের নৌকাবিহারের মনোরম সন্ধ্যাগুলি তার কাটে ইংরেজ পর্যটকের সান্নিধ্যে—বিভিন্ন আলাপে—মনের প্রকর্ষ সাধনে। মধুর মনের বহুমুখীনতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। মধু ভাবে—মধুর ভাবনার বিষয়ের মধ্যে আছে ইংরেজি ভাষা এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণ সম্পর্কিত কৌতূহল, ভারতে তামাকের প্রচলন এবং তামাক-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ। মধুর ভাবনার মধ্যে নিত্য ঘোরাফেরা করে বাংলার প্রাচীন ও সমকালীন (ষোড়শ শতক) সাহিত্যের প্রসঙ্গ, সতীদাহ প্রথা-র পাশাপাশি ইউরোপে ডাইনি পোড়ানোর প্রথার সমান্তরাল স্থাপনা করতে চায় সে। তার জীবন যাপনের অভ্যাসে মেজাজি, বৈঠকি, উপভোগ-সরস। এক ধরনের বাবু-বিলাসিতা আছে তার—যা ঠিক বড়োলোকি নয়। এলিট ক্লাসের একজন সদস্য হিসেবে তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু মধু সাধুখাঁর মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিকতা আমাদের চমকে দেয় যখন সে তার ফিরিঙ্গি সহযাত্রীকে বলে—"ধর্মেতে সেঁদিয়ো না বাপা, ও বড়ি গাড্ডা। আমরা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে দিই, মোরগে যা বলি।"

এ-সবের পরেও মধু সাধুখাঁর চরিত্রটি তার ইতিহাসের পট থেকে রক্তে-মাংসে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে তার জীবন-অনুভবে, জীবন বাসনায়। শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি তার মোহ

এবং নিরাসক্তির কারুকার্য মিশ্রিত ভালোবাসা তার জীবন বোধকে এক চিরন্তন দর্শনের মতোই আমাদের চিত্তে মুদ্রিত করে দেয়।

মধু সাধুখাঁর চোখে নদীতীরের সতীদাহের দৃশ্য কোনো ধর্মের আবেগ জাগায়নি। এই দৃশ্য সে তার সমাজ-চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছে। মধু ইংরেজ পর্যটকের সঙ্গে পৃথিবীর রাজনৈতিক ভূগোলের বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছে। তার ক্রীতদাস বদর-এর তরুণ শরীরের চিক্কণ নমনীয়তা তার মনে জাগায় নারী-সংস্পর্শবিহীন এই নৌকা-যাত্রায় নারীর অভাব। কিন্তু এই মনটিকে সে নিয়ন্ত্রিত করতেও পারে। অরণ্য প্রান্তিক নদীতীরে ঘাই হরিণীর টানে ছুটে আসা যুবক হরিণ ব্যাধের অ-দৃশ্য তীরে মৃত্যুতে ঢলে পড়ে; আর হরিণী 'ধীর-মন্থর'-গতিতে ঢুকে যায় বনের ভিতরে। এই ছবি তার মনে জীবনের গহন জটিলতার সৌন্দর্য এঁকে দেয়। যেমন দিয়েছিল জীবনানন্দেরও মনে। মধু বলে—"এমত দেখিছো আরু? এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয়।"—এই মধু সাধুখাঁ জলদস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভয় পায়নি। বিপদের মধ্যে পথ খুঁজে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রয়োজনে চার বছরের সঙ্গী বদরকে তুলে দিয়েছে অন্যের হাতে। এই সব কিছু নিয়েই মধু সাধুখাঁ এবং তার জীবনবোধ। উত্তর পুরুষের মধ্যে সে বাঁচতে চায় এবং তার শেষ প্রার্থনা—"হে প্রাণনেতা আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ, আবার দেখিবা দিহ, আবার"। মধু সাধুখাঁ একই সঙ্গে ষোড়শ শতকের বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাস এবং চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষার ইতিহাস হয়ে ওঠে। এখানে অমিয়ভূষণ-এর কমিউনিকেশন-এর অবলম্বন হয়ে ওঠে ষোড়শ শতকের সামাজিক ইতিবৃত্ত।

'নীলভুঁইয়া' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'নয়নতারা'-নামে পূর্বে প্রকাশিত) উপন্যাসটি দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৬) থেকে 'নয়নতারা' নামে পরিচিত। তাই আলোচনায় 'নয়নতারা' নামটি ব্যবহার করছি। এই উপন্যাসেরই দ্বিতীয় পর্ব 'রাজনগর' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪-তে। এখানে ইতিহাস তথ্য পরিগৃহীত হয়েছে উনিশ শতক থেকে। 'নয়নতারা'-র সময়সীমা ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮। ভূমিকায় লেখকের উক্তি—"তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে।"—কাজেই বলা যেতে পারে একটি বিধিবদ্ধ, ও গতানুগতিক ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখবার পরিকল্পনা করেছিলেন অমিয়ভূষণ। কিন্তু তাঁর লেখক চরিত্রের প্রবণতায় উপন্যাস দুটি হয়ে গেছে একটু অন্য রকম।

নীলাক্ত সমাজ বলতে তিনটি শ্রেণীকে বোঝায়। এক. নীল-ব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গরা, তাদের অনুগত ভারতীয় কর্মচারীবৃন্দ। মরেলগঞ্জের ডানকান, তার দেওয়ান মনোহর সিং ও তহশীলদার চন্দ্রকান্ত এই শ্রেণীর প্রতিভূ। ডানকানের কুঠির বর্ণনা ও নৌকোয় ব্রিটিশ শাসকের পতাকা উড়িয়ে দেবার ঔদ্ধত্য এই শ্রেণীটিকে অল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। দুই. দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় এই নীলাক্ত সমাজের অপর পিঠ। কিন্তু এই উপন্যাসে তাদের কথা প্রায় বলাই হয়নি। একটিমাত্র অত্যাচারের দৃশ্য আছে। নীলকুঠির সাহেব এক দরিদ্র এ-দেশীয় ব্যক্তির প্রতি সেই পীড়ন করেছে। কিন্তু কৃষক সমাজের সমস্যা একেবারেই প্রাণবন্ত হয়নি এখানে। নীল-অত্যাচারে রিক্ত কৃষকের প্রকৃত ইতিহাসের জন্য আজও আমাদের দীনবন্ধুর সেই অ-সামান্য নাটকটির কাছে ফিরে যেতে হয়। তিন. নীলাক্ত সমাজের তৃতীয় কোণ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী যাঁরা নীল অত্যাচারের প্রতিবাদে কিছুটা সরব হয়েছিলেন। এই দিকটাও উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়নি। দেওয়ান হরদয়ালের ভাবনায় হরিশ মুখার্জি ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর উল্লেখে এই দিকটি সামান্য উক্ত হয়েছে। কিন্তু সবকিছু জড়িয়েও এই উপন্যাসে

নীলাক্ত সমাজ থেকে যায় প্রান্তিক। কোনো অর্থেই এই উপন্যাসের অবলম্বন নয় নীলকর সাহেব বা হৃত-সম্পদ কৃষক। অবলম্বন হল উত্তরবঙ্গের একটি রাজ্য ও রাজপরিবার। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যই তাদের স্বাভাবিক জীবনধারা।

'নয়নতারা' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'রাজনগর'-এর কাহিনি শুরু হয় ১৮৫৯ সালে। রাণীর মন্দির-নির্মাণ ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়ে। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র রাজচন্দ্র। তার বেড়ানো, শিকার, প্রেম, কৃষ্ণাঙ্গ, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী স্কুল-শিক্ষক বাগচির শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী কেট্-এর সঙ্গে তার আলাপ ও পিয়ানো-বাজানো, রাজবাড়িতে রাণীর জন্মদিন-উৎসবের প্রস্তুতি, রাজচন্দ্রের বিবাহ-পরিকল্পনা ও উদ্যোগ, ঝড়ের রাতে রাজচন্দ্র-নয়নতারার মিলন—এইসব ঘটনার পর ১৮৬১-তে একটি ছেদ পড়ে। তারপর ১৮৮৩-তে রাজচন্দ্রের একটি ট্রেনযাত্রার চিত্রে শেষ হয় উপন্যাস। 'রাজনগর'-উপন্যাসেও সময়ের নথিবদ্ধ ঐতিহাসিক চিহ্ন আছে যথেষ্ট। সিপাহি বিদ্রোহ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ইনডিগো কমিশন, দেওয়ান হরদয়ালের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইংরেজি শিক্ষিত 'আলোকপ্রাপ্ত' বাঙালি মধ্যশ্রেণীর ছবি, ধর্মমত-সম্পর্কিত নানা বিতর্ক, নীলকর-অত্যাচারের নিষ্ঠুরতার একটি বিবরণ—সবই আছে।

যে উপকরণ লেখকের হাতে ছিল তাই দিয়ে নীলকর সম্পর্কিত চমৎকার একটি উপন্যাস গড়ে উঠতে পারতো। তা না হয়ে 'নয়নতারা' ও 'রাজনগর' হয়ে উঠল চমৎকার প্রেমের যুগ্ম উপন্যাস। সামন্ততন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তন বা ভাঙন ইত্যাদি দিকের ব্যাখ্যাতেও লেখকের মনোযোগ দেখা গেল না। প্রেমই এ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। নায়ক আঠারো বছরের তরুণ রাজকুমার রাজচন্দ্র, নায়িকা পঁচিশ বছরের 'রমণীরত্ন' নয়নতারা—গ্রামের ন্যায়রত্নের বোন। পাশাপাশি রইল রাণী ও পিয়েত্রোর সূক্ষ্ম প্রেমের সম্পর্ক, রাণী ও হরদয়ালের সূক্ষ্মতর-শ্রদ্ধা-প্রীতিময় সম্পর্ক, কেট ও রাজপুত্রের সখ্য-মধুর সম্পর্ক। সঙ্গে থাকল সেই পদ্মাতীরবর্তী উত্তর বাংলার প্রকৃতি ও রাজবাড়ির দীপ্ত সুন্দর বর্ণনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করলে এখানে মনে হতে বাধ্য যে পূর্ণ ইতিহাসবোধ আয়ত্ত করবার পথে অমিয়ভূষণের মনের গড়নে যেন কোথাও একটা দুর্বলতা আছে। রাজা, জমিদার ও অভিজাত সমাজের প্রতি তাঁর বেশ জোরালো টান। রাজবাড়ির মানুষজন আঁকেন তিনি। পোশাকের কারুকাজের প্রতিটি সুতো আলাদা আলাদা করে দেখান, কিন্তু রাজা ও প্রজার স্বতই বিরুদ্ধ-সম্পর্কের কোনো চিহ্নই থাকে না উপন্যাসে। রাজপুত্রের সঙ্গে গ্রামবাসিনী যুবতীর প্রণয় চলে অবাধে। গ্রামের মানুষ কথাটি বলে না। রাণী, রাজপুত্র, দেওয়ান—সকলেই ব্যক্তিত্ববান, বিচক্ষণ, বিবেচক, দয়ালু, পরিশীলিত-মানস। বাড়ির ক্রীতদাসটিও উৎসর্গিত প্রাণ। কোথাও নেই কোনো সংঘাতের আভাস। 'নয়নতারা' উপন্যাসে লেখক রূপবান নারী-পুরুষের সৌন্দর্য-বর্ণনায়; হাওয়া-ঘর, শিবমন্দির বা পদ্মবিলের বর্ণনায়; রাণীর পাল্কি-যাত্রা, রাজপুত্রের পিয়ানো বাজানো, এবং রাজবাড়িতে সঙ্গিনীসহ ওয়াইন কাপ মুখে তোলার বর্ণনায় এত বেশি সময় দেন যে চিত্রময়তার অপরূপতা সত্ত্বেও তা উপন্যাসটিকে যেন তা গতিচ্যুত করে, সময়-চিহ্নিত হতে বাধাগ্রস্ত করে।

কিন্তু অমিয়ভূষণের ইতিহাসবোধ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই আমরা প্রশ্ন করতে চাইছি এই প্রবন্ধে। ইতিহাসকে পুনঃবিবৃত করার জন্য তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেননি। ইতিহাসের সূত্রে নিজের কালের কোনো উপলব্ধিকে (স্বদেশপ্রেম, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সম্পর্কিত

সংশয় ইত্যাদি) রূপদান করবার জন্যও তিনি লিখতে বসেননি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস তাঁর কাছে এক অনুভব-সঞ্চার-শক্তি—এক সংবিত্তি বা কমিউনিকেশন। অমিয়ভূষণ প্রকৃতপক্ষে যা বলতে চান তা পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধের একটি উক্তি থেকে।—

"আমরা যাকে রেনেশাঁ বলেছি, কালচারাল রিভাইভাল বলেছি, এই যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঊনবিংশ শতকে যে সব পরিবর্তনগুলো হয়েছিল, যা নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এর মধ্যেও সৌন্দর্য, রূপবোধ এবং জীবন-ভালোবাসা—এগুলো এত মহার্ঘ যে বিভিন্ন সময়ের মধ্য দিয়েও এগুলি ফুটে ওঠে।" ('বিজ্ঞাপন পর্ব', পূর্বোক্ত)।

তাহলে অমিয়ভূষণ আমাদের উনিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করাতে আদৌ চাইছেন না। এমনকী উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসও তুলে ধরতে চাইছেন না তিনি। তিনি চাইছেন রূপবোধ এবং জীবন-ভালোবাসার উপলব্ধিকে পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে। তাঁর এই সঞ্চারের মাধ্যম হল ইতিহাসের উপাদান। ইতিহাস কখনই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অথবা বলা যেতে পারে এই দুটি উপন্যাস থেকে আমরা যে ইতিহাসকে স্পর্শ করবো তা প্রেম আর রূপবোধের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় জীবন-সৌন্দর্য-চেতনার উদ্ভাসন।

এই দুটি উপন্যাস আমাদের শোনাবে পুরনো দিনের কয়েকটি দরবারি সুর, দেখাবে হারানো অভিজাততন্ত্রের কিছু অন্তরঙ্গ ছবি। রাজবাড়ির উৎসব, বরকন্দাজদের যুদ্ধ-খেলা, অনেক হীরে-মুক্তো-পান্না-পোখরাজের পাথর শুধু নয়—তাদের দীপ্তিও। রাণীর পাল্কির আগে পিছে ছুটে-চলা, সাজ-পরা, হাঁক দেওয়া তোপদার; লাইব্রেরির আরাম-কেদারায় একদিকে পুরনো 'লণ্ডন টাইম্স্' অন্যদিকে দামি মদের গ্লাস নিয়ে আত্মমগ্ন হরদয়াল—এইসব দৃশ্যমালা ধ্বনি সমবায় ও কালবাহিত সৌরভ আমাদের মুগ্ধ করবে অনেকদিন ধরে।

যেহেতু অমিয়ভূষণ ইতিহাসকে তাঁর জীবনবোধ সঞ্চারের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছেন, সে কারণে তাঁর ইতিহাস-পরিগ্রহণের ব্যাপ্তি বহুদূর বিস্তৃত। এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয়গত স্পেশালাইজেশন-এ তিনি স্বভাবতই বিশ্বাস করেন না। অতিকথার যুগ (মিথিকাল) থেকে বিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশক পর্যন্ত তাঁর ইতিহাস পরিক্রমা চলেছে খুব সহজে। বিষয়ের দিক থেকেও অভিজাত-সামন্ততন্ত্র, রাজা এবং বণিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—জনগণ—গরিব এবং নামহীন জনতা তাঁর উপন্যাসে উপাদান হয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক সময় এবং বিষয়ের এই ব্যাপ্তিতে তাঁর সঙ্গে এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রও তুলনীয় হন না—অন্যদের তো কথাই ওঠে না।

'নয়নতারা'-'রাজনগর'-এর রাজকাহিনীর পাশাপাশি গণ-কাহিনীও লিখেছেন তিনি বেশ কিছু। 'দুখিয়ার কুঠি', 'নির্বাস' 'মহিষকুড়ার উপকথা' উল্লেখ্য। মনে পড়ে 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের শ্রেণী বিন্যাসের পরিকল্পনা। জমিদারের পাশাপাশি জমি আঁকড়ে থাকা কৃষক আর আদিবাসী সান্দার-দের বিবরণ সমপ্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসে। জমিদারদের তুলনায় এই গণচরিত্রগুলিই অধিকতর সু-চিত্রিত।

এই গণ-ইতিহাসের মাধ্যম ব্যবহার করে যে জীবনবোধকে অমিয়ভূষণ স্পর্শ করতে চেয়েছেন তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দুটি উপন্যাসকে অবলম্বন করবো। অথবা বলা যেতে পারে একটিই উপন্যাস দুই পর্বে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গের রাভা উপজাতির মানুষজন ও অস্তিত্ব

সংকট নিয়ে রচিত। 'বিনদনি' (সপ্তাহ, শারদীয়, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ) এবং 'মাকচক হরিণ' (শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) উপন্যাস দুটি একই চরিত্রদের নিয়ে লেখা ধারাবাহিক কাহিনী। এই দুটি উপন্যাস নির্বাচন করবার একটি উদ্দেশ্য এই যে, অ-সাধারণ এই লেখা দুটি আজও গ্রন্থাকারে অ-প্রকাশিত।

বোড়ো-উপজাতির একটি শাখা এই রাভা সম্প্রদায়। বর্তমানে তারা পশ্চিমবাংলায় আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে বাস করে। অসমের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপেও তাদের বসবাস। তারা মোঙ্গল গোষ্ঠীর মানুষ। 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রথম দিকেই অমিয়ভূষণ লিখেছেন রায়ডাক নদী পার হয়ে ভোটান, অসম, ব্রহ্মপুত্রের দুপারে বড়ো বড়ো ঘাসের জমিতে কোনো এক যুগে একদল মানুষ এসে পৌঁছেছিল।—

"তাদের ভাষায় হা-সাম মানে পৃথিবী, মাটি ভূমি—তৃণ তৃণাচ্ছন্ন, এক কথায় সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পৃথিবী। যাক সে কথা, কোথায় গেল তারা?"—কোথায় তারা গেল—কোথায় যেতে পারে—তাই নিয়েই এই উপন্যাস। রাভা-রা ছিল অরণ্যদেবতার পূজক। সুর এবং মাসাং ছিল তাদের দেবতা। কিন্তু ছিল বলছি কেন?—বলছি এই কারণে—এই আদিবাসী রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজ কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান। যে অঞ্চলে যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ধর্মই নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। অন্যথায় তাদের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অন্তরে তারা সকলেই রাভা কোচ। উপন্যাসটিতে দেখা যায় দুই মেমসাহেব গবেষক রাভাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তল্লিগুড়ি গ্রামে এসেছেন। রাভা থেকে হিন্দু হয়ে যাওয়া বুদিনাথ দাস ক্ষোভের সঙ্গে জোন ম্যাডামকে বলে—"সেই রাজারাই তো রাভা-কোচদের সর্বনাশ করেছে। জাতিটাকে হিন্দুর সঙ্গে মিশাইদিছে।"—এখানে বুদিনাথ হিন্দুদের থেকে আলাদা করতে চায় নিজেকে; আবার কোচবিহারের রাজবংশ যাঁরা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু হবার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তাঁদের সঙ্গেও নিজেদের আলাদা করেছে। পৃথিবীর সব জাতিগোষ্ঠীতেই ধনী আর দরিদ্রের একটি বাড়তি জাতি-বিভাগ আছে—এই সত্যও এখানে স্পষ্ট হয়ে যায়। ম্যাডাম যখন বুদিনাথকে আবার স্মরণ করিয়ে দেন—"তুমি তো আছো হিন্দু",—তখন বুদিনাথ বলে—"আমাদের রাইত্তক পূজা করিতে পর্ক মাংস, চকৎমদ লাগে।"—স্পষ্টতই বুদিনাথ হিন্দু হয়েছে কিন্তু হতে চায় না হিন্দু। হিন্দুরা শূকর-মাংস পুজোয় ব্যবহার করে না, কিন্তু রাভা-রা করে। বুদিনাথ নিজের রাভা-সংস্কৃতি এভাবেই প্রকাশ রাখতে চায়।

ধর্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বেড়েছে বহুগুণ। রাভা সমাজে জমির অধিকার নারীর। মায়ের জমি পায় মেয়ে। অন্য সব সমাজে বাপের জমি ছেলে পায়। ফলে রাভারা যখন হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান হল তখন তাঁদের বহু প্রজন্ম বাহিত সংস্কার এবং মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে বহির্জগতের এক সমাধানহীন দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। তফশিলি গোষ্ঠী হিসেবে নাম লিখিয়েছে তারা। কিন্তু সম্পত্তির হিসেব দেওয়ার সময় বিপুল সংকটে পড়ে গেছে। কোন্ জমি কোন্ অধিকারে কার হয় তা যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে না পারায় তাদের জমি ক্রমশই হস্তগত হয়ে যাচ্ছে অন্যের। এভাবেই রাভা সমাজে দেখা দিচ্ছে অন্তর্বিরোধজনিত দুর্বলতা।

উপন্যাস দুটিতে রাভা নারী-পুরুষের এই অস্তিত্ব সংকটকে একেবারে ভিতর থেকে তুলে ধরা হয়েছে। দিন বদ্‌লায়। রাভা মানুষগুলি ক্রমেই সংখ্যালঘু থেকে আরও সংখ্যালঘু হতে থাকে। উত্তর বাংলার অন্য গোষ্ঠীগুলি তাদের কখনও নিজেদের লোক বলে গ্রহণ করে

না। জমির আন্দোলন দেখা দিতে থাকে। জোরদার হতে থাকে পুলিশি ব্যবস্থা। চিরকালীন সংস্কারবশত শাশুড়ি বিনদনির জমিতে গোপনে কৃষিকাজ করতে যায় খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া জামাই জনাদন। সেখানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল তার। 'বিনদনি' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এখানে।

"মাকচক হরিণ" উপন্যাসটি এর পর থেকেই শুরু। মাকচক রাভা শব্দ। তার অর্থ হরিণ। 'মাকচক হরিণ' অভিব্যক্তিটির মধ্যে এক একাকীত্বের ব্যঞ্জনা আছে। 'রাভা হরিণ'। উপন্যাসটিতে আছে এক সঙ্গীহীন প্রতীকী হরিণ। তাকে ধরে রেখেছে বীজেন্দ্র। উপন্যাসের শেষে বীজেন্দ্রের দিদির ছেলে প্রদ্যুম্ন সিংহ—রাভা সম্প্রদায় থেকে উঠে এসে যে সমাজে কিছুটা জায়গা করে নিতে পেরেছে—করুণভাবে বলে—"যত পয়সা লাগে মাকচকটাক ছাড়িদে। দূর বনে নিয়া যা। এটে নাই দোসর, নাই হরিণী, দেখ হয়তো আট-নও বছর বয়স হয়া যায়। উয়াক ছাড়ি দে, মামা। বনত চলি থাক। ছাড়ি দে।"

এভাবেই উপন্যাসটির প্রতীকী সমাপ্তি হতে পারতো। রাভা সম্প্রদায়ের নিঃশব্দে লুপ্ত হয়ে যাবার ইতিহাসে। কিন্তু অমিয়ভূষণ আমাদের তীক্ষ্ণভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই বিলোপ স্বাভাবিক নয়। অন্‌-আদিবাসী ভারতীয়রাই তাদের হত্যা করেছে। আদিবাসীদের আপন বলে গ্রহণ করতে পারিনি আমরা। রাভা থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া বমভোলা এক জায়গায় দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশ-বিভাগের পরে পূর্ব বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানেরা অসম এবং উত্তর বাংলায় নিজেদের বসতি যখন স্থাপন করেছে তখন কিছুকালের মধ্যেই তারা স্ব-জাতীয় বলে গৃহীত হয়ে গেছে এই দেশে। বহু বহু বছর আগে থেকে এ দেশে বাস করেও রাভাদের কেউ স্বজাতি বলে মনে করেনি।

দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি তীক্ষ্ণতর। 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসের শেষে সংযোজন হিসেবে সেটি রেখেছেন অমিয়ভূষণ। অর্থাৎ কিছুতেই যাতে পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়, সেভাবেই উপস্থাপিত করেছেন এই অংশটিকে। সেখানে পাই বিনদনি-র কাছে লেখা জোন ম্যাডাম-এর একটি চিঠির প্রসঙ্গ। বিনদনি-র জামাই জনাদন বা জনু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। থাকতো মিশনে। ম্যাডাম-এর ভাষায়—'ফাইন স্পেসিমেন অভ্ রাভা হুড'। কিন্তু ম্যাডাম-এর একটি দামি ঘড়ি চুরি যাওয়াতে তিনি খবর দিয়েছিলেন পুলিশে। পুলিশ এসে তল্লাসি করেছিল জনুকে। গরিব রাভা ছাড়া কেই-বা চুরি করবে ঘড়ি! নগ্ন করে তল্লাসি করেছিল। সেই অপমানে জনু মিশন ত্যাগ করে। পরে ঘড়িটা পাওয়া গিয়েছিল গাড়ির মধ্যে। ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন জোন ম্যাডাম। কিন্তু ততদিনে খ্রিস্টান জনু তার রাভা শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে বিনদনি-র জমি রক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং নিহত হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। এমনি করেই আদিবাসীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুছে যায় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

অমিয়ভূষণ রাভা সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের জ্ঞান নিষ্কাশন করে যে জীবন-সত্য তুলে এনেছেন তার শৈল্পিক সংবিত্তি আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন এই উপন্যাস দুটিতে। এ ভাবেই ইতিহাসের অমিয়ভূষণ প্রকৃতপক্ষে জীবন-দার্শনিক অমিয়ভূষণ রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হন।

## দিনান্ত যখন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ছাড়তে কারও ভাল লাগে? এ কি একটা প্রশ্ন হল নাকি?
যে-সূর্য সমস্ত দিনমান
জ্বলজ্বল করেছে, এই শেষবেলাতে তারও
মুখখানিতে দ্যাখো
কীভাবে ছড়াচ্ছে বেদনার
রক্তরং।
পৃথিবীও এই মুহূর্তে একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে।
না গাছপালা, না নদী, না ধুধু প্রান্তর, না মানুষ,
কেউ কথা বলছে না।
ছাড়তে ভাল লাগে কি না, এ কি একটা প্রশ্ন হল নাকি?

তার মানে কি এই যে, আমরা সব্বাইকে আঁকড়ে ধরে রাখি
সমস্ত জীবন? তা তো নয়।
মাঝে-মাঝে ঝগড়া করি, মাঝে-মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়।
এ ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাই। গেলে
শিকড়ে প্রচণ্ড টান লাগে।
বুঝতে পারি, গণ্ডগোল ঘটেছে কোথাও।
সারাদিন দূরে থেকে সন্ধ্যালগ্নে তাই দ্যাখো আবার
ঘরে ফিরছে পাখি।

## অমিল থেকে মিলে

(প্রয়াত কবি মণীন্দ্র রায়কে মনে রেখে)

রাম বসু

সমিল পয়ার আমি লিখি নি অনেক দিন
মিল খুঁজতে গেলেই অমিল
নিখিল বলে ডাকলে অন্য কেউ হয়তো বেরিয়ে আসবে
যে নিখিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু
সে নাকি এখন অখিল
এমন কি যে জগৎ আমাকে পালন করেছে
সে এখন এক পাহাড়ী নদীর ধারে
আলো ছায়ার শতরঞ্চিতে বসে
আমার দাপনার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়
তারপর হাতের ওপর মাথা রেখে কাৎ হয়ে শোয়।

এই সব তুমুল ধ্বংস আমার আশ্রয় এখন
এই সব তৈমুর ঢেউগুলো আমাকে উলটে পালটে
নিয়ে যায় উপাধিহীন সত্তায়
লতানো লাউ-এর মাচায়
ঊষার প্রতিভাসম্বিতে
এবং শ্রদ্ধায়।

আর এই সব ঘটে গেল বলে আমি চমৎকার নিঃসঙ্গ
নিজের সঙ্গে ভাব জমাই
আমি একই সঙ্গে অখিল নিখিল
মৌখিক জীবন থেকে সরে গিয়ে
গীত-মুখরিত শিকড়ে-বাকড়ে
হেঁটে বেড়াই।

সেখানে সময়ের উপস্থিতি
দুপুরে ঘুঘুর চোখে
রাতে কচলানো লেবুর পাতায়।

বানানো মিলের থেকে প্রখর অমিল
অদৃশ্য বিদূর।

## তুমি গ্রহণ করো

**কৃষ্ণ ধর**

কিছু শব্দ তোমাকে উপহার দিই
তোমার গ্রহণেই তার মর্যাদা, এই তার সমর্পণ
চমক পাবে না তাতে, পাবে কিছু মেঘ, কিছু রৌদ্র
বিপন্নতা কুয়াশাও পাবে, কান পাতলে শুনতে পাবে
তার বুকের ধুকপুকুনি, বড়ো ব্যথা তার

একে তুমি আপন বলে মানতে পারো
গোপন কথাও তাকে বলতে পারো অনায়াসে
সাদাসাপটা শব্দগুলির নিজস্ব কিছু জায়গা আছে
নিজস্ব আকাশে দেখতে পায় শুকতারা

ঘুমঘোর থেকে তুলে এনেছি এদের বেছে বেছে
রাতের পোশাক ওদের গায়ে
ভোর হলেই সব পাল্টে যাবে তুমি দেখে নিও

ওরা কোনো ম্যাজিক জানে না
আপনজনের মতো ওরা তোমাকে ঘিরে রাখবে
তুমি ওদের গ্রহণ করবে, শুধু এই সমর্পণ
তোমার আবহে ওরা ঠিক মানিয়ে নেবে নিজেদের
তুমি নাও শব্দগুলি

## অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা

### চরাচর

পাথুরে কাঙাল মাঠে মাথা তোলে অফুরান ঘাস
তাদের জন্মের কথা যেন ঠিক মানুষের মতো
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ধুলো শান্ত শীত রৌদ্রে...বারোমাস
যেমন মানুষ বাঁচে—যতো মরে, জন্ম নেয় ততো

গ্রামে যাও—ক্ষেতে, আলে যেরকম জলের সুবাসে
মেঘ ছেঁচে চাষা আনে বছরের শস্যের ফসল,
তেমনই তো এইসব ঘাসে ঘাসে পরিত্রাণ আসে
যেমন বন্যার শেষে কাজে নামে আবার লাঙ্গল।

কথাটা সহজ খুব, সহজ কথার থেকে সোজা
তৃণঘাস মানে তাই—মাটিকাটা প্রবল জনতা
পাতালের তালা ভেঙ্গে খুলে দেয় সবুজ দরোজা
নিরন্ন মানুষে ঘাসে পৃথিবীর একই আত্মীয়তা।

কঠিন কংক্রীট কেটে ঘন হয় ঘাসের জগৎ
শহরেও বেড়ে যায় মজুরের মত বুনোঘাস
ঘাসে ঘাসে জ্বলে ওঠে আন্দোলিত হরিৎ শপথ—
গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছোটে ঘাসের উল্লাস!

সূর্য চাঁদ শীতে ও খরায় দেখি বন্যা বর্ষাজলে
মৃত্যুর সন্ত্রাস ভেঙে মানুষেরা যুদ্ধ জয় করে,
রাতের তিমিরে কাঁপা লণ্ঠনের মুগ্ধ বাতি জ্বলে।
ভোরের শিশুর মত চারাঘাস নাচে চরাচরে।

---

এই লেখাটি প্রয়াত কবির স্ত্রী শ্রীমতী ভারতী চট্টোপাধ্যায়-মারফৎ পাওয়া গেছে।

# বাজি ধরার কথা

তরুণ সান্যাল

বালকবেলায় হয়তো নামই শুনেছিলাম
না সীতা হেলেন নয়    অন্য কেউ হবেন
এপিকতো গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভই মাঝনদীতো আওরতই
রক্তে কোনোদিন কেউ বিস্ফোরক দেশলাই ছুঁইয়েছে

বেজে উঠেছে কোনো মধ্য শীত রাতে সানাইয়ে দরবারি
জ্বলে উঠেছে লাইন-লাইন গ্যাস লাইট
না সেও আমার জন্যে গৌরীঘটে অপেক্ষা শেখেনি

কেউ বলেছে বিপ্লব অমনিই তারও প্রত্যাশা অমনিই
ঘরে-বাইরে ভালো লুঙ্গি দুধসাদা পায়জামা পরো
    মানুষের খুব কথা বলো বলো মানুষই মানুষ

তা বেশ তোমারও সন্ধ্যায় জুটলো এক বাটি দক্ষিণ হাওয়া
    এক হাতা বৃষ্টির মেঘ
        দু হাতা পাগাল খরা মাটি

আমিও তো বুড়ো হচ্ছি
আমার জন্যেও ঐ ঝিমঝিম চাঁদের আলো কেষ্টপুর থেকে দৌড়ে আসে
এবং দু-হাইরাইজে সুঁড়িপথে গা ছমছম ভোর
সাত সকালে কলেজ স্টপে সূতা শঙ্খ মাপ উনুনে ধোঁয়া

রাত্রি এক পা তুলে দাঁড়িয়ে    'এসো'
ও তোমাকে সঙ্গী হতে ডাকছে    'চলো চলো'

অথচ উষার হাত তোমাকে তোলপাড় করে টানে
'যাবে না'? উদ্বেগ হয়ে ভয়কাতুরে ছোঁয়া দিয়েই
        সরে যেতে চেয়েছে
ধরো ওকে ধরো
ও এখন বাঘিনী  আশমান জমিনে যাকে ডোরা শাড়ি মেলা ভেবেছ

## সে ওরই শরীর

তুমি বুকে ঢিব ঢিব শুনছিলে ওসবও শুনেছে
সে তোমাকে খাবে ও হবে কবিতা

জঙ্গলে প্রমোদ ট্যুরে এলে দু-একজন হর বছরে খায়

ওকে তুমি পোস্ট মডার্ণ সেক্স হীরাটিরা বোলো
নাকি ওকে প্রেম বলতে সাবেকি ভাষায় ডায়মণ্ড কাটা বালায়
যা ইচ্ছা তা বোলো

সমুদ্র কেমন উপছিয়ে আসছে কোটালের গাঙ
ঢঙ ঢঙ বন্দরে ওয়ার্নিং
ঐ পানশি হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে
ছোট নদী পাড়ি দিয়ে বড় নদীতে পড়ে
এখন স্বচ্ছন্দে তুমি ঠিকঠাক হাল ধোরো হাল ধরতেও শেখো
তুমিতো ভাটিতে যাবে স্রোত তোমাকে নেবে

এই যে তুমি হাজার বছর আগে কবিদের আদিখ্যেতা শুনেছ
কায়া তরুবরে পাঁচটি ডাল
তা তুমি পাঁচটি ডাল থেকে কতো পাঁচশো কলম বানালে
ও চাইছে আবার তুমি জন্ম নাও
ক্লোনিং নয় ও চাইছে পুরুষ-নারীর এক ছিমছাম পাগলামি

দৌড়ে আসছে রক্তবীজ না আমরা তো হেরে যাইনি
প্রথম রাউণ্ডে ওরা নম্বর বাড়িয়ে নিয়েছে
আরো ঢের রাউণ্ড বাকি নানা ট্র্যাকে

তৈরি হচ্ছি তৈরি আছি এসো।

# নতুন কিছু ভাবো

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিরক্ষা কমিটির কাছে আমার আবেদন ছিল :
কী দরকার, মানুষটাই যখন নেই
তখন তার খড়ম আর ছাতা, তার ব্যবহৃত চশমা
আর বাঁধানো দাঁত—
লেখার টেবিল, মাদুর আর আয়না
আমাদের কী কাজে লাগবে!
বরং ভেবে দেখ, তার অসম্পূর্ণ কাজ
শেষ করা যায় কিনা,
তার সংস্কারের ভাবনা যদি আজও প্রাসঙ্গিক থাকে
তাকে এগিয়ে দেওয়া যায় কিনা।
দিন দ্রুত বদলাচ্ছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই
জঙ্গল গজিয়ে উঠছে উঠোনে,
উই ধরছে বইগুলোয়, ইঁদুরে খেয়ে নিচ্ছে তক্তপোশ—
কী দরকার—
যা গেছে তাকে চলে যেতে দেওয়াই উচিত—
বরং নতুন প্রজন্মের জন্যে নতুন কিছু ভাবো
ওরা তো পেছন ফিরে চাইবে না।

স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্যেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় :
মৃত্যুকে স্বীকার করতে একদম রাজি নয় তারা
পেছন দিকেই তাদের স্মৃতি, তাদের ভরসা,
সামনে অনিশ্চয়তা আর অচেনা মানুষদের নিয়ে ভয়।

# টহল

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মেঘে ধ্বনি থাকে, ধ্বনি থাকে সমুদ্রকল্লোলে
পাখিও ধ্বনিত হয় কাকলীসকালে
বাণীহীন ধ্বনিযন্ত্রে সপ্তসুর যে জাগায়
তার কাছে ধ্বনি জীবনের ধর্ম হয়ে যায়,
আসলেতো পতঙ্গ পশুর থাকে ধ্বনি স্বরগ্রাম
তাদের তদ্ভব দুঃখ, তৎসম মুখ যদি চিনতে পারতাম
আমি শব্দে এনে বসাতাম,
শব্দের নিজস্ব কোনো স্থায়ী অর্থ নেই
এই যে ধ্বনি থেকে ক্রমশই ভাষায় পৌঁছানো—সেই
ভাষায় মানুষ নানা অর্থ যতিচিহ্ন বসিয়েছে, তবু অবক্ষয়ের কোনো
অপরিবর্তনীয় নেই, কবিতা এখনো
বিভিন্ন কলমে ভিন্ন অর্থ হয়, হয় মায়াবী জীবনও
যেখানে জল পড়লে পাতা নড়ে, আমাদের চতুর্ভুজ ঘরে
গন্ধ বেড়াতে আসে, ঠিক তখনি ধ্বনিগুলি অক্ষর গড়ে।

## দুই

আসলে আমি কি চাইছি? আমি কি ফিরতে চাইছি
মানুষের বন্য সূচনায়!
না, তা বোধহয় চাইছি না, বোকা খুশি কিংবা বাধ্যতামূলক বেদনায়
বেঁচে থাকা আমাকে কি দেবে আর এতগুলি
মৃত বছরের পর। আমি ভাষা বসিয়ে জীবনের শুরু শেষ বলি
অথচ না হন্যতে হন্যমান যে জীবন আমার একার
সে জীবনের গায়ে বহু মশা মাছি অমানুষ এসে লাগে,
দেখা অদেখার
ভুল প্রণয়ন বারবার শব্দের অর্থ বদলে দেয়,
ধ্যান আর অভিধানে থাকে না
তারা বৃক্ষলতায়, মেঘের নিসর্গে ফিরে যায়
ছন্দে তখন আর নৈঃশব্দ বাজে না!
ছন্দের উপলক্ষ কি নারী, যার চোখ থেকে পাখি উড়ে গেছে,
স্তন থেকে সূচনার শিশুগুলি পুরুষ হয়েছে

যে পুরুষ অবতরণপ্রিয় জীবনের তোরণে পৌঁছেছে
যোনিমণ্ডলেই হাবা শব্দ শেষ থেমে গেছে!
তারপর আবার চলতে চলতে শ্মশানের আগুন পেরুলো
আগুনই মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার! আলো
সেই আগুনেরই গুণ, এই গুণ ক্রমে ক্রমে ধ্বনিকে বদলালো!

**তিন**

একটি অনিন্দ্য শিশু আপন মনে নাচছে গাইছে
তার হাত গাইছে, পা গাইছে, সমস্ত শরীরই গাইছে
সে কিছুটা ধ্বনি, খানিকটা শব্দ, সাধ্যমত সুর,
সে পেয়েছে আকাশকে
শিশুতো পাখির জন্য নাচে, ফুলের জন্য হাসে, তাকে
আমি কি বিরক্ত করবো অভিধান ভাঙা সব বিশেষণ দিয়ে,
নেবো কোনো ধ্বনিমগ্ন মুগ্ধবোধ কবিতা বানিয়ে!
না, তা বোধহয় পারবো না, তবু সেই অর্ধস্ফুট ধ্বনিদের
শব্দ হতে ডাকি, শিশুর সাহায্য চাই
আমি যে অস্মাদ বাঁচবো তাদের সাহায্য ছাড়াই
সম্ভব? এই যে প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে
নিসর্গ সাহায্য চাই যাতে মন আবার মান হয়ে ওঠে
তা অবশ্য প্রত্যেক সূর্যেই পারি না, তাই
আমার এখনো বহু সমার্থবোধক শব্দ চাই।

**চার**

আজ আমি অতীতবাদী, যে পূর্বতন সদ্যতনে আছে
সেই অতীত তো ভবিষ্যতের আনাচে কানাচে
জেগে থাকবেই। কোনো কোনো জন্মছোঁয়া নদী
হয়তো শুকিয়ে যাবে, কোনো তটিনীর নবজন্ম হবে, যদি
তাকে সসাগরায় পৌঁছে দিতে পারি, তবে
আমার সাক্ষরগুলি জন্মেজয় হবে।
একদিন যুবদিনে নিশানকে বিপ্লব ভেবে গুলি আর টিয়ারগ্যাসের
মানুষ-ধাক্কানো ধোঁয়া আমাকে অনেকবার নিশ্বাসের
বিশ্বাস ভাঙতে চেয়েছে, আমিও দিকদখল দৌড়ে—যেন
রাস্তার অলিগলি নয় আমি যুগকে মাড়াচ্ছি—যেন
এভাবেই ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা দেশের

ক্রমমুক্তি হবে, ক্রমমুক্তি না ভ্রমমুক্তি! জীবনের
নির্মাণ ভেঙে আমি কেন বিনির্মাণে পৌঁছুলাম, যেখানে
পার্লামেন্টে মাত্র আশি-পঁচাশিজন লেখাপড়া জানে
তথাকথিত গ্রাজুয়েট, বাকি সব আনপড়, লিখেছে কাগজ! রাগের আগুনে
পুড়ে দুঃসংবাদপত্রগুলি না পড়েই সের-দরে বেচে দিই, কেবলি
লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অপহরণকে শিল্প হতে দেখি আর জ্বলি।

**পাঁচ**

আমি যে ক্রমশ হয়ে উঠছি ছাই
তা কেউ বুঝতেই পারছে না, না পারুক, আমাকে একাই
যেখানে পৌঁছুতেই হবে তার নাম নিজস্ব স্বদেশ
সেই দেশে আমি একা নাগরিক, একাই শাসক, উদাসীন বেশ
যে নাকি শব্দ লেখার আগে প্রত্যাদেশ চায়,
জানে, আকাশ কখনো তাকে
লিখবে না, তাকেই লিখতে হবে নীলিমানিমগ্ন মেঘ, তাকে
হাতের নিশানাটিকে ধ্বজা করে তুলতে হবে, ধর্মধ্বজা নয়
নয় খরবায়ু লাগা কোনো মন্দির-মসজিদ নাড়ানো সময়।
এ হলো "উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে"
অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর বাণীকুশল গান
এখন আর কিছুই শুনবো না আমি, সুরে হবো স্নান।
এই শেষ হওয়া বয়সে পৃথিবীকে শিখে ফ্যালা বিষাদ প্রদোষে
"আমারে তুমি অশেষ করেছো, এমনি লীলা তব" মনে রেখে
আবার মহান মুদ্রাদোষে
সাদা কাগজের শূন্যস্থান পূরণ করতে বসবো
শব্দগুলি আর হয়তো পুরানো থাকবে না আমি লিখবো
গায়ে-গতর শ্রমময় মানবকাহিনী, এইসব মানুষই দোসর
যারা আমার এক অক্ষরও পড়তে পারবে না, তবু তাকে ডেকে ডেকে নিজস্ব অক্ষর
পড়ে শোনাবো, বলবো, এসো, তোমরা আমার দুপাশে এসে বসো।

"যাবার সময় হলো এ বিহঙ্গের", ভালবেসে
একবার শুধু তার ডান-হাতটি ছুঁয়ে দাও, যাতে সে
এক-উচ্চারণ মিথ্যাও না লেখে, আর
লেখার সমান সৎ হয়ে উঠতে পারে আবার।

## যেখানে জন্মেছি

শ্যামসুন্দর দে

আমি যদি মেঘের ভেলায় চেপে
পাড়ি দিই
দূর দূর নক্ষত্রের দেশে
তখন কি থাকবে মনে
এ পৃথিবী
সবুজ বনানী ঘেরা
নদীর সমুদ্র অভিযান!
আমি তো দেখেছি
কত না বাহার আকাশের
ভোরের আলোক থেকে
গোধূলির রঙ,
ডানা মেলে উড়ে যায় পাখি
অসীম নীল সাগরে
ফিরে আসে সন্ধ্যার আভায়
ভালোবাসার আলয়ে
আমি তো দেখেছি
কী কঠিন শ্রমে জন্মেছে ফসল
মানুষের কত রক্ত
কত ঘামে,
লোভের করাল ছায়া
সব কিছু লুটে নিতে
দেখেছি অধিকার জয় করতে
মানুষের জীবনের পণ!
আমার জীবন-তার
সেই মুখর জীবনের সুরে বাঁধা
সবুজ ঘাসের শিষে ফড়িঙের আনাগোনা
রাতের শিশির বুকে ভোরে ঝরে
শিউলিরা টুপটাপ,
শরতের মেঘ ছায়া ফেলে
হাওয়ায় হাওয়ায় দোলা কাশফুলে

প্রখর গ্রীষ্মের দিন
পাতার আড়ালে কোকিলের ডাক
সহচরী আমন্ত্রণে
নীরব দুপুর জুড়ে
কৃষ্ণচূড়া উদ্ধত ঘোষণা
আমার পৃথিবীর সীমা
আমারই মনন গভীরে।

আবার ফিরে আসব
নক্ষত্রের সাথে মিতালির শেষে
যেমন অনন্ত পরিক্রমা অবসানে
পাখি ফেরে নীড়ে
তেমনি আসব ফিরে
মাটির গভীর টানে।

আমি যে জন্মেছি
এই ধরণীর ধূলায় ধূলায়।

## কে বইবে

**বিতোষ আচার্য**

অশ্রুর প্রপাতে নেমে লবণাক্ত জলে চক্ষু ধুয়ে
যে চেখেছে স্ফটিক হৃদয়—সে যে নিরুদ্দেশ হল
বহুকাল;
ভেবেছিল, সবেগে দুর্বৃত্ত কাম আছড়ে পড়ে
তনুতটে
সবকিছু তছনছ করবে চেটে খাবে শিকড় অবধি...
এ যে কী নিটোল ফাঁদ ছড়ানো ভুবনে :
অনশ্বরা অঙ্গের আঙনে রমণীয় শিষ্ট ভাঁজে
ভাঁজে
কী করুণ অসহায় আর্তি যে লুকানো থাকে

যে বোঝে সে আর ফেরে না
ফেরে না, ফেরে না।

এত যে অনন্য কথকতা চেপে বসে
স্মৃতির জাঁতায়
কে বইবে তার ভার, উত্তরাধিকার।

## দৃশ্যের ভিতরে যাই

**নন্দদুলাল ভট্টাচার্য**

১। খড় বোঝাই নৌকো পালতোলা বিদ্যাধরীর খালে
ভেসে আসে সুন্দরবনের থেকে প্রবল জোয়ারে
ঝড় শেষে ঘর ছায় কিছু থাকে গরুর গোয়ালে
চাষিদের পাড়া গড়ে ওঠে অনেক মানুষজন
ক্ষীণ হতে থাকে এখানের নলখাগড়ার বন।

সবুজ ধানের চারা মিষ্টিজল ঘাসের খোঁয়াড়ে
নীলাভ চিংড়ির দাড়া খুঁটে খায় খুদে জলপোকা
মাছ ধরে কোলাহল মেয়েদের শাড়ীর আঁচল
ভরে ওঠে কলমিলতার আর হেলেঞ্চার ভারে
কচুরিপানায় ঠেলে তালডিঙি বৈঠায় সফল।

২। পুবের ইছামতী ভাটির টানে চলেছে দক্ষিণে
বাদামি পালে উত্তুরে হাওয়া নৌকো বোঝাই পণ্য
স্থির বনের রেখা পেরিয়ে আসছে সারসদল
তুলোর মেঘ ভাসছে এপারে ফেটে শিমূল ফল
মনের সেতু বেয়ে ওপারে নামি নারকেল বনে।

গোয়াল ঘরে জাবর কাটে কালোধলো গাই
কবিয়াল দলে গাইতে গেছে আনোয়ার ভাই
চালে লাউলতার ডগায় লীলায়িত সবুজলাবণ্য
সন্ধ্যার আজান শেষ হলে ঢাকে কাঠি দিচ্ছে ঢাকী
পোড়ামাটি মণ্ডপে বিসর্জনের বাজনা বাজায় টাকী।

## কল্পবিজ্ঞানের গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়ছিলুম। উপহার-বাজনার
ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে কল্পনায় উড়ে যাওয়া...
ডিজিটাল কম্পিউটার আজকে ঘরে ঘরে।
খেলা ছবি পদ্য—অনায়াস ইচ্ছেসুখে
নিশ্চিন্ত লোকের লঙ্গ-দারচিনির দ্বীপ।
তামাশার মাইফেলে কুঞ্জ ঘেরা ঘেরা স্ন্যাক্‌বার, গা ঢাকা
বিচ্ছুরণে ফুলে উঠছে শাঁখসাদা আদ্ধি, বালুচরী,
মায়ামঞ্চে ফটিক-পুতলির মতো সঞ্চালিকারা...
গলা উঠছে না কেন? লাসবেশ কিচ্ছু নেই তাও
আমন্তন্ন—সেই বা কী সুবাদে?
অস্ফুটে যা বলো, খালি নিজেকে গেলা আর উগরোনো।
নিবে বসে আছে পুরো উদ্‌গ্রীব সংস্কৃতি।
বিবেক তাসছে মনে মনে : নেমে যাও—
সঞ্চারী না হও, সামবায়িক আবেগও না পারো তো
নেমে যাও। দোর দিয়ে ঘরে ব'সে
জীবনমুখীর সঙ্গে সফ্‌ট্ পর্ন চালিয়ে
হালচালে দুরন্ত হও। উলুটিপালুটি যূথাচারে
রঙে রঙে ওঠা-নামা ক'রে এসো কতক্ষণ
পরিষেবা-শিবিরের মাইক্রোফোনে।

## এখন আদিগন্ত

### শান্তিকুমার ঘোষ

ফাল্গুন আসবে ফের
ফুল নিয়ে, গান নিয়ে।
যদিও থাকবো না আমি
কালের নিয়মে।
প্রণয় আমার একটি আধারে আর
পড়বে কি বাঁধা,—
ছাপিয়ে ছড়িয়ে যাবে
মানবমণ্ডলে।

ছিল আরোহণ এ পর্যন্ত
ভালোয়-ভালোয়,
দিনের চাইতে রাত্রি উজ্জ্বলতর
অবরোহন-কালে।

এখন নক্ষত্রমালার নীচে
আদিগন্ত খোলে রূপ নয়নমোহন :
জাগে শৃঙ্গে-শৃঙ্গে বজ্রগর্ভ আগ্নেয় সঙ্গীত।

# ই ঈ

## কার্তিক লাহিড়ী

রিটায়ারমেন্টের পর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সময় কাটানোর, অথচ একসময় সে দিব্বি পাড়ি দিতে পারতো সময়কে, তখন কোথা দিয়ে কেটে যেতো সময়—টেরও পেতো না—দিনের পর দিন মাসের পর মাস গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত অমাবস্যা পূর্ণিমা কোথা দিয়ে চলে যেতো—ফাল্গুনী কি তার হিসাব রাখতো, নাকি দরকার ছিল হিসাব রাখার? তবু সময় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে ফাল্গুনীকে বেশ কারণ

তখন সকাল থেকে উঠেই তাড়া, মধ্যে মধ্যে চোখ চলে যায় ঘড়ির কাঁটায়—সময়ের ধারক ও রক্ষক ঐ ছোট্ট যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ করছে চলা ফেরা, কাঁটা যত পেরিয়ে যেতে থাকে ঘণ্টার ঘর, তত দ্রুত সারতে হয় অপিস যাওয়ার আগের কাজকর্ম, তারপর অপিস যাওয়া

তারপর অবশ্য ঘড়ি কিংবা তার কাঁটার দিকে নজর রাখার দরকার পড়ে না, এমন কি পাঁচটার সময়ও নয়, কারণ কাজের চাপে ভুলতে হয় সময়, অন্যদের ছুটির সময় পাঁচটা, কিন্তু তার কাজ সারতে সারতে ছ-টা সাড়ে ছ-টা সাত-টা বেজে যায়, এখানে সময় তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, সময় তখন দাঁড়িয়ে থাকে ঐ পাঁচটায় তার বেলায়, যেন ছ-টা সাড়ে ছ-টা তখন হয় পাঁচটা—ছুটির সময়ই তো ঐ পাঁচটা, দশটায় ঢোকা পাঁচটায় বের হওয়া...

তারপর সময় বেপাত্তা হয়ে যায় ফাল্গুনীর চৌহদ্দি থেকে, বিপাশা এসে চা দিয়ে যায়, চা খেতে খেতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, টিভি দেখে কি দেখে না, ঐ সময়টি টিভি-র বিপাশার একান্ত তখন বাংলা প্রোগ্রাম হয় টুকটাক সিরিয়াল...

ফাল্গুনী একটু-আধটু দেখে—বাংলা কি হিন্দি সিরিয়াল, সেই একই ধরনের গল্প, ঘুরেফিরে সেই এক মুখ, সব সিরিয়াল একাকার হয়ে যায়, তাই বিছানায় গা এলিয়ে দেয় আবার, এলোমেলো ভাবনা, কখনো-সখনো হাবুলের কথা মনে পড়ে যায়, আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে

ছেলেটার কিছুই হলো না, মাধ্যমিক পাশ করলে না হয় কোথাও ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো কিন্তু...

কী হলে কী হতো ভাবতে ভাবতে খাওয়ার ডাক পড়ে, খেতে খেতে টিভি দেখে কি দেখে না, তারপর বিছানায়—তখন শরীর বিছানা ছুঁলে কিছুক্ষণের মধ্যে দেশ-কাল পেরিয়ে ডুবে যায় ঘুমের কোলে সময়কে পাত্তা না দিয়ে, পুরো ফাঁকি দেয় ছ-সাত ঘণ্টা, তারপর আবার শুরু...

কিন্তু এখন রিটায়ারমেন্টের পর
সময় হচ্ছে মস্ত ব্যাপার
প্রতিটি সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা, প্রতিটি কলা অনুপল বিপল পল দণ্ড হোরা
স্পষ্ট উপস্থিত থাকছে সর্বদা

প্রতিটি সেকেণ্ড নয় প্রতিটি অনুপল বিপল মৃদু মন্থর গতিতে চলেছে বোঝা চাপাতে চাপাতে খুব, সময় হচ্ছে যা যায়, সমানভাবে যায়—একটা প্রবাহ, তবু প্রবাহ নয় যেন,

প্রবাহকে আটকানো যায় বাঁধ দিয়ে তার আধেয় নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু সময়ের প্রবাহ বন্দী করা যায় না কোনোভাবে, তার উৎস ও মোহনা আমাদের সব কিছুর বাইরে থেকে যায়, হয়ত

ঐ স্রোতে ভাসতে পারলে সময় কাটানোর ভাবনা থাকত না মোটে, কিন্তু কী করে ভাসা যায়—ফাল্গুনী জানে না সে কৌশল, এমনকি জানেও না সময়ের স্রোতে গা ভাসালে সময়-কে ফাঁকি দেওয়া যায় কিনা, সময় কি শত্রু তবে এখন?

হাতে অঢেল সময়, সময়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ফাল্গুনী ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টার কতটুকু খরচ করে সেই ভাণ্ডার থেকে—সকালে উঠে মুখ ধোয়া প্রাতকৃত্য ইত্যাদি খুব বেশি হলে ১ ঘণ্টা

বাজার করা ইত্যাদি ১$^1/_2$ ঘণ্টা

জলখাবার চা খাওয়া $^1/_2$ ঘণ্টা +

দুপুরে খাওয়া + টিভি দেখা ইত্যাদি ২ ঘণ্টা

বিকেলে চা ইত্যাদি $^1/_2$ ঘণ্টা

খবর শোনা সিরিয়াল দেখা ইত্যাদি ২ ঘণ্টা

রাত্রে খাওয়া + টিভি দেখা ১ ঘণ্টা, এ বাদে আজকাল একটু বেশি কাগজ পড়ে, কখনো-সখনো বিপাশার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলে এবং ইত্যাদি মিলে ২ ঘণ্টা আরও, খুব বেশি বেশি ধরেও সে খরচ করে মাত্র ১০-১১ ঘণ্টা সময়, হাতে থাকে আরও ১৩-১৪ ঘণ্টা দুপুরে ঘুমের জন্য ২ঘণ্টা রাত্রে ঘুমের জন্য ৮ ঘণ্টা কাটলেও বাকি থেকে যাচ্ছে তিন-চার ঘণ্টা অন্তত, কিন্তু দুপুরে অতক্ষণ ঘুমোলে রাত্রে কি ঘুম আসবে সহজে? বারে বারে ঘুম ভেঙে যাবে, বাথরুম যেতে হবে ইত্যাদি, আর একবার ঘুম ভেঙে গেলে কি সহজে ঘুম আসতে চায়? তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে একগাদা চিন্তা, জাঁকিয়ে বসে দুশ্চিন্তা খুব

তাহলে কী করা? ছেলেটা মানুষ হলে না হয় তার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে সময় কাটানো যেতো, তা কি সম্ভব? নিজে বাবার সঙ্গে ক-টা কথা বলেছে সে জীবনে, কথা থাকলে তা হতো মা-র সঙ্গে বেশি, কোনো বিষয়ে বাবার অনুমোদন পেতে হলে মা-র মাধ্যমেই করতো হতো, তাছাড়া বাবা সময়ই বা পেতেন কোথায়? সর্বদা ব্যস্ত এমনকি রাত বিরেতে...

বাবার মতো ডাক্তার হলে তো কথা ছিল না, ডিস্‌পেন্‌সেরি কলে যাওয়া ইত্যাদিতে ফুরসত পেতো না মোটে, রিটায়ারমেন্টের ঝামেলা থাকতো না, যতদিন শরীর ফিট্ থাকতো ততদিন চলতো বেশ, বাবা চেয়েওছিলেন তাই, কিন্তু রেজাল্ট-ই বাধ সাধলো, বাবার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল

ফাল্গুনী হয়ে গেল অপিসের কেরানি...

তাঁর ইচ্ছা যেমন অপূর্ণ থাকে, তেমনি ফাল্গুনীর ইচ্ছাও...

ছেলেবেলায় হাবুল ছিল দারুণ ইন্‌টেলিজেন্ট, বোধহয় তাই হলো তার কাল. বুদ্ধির দোষে পড়ে গেল পাঁকে, হয়ে উঠলো ড্রাগ এডিক্ট, তারপর...

দীর্ঘশ্বাস পড়ে

নিজের অজান্তেই ফাল্গুনী সময়কে বন্দী করে ফেলছে, শরীর তার বর্তমান সময়ে আছে, অথচ মন চলে গেছে অতীতে—কত কত বছর আগে, এইভাবে তার মন চলে যাবে আগামী দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভবিষতের কোনো সময়ে, তখনও সে শারীরিকভাবে উপস্থিত

এখন এই সময়ে তবু

কিন্তু তাতে আর কতটুকু সুরাহা হবে সমস্যার—সময় কাটানোর...

ফাল্গুনী একে একে প্ল্যান করতে থাকে

তাস কিনে আনবে, টোয়েন্‌টি নাইন্‌ খেলবে, কিন্তু আর তিনজনকে পাবে কোথায়, বিপাশা ছাড়া মনে পড়ে না কাউকে, ওকে পাওয়া গেলে গাধা মারপিট ছাড়া কি খেলতে পারবে আর, অতএব—

লুডো কিনবে, বিপাশা আর সে খেলতে পারবে, দুজনে হলেই খেলতে পারবে এমনি কিংবা সাপ লুডো, কিন্তু সংসারের কাজ থেকে কখন ফুরসত পাবে বিপাশা, সময় পেলেই যে তার লুডো খেলতে ইচ্ছে করবে—এমন কথা নেই, অতএব—

নাকি কদমগাছের নীচে বাঁধানো চত্বরে গিয়ে বসবে অন্যান্য বুড়োদের সঙ্গে, ওদের তো কোনো কাজ নেই, কেবল পরচর্চা পরনিন্দা, ওখানে গিয়ে সুখ পাবে না মোটে, অতএব—

কোনো বিকল্পই তার মনমতো হয় না, তখন ফাল্গুনী বাজার করার সময় একটু বেশি দিতে থাকে, আগে তার ফিক্‌স্‌ড্‌ দোকান ছিল, দাঁড়ালেই দোকানী দিয়ে দিত সে যা চায়, এখন প্রথমে সে পুরো বাজারটা একটা চক্কর মারে, তারপর দু-একটা জিনিসের দর-দাম করে বিভিন্ন বিক্রেতার কাছে গিয়ে, তারপর এর থেকে আলু তো ওর থেকে ঝিঙে-পটল কেনে, এরকম করতে করতে সে যথারীতি হাঁফিয়ে ওঠে, আর দেখে যে এতে খুব বেশি সময় কাটছে না, উপরন্তু সে থকে যাচ্ছে, অতএব—

ফাল্গুনী তার পুরনো ধাঁচায় ফিরে আসে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দোকানে দাঁড়ায়, দোকানী ঝটপট আনাজপাতি দিয়ে দেয়, এবং ঝটিতি বাজার থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর কাগজ কিনে বাড়ি ফেরে

কাগজ পড়া তার নেশা নয়, যেদিন বাজার যায় সেদিনই মাত্র কাগজ কেনে, হেডলাইনগুলো দেখে, বড়জোর হেডলাইনের দ্বিতীয় তৃতীয় লাইন, কখনো-সখনো তেমন কৌতূহলোদ্দীপক খবর থাকলে দেখে যেমন—পোস্টাপিস বা ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়া-কমা ডি. এ-র বাড়তি টাকা সিনিয়ার সিটিজেনের কিছু বাড়তি ছাড় হলো কিনা কিংবা কোনো খুন-ডাকাতির লোমহর্ষক ঘটনা, তারপর কাগজ এধার-ওধার লাট খেতে থাকে প্রায়, কিন্তু

কয়েকদিন হলো ফাল্গুনী আগাগোড়া কাগজ পড়ে যাচ্ছে, খবর থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন জন্মদিন ভ্রমণ ব্যবসাবাণিজ্য সম্পত্তি কর্মখালি বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী চাই-এর পাতা, পাত্র-পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন থেকে খুব সহজে সমাজের গতিপ্রকৃতি মায় ব্যক্তিগত মনোভাব ইত্যাদি ধরা যায় :

পূঃ বঃ ভট্টাচার্য ২৪/৫ ৩'' বি. এ (ইংলিশ অনার্স), এম. বি. এ (থ্রু ক্যাট্) পাঠরতা সুন্দরী দেবগণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই...

চ্যাটার্জি ২৭ ডাক্তার এম. বি. বি. এস, ডি জি ও পাত্রের জন্য সুন্দরী ফর্সা উচ্চশিক্ষিতা গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই, পাত্রীর পিতাকে কমপক্ষে এম. এ পাশ হওয়া চাই...

পূঃ বঃ কায়স্থ ২৫/৫'' এইচ্. এস্. (ব্যাক) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই...

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ নরগণ সুশ্রী সুন্দরী ২২/৫ ৪'' বি. এস. সি অনার্স ইংলিশ মিডিয়াম প্রচুর বিত্ত, একমাত্র, উপযুক্ত পাত্র কাম্য...

উচ্চশিক্ষিত এম. এ, সৈয়দ, ২৪/৫-৪" সুশ্রী গৃহকর্মে নিপুণা, ভ্রাতা ডাক্তার সুদর্শন, উপযুক্ত পাত্র চাই...

ব্রাহ্মণ সুদর্শন ইঞ্জিনিয়ার নিজস্ব বাড়ি গাড়ি ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুন্দরী স্লিম্ অনূর্ধ্বা ২৫ অবিবাহিত পাত্রী চাই লিখুন পোস্ট বক্স নং—

ইত্যাদি, কিন্তু

একই কাসুন্দি ঘাঁটতে কার-ই বা ভাল লাগে, দু-চার দিনের পক্ষে বেশ, তারপর নতুন কিছুই থাকে না—ফাল্গুনী দলামোচড়া পাকাতে গিয়ে থেমে যায়, কাগজের ঐ দিকে নজর পড়েছে কিন্তু মন দিয়েছে বলে কখনো মনে পড়ে না—একটা বড় খোপের মধ্যে চৌকো ছোট ছোট অনেক খোপ, তার সবগুলো খালি নয়, মধ্যে মধ্যে পরপর কয়েকটি খোপ গাঢ় কালো কালিতে ভরা, খালি খোপগুলো-র উপরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা লেখা আছে, আর বড় বর্গক্ষেত্র-র বাইরে পাশাপাশি ও উপর-নীচ শিরোনামে সংখ্যাগুলির পাশে কিছু লেখা আছে সূত্রের আকারে—

শব্দ ধাঁধা

বর্গক্ষেত্রের উপরে কালো বাক্সের মধ্যে লেখা...

ফাল্গুনী কাগজ সটান করে মেলে ধরে, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে পাশাপাশি উপর নীচে দেওয়া সূত্র থেকে ঃ

যা ভাঙলে জোড়া লাগে না, ফাল্গুনী কয়েকবার সংকেতটা আওড়ে বলে ওঠে, কপাল আর দেখে যে ৬-এ পর পর তিনটে ঘর খালি, খুশিতে লাফিয়ে ওঠে

সেই শুরু হয়ে যায় ফাল্গুনীর শব্দ-ধাঁধা সমাধানের খেলা তারপর—

কিছু কেনার না থাকলেও সে চলে যাচ্ছে বাজার, হকার মোহনের কাছ থেকে কিনছে কাগজ, বাড়ি ফিরে কোনোমতে জলখাবার খেয়ে পড়ে যাচ্ছে শব্দ-ধাঁধার চক্করে—সূত্রগুলো পড়ছে, মনে মনে আওড়াচ্ছে—

ভারী ওজনের মালবহনের যন্ত্রবিশেষ, ফাল্গুনী ভাবছে, হাঁ এই ১১-র ঘরে চারটে ঘর ফাঁকা, চার চার করতে করতে লিখে ফেলে কপিকল, উপর-নীচের ১৭ নম্বরে গুজরাতি নৃত্যগীত—তিনটে ঘর, লিখে ফেলে গরবা

এইভাবে সে ভরে ফেলছে শূন্য খোপগুলো, সমাধান করতে পারে না তবু সব, অস্থির হয়ে ওঠে তখন, বিপাশা-কে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা অকারণে বেশি কথা বলে এমন, কী হবে, তিন অক্ষর কিন্তু

উত্তর আসে, বাচাল

বাহ্ তাইতো, তাহলে মধুর ধ্বনি চার অক্ষর

জ্বালিও না তো বাপু

ফাল্গুনী বোঝে, বিপাশা জানে না, কিন্তু কিন্তু...অস্থির হয়ে ওঠে, কী হবে কী হবে...

অনেক রাতে বিছানায় উঠে বসে, হাঁ কলনাদ, কলনাদ মানে মধুর অস্ফুট ধ্বনি...

সময় কোথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ফাল্গুনী তার হিসেব রাখে না, সে মগ্ন হয়ে আছে শব্দ ধাঁধা আর তার সমাধানে...

বাংলা অভিধান এসেছে একটা, সামনের মাসে একটা বড় ডিক্‌শেনারি কিনবে ভাবছে অবশ্য টাকায় কুলোলে, এখন বেশ চটপট সমাধান করতে পারছে, শব্দের স্টক বেশ বেড়ে

গেছে বেড়ে যাচ্ছে, নিজেই অবাক হয়—

হিন্দুর ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানরা যা বলেন—ওলাবিবি

ধনুকের সঙ্গী—তীর

অতিরিক্ত মূল্যহীন—ফালতু

ইনি কাগজপত্রাদির অনুলিপি করেন—নকলনবিস

আরও কত কত

আবার ঠেকেও যায় যেমন—

অমৃতের মতো মধুর চরিত্র, বেলা যায়—এই ডাক শুনে যিনি ঘর ছেড়েছিলেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এমন মানুষ ছিলেন ইত্যাদি...

কিন্তু সেদিন পটাপট হয়ে যাচ্ছিল, বেগ পেতে হচ্ছিল না মোটে ,

সেনাদল—রক্ষীবাহিনী

পাজি বদমাশ—বজ্জাত

স্তব—বন্দনা

দোষগুণের আলোচনা—সমালোচনা

ঠক-জোচ্চর—ফেরেববাজ...

দ্রুত ভরে যাচ্ছে খোপ, খুব খুশি হচ্ছে ফাল্গুনী, আর তিন চারটে সংকেতের সমাধান বাকি আছে, বিনা বাধায় এত মসৃণভাবে সহজে হয়নি কখনো, বিপাশাকে একবারও জিজ্ঞেস করেনি, বিপাশাও বলতে পারবে না সে-ই যদি সব বলে দেয় তবে কৃতিত্বটা কার? তা বটে, অনেক জিজ্ঞেস করে বিপাশাকে, কঠিন কঠিন উত্তরগুলো বিপাশা একটু ভেবেই বলে দেয়, বিপাশা কি কোনোদিন করেছে এই শব্দ-জব্দ?

যাক্ আজ সে বলতে পারবে বুক ফুলিয়ে, দেখো সবটা আমি করেছি, তোমার হেলফ্ ছাড়া আজ—

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে সে

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন—সঙ্গে সঙ্গে লেখে ফাল্গুনী, লিখেই হেসে ওঠে, বিপাশা দেখো, নিজের নাম শব্দের ধাঁধায়, হাঁ-হাঁ, এটা করেই উঠছি...

তৃতীয় ঘরের শেষ অক্ষর নিয়ে লিখতে হবে—তেতো ফল বিশেষ, যে গাছের আগাপাস্তালা তেতো, দু-টি খোপ বরাদ্দ এজন্য, নী আছে, সেকেণ্ড-টা কি হবে, হাঁ, নিম

কিন্তু ন-এ দীর্ঘ ইকার দিয়ে নীম কি নিম হতে পারে? অর্জুনের নাম ফাল্গুনী, ঐ নী দিয়েই তো, খোঁজ খোঁজ অতএব

ডিক্শেনারীর পাতা উলটে ন-এ দীর্ঘ-ই ম = নীম দেখতে চায়, এই তো দেখছি নি (নী) ম আছে—মূলা বাগ্যণ শীম, তাহে দিয়া রান্ধ নীম, কিন্তু এটা কি আধুনিক বানান?

যাক্ গে বাবা, পুরনো-ই হোক আর আধুনিক, মিলিয়ে তো দিয়েছি, শরীর হালকা ঝরঝরে হয়ে উঠেই মনটা কেমন খুঁত খুঁত করতে থাকে, যিনি শব্দ ধাঁধা-র সূত্র দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই নিম ভেবেই দিয়েছিলেন, এ নীম বানান তো কেউ লেখে না আজকাল

ফাল্গুনী পাতা উলটে যায় তখন

চোখ আটকে যায় ফাল্গুন ফাল্গুনি ইত্যাদিতে এসে—

ফাল্গুন = ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীযুক্ত মাস

ফাল্গুনি = 'ফাল্গুন জাত', অর্জুন

...

ফাল্গুনী = ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত-কাল, ফাল্গুনী পূর্ণিমা

তার মানে নীম কখনো-সখনো নিম হতে পারে কিন্তু ফাল্গুনী কখনও অর্জুন হতে পারে না, বাবা-ই কিন্তু নাম-টা দিয়েছিলেন, হাতেখড়ির পর ফাল্গুনী বানান ন-এ দীর্ঘ ই-কার দিয়ে শিখিয়েছিলেন তিনি, বলেছিলেন—ফাল্গুনী হচ্ছে অর্জুন, একজন বীরপুরুষ যাঁর শৌর্যবীর্য তুলনাহীন, তিনি একাই একশ'

আজ ৫৬/৫৭ বছর পরে জানছে সেই ফাল্গুনী অর্জুন নয়, এমনকি পুংলিঙ্গ-ও নয়, হচ্ছে বড়জোর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা, ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত কাল মাত্র এবং স্ত্রীলিঙ্গ, তার মানে শরীরে পুরুষ হয়েও পুরুষ নয় তবে? সময়কে আড়ি দিতে গিয়ে যত অনর্থ ঘটে যাচ্ছে, যদি—

ফাল্গুনী থমকে যায়, যদি সায় দেওয়া যায়, তবে?

ফাল্গুনী চমকে ওঠে

সময়ের সঙ্গে সায় দিলে ফাল্গুনী কি ফাল্গুনি হয়ে উঠবে না কোনোদিন?

চারদিকে কত কী ধ্বসে পড়ছে, ফাল্গুনী সেই ভাঙার শব্দ শুনতে পায় না তবু সে চুপ করে যায় খুব...

❀

# পোষাপুষি

## দেবেশ রায়

আমাদের দেশের বাড়িতে গরু মোষ পোষা হত কী না সে-কথা আমার মনে নেই। নিশ্চয়ই হত। গরু ছাড়া কোনো বাড়ি কি আর থাকত? মোষ পোষা বোধহয় তখন চালু হয় নি। হলে হত। তবে বাড়ির কোন দিকে গোয়াল ইত্যাদি ছিল আর সে-সব গরু চরাতেই-বা কে কখন নিয়ে যেত সে-সব কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

গরু সংক্রান্ত একটা অনুষ্ঠানের কথা স্পষ্ট মনে আছে। তখন বোধহয় নিয়ম ছিল গরুর বাছুর হলে একুশ দিন সে-গরুর দুধ খাওয়া নিষেধ। দুধ দুইয়ে সে দুধ জ্বাল দিয়ে-দিয়ে জমিয়ে রাখত। একুশ দিন পর বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হত। সে অনুষ্ঠানে নানারকম গানবাজনা নর্তনকুর্দন চলত। এখন বুঝি, তাতে এসে মিলতেন গ্রামের অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলমানরা। তাঁরা সবাই মিলে গান গেয়ে নেচে প্রায় উৎসব তৈরি করে ফেলতেন। কোথা থেকে উজ্জ্বল আলো এনে ঝুলিয়ে দেয়া হত—নিশ্চয়ই ডেলাইট বা হ্যাজাক। সেই গান বা নাচের শব্দ বা অর্থ কিছু মনে নেই, শব্দ বা অর্থ বোঝার বয়সও তখন হয় নি। অথচ সেই একটা খুব জ্বলজ্বলে সন্ধ্যা মনে ছাপ রেখে গেছে আর উজ্জ্বল আলো পিছলনো পেশল শরীরগুলির আবর্তন।

নাচ-গানের পর একটা অনুষ্ঠান ছিল—বাগনাড়ু বা বাঘনাড়ু খাওয়া। ঐ একুশ দিনের দুধ থেকে একটা খুব বড় সাইজের নাড়ু পাকানো হত। সেই নাড়ু একটা থালার ওপর রেখে দেয়া। যে আর্চের মত ভঙ্গি করে নাড়ুটা মুখে তুলে নিতে পারবে উল্টো দিক থেকে, তার তো নাড়ুটা জুটতই, আরো সব পুরস্কার জুটত। তারপর উঠোনে সারি দিয়ে সবাই খেতে বসত।

এই পর্যন্তই মনে আছে—এই এক সন্ধ্যায় বাগনাড়ু বা বাঘনাড়ু খাওয়া। বাঘনাড়ু যখন খাওয়া দেখেছি, তখন বাড়িতে তো গরু নিশ্চয়ই ছিল। তবে গরুকে কি পোষা পশুর লিস্টে তোলা যায়? গরুপোষা কথাটা বাংলায় চলে, তাই বলে পোষাগরু তো আর চলে না। পোষা মানে তার একটা বুনোরকম থাকতে হবে। যেমন বন বেড়াল, বনশুয়োর, বুনো মোষ, বুনো হাঁস, বা বন মুরগি। বনগরুও হয় বটে তবে সে জেনেছি অনেক পরে বই পড়ে। ছবি দেখেছি। আর দেখেছি জলপাইগুড়ির ফরেস্টে আরো পরে—হয়তো চোদ্দ-পনের বছর বয়সে, আর চিনেছি, ঐ জলপাইগুড়িতেই, আরো অনেক পরে। বাড়িতে পোষ্য হিশেবে তা হলে পরোক্ষ সাক্ষ্যে গরুর কথাটাই প্রথম আসা উচিত। জলপাইগুড়িতে আমাদের বাড়িতে কখনো দুধের জন্য গরু পোষা হয় নি। দুধ খাওয়া হত কিনে।

১৯৪৩-এ দেশ ছেড়ে জলপাইগুড়িতে এসে আমরা প্রথম ভাড়া ছিলাম কদমতলার কাছে একটা পাড়ায়। একটা গলির মধ্যে। গলিটা কদমতলার সদর রাস্তা থেকে বেরিয়ে সমকোণে বেঁকে নতুন পাড়ার রাস্তায় গিয়ে মিলেছে। আবার, ঐ সমকোণের বাঁক থেকেই আর একটা রাস্তা সোজা গিয়ে পাহাড়ি পাড়ার রাস্তায় মিলেছে। কতমদলার রাস্তা থেকে যেখানে আমাদের

গলিটা বেরিয়েছে তার প্রায় ঠিক উল্টো দিকেও একটা রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে—আনন্দ পাড়া। ফলে আমাদের পাড়াটার কোনো নাম পাকা হতে পারে নি। বড় করে কদমতলাই বলা হত, তাতে তো আর জায়গাটাকে চেনা যেত না। ঐ চেনার জন্যে নতুন পাড়া, পাহাড়ি পাড়া, আনন্দ পাড়া—এই সব নামই চলত। আমাদের গলির কদমতলার মুখে একদিকে ছিল মোহিনী চন্দ্র বর্মনের বাড়ি। তিনি ১৯৪৭-এর প্রথম স্বাধীন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর লম্বা ফরসা চেহারা মনে আছে—সামনের দাঁত বোধহয় দুটো একটা পড়ে গিয়েছিল। তিনি কলকাতায় আততায়ীর গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। তাঁকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসা হল। খুব ভিড় হয়েছিল। গলির মুখে কদমতলার রাস্তায় আর এক দিকে ছিল রমাপ্রসন্ন সরকারের বড় বাড়ি, পাশে কদমতলা গার্লস স্কুল। তিনি ছিলেন সরকারি উকিল। এমন নামজাদা লোকজনের বাড়ির পেছনের গলি বলে আমাদের পাড়াটাকে চিনতে বা চেনাতে খুব অসুবিধে হত না।

তখনকার দিনে হাটে বা বাজারে কেটে মাংস বিক্রি হত না। একেবারে হত না, তা নয়। হাট বা বাজারের প্রান্তে একটু খোলা মাংস নিয়ে কেউ হয়তো কখনো-কখনো বসত। সেগুলো বেশির ভাগই ছিল মরা পশুর মাংস, খেতেন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একেবারে প্রান্তবাসীরা—যাঁদের খুব একটা খাওয়াই জুটত না। হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোকরা কাটা মাংস কেনার কথা ভাবতেই পারতেন না। মুসলমান ভদ্রলোকরা তাও মুরগি পুষতেন বা কিনে আনতেন। হিন্দু ভদ্রলোকরা কখনো-কখনো হাঁস কিনে আনতেন। তাছাড়া মাংস খেতে হলে গোটা একটা পাঁঠা বা খাশি কিনে আনতে হত। খাশি খাওয়া খুব একটা অনুমোদিত ছিল কী না মনে পড়ছে না। পাঁঠা এনে যোগমায়া কালীবাড়িতে বলি দিয়ে আনতে হত। কারো-কারো বাড়িতে কালীপুজোর সময় বলিটলি চলত। কালীপুজো যে কালীপুজোর দিনই হত, তা নয়। আরো নানা ছুতোয় পুজো লাগিয়ে দিলেই হল। আমাদের বাড়িতে বোধহয় ৬৪ সালেই বাবা এক জগদ্ধাত্রী পুজো লাগিয়েছিলেন, তাতে এক পুজোয় তিন বলি দেয়া হল। এ পুজোর নাকী ও-রকমই নিয়ম। ৬৪ সালের বলিতে তো আমি বলির পাঁঠার ঠ্যাং ধরতাম। আমার সন্দেহ হয়, মাংস খাওয়ার ছুতো বানাতেও বাড়ির কর্তারা পুজো লাগিয়ে দিতেন।

কদমতলার বাড়িতে বাবা একদিন হাট থেকে পাঁঠা কিনে আনলেন। ৪৪-৪৫ সাল হবে। সেই কচি পাঁঠার ভ্যা ভ্যা কান্নায় পাড়ার সবাই আকুল হয়ে উঠল ও পাড়ার সবাই এসে পাঁঠাটাকে দেখে ও তদবির করে গেলেন। এত কাঁঠাল পাতা জমা হল যে সবটা যদি সেই কচি পাঁঠা খেয়ে উঠতে পারত তাহলে তাতেই তার মরণ ঘটত। ঠিক মনে নেই—পাঁঠাটাকে কীভাবে বলি দেয়া হবে, কে কে দায়িত্বে থাকবে এ সব কথাবার্তাও চলছিল কীনা। কিন্তু পরদিন বা তার পরদিন বা তার পরদিন যখন সত্যি পাঁঠাটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন আমি নাকী পাঁঠার গলা জড়িয়ে আকুল কান্না জুড়ে দিই। সে কান্না আমার মনে নেই। মায়ের কাছে শুনেছি। বলিটলি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এতটা আমি বুঝেছিলাম মনে হয় না। তেমন বুঝলে হয়তো মনে থেকে যেত। হয়তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেই আমি পাঁঠার গলা জড়িয়ে থাকব। যারা কয়েক দিন ধরে মাংস খাওয়ার লোভ লালন করেছে তারা আমার কান্নাকে খুব একটা পাত্তা দিয়েছিল মনে হয় না। আমার কান্নাতেই হোক, পাঁঠার কান্নাতেই হোক, বা আমাদের দ্বৈত কান্নাতেই হোক আমার স্বল্পভাষী বাবা বলে দিলেন, বলি হবে

না, ওটাকে ছেড়ে দাও।

শুনেছি, তখন বলিমত্ত যুবকেরা পারলে পাঁঠার সঙ্গে আমাকেও বলি দেয়। নেহাত সম্ভব না বলেই তারা আমাকে পাঁঠার সঙ্গে জুতে দিয়ে বলে, নে, তোর পাঁঠাই নে। এ গল্পটা এতই বেশি পারিবারিক লোককথা হয়ে গেছে যে বাল্যে-কৈশোরে আমি অনেক চেষ্টা করেছি সেই অচেতন শৈশবের করুণা আবার জাগিয়ে তুলতে। তার পর সন্দেহ হয়েছে গল্পটার বাকি অংশের জন্যই আমাকে এমন জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল কী না।

বাড়ির পুরোহিত মশায় এসে বাবাকে বললেন, বলির জন্য রওনা হয়ে বলি না দেয়ায় মহাদোষ অর্শাবে।

দোষ খণ্ডাতে বাবা পরের হাটে আর-একটা পাঁঠা কিনে সোজা কালীবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে যে-পাঁঠাটিকে আমি বাঁচিয়েছিলাম সে ছাড়া পেয়েও কোথাও গেল না। থেকে গেল। সে ধীরে-ধীরে বাড়ির আনাচ-কানাচ পাছ-দুয়ার-সদর, আমাদের গলির এ-বাড়ি ও-বাড়ি এ সব চিনে নিতে লাগল। তার সঙ্গে যে আমার কোনো রকম সম্পর্ক ছিল তা নয়। কখনো-সখনো রাস্তা ঘাটে দেখা হয়ে গেলে তার জীবনদাতা হিশেবে সে কোনো কৃতজ্ঞতা জানাত না, যেন সে তার নিজের জোরেই বাঁচছে। আমার ভিতরেও তার সম্পর্কে যে কোনো বিশেষ দায়িত্ববোধ ছিল, তা নয়। সে তার নিজের ক্ষমতাতেই নিজের নিরাপত্তার গণ্ডি ছকে নিয়েছিল। সন্ধে হয়ে গেলে পাড়ার যেই তাকে যেখানে দেখুক, তাড়া দিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিত, নইলে রাতে শেয়াল এসে টেনে নিতে পারে। বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে সে ভ্যা ভ্যা করে বোকার মত নিজের উপস্থিতি জাহির করত আর বেনুমাসি বলত, ঐ এলেন।

পাড়ার সব বাড়িতে গিয়ে সে নানা সময়ে ঐ একই ডাক ডাকত, একটু কম্পিত ও নমিত ভ্যা- আ, ভ্যা। মনাদার মা জেঠিমা, আমাদের একপাশের বাড়ির দিদি, আর-এক পাশের পাড়ির ঝুনু মাসি, উল্টোদিকের জেঠিমা—তখনো বোধহয় উষা মাসিমার বাড়ি হয় নি, জায়গাটা মাঠ ছিল—ঐ ডাক শুনেই আমার ডাকনাম ধরে বলতেন, ওর পাঁঠা এসেছে, খেতে দাও। কালক্রমে এই সমাদর নানা রকম ভাষান্তরে প্রকাশ হতে লাগল। ওর পুষ্যি এসেছে। ওর ছেলে এসেছে। নিত্যি কুটুম এসেছে। পাশের বাড়ির দিদি আমাদের বাড়িটাকে বাপের বাড়ি ধরে নিয়ে বলতেন, বাপের বাড়ির লোক এসেছে।

ধীরে-ধীরে সে আমাদের বাড়িঘরের ও আমাদের রোজকার জীবনের অংশ হয়ে গেল আর সবাই তাকে ডাকতে লাগল ঐ আমার ডাকনামের সঙ্গে কিছু জুড়ে—ওর পুষ্যি, বাবা ওর দুলাল, বাবা পাড়ার জামাই ইত্যাদি। ওর পেট খুব বড় ছিল না আর ওর খাওয়ার মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিল। ঐটুকু পেট ভরাতে আর কতটুকু তরকারির খোশা বা গোড়া দরকার? আমার মনে হয়, স্নেহাধিক্যে কেউ-কেউ ওকে রান্না তরকারিও দিতেন। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে বড় মাঠ ছিল। ওর পেট ভরে গেলে ও সেই মাঠে গিয়ে ছায়া খুঁজে ঘুমত, আর কোনো বাড়িতে যেত না। সে সব বাড়ি থেকে তখন সেই আদরের ডাক ডাকা হত, আমার নাম জুড়ে-জুড়ে।

এতটা আদর-যত্নে সে দিনে দিনে নধর হয়ে উঠল, তার দুটো শিঙও গজাল, সে বেশ একটা চালে হাঁটাও ধরল, তার গলার স্বরেও গাম্ভীর্য এল। কোনো দরজায় গিয়ে সে একবারের বেশি ডাকত না। ডাকার বদলে মাটিতে পা ঠুকে বা টিনের দরজায় শিং ঘষে আওয়াজ

তুলতেও সে শিখে গিয়েছিল। স্নানের অভাবে তার গায়ের বেশ ঝোলা রোমরাজির রং কোথাও পাটকিলে, কোথাও ধূসর হয়ে গিয়েছিল। সেই চকচকে কাল আর ছিল না। একটু দাড়িও বোধহয় গজিয়েছিল। পাড়ার ছোটরা যেমন বড় হয়, ও-ও তেমনি বড় হয়ে উঠছিল।

সেই বড় হয়ে ওঠাটা আমার পক্ষে একটু বিপদের হয়ে উঠল।

পাড়ার ছোটরা বড় হয়ে উঠতে উঠতে নানা রকম নাম পেয়ে যায়। এমনকী তাদের মা-বাবাও সে সব নাম শুনে চমকে-চমকে ওঠেন—এ নাম তো তাঁরা তাঁদের ছেলেকে কখনো দেন নি। এক থিয়েটারে ট্যাপা নামের একটি চরিত্রে পার্ট করে ট্যাপাদার নাম চিরকাল ট্যাপাই থেকে গেল। ট্যাপাদা কত চেষ্টা করেছেন সেই নাম কাটাতে। তিনি জলপাইগুড়িতেই আর থাকেন না। জলপাইগুড়ির লোক তো কলকাতাতে যায়। ট্যাপাদা যখন ধরে নিয়েছেন আর তাঁকে ও নামে কেউ তা হলে ডাকার নেই, অমনি কোনো মধ্যরাত্রিতে ফোনে অথবা অটোর পেছনের সিট থেকে কেউ ডেকে বসে 'এই ট্যাপা', 'আরে ট্যাপা।' ট্যাপাদা চেষ্টা করে দেখেছেন সাড়া না দিয়ে বোঝানো যায় কী না যে তিনি ট্যাপা নন ও তিনি স্বীকার করছেন না যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। লাভ হয় নি। যে ডাকছে তার কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। আর, থাকবেই-বা কেন। যাকে চিরকাল সে ট্যাপা জেনে এসেছে সে ফোনের ওপারে, কিংবা অটো রিক্সার ড্রাইভারের পাশে, বা মিনিবাসের সাইড সিটে ট্যাপা না হয়ে যায় কী করে? জলপাইগুড়িতে এরকম অনেক নামের ব্যাপার ছিল—সে আর-এক বা অনেক গল্প।

যে পাঁঠাটিকে আমার ডাকনাম ধরে 'কুটুম', 'পুষ্যি', 'জামাই' এই সব জুড়ে ডাকা হত, কখনোই পাঁঠা বলে ডাকা হত না—তার সামাজিকতা থেকে ঐ সম্বন্ধবাচক শব্দগুলি অচেতনে একটু একটু করে ঝরে যেতে লাগল। তখন ওর গা থেকে চাপা একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। বেশ অসহ্য রকমের চাপা। বাতাসে সে-গন্ধ একবার লেগে গেলে আর কাটতে চাইত না—সারাদিন লেগে থাকত। সেই সব সময়ে জেঠিমা-মাসিমা-দিদিদের কেউ আর ওর সম্পর্ক ধরে মজা করতেন না, বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন, আমারই ডাকনামটুকু ধরে, 'ওকে নিয়ে তো আর পারা যায় না। গন্ধের চোটে ভূত পালায়।' আবার কেউ কেউ গলা তুলে আমাকেই ডেকে বলতেন, 'এই ..., ...-কে এখান থেকে সরা।' অর্থাৎ আমার একটা নাম দিয়েই পাঁঠাকে ও আমাকে ডাকা হতে লাগল। আর সে নিজের বড় শরীর, সর্বত্রগামিতা ও অসহনীয় দুর্গন্ধ নিয়ে ঐ নামে আমার চাইতে বেশি চেনা হয়ে উঠল। আমার এই স্বানামখ্যাত হয়ে ওঠার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু বেনুমাসির সেটা সইত না। বেনুমাসি ঝগড়া আর স্নেহাধিক্য ছাড়া কথা বলতে পারত না। স্নেহের পাত্রভেদ ছিল, ঝগড়ার ছিল না। বেনুমাসি সাধারণত সারা দিন ধরে ঝগড়া করত। মাঝখানে বিকেলের দিকে স্নান আর খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে। তাও পুরো বাদ দিত না। সারা দিন ধরে শোনার পরও অনেক সময় বোঝা যেত না—বেনুমাসি কার সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া করছে। যার যখন সময় হত সে একটু ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঔদাস্যে বেনুমাসির ঝগড়া শুনে আবার নিজের কাজে ফিরে যেত।

ঐ আমার পাঁঠার নাম নিয়ে বেনুমাসি একটা স্থায়ী বিষয় পেয়ে গেল। বেনুমাসির ঝগড়ার একটা লক্ষ ছিল পাঁঠাটা। এত দিন হয়ে গেল, সে কি এর মধ্যে তার নিজের একটা গতি করে নিতে পারত না? তার সে বিষয় কোনো মনই নেই। থাকবেই-বা কেন? এমন নবাবপুত্তুর হয়ে তো আর অন্য কোথাও থাকা চলবে না, খেটে খেতে হবে। বেনুমাসির আর-একটা

লক্ষ ছিল আমাদের পাড়ার মা-মাসিরা। তাঁরা অচেতনেই আমার নাম ধরে দূর-দূর করতেন। তাদের কি একটা আক্কেল নেই যে বাড়ির ছেলের নাম ধরে এমন দূর-দূর করলে অমঙ্গল হয়। তবে দূর-দূরই ভাল। তাহলে ছেলের অন্তত ডাইনির চোখ লাগবে না। দূর-দূরই ভাল। ছেলের আয়ু বাড়বে। কিন্তু লোকজনের কি চোখের চামড়া কী জিভের আগল নেই, একটা দুধের ছেলেকে সকাল থেকে সন্ধে নাম ধরে দূর-দূর করা।

কিন্তু এ গল্পের শেষটুকু আমি জানি না। যাঁরা আমার বড় আর ঘটনাটা পুরো জানতেন তাঁরাও এই বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত আমার ও পাঁঠার নাম আলাদা হতে পেরেছিল কী না কিংবা পাঁঠার গতি কী হল। আমি যে আমার নাম ছাড়ি নি—তা তো প্রমাণিতই হয়ে গেছে। একরকম করে হয়তো পাঁঠাটাই জিতে গেল। আমি সে-নাম নিয়ে টিঁকে আছি অথচ সে-নাম ধরে ডাকার লোক প্রায় শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এক জলপাইগুড়িতে পুরনো পাড়ায় গেলে প্রাণ ভরে ডাকনামে ডাকা শুনে আসতে পারি।

আর-একটা ডাকও এখন তৈরি হতে শুরু করেছে। আমার একমাত্র ভাগ্নে বাবুইয়ের দুই ছেলে—বুবকা আর পাবলো। বড় ছেলের বয়স ছয়-সাত। ছোট ছেলের সবে বুলি ফুটছে। তারা আমাকে ডাক নাম ধরে দাদু ডাকে।

৫২-৫৩-তে আমার স্কুলের পড়াও শেষ, আমাদের কদমতলার বাড়িতে থাকাও শেষ। আমরা উঠে গেলাম জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের কাছে এক পাড়ায়। সেখানেও পাড়ার নাম নিয়ে গোলমাল। কদমতলা বলতে যেমন একটা পুরো অঞ্চল বোঝাত, নয়া বস্তি বলতেও তেমনি শহরের দক্ষিণের ঐ এলাকাটা বোঝাত। অথচ ঐ নামে শুধু কি বোঝানো যেত, জায়গাটা চেনানো যেত না। বাড়ির একদিকে স্টেশন, আর-এক দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, সামনে নরেন ভিলা বলে একটা বড় আবাসন। ফলে, আমাদের ঐ বাড়িটা বোঝাতে স্টেশন পাড়া, নয়া বস্তি, নরেন ভিলা—তিনটি নামই ব্যবহার করা হত। কলেজে ঢুকে আমারও ঠিকানার দরকার হয়ে পড়ল। নয়াবস্তি নামটা খারাপ লাগত, আমি তাই বদলে নিয়েছিলাম, নতুন বসতি। তাতে যে কী বদলেছিল, কে জানে। বড় রাস্তা ছোট রাস্তাকে টানে। বড় গলি, ছোট গলিকে টানে। এ-বাড়িটা ছিল একেবারে রাস্তার ওপরে, একটু দূরেই ঝাপসির গ্যারাজ। ট্রাক-বাস চলার মতন চওড়া। দরজা খুললেই রাস্তা। দরজা না-খুললেও রাস্তা ঘরের ভিতর এসে পড়ত। রাস্তা থেকে এক ধাপের একটা সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকতে হত। একটু ঘুপচি মতই ছিল বাড়িটা, জানলাগুলো ছোট। সেজন্যও বাইরেটা টানত।

অন্য সব কারণও ছিল। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সিগারেট-বিড়ি জরদা দেয়া পান ধরেছি। পানটা প্রকাশ্যে খাওয়া চলত। সিগারেট-বিড়ি ভাবাই যায় না। এখনো জলপাইগুড়ির বড় কোনো রাস্তা দিয়ে প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়ার সাহস নেই আমার। ধারে সিগারেট-বিড়ি-পানের দোকান ছিল, পরিমলের দোকান, স্টেশনের কাছে। আমরা সেখান থেকে পান-সিগারেট নিয়ে আত্মগোপন করতে-করতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসের দিকে এগতাম। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তো বটেই, ছুটির দিনে দুপুরেও।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা বাঁধানো টেনিস কোর্ট ছিল। বিকেলে সেখানে টেনিস খেলাও হত। রাত্রিবেলা সেই বাঁধানো চত্বরে শুয়ে বসে আমাদের আড্ডা চলত—অনিল, বুবু, বিনু, মাঝে-মাঝে অন্য কেউ। আমাদের এই নৈশ আড্ডার কথা বেশ রটেছিল বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। অত রাতে দূর থেকে আর আড্ডা মারতে কে আসবে। আমরা সকলেই তো ছিলাম প্রায়

এক পাড়ায়, যারা রাতে বেরতাম। বুবুর বাড়ি ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যেই আর বিনু-অনিলের বাড়ি ছিল উল্টো দিকে। বিনু আবার আমাদের দিনের আড্ডায় খুব বেশি থাকত না যদি না তাদের বাড়ির বাইরের পোর্টিকোতেই আড্ডা বসত।

এই সময়ই আমার বড়দি 'শিশুমহল' নামে একটা নার্সারি স্কুলে চাকরি শুরু করে, দাদুকে ধরে বাড়ির তিন পুরুষের মধ্যে, দাদুর পরে, দ্বিতীয় চাকরি আর আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে প্রথম চাকরি।

বড়দিই বাড়িতে একদিন কুচকুচে কাল দুই খরগোশ নিয়ে এল। খরগোশ মানেই তো তুলতুলে শাদা, তার মধ্যে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কাল খরগোশ যে শাদা নয় এই উত্তেজনাতেই আমাদের প্রথম সন্ধ্যা কাটল। ঐটুকু সময়ের মধ্যে আর তাদের থাকার জায়গা তৈরি হবে কী করে। আমার মাসতুতো ভাইবোনদের পিসতুতো রাঙাদার সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। তাঁদের বাড়ি ছিল কোচবিহার জিলার মেখলিগঞ্জে। মেখলিগঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি আসতে রিকসায়, বাসে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয় ও নৌকোয় সারা দিন লেগে যেত। পাহাড়ে বা সমতলে বৃষ্টি নামলে তিস্তার খেয়া বন্ধ থাকত। এখন জলপাইগুড়ি থেকে মেখলিগঞ্জে সকাল-বিকাল মিনিবাস যায়। বাসও আছে। দিনের মধ্যে বারকয়েক যাতায়াত করা যায়।

এই রাঙাদা ছিলেন এক বড় ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ। তাঁর জলপাইগুড়ির ঠিকানা ছিল আমাদের বাড়ি। প্রচুর কার্টন আসত তাঁর। সেই কাগজের বাক্সগুলোর মধ্যে দুটো সাইজমত দেখে বের করে খরগোশ দুটোকে রাখা হল। খরগোশ দুটো দু-একবারের চেষ্টাতেই বাক্সটাকে উল্টে ফেলে বাক্স থেকে বেরিয়ে গেল। তখন দৌড়ে আবার তাদের খুঁজে আনা হল। অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকারে কাল খরগোশ খুঁজতে খুঁজতে কখন যে সে-রাতে খরগোশদের ও আমাদের ঘুম এসেছিল।

তারপর ধীরে-ধীরে তারা বাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। সকালে মা তরকারি কুটতে বসলে তারা বঁটির সামনে অচল হয়ে বসে থাকত, খাড়া কানদুটো আর চোখদুটো শুধু চঞ্চল হত। মা যখন শাক কিংবা কচি কপিপাতা তাদের দিকে এগিয়ে দিতেন, তারা ধবধবে গুঁড়ি-গুঁড়ি দাঁত দিয়ে সেগুলো চিবিয়ে খেয়ে নিত।

এ-রকম কপির ডাঁটা দিয়ে বাড়িতে কিছু পোষা হলে সেই পোষাপুষির কোনো মান-মর্যাদা থাকে না। তাই বড়দি ওদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করেছিল। বেশ চুকচুক করে বাটিতে মুখ ডুবিয়ে দুধ খেয়ে নিত ওরা। খরগোশ দেখতে এত সুন্দর আর এত ভঙ্গি বদলায় যে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। আর এরা কাল খরগোশ বলেই আমরা অনেক সময় এক হাতে এদের বুকে চেপে আর এক হাতে দরজা খুলতাম। যিনি এসেছেন তিনি কাল খরগোশ দেখে অবাক হয়ে অনেক কথা বলতেন—এটা প্রত্যাশিতই ছিল।

সব সময় যে এই আশা পুরত তা নয়। যারা এর আগে দেখেছে, আর যথোচিত বিস্মিত হয়েছে, তারা বিরক্ত হয়ে বলত, 'তোদের এই খরগোশ নিয়ে আদিখ্যেতাটা বন্ধ কর। খরগোশ তো খরগোশ, কাল তো কাল—তাতে হয়েছেটা কী? তোরা এমন ভাব করিস যেন তোদের খরগোশ মানুষের মত কথাও বলে।'

হঠাৎ একদিন থেকে খরগোশরা দুধের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়ল। তারা কেউ

কেউ দুধ খানিকটা খেয়ে সরে পড়ে, কেউ বাটির গন্ধ নেয়ার মত করে একবার নাক বাড়িয়েই সরিয়ে নিল। দু-তিনদিন এমন হওয়ার পর ব্যাপারটা বড়দির নজরে পড়ল। বড়দি প্রথমে ভাবল, চিনি কম দেয়া হচ্ছে কী না। তারপর ভাবল, দুধের স্বাদের কোনো বদল হয়েছে কী না। বড়দি নিজে কখনো দুধ খায় না কিন্তু খরগোশদের অরুচি সন্ধানে খানিকটা দুধ খেয়ে বলল—এটা কি দুধ না কী? এতে আমাদের কৌতূহল বেড়ে গেল, দুধ যদি দুধ না হয়ে অন্য কিছু হয় তাহলে তো বেশ বড় একটা গোলমাল বেধে উঠবে। ফলে, আমরাও এক ঢোক, দু ঢোক দুধ খেয়ে ঘোষণা করে দিলাম, যে জিনিশ দুধওয়ালা দিচ্ছে, সেটা, আর যাই হোক, দুধ নয়। পরদিন সকালে দুধওয়ালা আসতেই বড়দি আত্মবিলাপময় অভিমানে বলে উঠল, 'ছী-ই-ছি তোমাকে এত বিশ্বাস করি আমি আর তুমি আমার পোষা খরগোশদের পাউডার মিল্ক খাওয়াচ্ছ?' দুধওয়ালা তো যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'পাউডার মিল্ক? উ কৌন চিজ বহিন?' এ-কথার অর্থ তো সরল। দুধওয়ালা পাউডার মিল্ক কোনো দিন দেখেই নি। যা সে দেখেই নি তা সে দেবে কী করে। বড়দি পাউডার মিল্ক কথাটা কোনো তথ্য-অনুযায়ী বলে নি। জল মিশিয়েছ বা ভেজাল দিয়েছ বলার বদলে বলেছে পাউডার মিল্ক। কারণ তখন পি এল ৪৮০-র সুবাদে আমেরিকা থেকে প্রচুর পাউডার মিল্ক আসত। সেই পাউডার মিল্ক রেশনের দোকান থেকে দেয়া হত, আবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্ল্যাস্টিক চাদরের ওপর রেখে বিক্রিও হত। ঘটনাটার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর রসিকতা ছিল। পেটে ভাত জুটছে না বলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। আবার ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া সে বিচারে না গিয়েও কী করে যেন 'পাউডার মিল্ক' কথাটা ভেজালের সমার্থক হয়ে উঠল। জল থাকতে দুধে পাউডার মিল্ক মেশাতে যাবে কেন—এই প্রশ্নেরও উত্তর ঠোঁটের আগায় ছিল। আসলে, জল মেশাতে হলেও যেটুকু দুধ দরকার, পাউডার মিল্ক গুলে দিলে সেটুকু দুধও দিতে হয় না। দুধের শাদা রঙের জন্যই হোক, গাভীর পেটে সংরক্ষিত দুধ সোজা আমার পেটে চলে যাচ্ছে, এ-রকম একটা কল্পনা থেকেই হোক, দুধ পবিত্র শুদ্ধতার প্রতীক ছিল। আগে দুধ যত খাঁটি ছিল, এখন আর তত খাঁটি নেই—এ কথার মধ্যে এমন একটা বিলাপও অন্তর্নিহিত ছিল যে শুদ্ধতা চিরলুপ্ত অতীতে সুলভ কোনো গুণ, বর্তমানে দুর্লভ। পাউডার মিল্ক ছিল তার বিপরীত প্রতীক—অপবিত্রতার, অশুদ্ধতার, ও অচিরকালের।

এমন একটা অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, শব্দার্থ-তাত্ত্বিক, সমাজভাষিক বিষয় সম্পর্কে দুধওয়ালা এতটা অজ্ঞতা না দেখালেই পারত যে সে চেনেই না পাউডার মিল্ক জিনিসটা কী? দুধওয়ালা নানাভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ল।

> 'ও, তুমি পাউডার মিল্কও চেনো না?'
> 'রেশন কার্ড থেকে গুঁড়ো দুধ তোলো না, না?'
> 'রাস্তার মোড়ে-মোড়ে হলদেটে গুঁড়ো বেচতে দেখো নি? না?'
> 'তোমাকে দুধ দিতে বললাম আমাদের খরগোশগুলোর জন্যে আর তুমি তোমার পাউডার মিল্কে খরগোশগুলোকে ডুবিয়ে দিলে।'

দুধওয়ালা হাতের নাগালে যে খরগোশটাকে পেল সেটাকেই বুকের কাছে তুলে আদর দিতে শুরু করে। খরগোশ কুঁই কুঁই করতে লাগল। সেটা আদর নেয়ার স্বরও হতে পারে। কিন্তু খরগোশের ভাষা বড়দির চাইতে বেশি জানবে কে? বড়দি বলে উঠল, 'ঐ দেখো, ওরা তো সবার কোলে যায়। তোমার কোলে থাকতেই চাইছে না। এই, তোমার গায়ে পাউডার

মিল্কের গন্ধ। ঐ গন্ধ ওরা সইতেই পারছে না। দাও, নামিয়ে দাও, এ গন্ধেই অসুস্থ হয়ে পড়বে ওরা।'

দুধওয়ালা সঙ্কট বাড়িয়ে দিয়ে ছোট সঙ্কট ভুলিয়ে চলে যেতে পা বাড়াল। ওর ভুল হল বড়দির কথার জবাব দিতে গিয়ে। আর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে কথাটা গুলিয়ে ফেলেছিল। বড়দি ওকে পেছন থেকে বলে ওঠে, 'কাল থেকে তুমি দুধ দেবে না।' দুধওয়ালা বলে বসল, 'আরে দিদি, খরগোশ কি কখনো দুধ, জল আর পাউডার মিল্কের পার্থক্য করতে পারে? ও কি জানে দুধ দুধ আর পাউডার মিল্ক পাউডার মিল্ক?'

দুধওয়ালার মুখে কথাটা এমন শোনায় যেন সে তার কর্মপদ্ধতির পক্ষে একটা যুক্তিতত্ত্ব খাড়া করছে। আর কথাটার মধ্যে অভিযোগ মেনে নেয়ার একটা স্বরও শোনা যায়, ঠিকই শোনা যায়।

বড়দি বলে ওঠে, 'জানে বলেই তো আগে তোমার দুধ খেত, এখন তোমার পাউডার মিল্ক ছুঁয়েও দেখে না। খরগোশকে চেনাচ্ছ পাউডার মিল্ক? তুমি তো বললে তুমিই পাউডার মিল্ক চেনো না। এখন বলছ খরগোশরাই চেনে না?'

বড়দি যে কোনটাতে আপত্তি বোঝা গেল না। দুধওয়ালার মুখ ও পা তখন বাইরের দিকে। সে বড়দির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'দিদি, কাল থেকে দেখবেন দুধ চিনবে, ঠিক চিনবে।'

এ-সব তো ছোটখাট ব্যাপার, খরগোশরা এর চাইতে অনেক জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল, আমাদের সবাইকেও জড়িয়ে ফেলল। প্রায় প্রতিদিনই নতুন খরগোশ জন্মাতে লাগল। তাদের একটিও যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য বড়দি বারান্দার ঐ উত্তর দিকটাকে ঘিরে দিল। সদ্যোজাত বাচ্চাগুলোকে আলাদা রাখা, তাদের যথাসময়ে খাওয়ানো, সেগুলো যাতে বড় খরগোশদের তলায় চাপা না পড়ে সেজন্য সরিয়ে সরিয়ে রাখা, যেগুলো পা চালাতে শিখেছে সেগুলোকে বড় বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে শেখানো, ছোট বাচ্চাগুলোর খাবার আলাদা করা—এ-সব কাজ তো ভাগ-ভাগ করে হয় না। এ-সব কাজ হতে পারে সবাই বা অনেকে মিলে একই রকম করে খরগোশগুলোকে চিনলে ও নাড়াচাড়া করলে। সে রকম একটা কিছু গড়ে উঠতে পারত। বাড়িতে খরগোশ-বিরোধী কেউ ছিল না, বড় জোর উদাসীন ছিলেন বাবা ও দাদা। তাও ঠিক উদাসীনতা নয়। বাবা যখন বাইরের ঘরে ক্রশওয়ার্ড করতেন তখন খরগোশরা তাঁর পিঠ বেয়ে উঠে ঘাড় ও হাত বেয়ে নেমে গেলে বাবা বিরক্ত হতেন না। এমন কী দরজা খোলা পেয়ে কোনোটা বাইরের সিঁড়ি পর্যন্ত গেলে বাবা হাঁক দিয়ে বলতেন, 'এই, রাস্তায় চলে যাচ্ছে।' দাদার কাতুকুতু বেশি ছিল। তাঁকে যদি কোনো খরগোশ একটু চুলকে দিত বা দাদার গা বেয়ে উঠতে চাইত তাহলে দাদা এত হাসত যে ঝাঁকুনিতে খরগোশগুলো গড়িয়ে পড়ে যেত। দাদাকে খেপাবার জন্য কেউ যদি দাদার কোলে একটা খরগোশ তুলে দিত, তাহলে দাদা দু হাত ওপরে তুলে 'সরিয়ে নে, সরিয়ে নে' বলে চেঁচিয়ে উঠত। বাবা আর দাদাকে বাদ দিলে বাকি সকলেই খরগোশগুলোকে ভালই বাসত আর অবসর মত তাদের নিয়ে খেলতও। কিন্তু খরগোশরা খরগোশের নিয়মে সংখ্যায় দ্বিগুণ, তিনগুণ, চার-পাঁচ গুণ হয়ে যাওয়ায় তাদের সবগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে যে-সঙ্কট দেখা দিল তা আমাদের আলাদা-আলাদা ভালবাসা ও খেলাধুলোটুকু দিয়ে মেটানো যাচ্ছিল না। তাও যদি-বা আমার ছোটবোনকে বড়দি একটু স্বাধীনতা দিত, বাকিদের সে বড় একটা বিশ্বাস

করত না। আর বড় খরগোশগুলোকেই এত নশ্বর ও ভঙ্গুর মনে হত, ছোটগুলোর দিকে তাকানোই যেত না, যেন জোরে ফুঁ দিলেও ঝরে যাবে।

আর-একটা বড় হাঙ্গামা ছিল, এগুলোকে বেড়ালের হাত থেকে বাঁচানো। দশ-বিশটা থাকলেও নানা রকম বুদ্ধি করে সামাল দেয়া যায়। সংখ্যা যখন বুদ্ধির বাইরে চলে যায় তখন আর সামাল দেয়া যাবে কী করে। খরগোশ যত বাড়তে লাগল, বেড়ালের সংখ্যাও তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে লাগল। আগে দুটো-একটা ঘুরঘুর করত, তাড়া দিলে পালিয়ে যেত। কোত্থেকে একটা হুলো এসে জুটল, সঙ্গে দু-তিনটি মাদি বেড়াল নিয়ে। তাড়া দিলে তারা পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করল। যেখানে তাড়া খেত সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ত। দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকত—একটু বিলম্বিত ডাক-যেন শিকারের অনুমতি চাইছে। একটা খরগোশকে খুন করার পরও বেড়ালগুলো তাড়া খেলে দাঁড়িয়ে পড়ত বটে—ডাকটা বন্ধ করে দিল, অনুমতি চেয়ে বিলম্বিত সেই মৃদু ডাক। তার একটা কারণ হতে পারে যে বারান্দা জুড়ে ছেটানো রক্ত আর রক্তের আঠায় লেগে থাকা খরগোশের কাল লোম আর বেড়ালের রক্ত-মাড়ানো থাবার ছোপ দেখার পর বাড়িশুদ্ধু আমরা সবাই নিজেদের অজানতেই বেড়ালগুলোকে কঠিন করে ঠেকাতে চাইছিলাম। বেড়ালকে আদর ছাড়া হাতেনাতে ধরা যায় না। শরীর পিছলে, পিঠ বেঁকিয়ে, পা বাড়িয়ে, লাফিয়ে দৌড়ে, হঠাৎ ঘুরে, গোল্লা পাকিয়ে, গোল্লা ছিঁড়ে, বেয়ে, ঝাঁপিয়ে বেড়াল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কোনো একটা বেড়ালকেও পোষ মানালে সে হয়তো খরগোশগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টায় জড়ো হত। তখন আমাদের কোনো পোষা বেড়াল ছিল না। যে বেড়ালগুলো খরগোশ খেতে আসত তাদের মধ্যে দুটো-একটা বাড়িতে বা বাসন-কোশন ধোয়ার সময় কুয়োপাড়ে ঘুরঘুর করত বটে তবে সেগুলো বাড়ির বেড়াল ছিল না। আর যখন তাদের লক্ষ খরগোশ হয়ে গেছে, তখন এঁটোকাঁটায় আর তাদের মন ছিল না।

খরগোশ যখন অসংখ্য বেড়ে গেছে আর অতগুলো বেড়াল যখন ঘুরঘুর করছে তখনো যে মাত্র দুটো-একটা খুনের ওপর দিয়েই কাটছে তার একটা কারণ, দিনে যদি-বা দুটো বেড়াল দুই দেয়াল বেয়ে কখনো কখনো আসত, রাতে তাও ঘটত না। বেড়ালগুলো একসঙ্গে আসত না, আসতে পারত না। বেশি রাতে পাশের গলিতে দুই বেড়ালের ঝগড়া শোনা যেত।

এতে আমাদের দিনরাত একেবারে বদলে গেল।

সারা দিন বাড়ি জুড়ে যেন অসংখ্য কাল বল গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে আসছে, গড়িয়ে থামছে। খাটের তলা থেকে, ট্রাঙ্কের পেছন থেকে, খাটের ওপর দিয়ে, খাটের বাজু বেয়ে কাল কাল বল গড়াচ্ছে—কখনো মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কখনো বৃত্তাকারে, কখনো আঁকাবেঁকা রেখায়, কখনো বৃষ্টির বড় ফোঁটার মত, কখনো ঝাপটা বাতাসে দোলা গাছের ফলের মত অসংখ্য কাল বল আমাদের ঘিরে ধরছে। এমনিতেই এই বাড়িটা ছিল একটু ঘুপচি, জিনিশপত্র রাখার পর ঘরে প্রায় জায়গাই ছিল না। যেটুকু ছিল সেই খোলাটুকুও জলভরা মাঠের ঘাসের মত কাল-কাল ছোটবড় বিন্দুতে ছলছল করে উঠত। আর এ-বাড়ির জানলাগুলো ছিল ছোট-ছোট, দু-চারটে কুলুঙ্গিও ছিল। সেই সব তাকের ওপর থেকে কাল বল ঝরে পড়ত আবার নতুন-নতুন কাল বলে সেই তাক ভরে উঠত। আর কোথাও কোনো বল স্থির হয়ে নেই। জলের ঢেউ বা বড় গাছের ছোট পাতার মত সব সময় অজস্র কাল বল একসঙ্গে নড়ছে দুলছে। দরজা-জানলা বারান্দা-কুলুঙ্গি সহ শক্ত ইটের গাঁথুনির পাকা বাড়িটা যেন সব সময়ই

দুলছে, সারাদিন।

আর রাতে খাঁচাগুলোতে যতগুলোকে আঁটানো যায় আঁটিয়ে বড়দি ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে বেড়ালের ঢোকার জায়গা আটকে খরগোশগুলোকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিত। খরগোশের পায়ে গায়ে কোনো আওয়াজ নেই। ঘরের অন্ধকারে কাল খরগোশগুলি মিলে যেত, প্রায় যেন গলে যাওয়ার মত আর তাদের ছোট-ছোট খয়েরি চোখ ঘরময় অন্ধকারকে অসংখ্য রেখায় ছিন্নভিন্ন করে ছুটত। দুটো চোখ একদিকে ছুটলে না হয় একটা খরগোশ কল্পনা করে নেয়া যেত। আর আমাদের কল্পনার দরকারও ছিল না। আমরা রাতদিন সেই কাল খরগোশ দেখতে দেখতে চোখ বুজলেও দেখতে পেতাম। রাতে চোখ খুললে দেখতে পেতাম না—খরগোশের সম্পূর্ণতা। তখন তাদের চোখ দুটোও যেন একটা শরীর থেকে ছিটকে আলদা হয়ে যেত, এমন বেগে আর একটা গতি এসে সেই ছুটন্ত খয়েরি বিন্দুগুলোকে ছিঁড়ে দিত। আমাদের রাতের অন্ধকার, ঘুম অথবা জাগা জুড়ে মশারির গায়ে, ছাদে, দেয়ালের তাকে, কুলুঙ্গিতে, মেঝেতে, খাটের বাজুতে, সেই খয়েরি বিন্দুগুলো নিঃশব্দে ছুটছে, কাটাকুটি করছে, রেখা তৈরি করছে, রেখা ভেঙে দিচ্ছে, রেখা রেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, রেখা যেন তরল কিছু এমন করে ঘূর্ণিত হয়ে উঠছে, যেন মেঝেটা শক্ত কিছু নয়—রেখাগুলো এমন করে মেঝের ভিতর ঢুকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা আবার মেঝের ভিতর থেকে চারিয়ে বেরচ্ছে। একমাত্র সিলিংটা এক পাত শক্ত অন্ধকারের মত, শূন্যতায় স্থির হয়ে থাকত। চোখ খুললে বা বন্ধ করে থাকলে আমাদের মনে হত যেন সিলিঙেও ঐ খয়েরি বিন্দু আলোর ঝলক লাগছে আর পরমুহূর্তে অন্ধকার বাতাস এসে সে আভা মুছে দিচ্ছে। এত নিঃশব্দে এই রাত্রিব্যাপী ছোটাছুটি ঘটত যে তাতে কারো ঘুমের কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এত নিঃশব্দে রাতে ঘরে আটকা সেই অন্ধকার ধাক্কায় ধাক্কায় আলোড়িত হত যা ঘুমের চাইতেও নিঃশব্দ। রাতদিনের সেই তুমুল ঘূর্ণির মধ্যে আমাদের দিনরাত কাটতে লাগল।

১৯৫৬-তে আমার কলেজে পড়া শেষ হল। আমরা একটা নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম।

# মজার দিনগুলি

## সাধন চট্টোপাধ্যায়

'না-নু!'

....

'কৈ গেলিরে পুতা!'

....

'নানুরে রক্ত মাখাইয়া দিল কে!'

......

'বৌমা। না-নু-রে রক্ত...!'

আশ্চর্য! চার-চারবার কে এমন কথার ছড়া কেটে উঠল? ঠাকুরঘরের পাশে অন্ধকার কুঠরি থেকে? অস্পষ্ট, ঘোর জড়ানো, কফে-লালায় পুরনো এঁদো গত্তটা দিয়ে? ও-ঘরে তো আজ আড়াই বছর ধরে শব্দ-ধ্বনি বা কোনো কথার জন্ম হয় না। সব হিম হয়ে আছে।

'তাই না মঞ্জুলিকা? মঞ্জু?'

'হ্যাঁ, তাই তো! ঠিক শুনেছ? মা'র গলা?'

'শুনেছি মানে? আমার কান এতটাই ট্যালট্যালে হবে? বয়স হয়েছে বলে...?'

'রাগ কল্লে? ঠিক তা বোঝাতে চাইনি!'

'মা-র গলা ভুল করব?'

'কিন্তু...হঠাৎ আজ কী মনে করে...এটা সম্ভব?'

'অসম্ভব বলেই তো ভয় পাচ্ছি! নানু ফেরেনি?'

'না।'

'সেই-তো সাতসকালে গেছে? ক'টা কলেজ থেকে ফর্ম তুলবে?'

'বলে যায় কখনো?'

'কেন? কেন বলে না শুয়োরটা!'

'কি মুশকিল! বাঁধন সবে ছিঁড়ল...বাপ-মায়ের কথা মেনে চলবে?'

'মানা-টানা নয় মঞ্জু! ফর্ম তুলবে, চলে আসবে—এই তো! যাগ্গে! বেশি না বলাই ভালো!...মাথা ঠিক থাকে না!'

'হ্যাঁ, সেই ভালো!'

'ঐ পুতপুত করেই তো গেলে!'

'কী আর করব? বড় হয়েছে...কলেজে ঢুকতে যাচ্ছে...নিজের ভালো বুঝে নিক...দেরি তো হতেই পারে!'

'দেরি তো হত্যেই পার্য়ে!...চমৎকার! বলতে লজ্জা লাগে না?'

'আমরা তো স্পটে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না!'

'স্টার পেয়েও যদি গোয়াল চটকাতে হয়!...কম্মাদের কী হবে তালে?'
'সংসারে স্টার তো তোমার ছেলেই একা পায়নি...পথে নামলে টের পেতে।'
'পথে তো নামি না আমরা! বড্ড তক্ক শিখেছ?'
'ফের চেঁচাচ্ছ?...কাজটুকু ফুরিয়েছে বুঝি?'

নিখিল এবার খাটো। হ্যাংলামির জন্য খোঁচাটুকু পৌরুষে আঘাত। কাজটুকু তার একার নৈবেদ্য ছিল।

অফিস ছুটি-নেওয়া নিখিল ও মঞ্জুর ঘরে দুপুরে দরজা-জানলা টিভি-প্লেয়ার—জামা, কাপড়—শাড়ি—বিড়াল সব ঘুমন্ত। এমনকি টেলিফোনটিও কায়দায় বিচ্ছিন্ন রাখা, যেন বেরসিক-বেহায়ার মতো যে-কোনো চরম উৎকণ্ঠায় ক্রিং ক্রিং হা-হা শব্দে কোনো কিছু চিড় না ধরতে পারে। নানু আজ তৃতীয় দিন—আটটায় বেরিয়েছে; সাতটা-সাড়ে ছটাতেও বেরুতে হয়েছিল।

নিখিল ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। এখন এ বয়সে অফিস নয়, আপিস! ছুটি পেয়েছে আপিস থেকে বড়বাবুকে জানিয়ে। কে না জানে ছেলেকে নিয়ে ভর্তির সিজন-এ বাবাকে দু-চার দিন অফিস কামাই দিতে হয়।

'বাবা হয়ে যাবে না একবারও?'
'খবদ্দার!'
'কেনরে নানু?'
'কারও বাপ কলেজে যায় না!...মা, তোমরা...!'
'মঞ্জু, জগৎটা তো একাই দেখবে পরে...তৈরি হোক!'
'বেঁচে গেলে, তাই না?'
'বাঁচার কী আছে মঞ্জু?...বাস্তব!'
'তালে আজ ছুটি নিলে কেন? সারা দুপুর...'!

সারা দুপুর...। নিখিল ও মঞ্জু। ঝি দুপুরের কাজ সেরে দিয়ে গেছে। আড়াই বছরের বিনিশব্দের ঘরটুকুর দেখভালের মহিলাটি—চলতি নাম আয়া—কুসুমিকা মণ্ডল—সকালের ডিউটি সেরে, ঢুকবে ফের ঘোর বিকেলে, সন্ধ্যা মাথায় করে।

নানু স্টার!
নানু বাপ-মায়ের আদুরে!
নানুই স-ব!
নানু মুখ রেখেছে!

ও কী কী হবে?...নানু অনেক কিছু হবে!...ও এখন বড়, বুঝদার!...ও আলাদা ঘরে শোয়!...রাত জেগে গত ফ্যাইন্যাল তৈরি করেছিল...তবে ৭টা ম্যাস্টরের খরচা ভুলিয়ে দিতে পারেনি। আপিসে ব্রজর ছেলেটা পুষিয়ে দিয়েছে। নানুচ্চেয়ে ৫০ বেশি। মাত্র তিনটে মাস্টুর ছিল। তাও কেবল সায়েন্সে।

নানু সেই কখ-ন বেরিয়েছে। ওর ঘরটা দুপুরে ফাঁকা। ওর বালিশের তলায় কিসের

ছবি? ঋত্বিক? রবীনা? অমন হয়-ই। দিনকাল কি আমাদের মতো!

'আমাদের বলতে? ম-ঞ্জু কী বো-ঝা-তে চাইছ?'

'কী আদিখ্যেতা হচ্ছে? জানলা খোলা।'

'তিনতলার জানলারা, উঁহু! ন্যাংটো হয়েই জন্মায়।'

'কী ভাষা! তোমারটাই বুঝি তিনতলা?'

'স-রি! খেয়াল করিনি।'

'বুড়ো বয়সে...কী যে করো!'

ঘড়ির মৃদু শব্দে—চরণরেখায়—দুপুর চলে। দূরে, বহুদূরে কোথাও বুড়ো কোনো গাছ আপন দায়িত্বে থমথম করতে থাকে। পাখির শব্দ হয়, তাতে লেখা থাকে দুপুর ঘনাচ্ছে। রোদ জ্বলে না, সরু শিসও তোলে না; কখনো মেঘ কখনো ছিচ্ছিরে বারিষ...প্যাচপ্যাচে কাদা...টায়ার চলতির আলপনা। কাঁঠালের গন্ধ ওঠে। তিনতলায় ওদের কোলের কাছে আসে, টের পায় না। টের পেতে চায় না।

'মঞ্জুলিকা! ম-ঞ্জু! নানুর মা!'

'যাঃ! এখন কেউ বেল টিপলে?'

চারদিকে বেল্ বাজে, বেল্ মানে ঘণ্টা। ঘণ্টা ঢং ঢং বাজে। হৈ হৈ বাজতে বাজতে যায়। মঞ্জুলিকা নিখিলকে ধীরে ধীরে ধারণ করতে থাকে নিয়তির মতো।

তারপর...। কিছু ঘুমের শব্দ। আত্মবিলাপের শব্দ! বয়স-দুর্বলতার শব্দ! ফোন ঠিকঠিক স্থানান্তরের শব্দ! কলিংবেল চালু রাখার শব্দ। এবং দুপুর গড়িয়ে পিছলে চিকন যাদুবিদ্যার মধ্যে বাথরুমে বিকেলের চা-পূর্ব মুখচোখ ধোয়ার আওয়াজে মঞ্জুলিকা নিখিলের দিকে টেপা ঠোঁটে, নিছকই হাসির ইঙ্গিতে জানতে চাইল চায়ের সঙ্গে নিখিল বিস্কুট খাবে কিনা!

নানু আসবে। ঘড়ি দেখতে শুরু হয়ে যায়। খেতে দিতে হবে। কিন্তু স্টেশনে টুকটাক বাজার আছে। মঞ্জুলিকার মার্কেটিং! নিখিল বেরুতে পারে কিন্তু মঞ্জুর মন ভরবে না।

'স্টেশনে যাব।'

'কেন?'

'টুকটাক! যাব আর আসব!'

'যাবেই বা কেন, আসবেই বা না কেন!'

'একদম জলখাবার নেই।'

তখনই নিখিল দুর্বল প্রস্টেটের অসহায় পেচ্ছাবটুকু সারতে বাথরুমে এবং আড়াই বছরের হিমঘর থেকে...! লালা, কফ মেশানো থাকলেও, কোনো ভুল নেই। চার-চারবার!

অশুভ, অলুক্ষণে ছায়ার ইঙ্গিতে নিখিলের চোখেমুখে তখন দুপুরের অনুস্মৃতি চলটা হয়ে ঝরে। ধন্দের প্রলেপ লাগে।

'...রক্ত মাখাইয়া দিল কে?'

স্পষ্ট শুনল। জননীর কণ্ঠ বুঝতে ভুল হয় কখনও? প্রথমে আচমকা না-বিশ্বাস হলেও,

ধৈর্য, বুদ্ধি ও একাগ্র মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখিল শুনল। তবে সত্য হয়ে ফুটে উঠবার ভয়ে দরজায় কান পাতল না। ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছু তফাতে। কী ভয়? মাকে ভয় কিসের? কিন্তু তিরিশ মাস তো কুঠুরিটায় কোনো কথার জন্ম হয়নি। বিছানায় বুড়ি অমন ভঙ্গিতে আড়াই বছর শুয়ে থাকার পরও কি তাকে মা বলা যাবে? কোমার মধ্যে, যখন বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে, কোনো চিকিৎসাতেই সম্পর্কটা তাজা হয় না—তখনও কি নিখিলের মা? প্রভাদেবী?

সেরিব্রাল বা স্মৃতিগ্রাসী রোগ যখন প্রাণটুকু রেখে জীবনের অন্যসব লক্ষণ বরফে লুকিয়ে রাখে, আধুনিক বিজ্ঞানে ডাক্তার-নার্সরা তো কিছু লক্ষণ ফিরিয়ে দেয়! দিতে পারার নজির আছে!

প্রভাবতীর দেয়নি। আড়াই বছর ধরে, উঁহু, সূক্ষ্মভাবে, প্রথম সাত-আটমাস নিখিল-মঞ্জু-নানুর আশা ছিল ওনার স্মৃতি ক্ষীণ সুতো হলেও ফিরে আসবে। সেই থেকে কুঠুরিটা বিচ্ছিন্ন। কুসুমিকা মণ্ডল বছরখানেক নিয়োজিত হয়েছে। ওর চাকরি এটা। স্বামী পর্যন্ত জানে, কুসুমিকা আয়া—প্রাইভেট আয়া।

কিন্তু আজই প্রভাদেবী, স্মৃতি ফিরে পেতে শুরু করলেন কীভাবে? কেন? নানুতো সত্যিই জীবনে প্রথম বাহির হল। পাশ করেছে, মুখ রেখেছে কিছুটা পড়শীদের কাছে। এখন সেই জগৎটাকে হিসেব-নিকেশে বুঝে নিতে গেল, যেখানে বাকি মস্ত জীবনটা চষতে হবে। রক্ত কেন উচ্চারিত হচ্ছে? অলুক্ষণে ইঙ্গিত? ঐ একটিমাত্র সন্তান তাঁদের—নিখিল ও মঞ্জুলিকা বাঁচবে কী ভাবে!

যদি 'বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা না দিয়ে' মা যদি স্মৃতি ফিরেই পেতে থাকে, বড্ড সুখের কথা। কিন্তু মার ৮৫ বছরের স্মৃতিগুলো তো ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে পর পর সাজিয়ে রাখলে। কোন্ বিন্দু থেকে ফিরে পেতে শুরু করল? আজ মাত্র ৩টে দিন হল নানু নাকেমুখে গুঁজে ফাইলে মার্কশিট্ নিয়ে বেরুচ্ছে। অভিজ্ঞতার প্রথম দিনটা ফিরে মাকে খাওয়ার টেবিলে শুধু হেঁয়ালির মতো বলেছিল।

'কুঁড়ি না ফুটলেই হত!'

'মানে?'

নানু মিতভাষী। ভাবে বেশি। যা বলে, যেন গেঁথে রাখছে কোথাও।

'আমাদের আপিসে ব্রজর ছেলেটা ভালো করেছে, দুটোতেই, বুঝলি নানু!'

'র‍্যাংক্?'

'তিন হাজার।'

'তোমার কলিগের জমানো ক্যাপিটল্ কত?'

'কিসের জন্য?'

'ফুল ফোটাতে?'

'হ্যাঁরে নানু, তোর র‍্যাংকও তো তাই, না?'

'যা বোঝ না মঞ্জু!'

'বাবু নিখিল তুমিও বুদ্ধু! খাঁটি একটি চাঁদু!'

'হো-য়া-ট্!'

'বাপি, এত সিরিয়াস হবে না। একটু র‍্যাগিং কল্লাম তোমায়!'

৭

মঞ্জুলিকা চটপট ফেরার আশা দিয়ে গেলেও, বাস্তবে তা ঘটে না। শপিং বলতে তাই-ই বোঝায়। নানুও তো আসছে না। ছটা পর্যন্ত ফর্মের লাইন? দাঁড়াগ্যে! এর পর পৃথিবীটা তো ওদেরই সামলাতে হবে। একটা ফোন করে দেবে, তাও না। ঘরে না-ঢোকা অবধি আজকাল নিশ্চিত থাকা যায়?

কলিং বেল! এই বুঝি! উঁহু। কুসুমিকা মণ্ডল।

'এত সকালে? অফিস বেরোননি আজ?'

'না।'

'বৌদি?'

'শপিং-এ গেছে। নানুটাও ফিরছে না!'

মিসেস কুসুমিকা মণ্ডল সোজা ঐ কুঠুরিটার দিকে। টুকিটাকি শব্দ, জল, মোছা, সরানোর আওয়াজ—ঐ ঘর কিছুক্ষণের জন্য সচল। অথচ ও-ঘর থেকে একটু আগেই তো! হ্যাঁ! নিখিল কোনো কিছু রে[illegible]নের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই কুসুমিকা ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে আসবে উৎসাহে। এমন একটা বিস্ময়!

নিখিল দাঁড়িয়েই; প্রতিদিনের কুসুমিকার আচরণে, উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় পা বাড়ায় নিজের ঘরে। ব্যাপারটা আয়ার গোচরে আনা দরকার। হয়তো ও নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখতে পারবে; রহস্যভেদ হবে খানিকটা।

'কুসুমিকা?'

....

'কুসুম?'

....

কেউ কি ডাকছে? তাইতো! কেন ডাকবে আমায়? দু-দুবার ভুল শুনলাম!

'ডাকছেন আমায়?'

'এ-ঘরে আসবে একবার?'

নিখিল বেডরুমে বসে গিয়ে। তৈরি হয়। কীভাবে বলবে? ভয়টুকু প্রকাশ করবে? ছেলে হয়ে মায়ের ঘরে ব্যাপারটা যাচাই করতে ঢুকল না—ও যদি অন্য কিছু মনে করে বসে এর?

কুসুম তো এবার স্পষ্টই শুনল উনি ডাকছেন। ভেতর ঘরে। কেন? দুপুরে বৃষ্টি গেছে, এখনও রেশ ঝুলছে বাতাসে, বিকেল ডুব দিয়েছে সন্ধ্যায়, প্রদোষের অন্ধকার যেন বাড়ি-ঘরের জটাজুটের মধ্যে তিনতলার সব কিছু চোরাগোপ্তা হয়ে উঠছে। কুসুমিকা অবুঝের ভান করে, দুষ্টুমিটুকু লুকিয়ে ঢুকে দেখে নিখিল বিছানায় পদ্মাসনে, সামনেই হাল্কা প্ল্যাস্টিকের একটা চেয়ার।

বসতে বসতে, 'বৌদি নেই?'

'ঢুকেই শুনলেন তো!'

'বটে! ডাকলেন কেন?'

নিখিল কুসুমিকার আধুলিমাপের সবুজ ভেলভেটের টিপটা দেখে না, ভুরু দেখে না,

চাপা ঠোঁটজোড়া লক্ষ্যে নেই, ঈষৎ শ্যামল গাত্রবর্ণ, কাঁধ, সিদ্ধহস্ত শরীরটার সঙ্গে আঙ্গুল, আংটি, নেইলপালিশ এবং তারই ডগার তলায় ময়লাগুলোর দিকেও তাকায় না। কেবল চোখে চোখ রেখে অশুভ অলুক্ষণে ব্যাপারটা, নানুর না-ফেরার দুশ্চিন্তা, বলে যায়।

কুসুম মিটিমিটি হাসে। বিশ্বাস করে না। কুঠুরির নৈমিত্তিক লক্ষণগুলো যথাযথই। তালে নিখিলের এগুলো ভনিতা, প্রস্তুতি বা প্রস্তাবের পথ তৈরি। কুসুম সাহসী অভ্যাসে কটাস্ করে ক্ষুদ্র একটি চোখ মারল একা ঘরের সুযোগে। নিখিল চোখ ঘুরিয়ে বলে স্পষ্ট সে মায়ের ডাকগুলো শুনেছে। কুসুমিকা ভেন্ন কায়দায় চলে যায়।

'তালে আমারই হাত-যশ বলতে হবে।'

'কেন?'

'৫০০ টাকায় কথা ফোটালাম!...মিনিমাম ২ চায় আজকাল এ-কাজে!'

'দুই হাজার?'

'আজ্ঞে! তাতেই দেখুন টোকা দিতে শুরু কল্ল!'

'টোকা বলছেন কেন?'

'স্মৃতি ফিরছে কিনা।'

নিখিল লম্বা শ্বাস ফেলল। কিন্তু স্মৃতি ফিরে পেলে নিছক নানুকে দিয়েই শুরু কেন? যেখানে গুটিয়ে গেছল, তা থেকেই তো মেলতে থাকবে? আমি তো তার গর্ভ থেকে নেমেছিলাম। আমার সম্পর্কেও তার ক-ত স্মৃতি! বাবার সম্পর্কে, দাদুর সম্পর্কে!

'দেখুন কী হয়! ডাক্তারকে ফোন করেছেন?'

'ঘরে ঢুকে কিছুই টের পেলেন না, এ-সবের?'

'কাল ভালোভাবে নজর রাখব।'

কুসুম ওঠে। বেশ লম্বা। এখন সে মালিক-কর্মচারী সম্পর্কটুকু আঁচলে জড়িয়ে, চটি গলিয়ে ধাপ নামতে থাকে। ফাঁকি দিয়েছে আজ। সুযোগ নিয়েছে। তবু কুসুমিকা এখনও পুরো বিশ্বাস করল না নিখিলকে। একটা বুড়ো দামড়ার এত ভয়? ঘরে ঢুকে কান পাততে পাল্লি না?

সিঁড়ি দিয়ে দুলকি চালে লাফিয়ে নামতে-নামতে সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চোখে-চুমু ছুঁড়ে দিয়ে গেল। নিখিল পুরো পাল্লাটা তখনও কভার করেনি। তাতে কিছু অতিরিক্ত বেরিয়ে এলো না। কুসুমিকা নিজের ভ্রান্তিটুকু বুঝতে পারল। মতলব কিছু নয়, বৌদির সঙ্গেই দাদার কিছু ঘটেছে। বড্ড মনমরা লাগছিল যেন!

খানিক বাদে মঞ্জুলিকা, অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল শুনে, বিস্ময়ে-দুর্ভাবনায়, তর্কে-তেতে দুপুরের জন্য খোঁচা লাগায়। কাজটুকু ফুরিয়ে গেছে বুঝি!

কিছু পরে, এ-অবস্থায় নানু।

'এত দেরি?'

'হয়ে গেল!'

ফেনিয়ে জবাব দেয় না মাকে। বাথরুম, তোয়ালে, নিজের ঘরেই জলখাবার। মঞ্জুলিকা লুকিয়ে দেখে রোজকার মতোই পুরনো হয়ে এসছে ছেলে। সেই বাচ্চাকালের নানু। আবদার, বায়নাক্কার নানু! কেবল মায়ের চোখে ধরা পড়ল, নানুর চোখেমুখে রক্ত লেপা রয়েছে!

হাল্কা রক্ত। অনেকটা ছালছাড়ানো মাংসবর্ণ।

'পেলি?'

'মাত্র একটাতে।'

'তাতেই সকাল থেকে রাত?'

তৃতীয় দিনে আজ নানু স্বাভাবিক। যদিও এই প্রথম রক্ত-লেপা দাগ ফুটে উঠতে দেখল, নানুর মধ্যে প্রথম দিনের শক্, আতঙ্ক, পৃথিবীদর্শন, বিরক্ত-অসন্তোষ আজ কিছুই নেই। সব পান করে টাইট্ পোক্ত হয়ে আছে। কেবল রক্তের দাগ নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়া।

পরদিন একা মঞ্জুলিকা সাক্ষী। দুপুর। তবু শরীর ছমছম করে।

'কৈ গেলিরে পুতা!'

...

'রক্ত মাখাইয়া দিল কে?'

...

'বৌ-মা! না-নু-রে...!'

নিখিল নেই। আপিস কামাই বা তাঁর অদ্ভুত খেয়াল সম্পর্কে আজ মঞ্জু ভীষণ আকুল হলেও রোজ রোজ ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নানু তো বলেছিল, ফর্ম তুলেই সকাল-সকাল ফিরে আসবে আজ! ছেলেটার মুখ দেখলে কষ্ট হয়। কোনো কালে সামান্য আঁচড়টি পায়নি। কিন্তু আজ কিছুই নতুন লাগছে না। সব স্বাভাবিক হয়েই ঘরে ঢুকল।

'দেরি করলি?'

'কৈফিয়ৎ চেও না রোজ রোজ!'

এটাই নিয়ম, এমন ভঙ্গিতে নানুর বাথরুমে ঢোকা, চান, মাথা মোছা, নতুন পোশাক, নিজের ঘরে বসা এবং টিফিন। মা দেখল ছেলে যেমন, তেমনই। বাড়তি হয়ে অদ্ভুত মজার আলো চোখেমুখে। মিস্ত্রির ফিনিসিং কাজ যেন। কেবল রক্তের দাগে ঘন পোঁচ একটু।

আর প্রতিদিনের মতো নানু চুপচাপ এটা-সেটা নাড়ানাড়ি করে, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঠিক ঘুমিয়ে পড়া নয়, মঞ্জুর মনে হয়, পরদিন বেরুনর জন্য চোখ বুজে আট-দশ ঘণ্টার অপেক্ষায় অচেতন হয়ে থাকে।

ঠাকুমার ব্যাপারটা কি নানুর কাছে বলা যাবে? নিখিলের প্রস্তাব মঞ্জুলিকার না-পছন্দ।

'শক্ পাবে!'

'মনে হয় না।'

'কেন? কীজন্য মনে হয় না?'

'দিব্যি তো বেরুচ্ছে ফিরছে। সেই নানু আছে?'

'তিন দিনেই বদলে গেল?'

মঞ্জু নিখিলকে জানায় না সত্যিই সে ছেলের চোখেমুখে রক্তের দাগ লেপটে থাকতে দেখে। রোজই তা ঘন হয়। রক্ষে, ছেলের অসুবিধে হচ্ছে না এতে, ফিরে কেঁদে ফেলছে না। সুন্দর মানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু রোজ ফেরার পর রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে মায়ের বুকে

কী প্রচণ্ড হাউর সৃষ্টি হয়!

আটদিন পর নানু একটি দিনের জন্য বিশ্রাম নিল। বেরুল না। ফ্যাতরা একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবার ভালোর সন্ধানে ঠ্যালা-গুঁতো। মঞ্জু ভাবে, আজ দুপুরে নানু যদি ঐ-ঘরের কথাগুলো টের পায়? ও কি বিশ্বাস করবে, মানুষ আড়াই বছর দলাপিণ্ড থেকেও স্মৃতি ফিরে পেতে পারে?

'মাসী আজকাল আসে না রোজ?'

'কুসুম? হ্যাঁ, দু-বেলা পোষ্কার করে। কেন?'

'বিটকেল গন্ধ কেন? দরজাটা ভেজিয়ে দাও।'

খেতে খেতে মঞ্জুলিকা অতিরিক্ত একটুকরো কাটা রুইমাছ পাতে তুলে দিল।

'উঁহু!'

'কেন? খাচ্ছিস না কেন?'

'—'

'ঘুম হচ্ছে না?'

'কেন হবে না?'

'ফের বেরুবি কবে?'

'কাল, পরশু, পরদিন। ধরো রোজই!'

'রোজই? আট-দশদিন কী তালে কল্লি?'

নানু চুপচাপ অনেক্ষণ ধরে কাঁটা চিবিয়ে রস আদায় করে।

'বুঝলে মা!' হঠাৎ হাসি। হাসলে ওর গালে টোল পড়ত। এ-কদিনে সেটি মনে হচ্ছে মিলিয়ে গেছে। মায়ের খারাপ লাগে। আলগা শ্রী ফুটত!

'তোর যা র‍্যাংক, মোটা টাকা দিলে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও পাবি না?'

'তুমিই বলবে শুধু? শুনতে বল্লাম না?'

'বাপের মতো ঝামটাতে শিখেছিস, না?'

নানু গোম খায়। পুরনো স্বভাব ওর। তখন কেটে ফেললেও কথা আদায় করা যায় না। আজ হঠাৎ হেসে 'র‍্যাগিং কল্লাম একটু!'

মঞ্জু শুনে অবাক। নানু তা'লে বদলেছে। অন্য সময়ে ওর গোমর ভাঙতে দু-তিন দিন লাগত।

'ছাড় তোদের ফ্যাগিং-ম্যাগিং! কী বলছিলি?'

'ফুল হবার অন্য ভ্যালু আছে মা। কুঁড়ি থাকা চিরকাল ভালো নয়।'

'মানে?'

'মানে-ফানে নেই। মনে হল বল্লাম।'

'এ-কদিন বাইরে বাইরে কী হত?'

'ফর্ম তোলা, জমা।'

'বাজে বকিস না।'

মঞ্জু বলে না ছেলেকে, সারা চোখমুখে কে রক্তের দাগ বুলিয়ে দিয়েছে। ও শুনলে

মানতেই চাইতে না। প্রমাণ দিতে বলবে। প্রমাণ দিয়ে কি রং-এর কথা বোঝানো যায়? ওটা তো যার যার চোখের মধ্যে লেগে থাকে।

'বাজে কথা না। ঘরে এসেও বা কী কত্তাম?'

'কত বিপদ-আপদ! চিন্তা হয় না?'

'মেয়েরা থাকছে, তো ছেলেরা!'

'তাই বল! সব একলাইনে দাঁড়াতিস?'

'কেন? ওদেরটা ভেন্ন, আমরা আমাদেরটায়।'

'যাদের ভালো নম্বর...তুইও দাঁড়াতিস?'

'ভালো নম্বর? নম্বরের হাট ওখানে!'

মুখটা কেমন ছালছাড়ানো লাগছে! দগদগে...

'মানে? বিড়বিড় করছ কি?'

'কিছু নয়। আমারই ভুল।...সত্যি বলতো নানু, সারাটা দিন কী করতি?'

'বিশাল লাইন!'

'তারপর?'

'ছেলেগুলো সব মস্ত একটা তাঁবুর মধ্যে।...মেয়েরা অন্য তাঁবুতে।'

'তারপর?'

'আকাশে মেঘ!'

'তো?'

'গনগনে রোদ!'

'তারপর?'

'হাজার হাজার নাকের গরম বাতাস!'

'বুঝলাম!'

'মস্ত ঘণ্টা!'

'ঘণ্টা? কী হয়?'

'বাজে।'

'তখন?'

'পকেটের নম্বরগুলো বার করে টেবিলে জমা দিতে হত।'

'তাই?'

'তারপর ডাং দিয়ে সবগুলো ছিটকে দিত একজন।'

'ওমাঃ! কী বলিস?'

'একজন হেঁকে বলত কুড়িয়ে আনো!...যে যত বেশি কুড়োবে...।'

'হুড়োহুড়ি হত না?'

'তেল মেখে রীতিমত কুস্তি!'

'শেষে?'

'মাইকে, যার-যার পার্টনার বাছতে বলত!'

'পার্টনার? মানে?'

'তুমি বুঝবে না।'

মঞ্জুর চোখ গোলগোল হয়, কিছু দুর্গন্ধ অনুমান করে সে।
'কোণায়-কোণায়, সারা তাঁবু জুড়ে...!'
'চু-প কর!'
'কেন? খারাপ ভাবছ কেন?'
'প্লি-জ নানু!'
এ-ভাবে পার্টনার চয়েসের অভ্যেস থেকেই জীবনে ক্যারিয়ারটা...!'
'শোনাতে হবে না আমায়!'
'প্রথম দিন ঘাবড়ে ছিলাম। কষ্টও পেয়েছি!'
'এখন?'
নানু স্মিত হাসিতে, 'আই এনজয়!'
'তোকে ক্লান্ত লাগছে!'

রাতে খাবার টেবিলে তিনজন। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন। হোম-সার্ভিসে ফোন করা হয়েছিল। মঞ্জু খানিক গম্ভীর। খেতে খেতে নিখিল নানুর দিকে, 'হিল্লে হল কিছু?'
'করে তো ফেল্লাম!'
'এই স্টেটেই থাকতে পারবি?'
'আলবৎ!'
'মোট প্যাকেজ?'
'ছয়!'
'ছ লাখ?'
'তালে কি ছ হাজারে হাত ধুতে চেয়েছিলে?'
নিখিল চুপ। চিলির রসে মাখা আঙ্গুলগুলো শূন্যে পদ্মের পাঁপড়ির মুদ্রায় স্থির।
'ব্যাংকগুলো লোন দিচ্ছে। প্রয়োজনে ধার করবে!'
'শোধ?'
অনেক পর, হাড় চিবুতে-চিবুতে নানু হেসে, 'পাবে তো দশগুণ ফিরে!'
'ততোদিনে আমি নেই!'
'ততোদিন নয়...ক্যাম্পাস দিয়ে ঢুকতে দাও! তুলে নেবো!'
'তুলে নিবি মানে?'
'এখন সিক্রেট্!'
'কেন?'
'ভাববে তোমাকে র‍্যাগিং-ফ্যাগিং করছি।'
'না, ভাবব কেন! বল!'
নানু হাসে, কথা বলে।...আকাশে মেঘ...গনগনে রোদ...হাজার হাজার নাকের গরম নিশ্বাস,...মস্ত ঘণ্টা...বিরাট তাঁবু...প্রতিটি পার্টনার...আমি আজ ১৮ বার...আমাকে সবাই ২১ বার...!
'স্ট-প!'
'ঠিক আছে! ক্যাম্পাসটা হোক!...শুনতে চাইলে বলে!'

গভীর রাতে ঘরময় পচা বাতাস ঘোরে। ঝেঁঝে ওঠে নাকের বাঁশি। দু-জনের ঘুম ভাঙে। আলো জ্বলে। প্রভদেবীর ঘরে ঢুকে দেখে দুদিন হল মরে দলাটার পচন ধরেছে। কুসুমিকা দুদিন আসেনি? সুযোগ নিয়েছে সে-দিন নির্জন সন্ধ্যায় কথা বলার।

সম্পর্কে তো মা। সংস্কারের দায় আছে। লোক ডাকা, আত্মীয়স্বজন-এর প্রয়োজন। ছেলের ঘরে ঢুকে দেখে রক্তলেপা মুখটা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পুরনো পাতাকাটা চুলটা কীভাবে যেন ব্যাক্‌ব্রাস হয়ে ফুলে ফেঁপে আছে।

শেষ রাতে পবিত্র শিশির যখন চরণ বিছিয়ে দেয় ঘাসে-পাতায়-ফুলের গর্ভকেশরে, নিখিল ও কিছু আত্মীয়র দলটা শবদেহ নিয়ে শ্মশানে হাজির হয়। নানু জীবনে প্রথম শ্মশান দেখল এবং ভারী মজা লাগল তার।

# নিউটনের তৃতীয় সূত্র

## ভগীরথ মিশ্র

১

—সান্যালদা ঘুমোচ্ছেন নাকি?

—আমি তো রোজ রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি ঘুমোই ব্রাদার।

—না, চোখ বন্ধ করে ছিলেন কিনা, তাই।

—ভাবছিলুম, ব্রাদার।

—চোখ বন্ধ করে ভাববেন না, সান্যালদা। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়বেন...।

সুপ্রভ সান্যাল ভ্রূ কুঁচকে তাকান। কথাটার মধ্যে কোনও খোঁচা আছে কিনা পরখ করেন। অনির্বাণ হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে অন্য দিকে চলে যায়। এবার ও ভবতোষবাবুকে ধরবে। এবং সেই প্রশ্ন তাঁকেও, ঘুমোচ্ছেন নাকি?

অনির্বাণের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সুপ্রভ সান্যাল ফের চোখ মুদলেন।

২

ইউনিয়ন অফিসের সামনে ভিড়টা জমাট বাঁধছিল। তিনপাশের জানালা দিয়ে উপচে পড়ছিল মুখ। চাপা উত্তেজনাটা ক্রমশ খোল্‌স ভাঙছিল। সুপ্রভ সান্যাল, ভবতোষ ধর, ঘনশ্যাম পাল, শশিভূষণ সরখেল, আরও দু-চার জন, যাদের বলা যায় এই কেসের সাফারার কিংবা অ্যাগ্রিভড্, অর্থাৎ কিনা বাদীপক্ষ,—দু-এক মিনিটের ব্যবধানে একে একে অফিস-ঘরে এসে ঢুকেছেন। নেতারা তো প্রথম থেকেই হাজির। তাঁদের সুমুখে রয়েছে বাদীপক্ষের মাস-পিটিশন। আর, আসামী অনির্বাণ বসু, সেও ঢুকেছে প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল।

ভেতরের নাটকটা ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। বাইরে থেকেই তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। ঘনশ্যাম, ভবতোষদের গলা ক্রমশ চড়ছে। নেতাদের কেউ কেউ গরগর করে উঠছেন মাঝে মাঝে। নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি মালিকপক্ষের দালালি করছো? আর, সবাইয়ের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে অনির্বাণ বসু নামের বছর পঁচিশের ছোকরাটি ভেজা বেড়ালের মতো তিরতিরিয়ে কাঁপছে, আর ঠোঁটের ফাঁকে কেবলই বিড়-বিড় করছে,—বিশ্বাস করুন, আপনারা বিশ্বাস করুন...। শুনে চিড়বিড় করে ওঠে জমায়েত। কুনো হালায় বিশ্বাস করি না। কেউ বলে, আরে তোর বিশ্বাসের ইয়ে করি। কেউ বলে, একটিবার বের করে দ্যান না, বিশ্বাসের পোলারে বাপ চেনাই। ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে জমায়েত। হিংস্রতা,—ভীরুতার গর্ভে তার জন্ম। আজকেও জমায়েতের এই হিংস্রতা সৃষ্টি হয়েছে এক সীমাহীন ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকে। রুটি-রুজি হারানোর ভয়। অফিসের প্রতিটি কর্মচারী যেন এক প্রবল ঘূর্ণিতে পড়েছে। সর্বদাই আতঙ্ক, এই বুঝি আমার পালা এলো। আমারই ঘাড়ে কোপটা পড়লো বুঝি। এমনি এক সীমাহীন

আতঙ্কের মুহূর্তে অনির্বাণ নামের যুবকটিকে ওরা সহসা পেয়ে গেছে সেই ঘূর্ণির উৎসমূলে। ওদের তাবৎ নিরুপায় রোষ আজ লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে গেছে।

৩

এমনিতে ভালো ছেলে বলেই তো মনে হয় অনির্বাণকে। বেশ স্মার্ট, বুদ্ধিমান, দক্ষ, হাসিখুশি,—পরোপকারীও বটে। অফিসে, ক্যান্টিনে খুব হৈ-হৈ করে মাতিয়ে রাখে। কেবল একটাই দোষ, মুদ্রাদোষও বলা যায়, যখন-তখন যাকে-তাকে শুধিয়ে বসে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? অফিসে কাজ করতে এসে সবাই সর্বদা কিছু ঘুমিয়ে পড়ে না, তবে সকাল আটটা-নটায় ভরপেট ভাত খেয়ে, ট্রেনে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে পৌঁছেছে, অফিসে পাখার তলায় বসে কারো কারো একটু-আধটু ঝিমুনি এসে যেতেই পারে। কিংবা ভরদুপুরে, একটা-দেড়টার পর, যখন অফিসের গমগমে ভাবটা ক্রমশ নিথর হয়ে আসে, বড় সাহেব চলে যান লাঞ্চে, মেজো সাহেব কারখানায়, ছোট সাহেব তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে টেলিফোনে গসিপ করতে থাকেন, তখন ভিজিটরদের সংখ্যা একেবারেই কমে যায়, ইউনিয়নের লিডাররা চলে যায় হরেক কিসিমের কাজে, অফিসের বাইরে বিশাল বাগানের মধ্যিখানের বুড়ো নিমগাছের চুড়োয় এক নিঃসঙ্গ ঘুঘু কোনও কোনও দিন ডেকে ওঠে, তখন শরীর জুড়ে কারো কারো, বিশেষত যারা মেদবহুল এবং পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, তাদের সামান্য আলস্য আসতেই পারে। চোখের পাতা সামান্য ছোট হয়ে, মগজের মধ্যে ভোঁতা ভোঁতা ভাব। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই অনির্বাণের গলা বেজে উঠবে, বড় সাহেবের কলিং-বেলের মতো, মোলায়েম, সুরেলা, ভীতিপ্রদ এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর, কী দাদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? যারা সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল, চমকে জেগে ওঠে। বিব্রত, সন্ত্রস্ত, ভীত। বলে, কই, না-তো। ঘুমোলুম কখন?

—হুঁ—হুঁ...। অনির্বাণ আরো সুরেলা হয়ে বাজে, আমি ঠিকই লক্ষ্য করেছি, ঘুমোচ্ছিলেন। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

যারা সত্যি সত্যি ঘুমোচ্ছিল, একেবারে সিঁটিয়ে যায়। যারা বাস্তবিক ঘুমোচ্ছিল না, তারাও চমকে তাকায়। বিরক্ত হয়। খেপে ওঠে। আড়ালে বলে, আচ্ছা পোঁদপাকা ছেলে তো। কেউ বলে, কেমন বোকাবোকা প্রশ্ন করে। ভোঁদাই। কেউ বলে, ভোঁদাই নয়, সেয়ানা। আসলে ছোকরা নির্ঘাৎ ম্যানেজমেন্টের দালাল। কে ঘুমোয়, কে কাজ করে, কে দেরিতে আসে, ছুটির আগে কাটে, এসব খবর গোপনে পাচার করে ছোট সাহেবের কাছে। ছোট সাহেব থেকে মেজো, বড় হয়ে সে খবর চলে যায় খোদ মালিকের কাছে। ব্যাটা আস্ত ঘুঘু। শেষের কথাগুলো সবাইয়ের মনে ধরে খুব। বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তারও সঙ্গত কারণ রয়েছে।

ভবতোষবাবু অম্বলের রোগী। খিটখিটে মেজাজ। আচমকা কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেওয়ায় খেপে উঠে বললেন, নিজের চরকায় তেল দাও হে।

—আজ্ঞে, নিজের চরকাতেই তো তেল দিচ্ছি।

—নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ? পাকামো হচ্ছে? আমি ঘুমোচ্ছি কিনা দেখবার জন্য ম্যানেজমেন্ট রেখেছে তোমায়?

—ম্যানেজমেন্ট রাখবে কেন? আমি নিজের থেকেই করছি।

—কেন? টেল মি, হোয়াই? চিৎকার করে ওঠেন ভবতোষবাবু, তোমার নিজের কাজকর্ম নেই? অন্যের ওপর খবরদারি করবার জন্য তোমাকে মাইনে দেয় কোম্পানি?

—এটাকে খবরদারি ভাবছেন কেন, ভবতোষদা? আমি নিজের মানুষ ভেবেই করছি এটা।

—নিজের মানুষ? চ্যাংড়ামো করবার আর জায়গা পাও না? খেপে ফায়ার হয়ে উঠে দাঁড়ান ভবতোষবাবু, নিজের মানুষের ঘুম ভাঙাবার যদি এতোই সখ, রাতের বেলায় নিজের বউয়ের ঘুম ভাঙিয়ে ঐ সখ মেটাও গে।

—আপনি খামোখা রেগে যাচ্ছেন ভবতোষদা।

—খামোখা? তোমার চেয়ে না হলেও বিশ বছরের বড় আমি। রোজ রোজ এমন পাতলা ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না?

—আপনি বিশ্বাস করুন, ইয়ার্কি করে এসব বলি নে আমি। আসলে—।

লোক জমে যায় ভবতোষবাবুর চারপাশে। কেউ মজা দেখছে, কেউ বিরক্ত। শশিভূষণবাবু ভবতোষের পক্ষ নেন। বলেন, সেদিন মিছিলের লাইনে ছোকরা আমাকে বলেছে কি জানো? বলেছে, কী শশিদা, এমন এলোমেলো পা ফেলছেন কেন? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? বোঝো!

—আপনি এলোমেলো পা ফেলছিলেন দাদা। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় অনির্বাণ।

—অ্যাই, একদম বাজে বকবে না। এইসব ডেঁপোমি বন্ধ না করলে আমি ইউনিয়নকে জানাবো।

এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ সারা অফিস উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। অনির্বাণের ওপর অনেকেই ভেতরে ভেতরে চটে রয়েছে। সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কাল-পাত্র নেই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? এ কী কাঁচা রসিকতা!

আসলে, সবাই ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছে খুব। অনির্বাণকে। সেই কারণেই চটে যাচ্ছে বেশি বেশি।

৪

ঘনশ্যামবাবু গম্ভীর ধাতের মানুষ। বড় একটা বাক্যালাপ করেন না কারোর সঙ্গে। তাঁর মুখখানি এমন এক জমাট কাঠিন্য দিয়ে মোড়া, কেউই কাছেপিঠে বড় একটা ভিড়তে সাহস পায় না। কিন্তু অনির্বাণ পায়ে পায়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এমনিতে অফিসে কারো মনে সুখ নেই ইদানীং। কানাঘুসোয় খবর, র‍্যাণ্ডম ছাঁটাই হবে। লিস্ট নাকি তৈরি হচ্ছে গোপনে। আরো খবর, ইউনিয়নকে নাকি হাত করে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। ইউনিয়ন নাকি লিস্ট বেরোবার পর তড়পাবে দু-এক দিন, গেট-মিটিং, মিছিল-টিছিল করবে, তারপর ফণা নামিয়ে পেড়িতে ঢুকে যাবে। উইথ প্রোটেস্ট মেনে নেবে ব্যাপারটা। ভয়ে, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সকলেই। লিস্টে কার কার নাম রয়েছে, সেই ভাবনায় আকুল। সকলেরই আশঙ্কা, আজই অফিসে না তার শেষ দিন হয়ে যায়। আবার কায়দা করে নাম রাখা হয়েছে গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেক। ভয়-ভাবনা, ম্যানেজমেন্টকে গালাগাল, যা কিছু সবই মনে মনে। ভুলক্রমেও মুখ খুলছে না কেউই। কে কোথায় শুনে ফেলবে; কোন দ্যাবতার থানে গিয়ে সাতকাহন করে লাগাবে। আজকের দিনে নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস নেই।

ঘনশ্যামবাবুর ক-দিন থেকেই বাঁ চোখটা নাচছিল। কেন জানি বারে বারেই মনে হচ্ছিল, লিস্টে তাঁর নামটা রয়েছে। এবং প্রথম দিকেই। ফলে, মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা অস্থির অস্থির ভাব। সারাক্ষণ আমাশার মোচড়। কাউকে খুলে বলাও যায় না, আবার চেপে রাখাও

দায়। একবার ইউনিয়ন অফিসে গেলে হয়। কিন্তু বিগত একত্রিশ বছরের চাকরিতে ওপথে তো হাঁটেননি ঘনশ্যামবাবু। চাঁদা দেননি একটি পয়সা, মিছিলে হাঁটেননি একদিনও। সহসা অ্যাদ্দিন বাদে, একটা গুজবের ওপর নির্ভর করে কোন মুখে হাজির হন ইউনিয়ন অফিসে। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘনশ্যামবাবু এক-পা এগোচ্ছেন তো তিন-পা পেছোচ্ছেন। তেমনি এক গভীর ভাবনার মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালো অনির্বাণ। আর, যে কিনা এযাবৎকাল ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলবারই সাহস পেত না, আচমকা শুধিয়ে বসে, ঘনশ্যামদা ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

ঘনশ্যামবাবুর চিন্তার জালটা পটাপট ছিঁড়ে গেল। মুখ তুলে তাকালেন। ভুরুজোড়া অজান্তেই কোঁচকালো, কিছু বলছো?

—বলছিলুম, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

সে কথায় সহসা ভয়ানক কঠিন হয়ে ওঠে ঘনশ্যামবাবুর মুখ। শান দেওয়া হাঁসুয়ার মতো ধারালো চোখে তাকান অনির্বাণের দিকে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। গটমটিয়ে চলে যান টয়লেটের দিকে।

এইসব ডেঁপোমির জন্য অনির্বাণের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও ইদানীং মনে মনে বেজায় বিরক্ত। ওরা ধমক দেয় অনির্বাণকে। বলে, সীমা ছাড়াচ্ছ অনির্বাণ। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে, দ্যাখো, একদিন লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে। অচিন্ত্য বিশ্বাস, অনির্বাণের কলেজের সহপাঠী, একই হোস্টেলে থাকতো, বলে, অনির্বাণের এটা একটা বহু পুরোনো ব্যাধি। সেই ছেলেবেলার। হোস্টেলে কম জ্বালিয়েছে আমাদের! দিনে-রাতে, যখন-তখন, এর-ওর দরজায় ঘা মারতো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? হোস্টেলের রাত-জাগুয়া ছাত্ররা দিনে ঘুমোতো, দিনে-পড়ুয়ারা রাতের বেলায় নিশ্ছিদ্র ঘুম চাইতো। কিন্তু অনির্বাণের জ্বালায় কি ঘুমোবার জো থাকতো? যখন-তখন শুরু হতো ওর দরজা ধাক্কানোর হিড়িক। এই সনৎ, নিবারণ, প্রভাত, অচিন্ত্য, কী হে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওই নিয়ে কতবার হুজ্জোতি হয়েছে হোস্টেলে। চড়চাপড়ও খেয়েছে অনির্বাণ। একবার তো ব্যাপারটা এতদূর অবধি গড়িয়েছিল যে ওর হোস্টেল-ছাড়া হওয়ার জোগাড়। আমরা জনাকয় হাতেপায়ে ধরে কোনও মতে ঠেকাই। কিন্তু তাতে কি। স্বভাব কি যায়? অনির্বাণের এই রোগটা গেল না কিছুতেই।

৫

অবশেষে সেদিন পুরো ব্যাপারটা সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

নিশিকান্ত দাস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এই কিছুদিন আগে অবধি বেশ রোগাপ্যাটকা গোছের ছিলেন। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছিল। চোখের গর্ত ছিল বেশ গভীর। ইদানীং বেশ মুটোতে লেগেছেন। সারা মুখে, চোখের কোলে যেন বন্যার পলি পড়েছে। চোয়াল, গাল একাকার। ফলে, আগে হাঁটতেন ঝড়ের বেগে, এখন হাঁটেন দুলকি চালে। হাঁটছিলেন তেমনি করে করিডোরে। যাকে বলে, গজেন্দ্রগমন। পেছন পেছন ক্যান্টিনের দিকে হাঁটছিল অনির্বাণ। আচমকা পেছন থেকে ডাক দিল নিশিকান্তকে।—নিশিকান্ত-দা—। নিশিকান্তর কান আগে ছিল খুবই প্রখর। ফিসফিস করে কথা বললেও শুনতে পেতেন অবলীলায়। ইদানীং কানেও বুঝি পলি পড়েছে। কেউ ডাকলে-টাকলে একডাকে ফিরে তাকান না। অনেক কথার জবাবই দেন না। ভাবখানা, যেন শুনতেই পাননি।

—সম্ভবত তাই।—কেউ কেউ মন্তব্য করে, নিশিকান্তদার শ্রবণশক্তি খুবই কমজোরি হয়ে গেছে।

—শ্রবণশক্তি কমেনি। আর এক পক্ষের ধারণা,—আসলে ওর ঘ্যাম বেড়েছে। বেশ ওজনদার গলা ছাড়া শুনতেই পায় না। সারা অফিস জুড়ে যে নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি নীরবে চলছে সেসব যেন তার নজরেই নেই। ওই নিয়ে কেউ কিছু বললে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বোবার মতো। অবশেষে এমন ভাব করে, যেন জবাব দেবার উপযুক্ত প্রশ্নই নয় ওটা। অনির্বাণ শুনে একান্তে বলে, ওসব কিছু নয়। আসলে, নিশিকান্তদা ইদানীং ঘনঘন ঘুমিয়ে পড়েন। নজর করলেই বোঝা যায়। সারাদিন জুড়ে ওঁর কেবলই ঘুম। আসলে, শরীরে মেদের আধিক্য হলে ঘুম পাবেই।

অনির্বাণ পেছন থেকে ডাক দিল, নিশিকান্তদা—।

ভ্রূক্ষেপ নেই নিশিকান্ত দাসের। তিনি হেঁটেই চলেছেন নিজের খেয়ালে। অনির্বাণ সহসা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। নিশিকান্ত দাসের গায়ে গা মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুনরায় ডাক দিল, নিশিকান্তদা—।

নিশিকান্ত দাস ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, কিছু বলছিলে?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

নিমেষের মধ্যে থমকে দাঁড়ান নিশিকান্ত দাস। কপালের তাবৎ বলিরেখা ভেঙেচুরে তছনছ হয়। বলেন, মানে?

—মানে, আমার মনে হলো, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

নিশিকান্তর চোখদুটি এবার সরাসরি বিঁধে যায় অনির্বাণের মুখের ওপর। অনির্বাণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন তিনি। বলেন, হাঁটতে হাঁটতে ঘুমোয় নাকি?

—আমার মনে হলো, আপনি হাঁটতে হাঁটতে ঘুমোচ্ছেন। বলতে বলতে অনির্বাণের সারা মুখে নিষ্পাপ হাসি, কিংবা ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটছেন।

নিশিকান্ত বেশ খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে যান।

৬

দুপুর থেকেই কথাটা অফিসময় রটে গেল খুব। অফিসেরই এক ছোকরা, অনির্বাণ না কী যেন নাম, গোপনে গোপনে মালিকের দালালি করছে। অফিসে কে ঘুমোয়, কে দেরি করে আসে, আগেভাগে চলে যায়, ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে কে কী মন্তব্য করে, সবকিছু পাচার করে। আর, তারই ভিত্তিতে গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেকের লিস্ট তৈরি হচ্ছে গোপনে। ছোকরার এমনই দুঃসাহস, ইউনিয়নের সেক্রেটারি নিশিকান্তদার ওপরেও নজরদারি শুরু করেছে। এমনিভাবেই সবকিছু রটে বোধ করি। কচি চারা নিমেষে ডালপালা গজিয়ে মহীরুহ হয়। ভয় মানুষকে এমনিতেই হিংস্র করে তোলে। আর, এ হলো রুটি-রুজি হারানোর ভয়। ফলে, শোনামাত্তর, সবাই একবাক্যে রায় দেয়, এমন মিরজাফরকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

অফিস-ঘরে বসে রয়েছেন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বদ্রীপ্রসাদ এবং অন্য নেতারা। থমথম করছিল বদ্রীপ্রসাদের মুখ। বারবার তিনি আড়চোখে দেখছিলেন অনির্বাণকে। আর, অনির্বাণ কেবল আউড়ে যাচ্ছিল একটাই কথা, বিশ্বাস করুন বদ্রীদা, বিশ্বাস করুন—।

—কেমন করে বিশ্বাস করি বল? আজ নিশিকান্তকে তুমি যেভাবে শুধিয়ে বসলে—। কেউ

তোমাকে আড়াল থেকে ইনষ্টি-গেট না করলে—। খুব ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বললেন বদ্রীপ্রসাদ, তাছাড়া, বাইরের এই এতবড় জমায়েত, এদের সকলেরই ধারণা, কোনও দুরভিসন্ধি নিয়েই—।

—কোনও দুরভিসন্ধি নেই। বিশ্বাস করুন। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে অনির্বাণ।

—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার মাথায় গুরুতর গোলমাল রয়েছে। নইলে, অফিসে কে কে ঘুমিয়ে পড়ছে, খামোখা ঐ নিয়ে জরীপ করে বেড়াও! বল, জবাব দাও। চুপ করে থাকলে আমরা শুনছি নে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে দিগন্তের রেখায় রেখায়। জমায়েতের মানুষগুলোর সন্দেহকুটিল চোখগুলো সেই আঁধার গিলছে গোগ্রাসে।

বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে অনির্বাণ। নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকায় সকলের দিকে। তারপর খুব আত্মস্থ গলায় বলে, আসলে, আমি না, নিজেই খুব ঘুমিয়ে পড়ি। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, আচমকা ঘুম পেয়ে যায় আমার। কিছুতেই খুলে রাখতে পারিনে চোখ। বাড়ি বসতে বসতে ঘুমিয়ে পড়লুম, খেতে খেতে, হাঁটতে হাঁটতে, এমন কি খেলার মাঠে দৌড়তে দৌড়তেও...। আর, সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আমি যে ঘুমিয়ে পড়ছি, সেটাই আগাম বুঝতে পারিনে।

মন দিয়ে শুনছিলেন নিশিকান্ত, বদ্রীপ্রসাদরা। অনির্বাণের কথা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন। নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কথা বলে নেন। একসময় বদ্রীপ্রসাদ বলেন, বল কী! এ-তো এক ধরনের রোগ!

—রোগ হয়েছে তো চিকিৎসা করাও। পাশ থেকে বলে ওঠেন নিশিকান্ত, অন্যদের রোগী বানাচ্ছ কেন?

—চিকিৎসাই তো করাচ্ছি নিশিকান্তদা। সেই কারণেই তো...।

—অন্যদের জ্বালাতন করাটা চিকিৎসা হলো তোমার কাছে? প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন নিশিকান্ত দাস।

ভারী অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে অনির্বাণ। কেমন করে যে ব্যাপারটা বোঝাবে, ভেবে পায় না বুঝি।

বিড়বিড়িয়ে বলে, অন্যকে যখন ধাক্কা মেরে জাগাই, তখন সমান ধাক্কা তো আমিও খাই। অন্যকে যখন বলি, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, তখন তো কথাগুলো আমার ভেতরেও ঢোকে। বুকের মধ্যে চারিয়ে গিয়ে তোলপাড় তোলে। বিশ্বাস করুন বদ্রীদা, কোনও দুরভিসন্ধি নয়, ষড়যন্ত্রও নয়, অন্যকে জাগাবার ছলে আমি অহরহ সুকৌশলে নিজেকেই জাগিয়ে রাখি। যখন নিশিকান্তদাকে চেঁচিয়ে বলি, নিশিকান্তদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? তখন, আসলে, মনে মনে নিজেকেই বলি, অনির্বাণ, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? বিশ্বাস করুন বদ্রীদা, বিশ্বাস করুন...।

# পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শহর

## জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

ভুবনমোহনের দুটি সমস্যা। একটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব, অন্যটি আর পাঁচজনের সঙ্গে যুক্ত। আবার সমস্যাদুটি পরস্পরের সঙ্গেও যুক্ত এবং এতটাই যুক্ত যে দুটি যেন প্রায় একটিই। দুটির উৎসও এক। দ্বিতীয় সমস্যাটি তাঁর নাম নিয়ে। কেউ তাঁকে ডাকে ভুবন, কেউ বলে মোহন। ক্বচিৎ কেউ পুরো নামটিই উচ্চারণ করেন, তাঁরা সাধারণত' তাঁর চেয়ে প্রবীণ। কিন্তু তাঁকে তো সাড়া দিতেই হয়। তিনি দেনও, যে যে-নামে যেভাবেই ডাকুক তিনি সাড়া দেন। দেন, কিন্তু মনে একটা জিজ্ঞাসা, খানিকটা অনুযোগও হয়ত থেকে যায়। থেকে যায়, যদিও তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কেন থেকে যায়। তিনি নিজেই বোঝেন না, অনেক ভেবেটেবেও, সারা জীবনেও বুঝে উঠতে পারলেন না, কোন নামটি ঠিক মানানসই, কোনটি তাঁর নিজের পছন্দ। এই তিনটির মধ্যে কোনওটি, অথবা চতুর্থ কোনও নাম বা পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোনও নাম, নাকি তা-ও নয়, অন্য কোনও নাম, ঠিক কোন নাম তাঁর পছন্দ।

আরও একটি নাম আছে তাঁর। সে নামে এখন আর কেউ ডাকে না। ডাকার যোগ্যতা যাঁদের ছিল তাঁরা প্রায় সকলেই গত হয়েছেন। সেটি তাঁর ডাক নাম, তিতির। তাঁর মায়ের দেওয়া।

তিতির নাম কি ছেলেদের হয়? হয় কিনা, হওয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি কী কী, সেসবের আগেই তো দেখা যাচ্ছে, হয়েছে। তাঁর নাম তিতির। বিখ্যাত সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের ছেলের নামও তিতির। একজন সাহিত্যিক এবং ভাষার গবেষক নিশ্চয়ই না ভেবেচিন্তে ছেলেকে তিতির বলে ডাকেন না।

কিন্তু তিতির নাম কি মেয়েদেরও হয় না? ভুবনমোহনের সমস্যা বেড়ে যায় যেহেতু তিনি অন্তত একটি মেয়েকে জানেন যার নাম তিতির। মুম্বাই-এর জনসংযোগ-বিশেষজ্ঞ উদয়ণ ভট্টাচার্যের মেয়ের নাম তিতির। তার মানে এ নাম ছেলেদেরও হয়, মেয়েদেরও হয়, হতে পারে। হয়েছে যে তা তো দেখাই যাচ্ছে। হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে অন্তত তিনজন তিতির। তাদের দু'জন পুরুষ, একজন নারী। তিতিরদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভাগাভাগি কি এইরকমই?

নামটা মায়ের রাখা, কিন্তু বাবার অপছন্দ। কেমন মেয়েলি মেয়েলি। তিতিরের মাংস জানো তো খুব নরম, খুব সুস্বাদু, দারুণ খেতে। যদি জাস্ট ঝলসে নিয়ে খাও...

বাবার গলায় মজা কিন্তু মা উত্তর দেয় না। মা বোধহয় ঝলসানো তিতিরে মজা পায় না।

ফ্রান্সের জঙ্গলে, এমন কি এই পাখতুনিস্তানেও সাপ মেরে, খরগোশ মেরে পাখি মেরে খেতে হতো আমাদের। কিচেন হয়তো আগে বেরিয়ে গেল, কিংবা কামানের গোলার পাল্লায় পড়ার ভয়ে পেছনেই পড়ে রইল, তখন তো নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হতো। দু-একবার ঠকার পর শিখে গিয়েছিলাম। খানিকটা মাখন আর একটু নুন সবাই সঙ্গে রাখত। ঝলসে খাওয়া যেত, মাছ পেলে মাছ, তিতির পেলে তিতির, যা-ই পাওয়া যেত। তখনই

দেখেছি, তিতিরের মাংস যেমন নরম তেমন সুস্বাদু।

মা হাসে না। রাগও করে না। মায়ের মুখটা শুধু কেমন হয়ে যায়। মুখে যেন কেউ ব্যথা মাখিয়ে দিয়েছে।

শেয়ালদায় নেমে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দু'হাতে দুটো স্যুটকেস, কাঁধে ঝোলা, স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে ভুবনমোহনের মনে হয়, আমার মাংসও তো নরম। নরমই হবে। আমি তো বাঘ নই, নরম ছাড়া আর কীরকমই বা হতে পারে? কিন্তু সুস্বাদুও কি?

এইখানেই তিনি ঢুকে পড়েন তাঁর প্রথম সমস্যাটির ভেতরে। একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সমস্যায়। সমস্যাটি এমন, কারও সঙ্গে আলোচনা করা যায় না, কারও পরামর্শ চাওয়া যায় না, কাউকে বলাই যায় না। আবার উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, এড়িয়ে যাওয়াও যায় না। সমস্যাটা তীব্র হয়ে গভীর হয়ে লেগে থাকে, লেগেই থাকে। যেন এঁটে আছে যেন মনের তো বটেই শরীরেরই অঙ্গ।

আচ্ছা মল্লিকা, আমি কে বলো তো?

মল্লিকা কথা বাড়ায় না।

বেশ, সে না হয় হলো, কিন্তু আমি ঠিক কী?

মল্লিকা নীরবই থাকে।

আমি তো অনেকগুলো আমি, অন্তত চারটে তো বটেই। একটা ভুবন। আর একটা মোহন। তৃতীয়টা ভুবনমোহন। আর তিতির। এর মধ্যে কোনটা আমি? ঠিক কোনটা?

তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে! এবার ডাক্তার দেখাও!

ভুবনমোহনের মনে হয় কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যে নয়। মাথাটা খারাপ না হলে, অন্তত খানিকটা খারাপ না হলে, আমি কে, আমি কী, ভুবন না মোহন, ভুবনমোহন না তিতির, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? এক আধবার মনে হতে পারে, যেমন হঠাৎ মেঘ করে অথবা হঠাৎ মনে পড়ে যায় কোনও গানের একটা...দেড়টা লাইন...তাই, তাই-ই! ঠিক তাই! গানের কলির মতোই। দু-একটা কলির এমন স্বভাব, মাথায় ঢুকে যায় আর বেরোতে চায় না। কিছুতেই বেরোয় না। কিছুতেই বের করে দেওয়া যায় না। অথচ সমানে বলে যাচ্ছে এ পরবাসে রবে না কিছুতেই এবং সকল নিয়ে বসে আছে সর্বনাশের আশায়। সর্বনাশের সঙ্গে আশা কখনও যায়, না যাওয়া উচিত? তবু যায় না কিছুতেই, ঘুরে ঘুরেই ফিরে আসে। এ-ও তেমনি। আমার প্রশ্ন, কায়দা করে বলা যায়, আইনস্টাইনের মতো, আমার জীবনজিজ্ঞাসা, ঠিক সেই দেড়টি কলির মতো, যেন মনের ভার, যায় না কিছুতেই।

মল্লিকা চলেই গেল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিংবা সরাসরিই কথাটা তোলার, এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ আর রইল না। কিন্তু সমস্যাটা তো রয়েই গেল, এঁটেই রইল। আমি কে? আমি ঠিক কী?

যদি ভুবন হই, ভুবনই হই, তবে আমার জীবন এত ছোট কেন? আমার মন কেন এতটুকু? ভাবনার জগৎ কেন এমন সংকীর্ণ?

ভুবন তো পৃথিবী। ভুবন তো সেই জল যা থেকে গড়ে উঠেছিল জীবন, একদিন, সর্ব প্রাণের উৎপত্তি যার গর্ভে। সে এক বিশাল যজ্ঞ, সহস্র শতক জুড়ে। ভুবন তো সর্বংসহা ধরিত্রী। আমি কেন তবে সইতে পারি নে?

সৃষ্টি বলতে মল্লিকা আর আমি মিলে জন্ম দিয়েছি রিয়া আর অভিষেকের। যৌবনে, যেন

বাল্যেই, যেসব কবিতা, গল্প আর দেড়খানা উপন্যাস লিখেছিলাম তা পাতে পড়ার যোগ্য নয়। তাই আপনিই হারিয়ে গেছে কোথাও, ফেলে দিতে হয়নি কাউকে।

সর্বং সওয়া কি সহজ, তিতির? মল্লিকা মারা গেলে, অভিষেক এদেশে থাকবে না বলে বোস্টনে চলে গেলে কিংবা রিয়ার ডিভোর্সের খবর পেলে, এতদিনের চেনা মাছওয়ালা পচা মাছ ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলে, কত কষ্ট হয়! জ্বালা করে। ধরিত্রী নই, ধরিত্রীর ধুলোও নই আমি। আমার কষ্ট হয়, রাগ হয়, ঘৃণা হয়, লোভও হয়, ভয়ও করে।

তবে আমি কী? অন্য কোনও ভুবন কি আমি? অন্য কোনও অর্থে? আমার আছিল মায় যতেক ভুবন। হাসান হোসেনে কৈল উঠান বৈঠান।।

কিন্তু তা-ও তো নয়। বন্ধু অর্থে আমার ভুবন নেই, উঠানও নেই, কোনও ফ্ল্যাটেই থাকে না। বাড়ির সামনেও জমে না বন্ধুদের ভিড়, আর্তনাদে শোকের কথা বলতে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানাতে, অথবা কোনও গোপন কথা সমস্বরে ফিসফিস করে বলবে বলে, কানের কাছে। আমার কোনও ভুবন নেই, বন্ধুহীন আমি, একা।

মোহনই কি তবে আমি? একা, কিন্তু মোহন? মোহন তো একাই। তার বন্ধু হতে পারে কে? বন্ধুত্ব তো সমানে সমানে। মোহনে মোহনে। কিন্তু সে তো মোহজনক, মোহকর। মুগ্ধ করে, অবশ করে জিতে নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার। মদন মোহন হন মোহিনীর কাছে। শুধু তো তাই নয়। ভালে সে চন্দন চান্দ, কামিনীমোহন-ফান্দ। একথার একটি শব্দ, একটি অক্ষরও কি খাটে তোমার ক্ষেত্রে, ভুবনমোহন?

পরিচয়ের পর কিছুদিন এবং বিয়ের পর অল্পদিন হয়ত মোহিত ছিল মল্লিকা। হয়ত। আর কোনও নারী বা পুরুষও কি ভুলেছে কখনও? নিজের সন্তানদেরই ভোলাতে পারিনি। নিজেই অপেক্ষা করে থাকতাম, প্রায় সারাজীবনই থেকেছি, মোহিত হওয়ার জন্যে।...আমি যে পথ চিনি নে। আলো খুঁজেছি, চেয়েছি চিরকাল। আলো কই, আলো? লুকিয়ে আসুক বা প্রকাশ্যে, আলোতে বা অন্ধকারে/আসুক, এসে আমাকে মুগ্ধ করুক, মোহিত করুক, নিয়ে যাক কোথাও, আলোতে নিয়ে যাক বা অন্ধকারেই। কিন্তু নিয়ে যাক। কেউ নিয়ে যায়নি। মল্লিকা নিজেই গেল চলে। হয়ত নিয়ে যেতে পারত মা। হয়ত পারত। কিন্তু সে-ও তো...

অত মা মা করো কেন কথায় কথায়?

ছেলে এবং মেয়েও হেসে গড়িয়ে পড়ে। প্রায় পড়েই যায়।

ঠিক বলেছ। সুক্তো থেকে পায়েস, জামার বোতাম লাগানো থেকে মেয়ের বিয়ে সব ব্যাপারে বাবা এমনভাবে মা মা করে...হি রিয়্যালি ইজ আ মাদার্স্ বেবি।

না না, তা কেন বলছ, দাদা? হি ইজ আ সফ্ট্ পার্সন, খুব নরম!

রিয়া সান্ত্বনা হতে চায়।

তিতির বলছিস?

তিনজনই গড়িয়ে পড়ে টেবিলে। বাকি জন্যের মনে হয়, যেমন নরম তেমন সুস্বাদু! যেমন ফ্রান্সের জংলী জলাশয়ে তেমনি পাখতুনিস্তানে। বা এই টেবিলে!

আকাশে উড়ছে পাখি। বেশি দূর যেতে পারে না। ছোট্ট জগৎ! বেশি ওপরে উঠতে পারে না। সংকীর্ণ সীমানা, আকাশেও। ডানায় জল। পালক ভেজা। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি। মাটি চায়, জল চায়, জল চায় পাখি।

তারপর সেই স্বপ্ন। স্বপ্নেও মা! মা-ই তো স্বপ্ন! স্বপ্নভঙ্গের পর হেমচন্দ্র। তিনিই তিতিরকে

হাত ধরে টেনে তুললেন ভুবনের দিকে। জননীজননভুবন দুই অতুলন।

ভুবনমোহন সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, মা-র কাছে যাব।

সুটকেসদুটো নামাতে হয় টিকিট দেখাতে। দেখিয়ে আবার তুলতে তুলতে দার্জিলিং মেল সত্যিই কত নম্বর থেকে ছাড়বে জেনে নিয়ে চলে যেতে চান ভুবনমোহন। যাওয়া যায় না। এত ভিড়, এত দোকান, এত আলো, এত চিৎকার, এত ধুলো! ভুবনমোহন অনেকদিন পরে এলেন এখানে। তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। তিনি ভাবতেই পারেননি এত ভিড়, এত দোকান, এত ধুলো হতে পারে।

একটা চায়ের দোকানের সামনে, সামনে ঠিক নয়, একটু কোণ চেপে, খানিকটা দূরেই, একটা লোহার চৌকো থামের পাশে সুটকেসদুটো নামান ভুবনমোহন। দোকানের কেনাবেচার অসুবিধা না হয়! দোকান মানে সাইকেলের চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি। যে-কোনও সময় চলে যেতে পারে। যেন এসেছে চলে যাবে বলেই। আসলে চাকা চারটে দেখনাই। থাকতেই এসেছে, যাবে বলে নয়। কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে সুটকেসদুটোর ওপর রেখে সেই চৌকো লোহার থাম ঘেরা সিমেন্টের বেঞ্চ মতনের ওপর বসতে যাবেন, তখনই,

এইখানে এইসব কী রাখলেন?

আজ্ঞে?

এইডা আমাগো জায়গা! এতগুলান জিনিসপত্র...দ্যাহেন না নাকি? চক্ষুর মাথাডা ইয়ার মধ্যেই খাইসেন?

দাগ দেওয়া, ভাগ ভাগ করা প্রত্যেকের জায়গা। গোটা প্ল্যাটফর্মটাই ভাগ হয়ে গেছে। ভলান্টিয়াররা ভাগ করে দিয়েছে। তাদের কারও বুকে ব্যাজ। কারও হাতে জড়ানো কাপড়ের পরিচয়পত্র। কারও কিছুই নেই। শুধু খাটছে দিনরাত। গণ্ডগোল বেড়ে গেলে, তারা সামলাতে না পারলে ডেকে আনছে পুলিশ। পুলিশের মাথায় লাল পাগড়ি।

আমার জায়গাটা তাহলে কোথায়? আমাদের জায়গা? মা-র, বাবার, দাদার, দিদির আর টুলুর? আমাদের ট্রাংকগুলো, বিছানা, জলের পাত্র, থালাবাটিগেলাস এবং মায়ের বই রাখা হবে কোথায়?

যেন সেই জায়গাটার খোঁজেই ভুবনমোহন দুচোখে উদ্বেগ নিয়ে ঘাড় ঘোরান। ঘোরাতে থাকেন, এদিক থেকে ওদিক, ওমাথা থেকে এমাথা।

ঠিক কোথায় আমাদের জায়গাটা? সব যেন কেমন বদলে গেছে। এত আলো, এত দোকানপাট এল কোথা থেকে? এইসব লোহার থামও তো থাকার কথা নয়। শার্টপ্যান্টপরা এত সচ্ছল মানুষজন ছিল কোথায়? কেমন শহুরে শহুরে মুখ। ভালোমন্দ না হোক, দু'বেলা অন্তত পেটভরে খাওয়া চেহারা। কারা এরা? কোন কোন জেলা থেকে এসেছে? ধুতির সঙ্গে শার্ট-পাঞ্জাবি-ফতুয়া পরা কিংবা কিছু না-পরা, শুধুই লুঙ্গি কিংবা হেটো ধুতির খালি-গা মানুষগুলো কোথায় গেল? ভুবনমোহনের দুচোখ ঘুরেই বেড়ায়।

কী হইল? এগুলান সরাইয়া লন!

ঝোলা কাঁধে, দু'হাতে সুটকেস ভুবনমোহন আবার হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে যান। কত দূরে তা-ও বুঝতে পারেন না। অনেকটা দূরে গিয়ে একেবারে হঠাৎই তাঁর মনে হয়, এই তো! এইটেই আমাদের জায়গা। ভলান্টিয়ারদের দাগ টেনে দেওয়া। নামটাও যদি লিখে দিত!

অ্যাই হারামজাদা! সইরে আয়, ইদিকে সইরে আয়! বাওনের ছেলেডার গায় পা লাগতিসে, দেখিস নে!

মা একপাশে ফিরে কাগজ পড়তে পড়তেই হাত বাড়িয়ে টেনে সরিয়ে আনে টুলুকে। কাগজটা দু'দিনের বাসি। দুটো খোপের ওদিক থেকে চেয়ে এনেছে। টুলু টের পেয়ে গেছে পাশের খোপের ওরা ছোট জাত, কৈবর্ত না নমঃশূদ্র। আমাদের গায়ে ওদের পা লাগলেই ওদের পাপ হয়। আর পাপ হলেই ওদের মধ্যে বড় কেউ জেরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুড়ির ভেতর হাতড়ে হাতড়ে পাটালি বের করে। ভেঙে একটা টুকরো দেয়। বলে, ঠাকুর, সেবা করো, দোষ ধইরো না! টুলু সুযোগ পেলেই গড়াতে গড়াতে ওদের খোপের দিকে সরে যায়।

রাত গড়াতেই মা বড় গামছাটা দিদির হাতে শক্ত করে বাঁধে। নিজের হাতটা আর গামছাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, তিতির, কষে বাঁধ তো, যত জোরে পারিস। তিতির বাঁধে। দিদি আপত্তি করে,

এভাবে হাত বেঁধে কি ঘুমোনো যায়? পাশ ফেরা যায় না কিছু না।

ঘুমোতে হবে না, চোখ বুজে শুয়ে থাকো। আমিও তো জেগেই আছি।

তিনটে খোপ ওপারে যে বদ্যি পরিবারটি আছে তাদের বড় মেয়েটিকে গতকালই রাত্রে কারা যেন নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি দিদির মতোই। দিদির চেয়ে ফর্সা। মুখখানা সুন্দর।

ভুবনমোহন সেই সুন্দর মুখখানা দেখার চেষ্টা করেন। সুন্দরটুকু দেখতে পেলেও মুখখানা দেখতে পান না। তাঁর এবং মুখখানার মাঝখানে কালো কালো ধোঁয়া, বিকট আওয়াজ, কর্কশ কান্না, অসংখ্য মানুষের ভিড় যেন বিশাল প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। দেখার চেষ্টা করেন আপ্রাণ কিন্তু দেখতে পান না। চেষ্টায় চোখ জ্বালা করে শুধু।

ভোঁস ভোঁস করে ওপরে কালো ধোঁয়া আর দু'পাশে শাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কোনও ট্রেন ঢুকল কি? বরিশাল এক্সপ্রেস? ঢাকার গাড়ি, না চুয়োডাঙার? কিন্তু গাড়ির রঙটা যেন কেমন! সেই নীল রঙ গেল কোথায়?

এটা কোন গাড়ি ভাই? এটা...

প্ল্যাটফর্মের সব শহুরে মানুষ তখন ছুটছে। দিগবিদিক জ্ঞান নেই কারও। একে ঠেলে, ওকে ফেলে, আর একজনকে মাড়িয়ে শুধু দৌড়চ্ছে, যেন এই ট্রেনই শেষ ট্রেন, এতে চেপে বসতে পারলে বাঁচলে, নইলে মরলে। তার পরেই আসবে শেষের সেদিন, ডুম্‌স্‌ডে, কেয়ামতের কাল।

আট-দশজনকে জিজ্ঞেস করার পর লাল জামা পরা এক আধবুড়ো বলে, দার্জিলিং মেল বা, দার্জিলিং মেল! বলতে বলতে অলস গতিতে চলে যায় কুলিটি। তার কোনও খদ্দের নেই।

কাঁধে ঝোলা, দু'হাতে দুটো সুটকেস, ভুবনমোহন এগোতে যান ট্রেনের দিকে। পারেন না। এগোনো যায় না। সব শহুরে মানুষ, যেন গোটা শহরটাই তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায়। তিনি যেন, 'দ্য ভিজিটে'র সেই অ্যান্টনি কুইন। ইনগ্রিড বার্গম্যান শহরকে খেপিয়ে দিয়ে ঘুষ দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যান ট্রেনের এক দরজার কাছে। তিনি পৌঁছে যান, নাকি শহরেরই একটা অংশ, পেছনের ভিড় তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছে দেয়, বোঝা যায় না।

সেটা আবার কোথায় গেল?

বাবার ক্রুদ্ধ চিৎকার সব আওয়াজ ছাড়িয়ে যায়।

ভিড় ভেদ করে মা হাত বাড়িয়ে দেয়,

উঠে আয় তিতির, উঠে আয়! ধর, আমার হাতটা ধর, শক্ত করে ধর।

এটা কি তবে চুয়োডাঙাই? শেয়ালদা নয়?

দরজা পেরিয়ে ট্রেনের কামরায় ভিড়ের পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যান ভুবনমোহন। সেঁধিয়ে যান বা তাঁকে সেঁধিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেন ছেড়ে দেয়। ভুবনমোহন রওনা হয়ে যান। তাঁর মায়ের কাছে যাওয়ার যাত্রা শুরু হয় অবশেষে।

শুরু হয়, কিন্তু শুরু হলেই কি শেষ হয়, শেষ করা যায় সব যাত্রা? যাত্রাশেষে পৌঁছনো যায় মায়ের কাছে? দিন চলে গেলে, রাত চলে গেলে, বহু দিন বহু রাত পার হয়ে গেলে? দিনভর, রাতভর বৃষ্টি হয়ে গেলে? সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, দুঃখ আর শোকের মেঘঝরা বৃষ্টিতে ভেজার পর, বহু যুগ ধরে, আর কি যাওয়া যায়? ফিরে যাওয়া যায়? যাত্রা শুরু হলেই পৌঁছনো যায়? মা তো গাছ নয়, বড়জোর গাছের ছায়া, বৃষ্টির শীতলতা, মেঘের কোমলতা, বড়জোর। বৃষ্টি-মেঘ-ছায়া কি স্থির থাকে? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভুবনমোহনের জন্যে যে তারা রওনা হলেই পৌঁছে যাবে গাছের ছায়াতে, বৃষ্টির শীতলতায়, মেঘের কোমলতায়? মায়ের স্নেহে? ভুবনমোহন বা তিতিরদের মনেই থাকে না কত ঝড় কত বৃষ্টি হয়ে গেছে কতদিন পৃথিবীর পরে। তারপর একদিন শীতও এসেছে তার বর্ণহীন শাদা রঙ নিয়ে। সেই রঙ লেগে গেছে তিতিরের ডানায় পালকে, ভুবনের চুলে! সেই রঙ চুলে নিয়ে তখন কি যাওয়া যায় মায়েদের কাছে?

এন্-জে-পিতে পৌঁছে ভুবনমোহন হাঁ। এটা শিলিগুড়ি তো? ট্রেনের সিঁড়ি থেকে বেশ নিচু, লম্বা প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মের একপাশে ট্রেন, অন্যপাশে সারি সারি ঘর ছবির মতো। ভোরবেলার আলোতে ছবিটি ভারি শান্ত। শান্ত সেই ছবিতে নীল রেল আর বাতাসে ম ম চায়ের গন্ধ। সাহেবরা মেমদের নিয়ে মেমরা ফর্সা ফর্সা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। একটু বেঁটে, নাক চ্যাপটা লোকরা গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে প্রথমে স্যালুট করছে। তারপর লাফ দিয়ে গিয়ে খুলে ধরছে গাড়ির দরজা।

বড় ট্রেনটার পেছন দিকে একটা ছোট ট্রেন। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে যাবে। তাতেও উঠে পড়ছে কিছু মেম, কিছু সাহেব। অন্যরাও উঠছে, অন্য কামরায়।

মালপত্তর ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে, সে, দিদি আর মা। টুলু মারা গেছে। টাইফয়েড হয়েছিল। ওতে কেউ বাঁচে? দাদা মামাদের কাছে। বাবা গেছেন মাঝারি ট্রেনের খোঁজে। নাগরাকাটায় যাওয়ার। লালমণিরহাটের গাড়ি। নর্থ ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রেলের গাড়ি, শিলিগুড়ি ডুয়ার্স এক্সপ্রেস। হাতের কাছে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন ভুবনমোহন,

আচ্ছা এটা শিলিগুড়ি তো?

ধুর মশাই, এটা এন. জে. পি! শিলিগুড়ি হতে যাবে কোন দুঃখে!

লোকটা এমনভাবে বলে যেন এন. জে. পি শিলিগুড়ি হয়ে গেলে সেটা এক ভয়ংকর লজ্জার, প্রায় অপমানের ব্যাপার হয়ে যেত।

এরপর আর কী বলা যায়? মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন ভুবনমোহন, যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছেন। কোথায় যেতে গিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

আপনি শিলিগুড়ি যাবেন?

লোকটার গলা কেমন বদলে গেছে। ভুবনমোহনের কেন যেন মনে হয়, লোকটার প্রাণে

দয়া আছে। তিনি বলেন,

শিলিগুড়ি, মানে স্টেশন থেকে বেরিয়েই, একটা মোড় পেরিয়ে বাঁদিকে গেলেই, হাসপাতালের পাশ দিয়ে, মহাবীরস্থান বলে একটা জায়গা...

ও, মেড়োদের বাজার! ফ্লাইওভার পেরিয়ে ওপারে চলে যান, প্রাইভেট ট্যাকসি, রিকশা...

লোকটা থেমে ভুবনমোহনের মুখ দেখে, গালের দাড়ি দেখে, টাকের কোণে কানের পাশে চুল দেখে, তাঁর জামাকাপড় দেখে, দু'হাতের সুটকেস এবং কাঁধের ঝোলা...

আপনি বরং একটা রিকশাই নিয়ে নিন, নিয়ে যাবে মহাবীরস্থানে।

ভুবনমোহন ফ্লাইওভারের দিকে চলে যান।

দর করে নেবেন! বিহারীগুলো শালা ভীষণ গলা কাটে।

রিকশাই নেন ভুবনমোহন। চালক নেপালী। তিনি উঠে বসার পর তাঁর পায়ের কাছে সুটকেসদুটো গুছিয়ে রাখে। নিজের সিটে উঠে বসে, প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে জানতে চায়,

কতা যানু, দাজু?

ভুবনমোহনের খুব আনন্দ হয়। মনে আছে! এখনও মনে আছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন ওর কথা। তারপরেই মনে হয়, কোথায় যাব? কোনও হোটেলে? হোটেলে? কত নেবে কে জানে? শিলিগুড়ি কি আর সে শিলিগুড়ি আছে? টু স্টার, থ্রি স্টার, ফোর স্টার!

কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি? অরবিন্দ নাকি বাড়ি করেছে হাকিমপাড়ায়। আমাদের পুরোনো স্কুলপাড়ায় রমা নাকি আছে, ল্যাড্‌লি আর রমা, সরকারি ফ্ল্যাটে। মহানন্দাপাড়ায় আছে বেনু। ভালো স্বাস্থ্য, নাকটা চ্যাপটা। যাওয়াই যায়। হয়ত পরিচয় দিলে, দু'চারটে ঘটনার কথা বললে মনেও পড়বে, চিনতেও পারবে, থাকতেও দেবে। কিন্তু কে কেমন আছে, কী অবস্থায় আছে, না-জেনে, একেবারে হঠাৎ এইভাবে...তাহলে কোথায় যাব? এত বড় শহরে...কতা যানু দাজু?

মায়ের কাছে যাব। মা-ই তো নিয়ে এসেছিল এখানে। তখন এমন শহর ছিল না, এত বড় শহর ছিল না, তবু মা-ই এনেছিল সঙ্গে করে।

তবে কি কাকিমার কাছেই যাব? কাকাবাবু নেই, বাবার বন্ধু দেবীশংকর মহলানবিশ। জলপাইগুড়ির মহলানবিশ পরিবারকে কে না চেনে? তাঁর ছেলেরা কি চিনবে? না চেনারই কথা। আর কাকিমা? বাড়িতে কে কে আছে, তিনিই বা কেমন আছেন, কী অবস্থায়...

মল্লিকাকে প্রণাম করতে দেন না কাকিমা, দেবীশংকরের স্ত্রী উমা। কতদিন আগে স্কটিশ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলেন। মা-ও করত। গ্রামের মেয়ে না হলে। পড়তে পেলে। মা-র বাংলা লেখা, মা-র ইংরিজি, এমন কি সংস্কৃতও...

কাকাবাবু বলেন,

করুক, করুক! অনাদিদার ছেলের বৌ! তার প্রণামও নেবে না? এ কখনও হয়?

কাকিমা একজোড়া দুল দিয়ে আশীর্বাদ করেন। মল্লিকা আপত্তি জানালে বলেন,

তুমি নতুন বৌ, আমাদের বড় বৌ। বাপ্পা গৌতমের বৌ কবে আসবে কে জানে! এলেও তুমিই তো বড়!

'পাড়ায় এবাড়ি ওবাড়ি নিয়ে গিয়েও বড় বৌ বলেই পরিচয় দেন মল্লিকার। দিয়ে খুব আনন্দ পান। মল্লিকারও খুব ভালো লাগে, একেবারে অচেনা-অজানা একটা অনুভূতির স্বাদ পায়। ক'দিন পরে কাকাবাবু বলেন,

এবার ওদের ছাড়ো! ওরা একটু ওদের মতো ঘুরুক। বিয়ের পরেই তিতির বৌ নিয়ে

এখানে এসেছে, এ তো ওদের তীর্থদর্শন।

মল্লিকার সেই প্রথম মহানন্দা পাড়ায় যাওয়া। একতলা সেই কাঠের বাড়িটা দেখা। তারপর মহানন্দায়, নদীর পাড়ে বালি আর পাথরের নুড়ির ওপর দাঁড়ানো। নদীর নীল জল—জল কি নীলই ছিল? জল কি নীল হয়? নাকি সে আকাশের ছায়া? স্বপ্নের জল? ইচ্ছার নীল মেশা জল।

কিয়ো ভয়ো, দাজু? কতা যানু?

এতক্ষণে রিকশাওয়ালা যেন একটু বিরক্তই।

ঠিক আছে, কাকিমার বাড়িতেই চলো!

কিয়ো ভনেয়? কিসকো বাড়ি?

ভুবনমোহন বোঝেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এটা পুরী নয় যে মাসির বাড়ি বললেই রিকশাওয়ালা নিয়ে যাবে চোখ বুজে। আর সে মাসি তো ভগবানের মাসি, জগন্নাথের মাসি। এ কাকিমা নিতান্তই আমার কাকিমা, তিতিরের কাকিমা। কেমন আছেন কে জানে! তিনি সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন,

সেবক রোডে চলো, দু'মাইল।

তাই যায় রিকশা। কিন্তু সারাপথ বকতে বকতে যায়! কত রকম লোকই না থাকে পৃথিবীতে! এতটা পথ এল রেলগাড়ি চেপে অথচ কোথায় যাবে জানে না। রিকশায় উঠে ভাবতে বসল কোথায় যাওয়া যায়। তা-ও আমি এতবার ধাক্কা দেওয়ার পর। আমি না হয়ে যদি অন্য কোনও রিকশাওয়ালা হতো? বাঙালি কিংবা রাজবংশী হতো? সে তো ভুল জায়গায় নিয়ে যেত। নানাপথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষকালে দু'শ টাকা চেয়ে বসত। আমারও চাওয়া উচিত। সেবক রোডের কথা বললে আমি কি এই রাস্তা নিতাম? এ তো আমার অনেক ঘোরা হয়ে গেল। রিকশা চালানো যে কী মেহনতের কাজ তা যদি বুঝতেন বাবুরা! কত রকম বাবুই যে থাকে পৃথিবীতে। যত্তোসব!

ভুবনমোহন কাকিমার বাড়ি থেকে বেরোলেন সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি। সকালের জলখাবারে সময় গেল। না-খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না কাকিমা।

পারতে এসব বলতে, তোমার কাকাবাবু থাকলে?

আবেগের জবাবে যুক্তি চলে না। চুপ করে যান ভুবনমোহন। আবেগের জবাবে আবেগও চলে না। ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন তিনি। মা-র কাছে যেতে...

খেতে খেতে প্রায় তর্কই করে গৌতম। এখন সে বড় হয়ে গেছে। রীতিমত একটা কারখানা চালায়। দু'দুখানা গাড়ি চড়ে। আচরণের সহজ সরলতায় তবু কাকাবাবুর মতোই। তাঁর মতোই বড় মন।

তুমি বুঝছ না তিতিরদা। এ জায়গাটা আর সেরকম নেই। বিশাল শহর এখন। গাড়িটা নিয়ে যাও। আমি বলে দিচ্ছি, ড্রাইভার তোমাকে সব চিনিয়েটিনিয়ে দেবে। একা একা হেঁটে হেঁটে তুমি পৌঁছতেই পারবে না। চিনতেই পারবে না। তুমি ধারণাই করতে পারছ না শহরটা কী হয়েছে এখন!

গৌতমের বৌ দেবদত্তা, ছেলে রাজ আর মেয়ে রায়নাও তাল দেয়। কাকিমাকে অমান্য করতে না পারলেও ওদের সব কথার জবাব হাসি দিয়ে সেরেই বেরিয়ে পড়েন ভুবনমোহন। একাই।

চিনতেই পারবে না! যত বড় ব্যবসাই চালাক, গৌতমের ছেলেমানুষি যায়নি। সেবক রোডের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন ভুবনমোহন। স্টেট ব্যাংকের কাছে পৌঁছে, ছাড়িয়ে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুপ্রকাশের কথা। তাঁর সঙ্গে পড়ত শিলিগুড়ি হাই স্কুলে। সুপ্রকাশ মায়ের হাতের তেতোর ডাল খুব ভালোবাসত। ওর মা ছিল না। তিন দিদি ছিল। নাকি চারজন? তার বাবা বি. বি. রায় ছিলেন উত্তর বাংলার নাম করা লোক। মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। দার্জিলিং-কালিম্পঙে বহু কাজ ছিল তাঁর।

বি. বি. রায়ের বাড়িটা তো এখানেই ছিল। এই রাস্তা থেকে, অনেক দূর থেকেও, রামকৃষ্ণ ক্লাবের মোড় ছাড়িয়ে একটু এগোলেই দেখা যেত। রাস্তার দু'ধারে প্রাচীন সব গাছ ছিল। কত রকমের। দেবদারুই বেশি ছিল। একটা মেহগনি গাছ ছিল। তার পাশ দিয়ে নেমে কোণাকুণি মাঠ চিরে চলে যাওয়া যেত বাড়িটাতে। বাড়ির পেছনে বাগান। বাগানে কতরকমের গাছ। বাগানের পর একটুকরো ছাড়া জমি। জমিটা খাড়া নেমে গেছে নীচে, গভীরে, মহানন্দায়। সুপ্রকাশদের বাড়ির দোতলা থেকে দেখা যেত চওড়া নদীটা। পাথরে পাথরে লেগে জলস্রোত চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যেত। সুপ্রকাশের বাবা বলতেন, চুপ করে বসে শোনো, এ কোনও কলের গান নয়, জলের গান। তখনই তাঁকে কেমন বৃদ্ধ লাগত কেন? ভুবনমোহন হিসাব করেন, হিসাব মেলে না। সুপ্রকাশের মা ছিল না বলেই কি ওই বয়সেই...।

এখন গাড়িঘোড়ার আওয়াজে, মানুষের কোলাহলে, মাইক্রোফোনে লটারির টিকিট আর নানা জিনিস কেনার আবেদনের আর্তনাদে কান বন্ধ হয়ে যায় যেন।

তবু ভুবনমোহনের মনে হয়, সেই গান শোনা যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, সেই বাড়িটায় যেতে পারলেই।

বাড়িটা দেখতেই পান না ভুবনমোহন, অনেক চেষ্টা করেও, কিছুতেই। রাস্তার ধারে গায়ে-গা-লাগা বাড়ি, দোকান, এটা ওটা সারাইয়ের কারখানা, রেস্তোরাঁ। চোখ আটকে যায়। রাস্তার ওপারে মাঠও নেই। এবং তখনই তিনি খেয়াল করেন, গাছ নেই। আকাশছোঁয়া সেইসব প্রাচীন গাছ, ছড়িয়ে দেওয়া দশ হাতের মতো ডালপালা, সবুজ পাতা, গাছের ছায়া...। ভুবনমোহনের বুকের ভেতর কী যেন হয়। কী যেন বিদীর্ণ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।

খুঁজতে খুঁজতে তিনি দুটো দোকানের মাঝখানে একটু ফাঁক দেখতে পান। মনে হয় ওই ফাঁকটা দিয়ে গলে যেতে পারলেই মাঠটা দেখা যাবে। আর মাঠ পেরোলেই তো সেই বাড়ি। বাড়ির পাশে নদী। নদীতে কুলকুল নীল জল। তিনি দৌড়তে চান নদীর দিকে। আর তখনই ঘটে যায় ঘটনাটা।

রাস্তার ওপর প্রথম পা ফেলতেই ভয়ানক চিৎকারে একটা হাত তাঁকে ধাক্কা দেয়। বেশ জোরেই। তিনি ছিটকে যান রাস্তার পাশে। প্রায় পড়েই যান। আর একটু হলেই তিনি রিকশার তলায়...হাতটা রিকশাওয়ালারই।

ধাক্কা সামলে ভুবনমোহন একটু ধাতস্থ হতেই মিশমিশে কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যান তিনি। পর পর তিনটে বাস আর লরী বেরিয়ে যায়। তারপর একের পর এক গাড়ি, নানা জাতের।

ভুবনমোহনের পথ আগলে রাস্তা। হয়ত সেই কারণেই তাঁর জেদ চেপে যায়। পার হতেই হবে। ওই চাপা গলিটার মুখে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। সুপ্রকাশদের বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। তারপরেই তো সেই নদী। আর জলের গান।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর, ধুলোয় প্রায় মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর, হঠাৎ রাস্তা শান্ত হয়। সমুদ্র বা ঝড় যেমন হয় মাঝে মাঝে। ভুবনমোহন সেই সরু ফাঁকটার মুখে গিয়ে দাঁড়ান।

প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ে আকাশ। আকাশের টুকরোটা সরু এবং লম্বাটে, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। উত্তর কলকাতার চাপাগলির মাথায় যেমন আকাশ থাকে। সে আকাশও লম্বা। শুয়ে থাকে টান টান হয়ে। এখানে এই গলির শেষে, আকাশের পায়ের দিকে পাহাড়ের আভাসও পান ভুবনমোহন। শুধু মাঠ নেই। পর পর উঁচু উঁচু বড় বড়, মাঝারি মাঝারি বাড়ি। দুই দোকানের মাঝে ফাঁকটুকু পথ নয়, ময়লা জলের নালি। সেই নালি যে-নালির জলে গান থাকে না, শুধু ঘরের গোপন যত কথা থাকে, কত কিছু ভেসে আসে, ভাসে।

বাড়িটা খুঁজে পান না ভুবনমোহন। কোথায় গেল তার কোনও হদিশও পান না। বুড়ো চেহারার লোক বেছে বেছে খোঁজ করেন তিনি। বি. বি. রায়? না, না, ও নামের কেউ এ পাড়ায়...হ্যাঁ, ওই বাড়িগুলোর পেছনে নদী একটা আছে বটে কিন্তু বাড়িগুলোতে...কী নাম বললেন? রায়? বাঙালি রায়? না, না, তাহলে নেই! এদিকটায় বাঙালি তো...আগরওয়ালা আছে, ঝুনঝুনওয়ালা, কেজরিওয়াল, সিংহানিয়া, শুধু সিং-ও আছে, পাঞ্জাব আর ইউ. পি.র, কিন্তু...

রিকশা, লরী, বাসের ধাক্কা থেকে বাঁচতে বাঁচতে সেবক মোড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভুবনমোহনের মনে হয়, গৌতম ঠিকই বলেছিল, তিনি সম্পূর্ণ অচেনা একটা শহরে এসে পড়েছেন। নতুন কোনও শহর। এ শহর আমার মায়ের নয়। এ শহরে মা আমাকে আনেনি।

এ শহরে পথের দু'পাশে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। ওখানে অনেক গাছ ছিল। ছোট ছোট এক-আধটা দোকান ছিল। বাস এসে দাঁড়াত। গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসত যাত্রীরা।

যেতে যেতে একটা তেমাথায় পৌঁছন ভুবনমোহন। ট্রাফিক পুলিশের একটা আইল্যাণ্ড। হঠাৎ কেমন চেনা চেনা গন্ধ পান তিনি। বাঁদিকে ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া রাস্তাটা মানুষ আর গাড়িঘোড়ায় ঢাকা। প্রায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু জায়গাটা তিতিরের চেনা-চেনা লাগে। আইল্যাণ্ডটায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের কাছে গিয়ে তিনি জানতে চান,

এইখান দিয়েই তো যেত কালিম্পঙের ট্রেন, তাই না?

কী যেত?—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে প্রশ্ন করেন বাঙালি পুলিশটি।

চারপাশের গোলমাল ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন ভুবনমোহন।

কালিম্পঙের ট্রেন!

ধূর মশাই, ট্রেন কি! বলুন বাস! কালিম্পঙে আবার ট্রেন!

বলেই এক হাতের আধখানা আকাশের দিকে তুলে, হাতের তালু আর পাঁচ আঙুলে অভয়মুদ্রা করে, আর এক হাত দিগন্তের সমান্তরাল করে বাড়িয়ে দেন নদীর দিকে। দিতে দিতে আপনমনে বলেন,

কতরকম পাগলই না থাকে এই শহরে! বলে কিনা কালিম্পঙের ট্রেন!

বলতে বলতে তিনি প্রায় হেসেই ফেলেন। কিন্তু এত ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে হলে হয়ত কাঁদা যায়, রাগও করা যায়, হাসা যায় না কিছুতেই। হাসতে গেলেই ধুলো, ময়লা আর ধোঁয়া ঢুকে পড়ে বুকের ভেতরে।

ভুবনমোহন তাঁর সম্পর্কে পুলিশের মতামত শুনতে পান না। পুলিশের হাত ভঙ্গি পাল্টাতেই

তাঁকে চাপা দিতে ছুটে আসা অগুনতি গাড়ির স্রোত থেকে বাঁচতে দীর্ঘ একটি লাফ দিয়ে পথের একপাশে পড়ে তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতেও তিনি দেখতে পান কালিম্পঙের টয়-ট্রেন আসছে। ঝিকঝিক আওয়াজ। সুরেলা বাঁশি বাজছে। একদল তিতির লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। বিকেলবেলার স্কুলফেরত খেলা চলছে।

ট্রেন চলে যেতেই তিতির দেখতে পায় তাদের ক্লাব। দোতলা বাড়ি। ড্রিলের পর ক্লাবের মাঠে লক্ষ্মীদা লাঠিখেলা শেখাচ্ছেন, ছোরা খেলা শেখাচ্ছেন। মনুদা এক মনে শ্যাডো বকসিং করে যাচ্ছেন। তারপর একদিন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বদলে তিনি চলে যাবেন আমেরিকায়। কী ভালো দেখতে মনুদাকে।

একটানা কর্কশ আওয়াজ, ভয়ংকর ভিড়, বড় বড় দোকান, বড় বড় বাড়ি, ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সেবক মোড়ে পৌঁছে যান ভুবনমোহন।

সেবক মোড়। হিলকার্ট রোড। মহানন্দা পাড়ায় ঢোকার প্রথম রাস্তা। সেই রাস্তায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তিতির, সেবক মোড়ের দিকে। ছোট একতলা কাঠের বাড়িটির মালিক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। উল্টোদিকে কিরণ ভট্টাচার্যের বাড়ি। খুব বড়লোক। ও বাড়িতেও একটা ছেলের নাম মোহন। সে শুধুই মোহন।

বাইরের ঘরে মা-র মাথাটা কোলে তুলে নিতে নিতে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন, তিতির! তাঁর ডাকে ভয়, উদ্বেগ আর উত্তেজনা। তিতির রান্নাঘর থেকে এঁটো হাতেই ছুটে আসে মাখা ভাত ফেলে। মায়ের একপাশে দিদি, একপাশে দিদিমা। শিগগির ডাক্তার ভশ্চাজ্জিকে...

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিতির ছুট দেয় ঊর্ধ্বশ্বাসে, সেবক মোড়ের দিকে। মোড়ে পৌঁছে দেখে ডাক্তার ভট্টাচার্যের চেম্বার বন্ধ।

তাআআ আধাঘণ্টা আগেই...

তিতির হাপরের মতো হাঁপায়। তার মনে হয়, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে মায়ের মুখখানা দেখে আসা হয়নি। কেন দেখে এলাম না? মা কি তাকিয়েছিল? চোখ কি খোলা ছিল? কী সুন্দর মায়ের চোখদুটো!

পেছন ফিরে কালু ডাক্তারের চেম্বারের দিকে ছোটে তিতির। কালু ডাক্তার কমিউনিস্ট। বাবা কমিউনিস্টদের দেখতে পারেন না। কালু ডাক্তারকে কল দেওয়া হয় না কখনও।

কিন্তু এখন...

উনি তো কলে বেরিয়ে গেছেন বাবা। বাবুপাড়ায়। ফিরতে সময় লাগবে। তুমি বরং...

লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তিতির। হিলকার্ট রোড ধরে ছুটতে ছুটতে, এঁটো হাতটা একবার হাফপ্যান্টে, একবার বুকে, একবার বাঁ হাতে ঘসতে ঘসতে মনে করতে চেষ্টা করে, মা কি নিঃশ্বাস নিচ্ছিল? মায়ের বুক কি ওঠানামা করছিল? মনে পড়ে না তিতিরের। দিদি কি কাঁদছিল? দিদিমার চোখে জল ছিল কি?

ডাক্তার পালের চেম্বারের দিকে ছুটতে ছুটতে তিতিরের এঁটো হাত যখন প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, হঠাৎ তার মনে হয় ডাক্তার পালকেও পাওয়া যাবে না এবং এখনই বাড়ি ফিরে না গেলে আমি আর কোনওদিন মাকে দেখতে পাব না।

তিতির থামে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে। বুক ফেটে যায়। যাক ফেটে! তিতির দ্বিগুণ জোরে ছুট দেয়, উলটো দিকে, বাড়ির দিকে। বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে না। যেতে হয় না।

দু-হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, গাড়ি-ঘোড়া এড়িয়ে, ধোঁয়া, ধুলো আওয়াজ আর রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যান ভুবনমোহন। পৌঁছে তিনি বোঝেন গৌতম ঠিক কী বলতে চাইছিল।

নদীর আগে বিশাল বাঁধানো চত্বর। দু'পাশে বড় বড় হোটেল; রেস্তোরাঁ শুঁড়িখানা। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। দেশি-বিদেশি। গোটা চত্বর জুড়ে ঝলমলে দোকান, আর ভিড়, যেন মেলা, এমন এক মেলা যা চলবে চিরকাল ধরে। সেসবের আড়ালে উধাও হয়ে গেছে নদী। শুধু গাড়িঘোড়ার গতি দেখে বোঝা যায় কোনদিকে ব্রিজ। ব্রিজ যখন আছে, তার তলায় নদীও আছে নিশ্চয়ই।

একটা ব্রিজ দুটো হয়ে গেছে। ভুবনমোহন যেন আবিষ্কার করেন। একটা দিয়ে শহর থেকে যাওয়া, একটা দিয়ে শহরে ফিরে আসা।

ব্রিজ আছে। দু-দুটো ব্রিজ। কিন্তু নদী নেই। নদী মানে স্রোত, স্রোতের মধ্যে বড় বড় পাথর, ছোট এবং মাঝারি পাথর, গোল কিংবা চৌকো বা চ্যাপটা, আস্ত কিংবা ভাঙা। সেইসব পাথরের দশ দিকে নদীময় ছড়ানো ছোট ছোট নুড়ি, লক্ষ লক্ষ মার্বেল, কত বর্ণে বর্ণময়। আর বালি, আর মাটি আর জল। সেইসব নুড়ির ওপর দিয়ে, সেইসব পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে বহে যাওয়া স্রোতস্বিনী জল। পাথরের ছায়ায় ছায়ায় সেই জলে ছোট ছোট ঝাঁকে ছোট ছোট মাছ। রোদ্দুর পেলেই ঝিলমিল করে ওঠে, যেন রূপো। আর নদী মানে নীল জলের সেই গান।

ভুবনমোহন ব্রিজ পার হন। রাস্তা পার হন। পাশের ব্রিজের গা দিয়ে নদীর দিকে নেমে যেতে চান। এখান দিয়েই নামতে হয়। মাকে নিয়ে মাঝরাত্রে সবাই মিলে নেমেছিল।

নামা যায় না। যেখানে নামার পথ থাকার কথা সেখানে একটা স্টেশনারী দোকান। একপাশে কাঁচের আড়ালে কেক-প্যাস্ট্রি। কাঁচের দরজা দেওয়া ফ্রিজে সফট ড্রিংক। পেপসি, কোকাকোলা। এনজয়! এনজয়! কিন্তু পথটা কোথায় গেল? ভুবনমোহন অবাক!

আচ্ছা ভাই, পথটা কোথায় গেল?

কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে আসে তরুণটি।

বলুন, কী সেবা করতে পারি?

আচ্ছা, এখান থেকে একটা পথ...নদীতে যাওয়ার...

কিছু কিনবে না। বিরক্তি গোপন করে না ছেলেটি। ইয়ারফোনটা কানের কাছে তুলে নিতে নিতে বলে,

এদিক দিয়ে নদীতে যাওয়া যায় না। ওপারে চলে যান, শমশানের পাশে পেয়ে যাবেন...

হাত তুলে সে বড় রাস্তার দিকে দেখায়।

কিন্তু একটা পথ ছিল!

বেশ জোর দিয়ে বলেন ভুবনমোহন।

আমার মাকে নিয়ে... পথটা একটু এঁকেবেঁকে নদীতে, মানে নদীর পাড়ের জমিতে, বালিতে আর কি...

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। সে বোঝে, লোকটা পাগল হতে পারে, কিন্তু খদ্দের হবে না। কানে ইয়ারফোনটা লাগাতে লাগাতে বলে,

থাকলে ছিল, এখন নেই! হাওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু নদীতে নামতে হলে...

কেন, হোয়াই নদীতে? কী দরকার আপনার?

না, মানে, দরকার খুবই...আচ্ছা যদি আরও এগিয়ে যাই, নদী বরাবর...

ধূর মশাই, বলছি এদিকে নেই! পরপর শুধু বাড়ি, দোকান, গোডাউন সব মিলবে, পথ পাবেন না। নদীতে সবাই শমশান হয়েই...

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন ভুবনমোহন। একটা বুদ্ধি খেলে যায় তাঁর মাথায়। শ্মশানের দিক থেকে নদীর পাড় ধরে তলা দিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে...

হনহন করে হাঁটতে থাকেন ভুবনমোহন। দোকানের ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। পাগলরা আজকাল এরকম ধোলাই করা, ইস্তিরি করা ধুতিপাঞ্জাবিও পরছে তা হলে! কেয়া বাৎ! কানে গান শুরু করতে করতে ভাবে ছেলেটি।

কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে শ্মশানঘাট। নিশ্চয়ই তাঁর ছেলেরা, বাদল আর খোকন, খরচপাতি করেছে। নইলে তাদের বাবার নামে হবে কেন? বাবার নাম অমর হয়ে গেল। এখানে তো আসতেই হবে সবাইকে।

ভুবনমোহন সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নামতেই নদী তাঁর খুব কাছে চলে আসে। সিঁড়ির গা বেয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে কালো জলের একটি ধারা। আর কোথাও জল নেই। নদীর বুক ভরে সব আছে, জল ছাড়া। থকথকে কাদা। কাদা জমে জমে দ্বীপ। কাদায় পুরোনো কাপড়ের টুকরো। ভাঙা প্যাকিং বাক্স, খাটের ভাঙা অংশ, পচা পাতা, মাটির মালসা, ভাঙা কলসী, নারীর রক্তমাখা প্যাড। অজস্র পলিথিনের ব্যাগ। নানা রঙের। সেইসব রঙের মধ্যে আকাশে চার পা তুলে পড়ে আছে পচে ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া একটা শুয়োর। তার পাশেই, যেন গায়ে গা লাগিয়ে একটা ভাঙাচোরা প্যারাম্বুলেটর। একটু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা পাথর, কাদায় গাঁথা। এবং দুর্গন্ধ। বিকট দুর্গন্ধ সমস্ত নদীজুড়ে। এবং কালো রঙ! ছাই ছাই কালো। যেন শ্মশানের যাবতীয় শবপোড়া ছাই বুকে নিয়ে পড়ে আছে নদী। পড়েই আছে, স্থবির। এগোতে পারে না, পিছোতেও পারে না। যেন প্রাণই নেই। এ যেন নদীর শব! তার মধ্যেই, নদীর বাঁধানো পাড়ে খেলছে একদল তিতির। খেলতে খেলতে পড়ে যাচ্ছে জলে, কাদায়। উঠে এসে আবার খেলছে। গায়ে কাদা নিয়ে, দুর্গন্ধ নিয়েই খেলছে।

তাদের পাশ দিয়ে নদীর পাড় ধরে ব্রিজের দিকে এগিয়ে যান ভুবনমোহন। প্রথম ব্রিজটা যেখানে মাটিতে পড়েছে তার কাছেও পৌঁছতে পারেন না তিনি। দুটি শিশু বড় একটা পাথরে মুখোমুখি বসে পায়খানা করছিল, খেলাও করছিল। ব্রিজের ছায়াতে জায়গাটা একটু অন্ধকার অন্ধকার, কালো আরও ঘন। শিশুদুটির পাথরের পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে কালো কাদায় পা বসে যায় ভুবনমোহনের। এবং বসে যেতেই থাকে। তিনি টাল হারিয়ে কাত হয়ে নদীতে, নদীর কাদায় গড়িয়ে পড়তে থাকেন। এই প্রথম তাঁর ভয় করে। নিজের মৃত্যুর কথা মনে হয় তাঁর। তাঁর শবের ছাই এই নদীতে পড়ে কাদা হয়ে যাচ্ছে, তিনি যেন দেখতে পান।

ভুবনমোহন শুনতে পান দুটি শিশুকণ্ঠ খিলখিল করে হাসছে। এমন দৃশ্য তারা কখনও দেখেনি। শুকনো খইয়ের সঙ্গে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, বড়জোর পঁচিশ পয়সা ছড়াতে ছড়াতে বাবুরা মা-বাপ-ভাই-বৌ-ছেলে পোড়াতে নিয়ে আসে। তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। এখন তাদেরই একজন তাদের এলাকায়, তাদের কাদায়, পায়খানায়, তাদের মরা শুয়োরের গন্ধে ডুবে যাচ্ছে। এত কথা হয়ত সেই দুই শিশু ভাবে না, বোঝেও না, তারা শুধু নির্মল আনন্দে হাসে।

তাদের পাথর ধরেই টাল সামলান ভুবনমোহন। ডুবে যাওয়া পা-টা টেনে তোলেন। পা

উঠে আসে, চটিটা থেকে যায়। ধীরে, খুব ধীরে পা ফেলে ফেলে ফিরে আসতে থাকেন ভুবনমোহন। গৌতম বলেছিল, তুমি ধারণাই করতে পারছ না শহরটা কী হয়েছে এখন। এতক্ষণে তিনি ধারণা করতে পারেন। মা-র কাছে যাওয়ার কোনও পথ নেই। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে শহর।

ওপরে উঠে, শ্মশানের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে, বাকি একপাটি চটি সিঁড়িতে রেখে দিয়েই তিনি চলে যান। শহরে ফেরার ব্রিজে উঠে অনেকখানি না গিয়ে, ব্রিজের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত না গেলে জায়গাটা দেখা যায় না।

সবুজ মাটি। মাটির ওপর মা। কাঠ সাজানো হয়ে গেছে। তিতিরের হাতে একটা মশাল দিয়ে কে যেন তার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল। চলার আর শেষ নেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হাতে এসে পড়ে আগুনের টুকরো। জ্বলে যায়। তবু চলা থামানো চলে না।

আগুন যখন দাউ দাউ জ্বলে ওঠে, একটু আরাম লাগে। তখন ডিসেম্বরের শেষ। তীরের ফলার মতো বাতাস ছাড়ছে হিমালয়। সে বাতাসে জমে যেতে যেতে সে আগুনে কিছু আরাম পেয়েছিল তিতির। তোমার আরাম লেগেছিল ভুবনমোহন? যে-আগুন তোমাকে আরাম দিয়েছিল সে আগুনে পুড়ছিল তোমার মা। এখন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, কোনও এক তীব্র অনুভূতি বুকে নিয়ে যেন অনুতাপের মতোই কোনও কিছু, ভুবনমোহন কেমন কুঁকড়ে যেতে থাকেন।

সে মাকে চোখেও দেখেনি মল্লিকা। তবু হাঁটু মুড়ে নত হয়ে সেই মাটিতে সে মাথা ঠেকিয়েছিল। তার পাশে বসে মাথা নত করতে করতেও বুকের ভেতর কষ্টের মতো কিছু একটা অনুভব করেছিলেন ভুবনমোহন। সে আগুনে আরাম লেগেছিল তোমার, ভুবনমোহন!

সেই মাটিটুকু কোথায়? সবুজ সেই জমিটুকু? সেই বালি-নুড়ি-পাথর? কোথাও খুঁজে পান না ভুবনমোহন। কোথাও দেখতে পান না। নদীর বুক থেকে পিলার উঠে গেছে। পিলারের ওপর বাড়ি-দোকান-গোডাউন। নদীর বুকের ওপর শহর। নদীতে জল নেই। নুড়ি নেই। মাছ নেই। জলের গান নেই। নদীই নেই। আর সব আছে নদী জুড়ে। শবপোড়া ছাই আছে, ছাই ছাই কাদা আছে, কালো কালো রঙ আর কটু দুর্গন্ধ আছে নদীর সমস্তটুকু জুড়ে।

শহরে ফেরার ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহন যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেন সেবক রোডে সুপ্রকাশদের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজে না পেয়ে তাঁর বুকের ভেতর ঠিক কী ঘটছিল।

সবুজহীন, মৃত্তিকাহীন, বৃক্ষহীন, নদীহীন, শহরের নির্মম উদাসীনতা তাঁর সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এত চেষ্টা করেও কোনওভাবেই মায়ের কাছে যেতে পারছেন না ভুবনমোহন। নির্বিকার সেই নির্মমতার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আবার তাঁর বমি পায়। ব্রিজে দাঁড়িয়ে, গলা বাড়িয়ে তিনি বমি করেন। বমি হয় না। চারদিকে এত দুর্গন্ধ যে বমিও হয় না। যতবার বমি করতে চান ভুবনমোহন, যতবার বমি করতে যান, শহরের উদাসীন নির্মমতা বুকের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বুক ফেটে যেতে চায়। ফেটে যায়।

## অগ্নিশমকের গান

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঐ তার চুলে ফুলকি,
ভূপল্লব পুড়ে খাক,
সুন্দর কপালে ফ্রেস্‌কো,
থুৎনির মোমদান
ধরেছে জ্বলন্ত দুই কনীনিকা,
তীক্ষ্ণ নাসা, গাল, গ্রীবা গ'লে একাকার,
কুণ্ডিলাগ্র স্তনবৃন্তে রক্তটুনি,
আগুনের তরল প্রতিভা
নামে সাবলীল
জন্মদাগ পেরিয়ে পেরিয়ে
রোমশ জন্মের দেশে,
তারপর উরুস্তম্ভ নারেঙ সাপের মত পাক দিয়ে
আরও নিচে নেমে
ছোঁয় দুপায়ের পদ্মপাতা,
জনয়িত্রী এই উন্মাদিনী
এ কাকে যে
শমীর গহন থেকে ছুটে আসা গূঢ়মন্ত্রে
ডেকেছেন স্বাহা, বাড়বাগ্নির প্রেমিকা!

সে আগুন দেখেছিল অম্বা,
গোল হয়ে নেচেছিল
হিংসা তার ভীষ্মের নিয়তি,
বল্লাল সেনের বাংলা
তার লেলিহান বুকে ছুঁয়েছিল
সতীচ্ছদ না ছেঁড়া-কিশোরী গৌরী সতী,
জহরব্রতের দাহে
ইতিহাস মহোৎসব করে গেছে কামিনীকুলের,

কূলহীন সাগর পেরিয়ে
স্ফুরিত লবণ-গোলা
　　বেগার্ত জোয়ারে ভেসে ভেসে
কখনো সে প্রতিবাদী
রিড্‌লে ও মর্টিমার,
কখনো বা ডম্‌রেমি-র তরুণী জোয়ান।

এত কি ছিল জ্বালা　ত্বকের কোষে কোষে
প্রতিটি রোম ছিল　এত কি দাহ্য
বাসনা ফুঁসে উঠে　নিজেরই বুক পেতে
পারে কি নিতে　সারা শ্মশান, শান্তি
আগুনে পোড়ে পাপ　বলেছে কোন্ পাপী
পাবক হাত পেতে　নিয়েছে মজ্জার
ভিতরে উচাটন,　অন্ধ পরিণাম,
এই কী নির্বাণ　এই কী ক্রান্তি?

ছেনির চুম্বনে ঠিক্‌রে পড়ল
　　কয়েকটি লাল নীল ফুল—
স্পর্শ করো।
রামকিংকরের ছেনিকাটা ক্রোধের মহিষ
নিঃশ্বাসের সাইক্লোনে ভুবনডাঙার মাঠে
　　জ্বালিয়ে দিল বিশাল লুব্ধক—
স্পর্শ করো।
গইয়্যা-র প্রতিবাদ ব্রেঁসোঁ-র হাহাকার
লোরকা-র বিকেল পাঁচটায় ঠিক বিকেল পাঁচটায়
গোলাফাটার মুহূর্তে
এ-মুড়ো ও-মুড়ো ছড়িয়ে পড়ল
আলট্রামেরুন　শাদা　ক্যাডমিয়ন লাল—
করো, স্পর্শ করো।

যে আগুনে ভ্যান গগ্ দক্ষিণ তর্জনি রেখেছিল
তার তাপ নাও।
স্নাত হও শুদ্ধ হও অগ্নিভ মানুষ হও—
প্রাজ্ঞ কন্‌ফুসিয়াস এ-কথা যে কেন বলেছেন,
লাইসিয়মের পাশে সকালের প্রথম মোরগ
কেন যে চিৎকার ক'রে এ-কথা বোঝাতে চেয়ে
কণ্ঠনালি ফেটে মরে গেছে

এসব জানার আগে শুরু হয় আলেখ্যদর্শন
রতনবাবুর ঘাটে রবীন্দ্রশ্মশানে
সাবলীলতায় জাগে
নিধে ডোম শঙ্খমালা চিতা...

থার্মো নিউক্লিয়ারের ভস্মসন্ততিরা
একে একে উঠে আসে দগ্ধ মুখে,
অটো হান্, ওপেনহাইমার
কিংবা অন্য কোনো ঈশ্বরবিজ্ঞানী
যাঁরা জবাকুসুমসংকাশ-
অগ্নির বিমূর্ত স্তবে ফুল্ল হতে হতে
কেউ ভেঙে পড়েছেন
কেউ বা শিকলবন্দী উচ্চণ্ড উন্মাদ,
আকাশে, অপার শূন্যে, বাঁজা মাঠে, নিবিড় পাতালে
সমবেত প্রার্থনায়, পিপাসায়
কোটি কোটি সগরসন্তান
জাহ্নবীর জানু চিয়ে জন্ম চায়
দুহাতে খরার যোনি চিরে
জল চায়, বন্যা চায় বাঁচার, প্রেমের
আর
ডাইনির ছাতিফাটা রাঢ়ের মৃত্তিকা ভেঙে
আমাদের গলায় গলায়
জেগে ওঠে তুমুলবর্ষণস্নাত গান
অগ্নিশমকের গান।

# হায়

## নবেন্দু ঘোষ

একটা বড় কাঠের সাইনবোর্ড। তাতে কাঁচা হাতে পাকা রং দিয়ে লেখা—তিনকড়ি'র চা। 'তিনকড়ি' কথাটা লাল রং আর 'চা'-টা কম দুধ মেশানো চায়ের রংয়ের মতো। কিন্তু দুটো লেখার রং-ই চার বছরের রোদে-জলে ফিকে হয়ে এসেছে।

একতলা পুরনো বাড়িটা। সামনের বড় বারান্দাটার দু'পাশে তিন সারি করে বসবার বেঞ্চি, তাদের সামনে খাবার বেঞ্চি। প্রতি বেঞ্চিতে দু'জন করে গ্রাহক বসতে পারে। দরকার হলে ছোট ছোট চারটে টেবিল আর হাতলহীন চারটে লোহার চেয়ার। ভেতরের ঘর থেকে যেখানে কয়লার উনুন জ্বলছে চা-টোস্ট-মামলেট করার জন্য আর সেখানেই একপাশে দু'চারটে বড় প্ল্যাস্টিকের ডিবেতে দু'তিন রকমের বিস্কুট। তার এদিকে একটা বড় সিঙ্কে কল, তার পাশে একটা পাথরের স্ল্যাবের ওপর কাপ প্লেট সাজানো।

বারান্দার পেছনদিকে, ডানহাতি একটা ছোট টেবিলের পেছনে হিসেবের খাতা আর ক্যাশবাক্স নিয়ে বাহান্ন বছরের নাদুসনুদুস আধমাথা-টাকওলা তিনকড়ি বসে বসে পা নাচায়। তার ওখানে দু'জন লোক কাজ করে। একজন চা, টোস্ট আর মামলেট তৈরি করে, নাম বটুক। বয়স চল্লিশ। অপরজন গ্রাহকদের তা পৌছে দেয়, ডাক নাম ফড়িং। বয়স তিরিশ।

'তিনকড়ি'র চা'-তে সব সময়েই চার-পাঁচজনকে বসে থাকতে দেখা যায়—সকাল সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত। গ্রাহকেরা বেশির ভাগই মজদুর, কারিগর ও মেকানিকদের দল, তবে মধ্যবিত্ত বাবুরাও মাঝে মাঝে চলতে চলতে এখানে থামে, চায়ে চুমুক দেবার পর মনে মনে বলে, 'বাঃ বেশ তো।'

তখন বেলা সাড়ে দশটা। রবিবার।

শান্তনু দাস, ডাক নাম শানু, বয়স চব্বিশ, চায়ের দোকানের বারান্দায় উঠে যখন অন্যমনস্কভাবে এককোণে গিয়ে বসল তখন তার বিপরীত কোণ থেকে একজন ডাকল, "এই যে শানুবাবু"—

শানু সেদিকে মুখ ফেরাল, তারপরে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল বিপরীত দিকের দেয়াল-ঘেঁষা বেঞ্চিটাতে।

"আরে, রাজু! এখনো বেঁচে আছিস্ তুই?"

সেই বেঞ্চিতে উপবিষ্ট সমবয়সী যুবকটি সহাস্যে বলল, "হ্যাঁরে সালা, তোর সঙ্গে আজ এখানে দেখা হবে বলে বেঁচে আছি।"

যুবকটির নাম রাজেন ঘোষ, ডাকনাম রাজু, তার পাশে গিয়ে বসে তার গায়ে একটা ঠেলা মেরে শানু বলল, "স্‌সালা"—

রাজুও পালটা একটা ঠেলা মারল শানুকে, বলল, "স্‌সালা।" তারপরে সে প্রশ্ন করল, "ইস্, কদ্দিন বাদে দেখা হল বল্ তো?"

শানু বলল, "কসবা ছাড়ার পর থেকে, তার মানে, প্রায় তিনবছর হতে চলল।"

ফড়িং এসে দাঁড়াল পাশে, "কী দেব?"

রাজু বলল, "একটা করে মামলেট আর দুটো করে 'কড়ক্' টোস্ট্—"

শানু বলল, "আরে তুই অর্ডার দিলি?"

"হ্যাঁ দিলাম। কাল তুই দিবি সালা।"

হাসল দুজনে। যারা দোকানে বসে চা খাচ্ছিল সেই চারজন গ্রাহকও মুচকি হাসল। তিনকড়ির পা-নাচানোও দু'চার সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ হল।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "তা গড়ের এই খালপাড়ে কী করতে এসেছিস?"

"কী করতে মানে? আমি তো এই খালপাড়েই থাকি?" শানু জবাবে বলল।

"এপার না ওপার?"

"এপারে আর তুই?"

"ওপারে। ঢাকুরিয়া ছেড়ে যাদবপুরে আড়াই বছর কাটিয়ে মাস ছয়েক আগে এইখানে ট্র্যান্সফার হয়েছি।"

"বেশ বলেছিস্—ট্র্যান্সফার—সালা—"

রাজু বলল, "তোর গোবিন্দে'র কথা মনে আছে?"

শানু বলল, "তার সঙ্গেও তো দেখা নেই প্রায় আড়াই বছর—সে তো যাদবপুরে নেই, একবার খোঁজ করেছিলাম, উঠে গেছে সেখান থেকে।"

"না গোবিন্দেরাও এখন এই খালপাড়ে, ওপারে"—রাজু বলল।

শানু হেসে বলল, "নিশ্চয় ব্যাটা এ্যাদ্দিনে এম. এ. পাশ করেছে?"

মাথা নাড়ল রাজু, বিষণ্ণতা-মেশানো গলায় সে বলল, "নারে শানু। বি. এ-তে ফেল করার পর ওর বাপের চাকরি গেল, তারপর অভাব শুরু হল। নিজেও কোনো চাকরি-বাকরি না পাওয়ায় একটা ছোট গ্যারেজে মেকানিক হবার চেষ্টায় ঢোকে, এখন মোটামুটি ভালোই কাজ করছে—'মোটামুটি' অর্থাৎ কষ্টেই দিন কাটাচ্ছে।"

শানু বলল, "আহা।"

রাজু বলল, "তুই আমার কথা জিজ্ঞেস করলেও যা বলব তা শুনে তুই আবার বলবি 'আহা'।"

শানু বলল, "আমিও 'আহা' রে।"

রাজু বলল, "তবু বল, কী করছিস আজকাল?"

শানু হাসল, "ডিগ্রী কোর্সটা শেষ করা হল না টাকার অভাবে। আজকাল সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত দু'টি ছাত্রকে পড়াই, পাই দেড়শো আর দু'শো, তারপর বিকেল দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত যাদবপুরের একটা জামাকাপড়ের দোকানে সেলসম্যানের চাকরি করে পাই পাঁচশো"—

"মাত্র পাঁচশো?" রাজু বলল।

শানু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, দোকানের মালিক হিসেবি লোক, সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত একজনকে দেয় পাঁচশো আর বিকেলের জন্য আমাকে দেয় পাঁচশো। একজনকে রাখলে আরো পাঁচশো টাকা বেশি লাগত—"

শানু হাসল, একটু থেমে আবার বলল, "এই সাড়ে আটশো দিয়ে মা আর দুই বোনকে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছি। এবার 'আহা' বল্।"

রাজু মাথা নাড়ল, "না, এবার বলব না কারণ আমার রোজগারের গল্পটা তোর চেয়েও বেশি করুণ। আমার লেখাপড়া তো হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল তাই এখন আমি একজন সেলস্‌ম্যান—নন স্টিকিং বাসন বিক্রি করি। কোম্পানি মাইনে দেয় নামমাত্র—দু'শো টাকা আর দেয় বাসট্রামের খরচা। আসলে উপার্জনটা আমার কপাল আর 'করিশ্‌মা'র ওপর নির্ভর করছে। আমি সুন্দর সুন্দর মিষ্টি কথা বলে যদি একসেট দু'শো টাকায় গছাতে পারি তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাই।"

"তাহলে তো ভালোই কামাস"—বলল শানু।

মাথা নাড়ল রাজু, "নারে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়, মাসে কম করেও পাঁচ হাজার টাকার মাল বেচতে না পারলে তিনমাস বাদে চাকরি থাকবে না।"

"মাসে পাঁচ হাজার টাকার বিক্রি হয় তো?"

"অতি কষ্টে—মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটে, সাত-আট হাজারও বিক্রি হয়ে যায়—অর্থাৎ মিনিমাম বিক্রি করে মাসে সাতশো টাকা আয় হয়। তার জন্যে বেলা এগারোটা থেকে পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত বড়লোক পাড়ায় ঘুরতে হয়। খুব কঠিন কাজ।"

"কঠিন কেন?"

"কারণ বেশির ভাগ বাড়িতেই বিরক্ত হয়ে 'না, দরকার নেই' বলে দেয়। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে কোনো বাড়িতে প্রায় ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়—'দুপুরবেলা এসে ডিসটার্ব করছো, পুলিশে খবর দেব।' আর দুপুরে না গিয়ে সকালে আরো পাত্তা দেবে না কেউ কারণ তখন বাবুরা অফিসে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যাচ্ছে—"

শানু গম্ভীরমুখে বলল, "হুঁ—"

রাজু বলল, "হুঁ নয়, বল্‌ 'আহা'। জানিস্‌, আমার মা ক্যানসারে ভুগছে—"

"ক্যানসার!"

"হ্যাঁ, লিভারের, প্রথম স্টেজ—কিন্তু চিকিৎসা করাতে পারছি না। তাছাড়া এক বিধবা বড় বোন আছে, শ্বশুরবাড়িতে জায়গা নেই, সে সেলাই করে মেয়েদের ব্লাউজ, মাসে শ'দেড়েক টাকা কামায়—এই আয়—"

শানু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চা এলো। সঙ্গে মামলেট আর 'কড়ক্‌' টোস্ট। কিন্তু চায়ের উত্তাপ যেন কম মনে হতে লাগল।

একটা ছোট্ট কংক্রীটের ব্রীজ খালের ওপর দিয়ে। একটা গাড়ি অক্লেশে পার হতে পারে। প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, খাল থেকে প্রায় পনেরো ফুট ওপরে ব্রীজটা। খালে তিরতির করে একটু জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, দেখলে নর্দমা বলেই মনে হয়। আর রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ, ঠোঙা, পলিথিনের ছোট বড় ব্যাগ আর জঞ্জাল দু'পাশে। সব সময়েই একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ হাওয়াতে ভাসে, অনেকে ব্রীজটা পার হবার সময় তাই নাকে হাত দেয়।

ব্রীজের ওপারে রাখালদাস লেন পার হলেই একটা বড় রাস্তা, তা দিয়ে তিনচার মিনিট ডানহাতি এগোলেই একটা ছোট কম্পাউণ্ডে 'লাহিড়ীজ গ্যারেজ'। কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্তে ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা এ্যাম্বাসেডরের কঙ্কাল রাখা আছে। ডানদিকেই একটা উঁচু এ্যাসবেস্টসের শেড, তার তলায় তিনটে এ্যাম্বাসেডর, একটা মারুতি আর একটা হিরো হোণ্ডা

নিয়ে কালো প্যাণ্ট, কালো কুর্তা পরিহিত মেকানিকেরা ব্যস্ত। বাকি খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ইয়ামাহা বাইক এবং আরো তিনটে এ্যাম্বাসেডর। সেই গাড়ির কঙ্কালটার বাঁদিকে একটা এক ইটের তৈরি ছোট্ট ঘর, তার সামনে লোহার গরাদওলা দরজা। ভেতরে দুটো বড় আলমারি আর র‍্যাকে গ্যারেজের জন্য তেল, মোবিল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাজানো। একটা বড় টেবিলে কাগজপত্র, তার ওপিঠে বসে আছে মালিক সুশীল লাহিড়ী, বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, সেও কালো প্যাণ্ট আর হাফহাতা কালো কুর্তায় সজ্জিত। গাড়ির ব্যামো জটিল মনে হলে সে এগিয়ে আসে মেকানিকদের সাহায্য করতে। কম্পাউণ্ডের সংলগ্ন নিজের একটা ছোট দোতলা বাড়িতে লাহিড়ী ওপর তলায় সপরিবারে থাকে আর নীচের তলায় এক ভাড়াটে। আর কম্পাউণ্ডের সামনের দিকটায় লোহার উঁচু ফটক এবং ওপরে কাঁটাতার লাগানো।

গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়াল শানু আর রাজু।

রাজু বলল, "দেখতে পাচ্ছিস শানু?"

শানু আঙুল তুলে বলল, "ঐ তো।"

হিরো হোণ্ডাটাকে বছর চব্বিশের শক্ত সমর্থ, মাঝারি গড়নের যে যুবকটি মেরামত করছিল সেই গোবিন্দ মানে গোবিন্দ দত্ত। পরনে সেই একই পোশাক, কালো প্যাণ্ট আর কালো কুর্তা। একটা মোবিলের পাত্রের জন্য ঘুরতেই সে রাজু আর শানুকে দেখতে পেল। দু'তিন সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টি মেলে দেখে সে হাতের কালিমাখা ঝাড়নটা ফেলে সোজা তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

মুখ টিপে টিপে হাসছে রাজু আর শানু।

কাছে এসে রাজুর দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, "রাজু, তোর সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই সালার নাম কীরে?"

রাজু সহাস্যে বলল, "তুই চিনিস না?"

গোবিন্দ গম্ভীরমুখে বলল, "চেনা চেনা মনে হচ্ছে—ঝানু না মানু এইরকম একটা নাম না?"

শানু বলল, "হ্যাঁরে দোলগোবিন্দ না ওলগোবিন্দ"—একসঙ্গে তিনজনেই হেসে উঠল।

এমন সময়ে সুশীল লাহিড়ী তার চেয়ার টেবিল ছেড়ে বাইরে এসে কোমরে দুই হাত রেখে দুই জ্বলন্ত চোখ দিয়ে নিঃশব্দ ভর্ৎসনা বর্ষণ করতে লাগল। এবং গোবিন্দ তা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলল, "এই তোরা এখন যা, আমাদের মালিক ব্যাটা চায় না যে কাজ করতে করতে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলি।"

রাজু বলল, "আমি তো জানি।"

শানু বলল, "আমিও জানলাম।"

গোবিন্দ বলল, "রাত ন'টায় তিনকড়ির চা খাব আমরা তিনজনে।"

"বেশ।" বলল শানু।

"ওকে।" বলল রাজু।

গোবিন্দ এ্যাবাউট টার্ণ করে কাজে লেগে গেল।

সুশীল লাহিড়ী'র হাত দুটো কোমর থেকে সরে গেল।

রাজুকে বাজার করতে হবে বলে সে চলে গেল।

শানু একা চলতে লাগল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। মানু মানে মনোরমা সেজেগুজে

আসছে বিপরীত দিক থেকে। একেবারে টিপটপ, একজন আধুনিকা ও সুন্দর যুবতী। কিন্তু শানুকে দেখেও না-চেনার ভান করল মানু, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাশ দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই তার সামনে প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শানু।

"মানু, কোথায় চললি?" সে হাসিমুখে বলল।

মানু ধরা পড়ে গেছে তবু যেন এই দেখেছে ভাব করে বলল, "আরে শানুদা!"

"কোথায় চললি?" আবার জিজ্ঞেস করল শানু।

"এই, যাচ্ছি চেতলায়, মাসির ওখানে।" মানু জবাব দিল।

শানু বুঝল যে মানু মিথ্যে কথা বলল, কিন্তু কিছু আসে যায় না। সুন্দরী মানু'র মিথ্যেকে মেনে নেওয়াই ভালো। সে যে তাকে আজকাল পাত্তা দেয় না সে কথা তো বছরখানেক ধরেই শানু টের পেয়েছে।

সে একটু তেতো হাসি হেসে বলল, "মাসির ওখানে? বড়মাসি না ছোটমাসি?"

ভুরু কুঁচকে মানু বলল, "এতদিন ধরে তুমি জানো আমাদের, তুমি তো জানোই যে আমার একটিই মাসি, তাঁর সঙ্গে তো তোমার কতবার দেখাও হয়েছে—"

শানু বলল, "ঠিক ঠিক, নয়নমাসি—ঠিকই তো, তোর তো একটিমাত্র মাসি—"

'চলি শানুদা'। কড়া গলায় বলল মানু, সে বুঝতে পেরেছে যে তার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে শানু। যেন ঘোরতর অপরাধ করেছে।

"যাবি?"

"হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলেই মানু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

যাচ্চলে। গেল। মনে হল যেন একটা স্ফীতকায় বেলুনের হাওয়া ফুস্ করে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মানুর নিতম্ব-দোলন দেখে শানু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। একটু হাসি ফুটে উঠল তার দু'ঠোঁটে, যা দিয়ে সে একদিন মানুকে চুমু খেয়েছিল। মানুও প্রত্যুত্তরে তার প্রতিদান দিয়েছিল। কিন্তু—হায়—

একটা দোতলা বাড়িতে পাঁচটি পরিবার থাকে। একতলায় তিনটি আর ওপরে দুটি। শানুরা থাকে একতলার পেছন দিকটায়। বাড়ির দেয়াল আর পাঁচিলের পাশ দিয়ে পেছন দিকে যেতে হয়। দুটো খুপরি ঘর, আর বারান্দার দু'পাশে রান্নাঘর আর বাথরুম।

বারান্দার দিকের পাঁচিলের ওপাশে দুটো আমগাছ, ফলে আলোর অভাব সব সময়েই আর কামরার ভেতরে অন্ধকার অন্ধকার। দিনে বাতি জ্বালানোর মতো ট্যাকের জোর নেই।

ঘরে ঢুকতে যাবার মুখেই দেখা হল সবার সঙ্গে।

মা: সুরভি'র বয়স আসলে বাহান্ন কিন্তু দেখায় পঁয়ষট্টি মতো, রুগ্নজীর্ণ শরীর, হাঁপানিতে ভোগে, ঘন ঘন শ্বাস নেয়, শব্দটা শোনায় অনেকটা গোঙানির মতো। বালতিতে সাবান গোলা জলে দুই ছেলের পাজামা আর প্যান্ট ডোবাচ্ছে সুরভি।

শানু ধমকের সুরে বলল, "শ্বাসের কষ্ট কমবে কী করে অত জল ঘাঁটলে?"

সুরভি গম্ভীর গলায় বলল, "এর বেশি তো বাড়বে না।"

রান্নাঘরে তরকারি কুটছিল সতেরো বছরের বোন বিনীতা, ডাক নাম নীতু, সে দাদা'র দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "শুনলি দাদা, মায়ের সংলাপ?"

শানু বলল, "শুনলাম, সংলাপটা জবরদস্ত।"

সুরভি হাঁপাতে হাঁপাতেও হাসল।

নীতু আর একদফা হাসল। হাসলে নীতুর দুই গালে টোল পড়ে, ফলে তাকে যা সুন্দর দেখায় যে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় ভুলেও হাসে না। একবার একটা ছেলে তার হাসি আর টোল দেখে রাস্তায় মন্তব্য করেছিল, "মাইরি, টোল দেখে টাল সামলাতে পারছি না।" নীতু চেঁচিয়ে উঠেছিল, "দাদা—" পেছন পেছন আসছিল শানু, ছুটে গিয়ে সেই ছেলেটার কলার চেপে ধরে বলেছিল, "মুখ সামলে টালের বাচ্চা, ও আমার বোন।" দু'একজন লোক চলতে চলতে থমকে সেই বখাটে ছেলেটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই ছেলেটা হাতজোড় করেছিল। তখন শানু তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, ছেলেটা প্রায় দৌড়ে পাশের এক গলিতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

বেচারি নীতু। টাকার অভাবে এবছর কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।

শানু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "ওমি আর মিতা কোথায়?"

মায়ের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো মিতা, ভালো নাম স্মিতা আর ওমি মানে অমিত। ময়লা ফ্রক আর ময়লা হাফ-প্যান্ট।

"স্কুল নেই?" শানু শুধোল।

খিলখিল করে হেসে উঠল ওমি, "বারে, আজ যে রবিবার।"

মিতা গম্ভীরমুখে বলল, "দাদার রবিবার তো বিষ্যুদবারে হয় তাই খেয়াল নেই।"

আবার হাসল ওমি। মিতা গম্ভীর হয়েই রইল। হাঁপাতে হাঁপাতে সুরভিও হাসল। আর নীতুর গালে আবার টোল দেখা দিল।

সুরভি বলল, "চান করতে যা শানু, আমি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।"

হাসিমুখে শানু বলল, "হ্যাঁ মা।"

রাজু বাড়ি ফিরল। ডানহাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ, তার ভেতরে এক কেজি আলু, দুশো গ্রাম পেঁয়াজ, একশো রসুন, তিনশো গ্রামের একটা ঝিঙে আর আড়াইশো কাটা মাছ, কাতলা। এইটুকু বাজার। এতে আড়াই দিন খাবে তিনটি প্রাণী—সে, মা আর তার একুশ বছরের বিধবা বোন। আর এই বাজারের মতোই তাদের থাকার জায়গা—এইটুকু মানে দু'শো গ্রামের মত পাশাপাশি দুটো কামরা, একটা ঢাকা বারান্দা যেখানে রান্না হয় আর বাইরে একটা বাথরুম-কাম-পায়খানা।

"বাজার এনেছি পদ্ম।" রাজু ডাক দিল।

মায়ের কামরা থেকে বিধবা বোন বেরিয়ে এলো। নামেই পদ্ম কিন্তু দেখতে মোটেই তেমন নয়। শ্যামবর্ণা, রুগ্না। বিয়ের দু'বছর বাদেই স্বামী মারা যায়, শ্বশুরবাড়িতে জন্তুর মতো ব্যবহার করত বলে মা আর যেতে দেয়নি।

ভেতর থেকে একটা কাতরানির শব্দ ভেসে এলো, তার সঙ্গে প্রায় অস্ফুট 'হরি হরি' ডাক। পদ্ম ফিসফিস করে বলল, "আজ আবার মায়ের বেদনাটা কষ্ট দিচ্ছে।"

বাজারের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাইরে থেকেই মায়ের কামরায় উঁকি মারল রাজু। শীর্ণা মা দরজার দিকে পিঠ করে দু'হাতে পেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছে। লিভারের ক্যানসার।

রাজু সরে এসে বোনকে নিচু গলায় বলল, "ডাঃ রায়ের কাছে চললাম।"

শানু যাচ্ছে 'ভবতারিণী স্টোর্সে' তার পার্ট-টাইম চাকরি করতে। আজ রোববারের বাজার, দোকানে ভিড় বাড়তে শুরু করবে বিকেল পাঁচটার পর থেকে। কিন্তু আর কতদিন চলবে এইভাবে? আর যে চলছে না—

হঠাৎ ডানপাশে একটা মোটরবাইক সবেগে এসেই সজোরে ব্রেক কষল। যেন শানুর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। চমকে বাঁদিকে লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই সে গোবিন্দের হাসি শুনতে পেল।

"স্‌সালা—ভয় পেয়েছিলি?" গোবিন্দ হেসে বলল।

"নারে সালা, চমকে গিয়েছিলাম।"

গোবিন্দ একটা হোণ্ডা মেরামত করার পর রাস্তায় ট্রায়াল দিচ্ছে। পরনে তার সেই কালো প্যান্ট অরা শার্ট।

গোবিন্দ বলল, "কী কাণ্ড দেখ—প্রায় আড়াই বছর বাদে হঠাৎ দেখা হল, এখন বার বার দেখা হবে—"

"হোক না, তাতে মাশুল লাগবে না।"

"ওক্কে—কোথায় চললি?"

"আমার পার্ট-টাইম চাকরিতে—'ভবতারিণী স্টোর্সে'"—

"যা—কিন্তু আজ রাত ন'টায়, মনে আছে তো?"

"তিনকড়ি'র চা? হ্যাঁ, দেখা হবে।"

গোবিন্দ হোণ্ডাতে স্টার্ট দিয়ে সবেগে এগিয়ে গেল। শানুও পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ বাইকটাকে এ্যাবাউট টার্ন করে শানুর দিকে এগিয়ে এসে তার পাশ দিয়ে গিয়ে একটু থেমে আবার ঘুরল, শানুর চারদিকে একটা চক্কর মেরে আবার সবেগে এগিয়ে গিয়ে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে একটা হাত নেড়ে রাস্তার ডানদিকে চলে গেল।

একজন পথচলতি বয়স্ক লোক মন্তব্য করল, "এমনভাবে বাইক চালায়! মানুষ চাপা দেবে নাকি?"

ভবতারিণী স্টোর্স।

বিকেল সাড়ে চারটায় যখন একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোককে তার ছেলের জন্য একটা সার্ট বিক্রি করল তখন তার কলেজ-জীবনের এক সহপাঠী এসে সামনে দাঁড়াল। নাম দীপংকর, দীপু। এই এলাকাতেই থাকে, মাঝে মাঝে দেখা হয়। সে এখন এম. এ পাশ করেছে ইতিহাসে। বাড়ির অবস্থা খুব ভালো নয়, চাকরি খুঁজছে।

"এই শানু, একটা সস্তা অথচ ভালো পাঞ্জাবি দে তো, আমার মতো লম্বা একজনের জন্মদিনে উপহার দেব।"

"দিচ্ছি"—

গোটা চারেক রকমারি পাঞ্জাবি এনে দীপুর সামনে রাখল শানু।

"কোনো চাকরি পেলি?" শানু জিজ্ঞেস করল।

"কাল একটা ইন্টারভিউ আছে—টাটাদের এক ফার্মে।"

"গুড লাক!"

"থ্যাংকস্।"

"এখন কী করছিস?"

"টিউশনি—একটা —আর একটা দরকার।"

একটা পাঞ্জাবি কিনে দীপু চলে গেল দোকান থেকে। এম. এ পাশ, শিগ্গীরই একটি ভালো না হোক মন্দ-নয় চাকরি পেয়ে যাবে দীপু। কিন্তু শানুর কী হবে? শানু নামটার সঙ্গে মানু নামটার একটা ধ্বনিগত মিল আছে। শানু মানু শানু মানু। ও আমার মানু, মানু মানু, তুমি আমার 'শান', আমি তোমার শানু। কবিতা। হায় মানু, তোর দু'ঠোঁটের স্বাদ আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

'তিনকড়ির চা' লেখাটার ওপরে একশ' পাওয়ারের একটা বালব্ জ্বলছে। বারান্দাতেও একটা একশো। কিন্তু এখন রাত ন'টা বাজল, গ্রাহকদের সংখ্যা এখন মাত্র দু'জন। তাছাড়া গোবিন্দ আর রাজু, তারা দু'তিন মিনিট আগে এসে পৌঁছেছে, এখন শানুর জন্য প্রতীক্ষা করছে, সে এলে চায়ের অর্ডার দেবে। গোবিন্দের পরনে এখন একটা পাজামা আর হাফ শার্ট।

বটুক হাত গুটিয়ে একটা হাতলহীন লোহার চেয়ারে তার নবজাত ছেলের মুখের হাসিটার কথা ভাবছে, ফলে তার মুখেও একটু হাসি খেলছে। আর ফড়িং দরজাতে ঠেস দিয়ে শিবনেত্র হয়ে একটা পায়রার পালক দিয়ে কর্ণকুহরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

এমন সময়ে দ্রুতপায়ে ঢুকল শানু।

"এই যে শানু ওরফে শান্তনু ওরফে মহাভারতের এক মহান রাজা যে অপূর্ব সুন্দরী ও পদ্মগন্ধা সত্যবতীকে বিয়ে করেছিল—" গোবিন্দ অভিনয়ের ভঙ্গী করে বলল।

তিনকড়ি পা-নাচানো বন্ধ করে মৃদু শব্দ করে হাসল।

শানু হাতজোড় করে গোবিন্দকে বাধা দিয়ে বলল, "হে গোবিন্দ, তুমি এই ফক্কুড়ি বৃন্দাবনে কোরো, কলকাতার এই খালপাড়ে কোরো না, দোহাই দোস্ত্"—

"ঠিক হৈ স্‌সালে, বৈঠ্ যা।"

শানু বসল।

বটুকও হাসছিল নিঃশব্দে।

ফড়িংও কান থেকে পায়রার পালকটা বের করে একটু হাসল, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল তিনজনের দিকে তাকিয়ে, "এবার চা দেব?"

গোবিন্দ বলল, "নিশ্চয় দেবে, সঙ্গে একটা করে মেরী গোল্ড।"

রাজুকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

গোবিন্দ তাকে একটা ধাক্কা মেরে প্রশ্ন করল, "কী ভাবছিস রে রাজু?"

রাজু তার দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল, বলল, "রোজগার বাড়াতে হবে।"

শানু বলল, "ঠিক।"

গোবিন্দ বলল, "এবার তো আমাদের সরকার বলছে যে বেকারত্বের অবসান ঘটাবে।"

রাজু বলল, "তার মানে বেকারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে আর পশ্চিমবঙ্গে চাকরির ফ্যাক্টরি একটাও নেই"—

গোবিন্দ বলল, "নেই বললে তো চলবে না চলবে না"—

শানু বলল, "চলবে না চলবে না বললেও তো আকাশ-কুসুম ফুটবে না ফুটবে না"—

রাজু বলল, ‘‘তার মানে ‘হাম তো মহব্বৎ করেগা’ এসব ভালো ভালো ছবি দেখা যাবে না—হায়’’—

গোবিন্দ বলল, ‘‘হ্যাঁ, তার মানে টিভি, ফ্রীজ আর মোবাইল কেনা যাবে না—হায়’’—

চা আর মেরী গোল্ড এসে গেল। তিনকড়ি তখন মৃদু মৃদু হাসছে, হেঁকে বলল, ‘‘ফড়িং, সাইনবোর্ডের বাতিটা এবার নিভিয়ে দে।’’

‘‘দিচ্ছি।’’

চা খেতে খেতে গোবিন্দ ফিসফিস করে বলল, ‘‘মাইরি, চায়ে তো আর দুঃখ ভোলা যায় না। একদিন মাল খেতে হবে। যতক্ষণ নেশা থাকবে দুঃখ কিছুটা ফুড়ুৎ হবে।’’

রাজুও গলা নামাল, ‘‘যা বলেছিস। কীরে শানু?’’

শানু বলল, ‘‘আমি পাঁচ ছ’মাস আগে একবার এইটুকু খেয়েছিলাম।’’

‘‘ভালো লাগেনি?’’ গোবিন্দ চোখ নাচাল, বলল, ‘‘ঠিক আছে, আমিই খাওয়াব তোদের, শিগ্গীরই।’’

ক’দিন পরে।

গ্যারেজ থেকে বাড়ি ফিরছে গোবিন্দ। ক্লান্তিতে চুর-চুর হয়ে।

গোবিন্দের বাপের নাম শিবদাস দত্ত। একটা মার্চেণ্ট অফিসে কেরানির কাজ করত, পাঁচ বছর আগে রিটায়ার করার পর থেকেই ধনুক হতে আরম্ভ করেছে। বয়স এখন একষট্টি কিন্তু মাথার সব চুল বকের পালক হয়ে যাওয়ায় মনে হয় বাহাত্তর। সারা দিনে ও রাতে রোজ এক বাণ্ডিল বিড়ি ফোঁকে আর প্রায়ই বউ বিমলা’র সঙ্গে ঝগড়া করে। বিমলা’র বয়স তুলনায় কম কারণ শিবদাস যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে উপলব্ধি করল যে একটি স্ত্রীর দরকার তখন বিমলার বয়স মাত্র সতেরো। তাই এখন অকালে বুড়িয়ে-যাওয়া শিবদাসের পাশে বিমলাকে মনে হয় ‘বৃদ্ধস্য’ তরুণী নয়, ‘যুবতী’ ভার্যা। তাছাড়া দারিদ্র্য আর অভাব-জনিত অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কামনাবাসনার তাড়নায় স্বামীস্ত্রী’র ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে।

গোবিন্দ বাড়িতে ঢুকতেই বিমলা ডেকে বলল, ‘‘অ’ বাবা গোবিন্দ, গণেশের খুব জ্বর এসেছে রে।’’

গোবিন্দের অনেক বছর বাদে গণেশের জন্ম। তার বয়স এখন পনেরো, তার দু’বছর বাদে শেষ সন্তান কার্তিক, তার বয়স এখন তেরো। দু’জনেই স্কুলে পড়ে।

গোবিন্দ তাদের কামরাতে ঢুকল, পেছন পেছন বিমলাও এসে দাঁড়াল। শিবদাসও বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দরজার গোড়ায় এলো।

গোবিন্দ ডাকল, ‘‘ওরে গণেশ’’—

গণেশ জবাব দিল না, তার চোখ বোজা, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোবিন্দ তার কপালে হাত রাখল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গণেশ, তারই ঘোরে বোধহয় অচেতনবৎ পড়ে আছে সে।

গোবিন্দ মাকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘জ্বর দেখা হয়েছে?’’

বিমলা জবাব দিল, ‘‘তোর বাপের মাথায় সে কথাটা আসেনি’’—

শিবদাস বলল, ‘‘তোর মায়েরও তো একটা মাথা আছে’’—

গোবিন্দ বিরক্তির সুরে বলল, "তোমরা থামো, আমিই এখন দেখছি, জ্বর বেশি মনে হচ্ছে—একশ' একের ওপরে হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।"

বাপ এগিয়ে এলো, "থার্মোমিটারটা কোথায়?"

গণেশের খাটের পাশেই দেয়ালের র‍্যাকে হাত দিয়ে খুঁজতে গেল শিবদাস কিন্তু হাতটা দেখতে পেল খাটের সামনেকার ছোট্ট টেবিলটার ওপরে, যেখানে একটা গ্লাসে জল ঢাকা দেওয়া ছিল। সেই গেলাসটা শিবদাসের হাতের ধাক্কাতে পড়ে গেল।

"আহাহা—দিল জলে থৈ থৈ করে"—বিমলা চেঁচাল।

শিবদাস অপরাধীর ভঙ্গীতে বলল, "ছিছি—চোখের দৃষ্টি"—

গোবিন্দ একটা সম্ভাব্য কথা কাটাকাটিকে বন্ধ করার জন্য বলল, "ঠিক আছে এখনো বান ডাকেনি"—সে থার্মোমিটারটা খুঁজে বের করল।

সেটাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গোবিন্দের নতুন করে চিন্তা আরম্ভ হল বাপের জন্য। শিবদাসের দুটো চোখেই ছানি। বাঁ চোখেরটা যে কোনো সময়ে ফাটতে পারে। হাসপাতালে বলেছে তিন সপ্তাহের আগে বেড পাওয়া যাবে না। অন্য কোনো ডাক্তারের ক্লিনিকে পাঁচ ছ'হাজার টাকার কমে হবে না। সা-লা।

পরদিন।

মোটরবাইকের স্পীডটা বাড়িয়ে দিল গোবিন্দ। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল হল। সা-লা, অনেক, অ-নে-ক টাকা চাই। আজ একটা ইয়ামাহা মেরামত করেছে সে, তারই ট্রায়াল দিতে বেরিয়েছে। তার জন্য দশ-পনেরো মিনিটই যথেষ্ট কিন্তু আজ সে একঘণ্টা ধরে চালাচ্ছে। হাওয়া ফুঁড়ে যখন মোটরবাইক ছোটে তখন সে এক ধরনের তৃপ্তির স্বাদ পায়।

আরো স্পীড বাড়াল গোবিন্দ, এঁকেবেঁকে, এই একজনকে চমকে দিয়ে, সামনের মারুতিটাকে পাশ কাটিয়ে পাগলের মতো ইয়ামাহাটাকে চালাল সে।

লোকেরা গাল পাড়ে, চেঁচায়।

"এই স্টুপিড"—

"পুলিশে রিপোর্ট করব।"

"আর একটু হলেই চাপা পড়তাম মশাই—শালা"—

বলতে না বলতেই বাইকের স্পীড একটু কমিয়ে, ইউ-টার্ন মেরে গোবিন্দ বাইক হাঁকাল গালিগালাজকারীদের মাঝখান দিয়ে, পাশ দিয়ে, মুখে তার এক তৃপ্তির হাসি।

ভট্ ভট্ ভট্‌ভট্—অবশেষে লাহিড়ীজ গ্যারেজে গিয়ে ব্রেক কষল সে।

সুশীল লাহিড়ী—তার টেবিলের ওপিঠে বসেছিল, গোবিন্দকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল, কোমরে দু'হাত তুলে ডাকল, "এ্যাই গোবিন্দো-ও-ও"—

"বলুন"—বলে গোবিন্দ এগোল দু'পা লাহিড়ীর দিকে।

সুশীল লাহিড়ী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, ঐ মোটরবাইকটা একজন গ্রাহকের, তোর বাপের নয়। আর ট্রায়ালের নামে শহরময় ঘুরে আমার পেট্রল ওড়াচ্ছিস!"

গোবিন্দের মনে হল যেন তার সামনে একজন কংস দাঁড়িয়ে আছে, সেও কোমরে হাত দিয়ে কটমট করে তাকাল।

লাহিড়ী সতেজে বলল, "এ্যাই, আমার দিকে কোমরে হাত দিয়ে তাকাবি না—

খবর্দার"—

দু'তিন সেকেণ্ড জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল গোবিন্দ, কিন্তু ধীরে ধীরে কোমর থেকে দু'হাত নামিয়ে মাথা নিচু করল। অন্য মেকানিকেরা ভয়ে ভয়ে দেখছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর গোবিন্দ মনে মনে গজরাতে লাগল—সালা, দেখে নেব, দেখে নেব, দেখে নেব। কিন্তু গোবিন্দ জানে না কাকে দেখে নেবে। না, লাহিড়ীকে নয়। তার সেই শত্রু যে কে সে এখনো জানে না।

দু'দিন পরে।

শানু মিণ্টুকে পড়াচ্ছে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত রোজ পড়ায় তাকে। মিণ্টুর বয়স দশ, শানুকে খুব ভক্তি করে। তার বাবা দিলীপ দাস স্টেট ব্যাংকের একটি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। তার দোতলার ফ্ল্যাটটি বেশ বড়, খুব ছিমছাম, ঝকঝকে। টিভি আছে, ফ্রীজ আছে, ওয়াশিং মেশিন আর মাইক্রোওয়েভ আছে, দেয়ালে ভালো ভালো দেশী বিলিতি পেণ্টিং ঝুলছে, মায় একটা ছোট্ট স্প্যানিয়েলও আছে। এইরকম ফ্ল্যাটে যদি সে জন্মাত কিংবা এমনি একটা ফ্ল্যাটের উত্তরাধিকারী হতো তাহলে সে মানুকে—আচ্ছা, মানু কি তাকে ভালোবেসেছিল? সেই একটা চুমু মানে ভালোবাসা নয়। তাকে ভালোবাসলে মানু তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে পালাবার চেষ্টা করত না সেদিন। তাহলে একবছর আগেকার সেইদিনটা, সেই মুহূর্তটাও তো সত্যি। শানুর চোখের সামনে সেই দিনটা, সেই মেঘমেদুর অপরাহ্ন বেলাটি সিনেমার ছবি হয়ে চলতে লাগল। সেদিন রাস্তায় প্রবল বর্ষণের ফলে জল জমেছিল। মেঘলা আকাশের ফলে আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল, মনটা কেমন যেন উদাস মনে হচ্ছিল শানুর। হঠাৎ তার মানুকে দেখার ইচ্ছে হল। মানুর দাদা বিনায়ক, বিনু, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে সহপাঠী ছিল এবং তাদের খুব ভাব হয়েছিল। দুজনেই কয়েকবার আসাযাওয়া করত। বিনুরা বড়লোক হলেও তার বন্ধুত্বে শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। একসময়ে শানুর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, বিনু বি. এ ও ল' পাশ করে কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছে তবু তার বন্ধুত্বের সুর পালটায়নি। বিনুর বাবা মাকে শানু কাকাবাবু আর কাকিমা বলে ডাকে, তাঁরাও স্নেহ করে তাকে। যখনি ওদের বাড়ি যেত মানুর সঙ্গেও দেখা হতো, কথা হতো। মানুকে দেখলেই তার বুকে একটা তোলপাড় হতো আর মনে হতো যে মানুর চোখ যেন চকচক করছে, তাকে দেখলেই মিষ্টি একটু হাসি দেখা দিত তার মুখেচোখে।

সেদিন মানুই দরজা খুলল।

"বিনু আছে?" শানু হেসে জিজ্ঞেস করল।

মানুও প্রত্যুত্তরে প্রথমে একটু হাসল, পরে বলল, "নেই, কেউ নেই এখন, শুধু আমি আছি।"

শানু বলল, "ওঃ, যাই তাহলে।"

বলে সে ঘোরবার আগেই মানু বলল, "কেন, বোসো না একটু, কষ্ট করে এলে। অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলতে যদি তোমার ভালো না লাগে।"

শানু লজ্জা পেয়ে বলল, "দূর কী যে বলিস।"

বলে সে ভেতরে এলো। মানু দরজা বন্ধ করে ঘুরে শানুর দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর।

শানু বসল না, মানুর চাউনিকে মাপজোক করতে করতে একটা জানালার ধারে গিয়ে বাইরের জলমগ্ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইস্, রাস্তায় কত জল জমেছে!"

"হ্যাঁ, কী জোর বিষ্টি হল!" বলতে বলতে মানু এসে শানুর পাশে দাঁড়াল। তার এলো চুল থেকে একটা সুঘ্রাণ ভেসে এলো—যেন মানুরই গায়ের গন্ধ।

বাইরে একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সুসজ্জিতা মহিলা তার আটবছরের স্কুল ফেরত ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার ভিজে জুতো দিয়ে জল ছেটায় চলতে চলতে। মা বকে কিন্তু ছেলেটি হাসে।

মানুও হাসে শব্দ করে, হাসতে হাসতে আরো একটু এগিয়ে জানালা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই তার গা শানুর গায়ে লাগে। স্পর্শ। যেন তড়িৎ-প্রবাহ।

"কি মজা, না?" মানু গলা নামিয়ে বলল।

শানুও নিচু গলায় বলল, "হ্যাঁ"।

মানু আরো গলা নামাল, "আমারো ইচ্ছে করছে জলের ভেতর দিয়ে চলতে।"

শানুও একধাপ নীচে নামাল গলা, বলল, "চল, চলিগে।"

হিহিহি, হাসল মানু, হাসতে হাসতে যেন ঢলে পড়ল শানুর দিকে আর কী যেন হল, দু'হাতে সে শানুর দু'বাহু চেপে ধরল হাসতে হাসতে। শানুও হাসতে লাগল। হঠাৎ দুজনেরই হাসি বন্ধ হয়ে গেল, দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুজনেরই মুখ পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল। মানুর ঠোঁটে শানুর ঠোঁট লাগল। মানু জড়িয়ে ধরল শানুকে। শানুও। তারপরে এক স্তম্ভিত আশ্চর্য কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই তাকে ঠেলে মানু ফিসফিস করে বলল, "ছাড়ো।"

শানু ছেড়ে দিল।

মানু সলজ্জভাবে তাকাল, বলল, "চা খাবে?"

"খাবো।"

কিন্তু মানু মাথা ঝাঁকাল, একপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "না না, তুমি এবার যাও শানুদা, প্লীজ, প্লীজ"—

বলে সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে শানু বেরিয়ে গেল। পায়ের চপ্পল হাতে নিয়ে জলের ভেতর দিয়েই হেঁটে বাড়ি ফিরল সে, কিন্তু জল ছিটোতে আর পারল না।

"শান্তনুবাবু"—

শানুর অতীত-চারণ শেষ হয়ে গেল। সামনে মিণ্টুর বাবা দিলীপ দাস।

শানু উঠে দাঁড়াল।

দিলীপ দাস ছেলেকে বলল, "মিণ্টু, তুই একটু ভেতরে যা।"

মিণ্টু ভেতরে গেল।

দিলীপ দাস জানাল যে শান্তনুকে তার টিউটর হিসেবে এখন দরকার নেই। একমাসের মাইনে আগাম দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিল দিলীপ দাস। কোনো কৈফিয়ৎও দিল না।

বাড়ি ফিরে স্তব্ধ হয়ে প্রায়ান্ধকার কামরায়, হাতলহীন কাঠের চেয়ারটাতে বসে রইল শানু।

"শানু এসেছিস?" সুরভি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ মা।"

"ওভাবে বসে আছিস যে? চা খাবি?"

"না। একটা খবর আছে মা।"

হাঁপাতে হাঁপাতে সুরভি তাকাল ভালোভাবে, "কী খবর?"

"মিঃ দাসের বাড়ির টিউশনিটা গেল আজ। আসবার আগে মিণ্টু লুকিয়ে জানাল যে আমার এক বন্ধু দীপু এখন থেকে পড়াবে তাকে। সে এম. এ পাশ।"

সুরভি হাসল, বলল, "ভাবিস না, ঈশ্বর আছেন। একূল ভাঙলে ওকূল গড়ে ওঠে। আজ থেকে নীতু একটা কাজে যোগ দিয়েছে। টাকার অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারল না, পরের বছর যাতে পড়তে পারে তার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।"

"কী কাজ মা?"

"সমরেশ সরকারের ছোট দুই বাচ্চাদের দেখাশোনা করা। সকাল সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত। সাতশো টাকা করে দেবে।"

"সমরেশ সরকার, এম. পি?"

"হ্যাঁ। তুই ভাবিস না।"

সুরভি চলে গেল রান্নাঘরের দিকে আর মায়ের নিষেধ-সত্ত্বেও শানু ভাবতে লাগল। সমরেশ সরকারের বয়স পঁয়তাল্লিশ, পাড়ার লোক বলে সে খুব সদাশয় ও পরোপকারী। খালি একটা ব্যাপার নিয়ে লোকেরা একটু কানাঘুষো করে। সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সরকার নানা ফুলের মধু খেতে ভালোবাসে। সে মানসনেত্রে দেখতে পেল যে সরকার নীতুর হাসি আর টোল দেখে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে একটা হিংস্র লালসাতুর শ্বাপদের মতো এগোচ্ছে। না না—সা-লা—আজ মদ খেতেই হবে। গোবিন্দ তাকে ও রাজুকে আজ খাওয়াবে বলেছে।

তখন সন্ধ্যে পার হয়েছে।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে গোবিন্দ বলল, "আয় শানু।"

ভেতরে ঢুকে শানু দেখল যে রাজুও এসেছে কয়েক মিনিট আগে।

শানু হেসে বসল, জিজ্ঞেস করল, "গোবিন্দ, আমাদের আড্ডা কোথায় হবে?"

গোবিন্দ হাসল, "এই গরীবখানাতেই হবে। কারণ কাল আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে আর বাবা মা ও ভাইয়েরা সেখানে গেছে আজ বিকেলে, বিয়ের পরদিন ফিরবে। সুতরাং আমরা আমাদের মতো গাইতে পারব—তবে খুব চিল্লিয়ে নয়"—

রাজু বলল, "হিপ্ হিপ্ হুররে"—

তিন বন্ধু হাসল।

দরজা বন্ধ করে দিল গোবিন্দ। তারপরে মেঝেতে একটা বিবর্ণ শতরঞ্জি বিছিয়ে বসল ওরা। তাদের মাঝখানে একটা মদের বোতল। দুটো থালায় চানাচুর ডালমুট আর চিনেবাদাম। একটা বড় বাটিতে সরষের তেলে মাখা মুড়ি তার পাশে একটা প্লেটে পেঁয়াজকুচি আর কাঁচা লঙ্কা।

গোবিন্দ বলল, "তোরা আড্ডা মারতে আসবি মাকে বলেছিলাম তাই মা সবার জন্য লুচি আর ঘুগনি রেখে গেছে। নেশার শিখরে পৌঁছে পেটভরে খাবি।"

শানু বলল, "ধন্য গোবিন্দ—রাধাগোবিন্দ তোকে দীর্ঘায়ু আর চিরসুখী করুন।"

হিহিহিহি—হাসল তিনজনে।

"জয় গণেশ"—বলে বোতলটা খুলল গোবিন্দ, বলল, "দিশি বটে কিন্তু বিলিতির চেয়েও ভালো।"

তিনটে গেলাসে মদ ঢালল গোবিন্দ, তাতে জল মিশিয়ে বলল, "নে, তোল গেলাস।"

গেলাস তুলে ঠুং ঠাং শব্দ করে অপর দুজনের গেলাসের সঙ্গে ঠুকে বলল, "চীয়ারস্"—

"চীয়ারস্"—

"চীয়ারস্"—

শানু এই দ্বিতীয়বার মদ খাচ্ছে। বিশ্রী, ঝাঁঝালো তেতো তেতো স্বাদ। কিন্তু এক মিনিটেই তা জানান দিল।

রাজু বলল, "ভালোরে গোবিন্দ।"

গোবিন্দ বলল, "থ্যাংক ইউ। কীরে শানু? কেমন?"

শানু বলল, "জ্বলছে মাইরি।"

"নেশা হলে জ্বালা কমে যাবে।" বলল রাজু।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সবাই মুড়ি খায়, ডালমুট চিবোয়। গল্প করে। এলোমেলো।

শানু বলল, "এখন নেশা হতে আরম্ভ করেছে রে"—

হিহিহি—হাসল তিনজন।

রাজু বলল, "মাইরি অনেকদিন সিনেমা দেখিনি, এবার চল একদিন তিনজনে।"

গোবিন্দ মাথা দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁরে দেখব—'লেটেস্ট' হিট ছবি—'হাম তো মহব্বৎ করেগা'—"

রাজু মেঝেতে চাপড় মেরে সুর করে বলল, "জরুর করেগা, আলবৎ করেগা"—

মানু'র কথা মনে পড়ল শানুর। সে কিছু না বলে শুধু হিহি করে হাসল। হাসতে হাসতেই মানুর কথা স্মরণ করল। এখানে আসার আগে হঠাৎ মাথায় ভূত চেপেছিল, তার মানুকে একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। বাড়িতে বিনু ছিল না, তার বাবা তখনো ফেরেননি, ছিল শুধু বিনুর মা আর মানু।

বিনু'র মা সস্নেহে তাকে বসতে বলে চা করতে গেল, মানুও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, সরে গেল শানুর সান্নিধ্য থেকে। খানিকবাদে মানুই চা আর দুটো বিস্কুট এনে তার সামনে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে বিনুর মা ফিরে এলো। মানু আবার চলে গেল ভেতরে। চা তেতো হয়ে গেল, বিনুর মা দু'একটা কথা বললেন। কোনোমতে চা গিলে শানু উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলি মাসিমা।"

বিনুর মা বলল, "আচ্ছা বাবা। বিনুর সঙ্গে দেখা হল না, আবার এসো।" তখুনি শানু দেখল যে ভেতরের ঘরের দরজার গোড়ায় মানু দাঁড়িয়ে আছে। তার ভ্রূকুটি-কুটিল চাউনি যেন শাসিয়ে বলল, "খবর্দার, আর এসো না এখানে।" বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে মনে মনে বলল শানু, "না মাসিমা, আর কোনোদিন আসব না।"

"এই শানু, কী ভাবছিস রে?" গোবিন্দের গলা শুনতে পেল শানু।

সে বলল, "কিচ্ছু না, ভাবছি যে নেশাটা ভালোই তো।"

"আরে দূর, আমি কী জিজ্ঞেস করছি তা কি কানে গেছে তোর?"

"কী জিজ্ঞেস করছিস?"

"প্রেম করেছিস কখনো?"

"না, এখনো করিনি। তুই? তুই প্রেম করেছিস?"

গোবিন্দ মাথা ঝাঁকাল, "নারে, ওসব বিলাসিতার সময় নেই আমার আর আমি লুচ্চাও হবো না। আমি ভালো রোজগার করতে পারলে বিয়ে করব, না পারলে বিয়ে করব না"—

রাজু বলল, "কিন্তু প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করবি কী করে?"

গোবিন্দ নেশাজড়িত কণ্ঠে হেসে বলল, "প্রকৃতিকে গুলি মারব, প্রাণায়াম করব"—

হিহিহি। তিনজনে হাসে, নেশার ঘোরে হাসে।

শানু বলল, "খুব নেশা হয়েছে মাইরি"—

"দূর এক পেগ তো খেলি সবে, আরো দু'পেগ গেল্"—

"দে—দে"—

রাজু বলল, "মালটা ভালোইরে গোবিন্দ তবে বিলিতির নেশা আরো ফুরফুরে"—

গোবিন্দ দুম করে মেঝেতে এক কিল মেরে বলল, "কিন্তু তার জন্য টাকা চাই"—

রাজু চেঁচাল, "হ্যাঁ—টাকা চাই—নইলে মা মরবে—"

গোবিন্দ মাতাল হয়েছে, বলল, "হ্যাঁ টাকা চাই—নইলে বাবার ছানি ফাটবে"—

শানুর গলা জড়িয়ে আসছে, "হ্যাঁ, টা-কা চাই-ই চাই—নইলে আমার বোনটা ঝিগিরি করবে"—

গোবিন্দ বলল, "হ্যাঁ টাকা চাই কিন্তু কীভাবে পাব টাকা? বল্ বল্"—

শানু বলল, "যা-দু বিদ্যে—? গুপ্তধন? না লুট?"

রাজু উঠে দাঁড়াল, "সাব্বাশ—জব্বর বলেছিস সালা, লুট—লুট—"

গোবিন্দও উঠে দাঁড়াল, একটু টলতে টলতে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস ব্যাটা শানু—সারাজীবন কেঁচোর মতো বেঁচে থাকব? কখ্খনো না—"

শানুও উঠে দাঁড়াল, দুলে দুলে বলল, "কভি নেহি—কভি নেহি—" তারপরে সুর করে বলল, "বাঁচার মতো বাঁচো নয়ত মরো মরো মরো"—

গোবিন্দও সুর করে বলল, "হ্যাঁ মরব নিশ্চয়—মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব—কিন্তু মরার আগে একদিনকা সুলতান হয়ে মরিবো-ও—"

শানু তিন পেগ খেয়েছে, টলতে টলতে নাচতে লাগল, নাচতে নাচতে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা লুটিবো-ও, লুটিবো-ও-ও—"

গোবিন্দ বলল, "বল্ মায়ের দিব্যি—আমরা লুটবো—"

রাজু বলল, "মায়ের দিব্যি—লু-ট-বো—"

শানু বলল, "মায়ের দিব্যি, লুটবো-ও-ও—লুটবো-ও-ও—এরপর যে ক'দিন বাঁচব একটু মজা করে বাঁচবো-ও-ও—"

তিন মাস বাদে। রাত সাড়ে সাতটার সময়।

'সাহা পেট্রল স্টেশনে'র ষাট বছরের মালিক তখন নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিল। বাইরে সদর রাস্তা দিয়ে গাড়ি বাস ছোটাছুটি করছে। রাজপথ থেকে পাম্পিং স্টেশনটা প্রায় একশ গজ দূরে। বড় বড় কাঠের পোল দিয়ে ঘেরাও করা, তাতে আটফুট উঁচু কাঁটাতার লাগানো। কম্পাউণ্ডে গোটা চারেক আমগাছ আছে, আপিসঘরটার দু'পাশে কেয়ারি করা মরশুমি ফুলের বাগানমতো আছে। তাছাড়া পেট্রল পাম্প দুটো।

হঠাৎ জগদীশের সামনে একটা লোক এসে দাঁড়াল। হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট পরিহিত, কাঁধে

একটা ব্যাগ, চোখের নীচে, নাকমুখের ওপর দিয়ে ঘাড়ের দিকে একটা বড় রুমাল বাঁধা। লোকটার হাতে একটা রিভলবার।

লোকটা রিভলবার উদ্যত করে কর্কশ অথচ চাপা গলায় বলল, "হাত ওপরে তোলো—"

জগদীশ সাহা হকচকিয়ে বলল, "মানে, কে তুমি?"

লোকটা বলল, "তোর বাপরে হারামজাদা"—কথায় পশ্চিমা টান, হয়ত অবাঙালি হবে, বলল, "হাত উপ্পরে তোল্—চিল্লালে কুত্তার মতো মরবি—"

জগদীশ সাহা দু'হাত ওপরে তুলল, বলল, "মেরো না বাবা।"

বাইরে দু'জন কর্মচারী আটত্রিশ বছরের রমেশ বোস আর পঞ্চাশ বছরের ত্রিলোকী সিং একটা মিটারের পাশে বসে অসমাপ্ত চায়ের গেলাসের সামনে গৌর নিতাই হয়ে বসে ছিল। তাদের সামনে ট্রাউজার ও কুর্তা পরিহিত, নাকে মুখে রুমাল বাঁধা দ্বিতীয় একজন, হাতে উদ্যত একটা দেশী পিস্তল। আর তৃতীয় আরেকজন, সে পাজামা শার্ট পরিহিত, সেও একটা দেশী পিস্তল উদ্যত করে রেখেছে বাকি দু'জন কর্মচারী চল্লিশ বছরের সুখদেও বর্মা এবং পঁয়ত্রিশ বছরের নির্মল নস্করের ওপর, তারা তখন সবে খৈনি মুখে দিয়েছে এমন সময়ে প্রত্যেককে দু'হাত ওপরে তুলতে হল।

ভেতরে, ক্যাশবাক্স থেকে পাঁচশো, একশো, পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোট ব্যাগে পুরল প্রথম লোকটি। তার মনে হল চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা নিশ্চয় হবে, বেশিও হতে পারে।

রিভলবারটা তাক করে সেই লোকটা হুকুম করল," আরে হারামজাদা, বাহর নিকল—জলদি—"

জগদীশ সাহা ইষ্টনাম জপ করতে বাইরে বেরিয়ে এলো, তার পিঠে ঠেকে আছে রিভলবারটা।

জগদীশ সাহাকে নিয়ে গিয়ে রমেশ এবং ত্রিলোকীর পাশে দাঁড় করাল প্রথম লোকটা।

"দাঁড়াও য়াঁ'পর"—

দ্বিতীয় লোকটি সুখদেও আর নির্মল নস্করকে পিস্তলটা নেড়ে হুকুম করল, "আরে তু লোগভি ইনকে বাজুমে খড়া হো যা"—

তারা তাই করল।

"খবরদার হাত উঁচা রাখ্।"

পাঁচজনেই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে রইল।

প্রথম ও তৃতীয় লোকটি তখন ছুটে দশহাত দূরে রাখা হিরো হোণ্ডাতে বসল। সেটার ইঞ্জিন চালুই ছিল।

প্রথম লোকটা ব্যাগ কাঁধে হ্যাণ্ডেল ধরে বলল, "আব আ যা দো নম্বর ইয়ার"—

তার পেছনে বসা তিন নম্বর লোকটি তার পিস্তল উদ্যত করে রইল জগদীশ সাহাদের দিকে, তখন দুনম্বর লোকটা ছুটে এসে হোণ্ডাতে তিননম্বরের পেছনে বসল।

হিরো হোণ্ডাটা তখন ছিটকে বেরিয়ে গেল তার তিন লুটেরা আরোহীদের নিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

জগদীশ সাহা এবং তার লোকেরা তখন চেঁচাতে লাগল, "লুট-লুট-লুট লিয়া-ধর-ধর-ধর"—

# আর্সেনিক ভূমি

## স্বপ্নময় চক্রবর্তী

অসুস্থ অবস্থায় বাবা বলেছিলেন দেশের জন্য কিছু করিস। এখানে 'দেশ' বলতে ভারতবর্ষকে বোঝাতে চাননি বাবা, একটা ফেলে আসা গ্রাম বোঝাতে চেয়েছিলেন, নাম বাকিলা, বাদুড়িয়া থেকে কাঁচা রাস্তায় চার মাইল, গোমতী নামে একটা বাঁওড় আছে, যেখানে ইছামতীর প্রাচীন জল আটকে রয়েছে। ইছামতী ওর ইচ্ছামতো সরে গেছে দূরে, পুরোন খাতে জল রয়ে গেছে কিছু, নোনা জল, খাওয়া যায় না, কিন্তু পাখি আসে। বাকিলা গ্রামেই আমার জন্ম, আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। বাকিলার গোমতী বাঁওড়ে সাঁতার শিখেছি, বাকিলার কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছি, বাকিলার প্রাইমারি ইস্কুলে পড়েছি, হাইস্কুল ছিল না, সুন্দরপুরে যেতে হ'ত। আম পেড়েছি, মাছ ধরেছি, ঢাক বাজিয়েছি, কত সুন্দর সব স্মৃতি, আবার অনেক অপমানও লেগে আছে। নমঃশুদ্দুর ছিলাম কিনা।

দেশের বাড়িতে যাইনি বহুকাল। মনে হয় গত তিরিশ বছর যাইনি। আমেরিকা থেকে প্রতিবছরই একবার আসি, কোনো কোনো বছর দুবারও। এত টাইট স্কিডিউল থাকে যে বাকিলাতে যাওয়া হয় না। দেশের বাড়ির সঙ্গে বাবারও সম্পর্ক নেই বহুকাল। তবু দেশে এলে দেশের বাড়ির কথা হয়। বাবা খুশিতে বলেন—গ্রামে, বুইলি, ইলেকটিক এয়েলো। কিম্বা শুনিচিস, রোড হয়ে গেল, পাকা রোড। বাদুড়ে থেকে বাকিলা এখন পাকা রোড। শুনচি বাসও চলবে। বাবার খুব আনন্দ হয়। যদিও আমাদের ওখানে আর জমিজমা নেই বহুদিন। আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে খুব একটা সুসম্পর্কও নেই। আসলে আমরা হচ্ছি চাষি। আমাদের খুব বেশি জমিজমাও ছিল না। আমার বাবা নিজে হাতে জমি চাষ করতেন। আমার দাদুর নাম ছিল ভোলানাথ মণ্ডল, অন্যের জমিতে চাষ করতেন। উনি নাকি গাছ-লতা-পাতা শেকড়ের নানারকম ইউজ জানতেন। বাড়িতে হার্বাল মেডিসিনের চাষও করতেন। বামুন কায়েতরা না এলেও অন্যরা মানে আমাদের মতো ছোট জাতের লোকেরা দাদুর কাছে আসতো। দাদু নাকি খুব একটা পয়সাকড়ি নিতেন না। কোনো ডিম্যাণ্ড ছিল না। জমিদারের নায়েবের অর্শ সারিয়ে দিয়ে দুবিঘে চাকরান জমি পেয়েছিলেন। তাতেই দাদুর খ্যাতি হয়ে যায়। অনেকেই দাদুকে ভোলা কোবেরেজ বলতো। সবাই এটা ঠিকভাবে নিত না। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি কালে কালে কী হ'ল। চামচিকেও পাখি হ'ল, ভোলাও কবিরাজ হল। আমার বাবা ছিলেন দাদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দাদু এরপর আরও জমি বাড়িয়েছিলেন। জলপড়া-টলপড়া দিতেও শুরু করেছিলেন। বাঁজা গরু ছাগলের গাভীন হবার জন্য, স্বামী নেয় না এমন মেয়েছেলের জন্য স্বামী বশ করার জন্য নানারকম তুকতাকও শুরু করেছিলেন। ভোলা কবরেজ আস্তে আস্তে ভোলা ওঝা হয়ে ওঠে। স্বামী নেয় না, এমন এক মহিলা আমার দ্বিতীয় ঠাকুর্মা হলেন। সেই ঠাকুর্মাকে আমি দেখেছি, কিন্তু আসল ঠাকুর্মা যিনি আমার বাবার মা, তাকে অমি দেখিনি কোনোদিন, যে আম গাছটায় ঠাকুর্মা গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিলেন সে গাছটা আমি দেখেছি। ঐ গাছের আম আমরা খেতাম না। গাছটাকে বলে

ফাঁসের গাছ। ঠাকুর্মা গলায় দড়ি দিয়েছিল ফাল্গুন মাসে। তখন নিশ্চই আমগাছে বকুল ছিল, কোকিলও ডাকছিল...

আমার বাবার নাম নব মণ্ডল। ঠিক করে বলতে গেলে নবকুমার মণ্ডল। আমার পাসপোর্টে ঐ নামই আছে। ডেথ সার্টিফিকেটেও। নব মণ্ডলের ছেলে আমি রামপ্রসাদ মণ্ডল। পাসপোর্টে তাই আছে, কিন্তু আমেরিকাতে আমি র‍্যাম মেনডাল। আমি সুন্দরপুর হাইস্কুল থেকে স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করি। র‍্যাংকও করেছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই। স্কলারশিপ পাই। স্কলারশিপের টাকা ছাড়াও টিউশনির টাকা ছিল। হোস্টেলে থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে দেশে পাঠাতাম। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতাম। ওখানেই শুনি নব আজকাল লবাব।

আমার দাদুর ছিল ছয় ছেলে। প্রথম পক্ষের ছেলে আমার বাবা। দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচ কাকা। তার মধ্যে একজন বোবা। দাদুর মৃত্যুর পর জলপড়ার ব্যাপারটা একমাত্র ঐ বোবা কাকুরই ক্লিক করেছিল। আই. এস. সি পাশ করে শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হই। আমার বাবার তখন খুব খারাপ অবস্থা। আমার আরও দুটো বোন, মা মিলে চারজনের সংসার, কিন্তু ইনকাম নেই। জমি অনেক ভাগ হয়ে গেছে, যেটুকু জমি বাবা ভাগে পেল তাতে চলে না। বাইরেও কাজ পায় না। কে কাজ দেবে, ছেলে ইনজিনিয়ার হ'তে চলেছে না? হোস্টেলে যখন পেটপুরে খেতাম, বোনদের কথা ভাবতাম, মায়ের কথা ভাবতাম। হোস্টেলে থাকতে হ'ত বলে বাইরে টিউশনি করতে পারতাম না। স্কলারশিপের টাকায় আমার হয়ত চলে যেত, কিন্তু হবু ইনজিনিয়ারের বাপ-মাকে না খেয়ে থাকতে হ'ত। সে এক দিন গেছে বটে। একদিন মা বলেছিলেন—তোর তো অংকে খুব মাথা। ঐ সব ইনজিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে সুন্দরপুরের হাই ইস্কুলে একটা মাস্টারি নিয়ে নে। আমি বলতাম আর অল্প কটা দিন অপেক্ষা করো মা। মা বলতেন এখনো কতগুলো দিন...। হোস্টেল পালিয়ে টিউশনি করেছি। যা পেরেছি বাড়িতে পাঠিয়েছি।

পাশ করেই চাকরি পাই। দুর্গাপুরে। কোয়ার্টার পেয়েছিলাম। আমার ফ্যামিলিকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসি আমার কোয়ার্টারে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল স্কলারশিপ পাবার পর। ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টারস ডিগ্রি করার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম। ওদের আবার দেশে পাঠিয়ে দেব? দেশে যাবার কথা উঠতেই বোনেরা কেমন ফিউজ হয়ে যেত। ওরা তো ততদিনে ইউনিফর্ম পরে ইস্কুলে যায়, মাখনকে বাটার বলে, ডিমভাজাকে ওমলেট। আমি যা হবার হবে ভেবে একটা বাড়ি ভাড়া করলাম। না, কলকাতায় নয়, দুর্গাপুরেই। বোনেরা ওখানেই পড়ছিল কিনা। বাবা হচ্ছেন চাষি মানুষ। হাতে খুরপি নিয়ে দিনে অন্তত ঘন্টাখানেক মাটি নিড়োতে না পারলে বাবার মন ভালো থাকে না। আমার কোয়োর্টারের পিছনে এক চিলতে জমিতে বাবা ব্যস্ত থাকতেন। ঝিঙে-ঢ্যাড়সের গোটা দশেক গাছ, তারপর ঐ গাছগুলো উঠিয়ে দিয়ে পালং, কপি, টমেটো। একবার বললেন একটু পাট করব ভাবচি; বীজ আনিস তো...। আমি বলি তিন ছটাক জমিতে পাট করবে? পঞ্চাশটা ভঁ্যাটিও তো হবে না...। বাবা বলেছিলেন এখন পাটের সময় কিনা, ছোটবেলা থেকে করিচি, অব্যেস হয়ে গেছে। বাবা হচ্ছেন এই টাইপের লোক। দুর্গাপুরের ড্যামের কাছাকাছি সারদাপল্লীতে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। একটু জমিও ছিল। পরে ঐ বাড়িটাই কিনে নিয়েছি। বাড়িটা বাড়িয়েছি, দোতলা করেছি। এখন দোলনা সমেত ব্যালকনি, দুটো ঘরে এসি. বসিয়েছি।

আমরা এলে গরমে কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ঘরেই থাকবে, বাবা-মার ঘরে এ. সি. থাকবে না, সেটা কি করে হয়! চারটে ঘরে এটাচ্‌ড টয়লেট তার মধ্যে একটায় বাথটাব। ফাঁকা জমিটায় সাইপ্রাস, ইউক্যালিপটাস, আর ট্রপিকাল পাইন লাগিয়েছি। বাবার ইচ্ছেয় কদম। আমাদের দেশের বাড়িতে কদম ছিল। যতদিন পেরেছে, বাবা খুপরি হাতে, নিড়ানি হাতে, কাস্তে হাতে বাগানে নেমেছেন। বাবা সব কিছু কিনেছিলেন। শাবল, কোদাল, সব। বোধ-হয় একটা হাল লাঙল কিনে রাখারও ইচ্ছে ছিল মনে মনে। এই আট কাঠা জমিতে একটা ধানখেত, একটু পাটের জমি। একটু পাট পচাবার ডোবা, একটু গোবর গাদা; একটু গোমতীর বাঁওড় ঢুকিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল মনে মনে।

দেশের জমিজমা সামান্য যেটুকু ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়েই আসতে হয়েছিল। দেশে গিয়ে একবার সৎ ভাইদের বলেছিল ঐ জমিজমার বিনিময়ে কিছু পয়সাকড়ি দিতে। আমি তখন ইলিনয় ইউনির্ভাসিটির ছাত্র। স্কলারশিপের টাকা বাঁচিয়ে দুর্গাপুরে কিছু কিছু পাঠাচ্ছি। অভাবেই ছিল ওরা। বাবা কিন্তু সম্পত্তি পায়নি। শুধু শুনেছে লব তো লবাব হয়েছিস আজকাল।

বাবার অভিমান হয়েছিল। দেশের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে দেশের বাড়িটা বুকে ক'রে বসে থাকতেন। কোনো মুড়িই দেশের বাড়ির মতো নয়। কোনো জলেই দেশেই বাড়ির জলের স্বাদ নেই। এখানকার শিউলি ফুলের গন্ধ দেশের বাড়ির শিউলির গন্ধের মতো কিছুতেই নয়। দেশের পুকুরের পুঁটিমাছটিও অনেক বেশি রুপোলি।

আমারও হ'ত আমেরিকায়। মেক্সিকান আম খেয়ে মনে হ'ত ওগুলোকে কেন আম বলা হচ্ছে। মাছের কোনো স্বাদই লাগতো না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমেরিকা অভ্যেস হয়ে গেল। ওদের সব কিছুই ভালো লাগতে লাগল। এখন যখন দেশে আসি, পৃথা সুটকেস ভরে নিয়ে আসে সাবান, ক্রিম, ওষুধ, কুকিজ...। আমরা বিস্কুটকে কুকি বলি, লজেন্সকে ক্যান্ডি। পেট্রোলকে অনেক সময় গ্যাস বলে ফেলি। এখানে ওরা বোঝে না। পৃথা তো কয়েক লিটার জলও নিয়ে আসে। হট করে এখানকার মিনারেল ওয়াটার খেতে ও ভয় পায়। ইশ, কী যে হ'ল আমাদের, জল ভীতি?

বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন, এসেছিলাম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কলকাতার নাম্বার ওয়ান নাসিংহোমে বাইপাস সার্জারি করিয়ে দিলাম। ভালোই ছিলেন এরপর আবার নানা উপসর্গ। তিন মাস পর এলাম আবার। কিডনি, লিভার, লাং, কিছুরই ফাংশন ভালো নয়। ডেটোরিয়েট করছেন, ডাক্তাররা বলেই দিয়েছেন রিভাইব করার চান্স্ নেই। কিন্তু আমি কতদিন থাকব? আমার তো কাজকর্ম আছে। কিন্তু মুস্কিলটা এমনই, যাবো, হয়ত গিয়েই খবর পাবো এক্স্‌পায়ার্ড। তখন আবার আসতে হবে। যাতায়াতের খরচার জন্য বলছি না, জেটল্যাগও তো আছে। তা ছাড়া স্কিডিউল র‍্যাপচার হয়ে যায়। বিছানার পাশে বসে থাকলে বাবা যখন বলতেন— এটাই আমার শেষ শয্যা, আমি বলতাম না বাবা, ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু বলতে লজ্জা করছে, আমি মনে মনে বলতাম যা হবার হয়ে গেলেই তো হয়। বাবার মৃত্যু কামনাই তো ওটা! বাবার পাশ বসলে বাবা মাঝে মাঝে বলতেন দেশের জন্য কিছু করিস।

বাবার মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম না। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আসি। বাড়িতে যা পাঠাতাম, বাবা খরচ করতেন না, জমাতেন। বাবা কোনো বিলাসিতা করতেন না। কিছুতেই সিগারেট খাননি। বিড়িই খেতেন। প্রথম প্রথম বলতেন লজ্জা করে। পরে বলতেন পোষায় না। মোটা

ধুতি পরতেন। চালটা সরু কিনতেন। সেটাই বিলাসিতা ছিল। বাড়িতে মাঝে মধ্যে কীর্তন বসাতেন, তাতেই কিছু খরচা-টরচা হ'ত। একটা হরিসভা আছে বেনাচিতিতে। ওখানে নাকি বেশ কিছু টাকা ডোনেট করেছিলেন। মা আমাকে বেশ কিছু কাগজপত্র বের করে দেখালো। দেখলাম বেশ কয়েক লাখ টাকা রেখে গেছেন। মায়ের সঙ্গে, আমার সঙ্গেও কয়েকটা জয়েন্ট এ্যাকাউন্ট ছিল। আমিই বা কী করব টাকা। আমার টাকার অভাব নেই। আমার বয়েস এখন ফিফটি নাইন প্লাস। পঁয়ত্রিশ বছরের উপর স্টেট্‌স-এ আছি। পঁচিশ বছর হয়ে গেল ওদেশের সিটিজেনশিপ নিয়েছি। গত বিশ বছর ধরে রোটারিয়ান দুর্গাপুরের রোটারি ক্লাবকে আমরা প্রচুর হেল্প করি। ওরা কী সব আই হসপিটাল করেছে, ওদের দশ হাজার ডলার আমি পারসোনালি দিয়েছি। ওরা স্প্যাসটিক্‌স আর হ্যানডিক্যাপড্‌দের জন্য কিছু একটা করতে চায়। প্রতিবন্ধী বিকাশ কেন্দ্র নাম দিয়েছে। ওখানেও আমি দশ হাজার ডলার আগেই দিয়েছি।

বাবার মৃত্যুর ছ'মাস পরে এলাম। মাকে নিয়ে যাবো ভাবছি। মা কিছুতেই যেতে চান না। একবারই নিতে পেরেছিলাম বাবা মাকে। ওখানে ওদের একদমই ভালো লাগেনি। খুব অস্বস্তিকর অবস্থা। সেটা অন্য গল্প। এবার একটু বেশি ছুটি নিয়ে এসেছি। মায়ের ভিসা করাব নতুন করে। বাড়ির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার নামে কিছু চ্যারিটি করব। বাবার ইচ্ছে ছিল দেশের জন্য কিছু করা। ভাবনা দেশের বাড়িতেও যাবো।

এদেশের গরম সহ্য হয় না আমার। দুর্গাপুরের বাড়িতে দুটো ঘরে এ সি বসানো আছে। বাবা চালাতেন না। আমি এলেই চালাই। বাকিলা যাবার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। পৃথার বাপের বাড়ি সল্টলেক-এ। ওখানে আমার এক শ্যালক আছে এখন। ওখানেই গেলাম। একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে বল্লাম। এয়ার কণ্ডিশন গাড়ি। ওরা একটা ইণ্ডিকা ভাড়া করে দিল। দু'লিটার মিনারেল ওয়াটার নিলাম। আশাকরি হয়ে যাবে। ফ্লাস্কে একটু চাও দিয়ে দিল অনুরাধা, মানে শ্যালকের বউ।

বহু বছর পর বারাসতের রাস্তায়। যশোর রোড একই রকম। পুরোন গাছগুলো মনে হচ্ছে কিছু কমে গেছে। রাস্তা একই রকম ভাঙাচোরা। রাস্তার দুপাশে একই রকম টালির চালের দোকান। রোগা রোগা গরু। বারাসত পেরুতেই ধানখেত দেখলাম। আহা ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে মনে পড়ল। কোন কবিতায় ছিল? আগের লাইনটা কী ছিল?—কিছুতেই মনে পড়ছে না। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো—তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি। একটা কোরাস। গাড়ির কাচ নামিয়ে দিই। হাওয়া আসুক। ধানখেত দাপিয়ে আসা হাওয়া। কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয়রে দূর্বা কোমল...। পরের লাইনটা কী? কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোথায় নাচে দোয়েল শ্যামা চাতক বারি যাচেরে মনে পড়ছে। শেষ লাইনে ছিল সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলারে। সব ভুলে গিয়েছি। গাছেরা নুয়ে পড়েছে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, আরও কী সব গাছ। এইসব গাছের নাম জানতাম একদিন। পাখিদের নাম মনে নেই। আকাশে মেঘ। ওগুলো কিউমুলাস আর অল্টো-কিউমুলাস। পোস্ট রেইনি-সিজন্‌ ক্লাউড্‌স্‌। শরৎ! শরৎ! আগস্ট মাস তো শরৎ। এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে। সকালবেলায়.....কী যেন....কী যেন.....। জাল ফেলে মাছ ধরছে জেলে। আমিও পারতাম, কত জাল ফেলেছি জলে। এই জলে এখন কি আমার এলার্জি হবে? গরুর গাড়ি দেখলাম, ছাগলচরানি বালিকা দেখলাম, আলপথ

দিয়ে আলতা রাঙা পায়ে হেঁটে যাওয়া ঘোমটা পরা বউ দেখলাম। সব কিউরিও দৃশ্য। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি? না, এই গান গাইব না। লজ্জা করে।

এই গান গাওয়া হয় ওদেশে। বাংলাদেশীরা মাঝে মধ্যে ফাংশন-টাংশন করে, এই গানটা খুব হয়। গানটাই হয়, স্কেল মেনে, কিছুটা স্বরলিপি মেনে। পৃথাও গায়। সত্তরের গোড়ায় রবীন্দ্রসঙ্গীত না জানলে বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের বিয়ে হ'ত না। এখন যেমন কম্পিউটার। পৃথা গাইলে আমার মেয়েরা কিছু বোঝে না। বলে ডোনট্ ক্রাই মাম্মি ইন দি নেইম অফ মিউজিক। আকাশ থেকে জরির ঝালের ঝুলছে। সোনা রোদ। সারা আকাশ-মাঠে যেন ঢাক বাজছে। পুজোর ঢাক। আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে।

আমাদের ঐ গ্রামগুলি ঢাকিদের গ্রাম। পুজোপার্বণে ওরা পিঠে ঢাক নিয়ে শহরে চলে যায়। অনেক মুসলমানও হিন্দুদের পুজোয় ঢাক বাজাতো। এখনো বাজায় কিনা জানি না। আমার একটা বন্ধু ছিল জয়নাল। দুটো কাঠি দিয়ে ইস্কুলের বেঞ্চিতে ঢাক বাজাতো, বড় বড় কচুপাতার উপরেও ঢাক বাজাতো। ও বলতো তুই যা বলবি, আমি তাই বাজিয়ে দেব। আমি বলতাম কই মাছ কানে হাটে পুঁটি মাছ ফরফর ও বাজিয়ে দিত। ওর ঢাকের ভিতর থেকে এইভাবে স্পষ্ট শুনতে পেতাম বোঁদে খাব মণ্ডা খাব খাব আলুর দম। ফেল করেছি বেশ করেছি ঢাক বাজাব বিলে। একবার মিত্তির বাড়ির দুগ্‌গা পুজোর দিনে ভটচায্যি বামুনকে ছুঁয়ে দিয়েছিলাম বলে মিত্তিরদের ছেলে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল। ওর বাবার সঙ্গে ঢাক বাজাতে এসেছিল জয়নাল। বাবার হাত থেকে কাঠি টেনে নিয়ে জয়নাল ঢাক বাজিয়েছিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম জয়নাল বাজাচ্ছে—একদিন আসবে একদিন আসবে আমাদের দিন।

জয়নাল, আমার কিন্তু দিন ফিরেছে। তুই কেমন আছিস জয়নাল?

বাদুড়িয়ার মোড় এলো। গ্রামে ঢোকার রাস্তাটার মোড়ে বটগাছটা এখনো আছে। ঝুরি নেমেছে। গাছের গায়ে টিনের ফলকে হাজী বদরুদ্দিন ফকিরের বৈজ্ঞানিক তাবিজের বিজ্ঞাপন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দ্বারা নির্বিঘ্ন গর্ভপাতের জন্য ফতিমা ক্লিনিক, আর কম্পিউটার শিক্ষার নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান রাধামাধব কম্পিউটার একাডেমি। গাছতলায় একটা শনি মন্দির হয়েছে দেখলাম। একটা নীল বোর্ডে লাল হরফে লেখা দেখলাম সরকার কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নলকূপের জলে বিপদসীমার বেশি আর্সেনিক আছে। ঐ জল পান করিবেন না।

তার মানে এদিককার জলে আর্সেনিক আছে বুঝি? আমি আমার মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা আঁকড়ে ধরি। ইনটারনেটে দেখেছিলাম বটে, এদিককার কতগুলো ব্লক যেন এ্যাফেকটেড। ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়াতেও এই প্রবলেম। আমাদের দেশের বাড়ির জলেও কি আর্সেনিক আছে? গভর্নমেন্ট কি সারফেস ওয়াটার ট্রিট করে পাইপলাইনে পাঠাচ্ছে? ব্রাজিল কিম্বা মেক্সিকোতে যা হচ্ছে। কয়েকটা আমেরিকান কোম্পানি এই কাজ করে, আর্সেনিক ফ্রি জল বিক্রি করে পয়সা নেয়। কোম্পানিগুলো মুখিয়ে আছে কোথায় নতুন করে আর্সেনিক দেখা দিল। আমি ওরকম একটা কোম্পানির কনস্যালটেন্ট ছিলাম কিছুদিন। এখানকার মানুষ আর্সেনিক জলের বদলে কী জল খায়?

এই রাস্তা দিয়েই তো বাদুড়িয়া আসতাম সার্কাস দেখতে, যাত্রা দেখতে। স্কুল-জীবনে বাদুড়িয়াই ছিল আমাদের অবন্তীনগর। আমি টাটা ইণ্ডিকার নীল নীল কাঁচের ভিতর দিয়ে

ফেলে আসা রাস্তাটা দেখি। রাস্তার মানুষদের দেখি। বয়স্ক মানুষ যারা, তারা আমার সময়েরই লোক। ওদের দিকে ভালো করে দেখবার আগেই গাড়ি সামনের দিকে চলে যায়। ঘন্টা শুনলাম, ঠিক বুঝতে পারলাম ওটা আমাদের স্কুলের ঘন্টা। মদন বাজায়। ঐ তো, সুন্দরপুর কৃপাসিন্ধু আদর্শ হাইস্কুল। আমাদের এস. কে. হাইস্কুল। খেলার মাঠটা এখানে আছে দুটো গোলপোস্ট সমেত। ধনঞ্জয় ছিল খুব ভালো গোলকিপার। খুব লম্বা। ওকে লম্বু ডাকতাম। ও নিজেকে ভাবতো সনৎ শেঠ। আমাদের স্কুল জীবনে কিছু ধনরাজ আমেদ ছিল, উমরিগড় মানকড় পংকজ রায় ছিল, সত্য চৌধুরী, বেচু দত্ত। হীরালাল সারখেলের গান ছিল, আর হেমন্ত মুখুজ্যে। কিশোরকুমারও। আমি যখন আমেরিকা যাই, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়। স্কুলের মাঠে গাড়িটা থামাই।

সিমেন্টে খোদাই করা সত্যমেব জয়তের মধ্যে অনেক নোংরা হয়েছে। কলতলাটার টিউবয়েলটা একটা বস্তা দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। যে ঘন্টা বাজায়, সে মদন নয়। হেডমাস্টারমশাই নিশ্চই অন্য কেউ, কোনো পুরোন স্যারই নেই। হেডস্যারের ঘরটা একই জায়গায় আছে, ঘরের সামনে একটা ফ্রেম লাগানো কাঠের বোর্ড, সেখানে সাদা রং-এ লেখা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে যাহারা ঃ

১। রামপ্রসাদ মণ্ডল। ১৯৫৮ দ্বাদশ স্থান

২। উত্তম মিত্র। ১৯৯৮ চতুর্দশ স্থান

এই উত্তম মিত্র নিশ্চই মিত্তির বাড়ির কেউ। যে বাড়ির দুর্গাপুজোয় বামুন ছুঁয়ে দিয়েছিলাম বলে মার খেয়েছিলাম। ও বাড়ির ছেলে চল্লিশ বছর পরেও আমাকে বিট করতে পারেনি।

স্কুলটাকে দেখি। বাথরুমের বাজে গন্ধটা আসছে। চারিদিক মলিন। দেয়াল নোংরা, সিমেন্ট উঠে গেছে। ইটও বেরিয়ে পড়েছে। স্কুলটার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করল। এক হাজার ডলার দিয়ে দিলে বোধহয় কিছুটা সংস্কার হয়। আমি হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। হেডমাস্টারের বয়েস আমার চেয়ে কম। আমি আমার পরিচয় দিতেই হেডস্যার দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেডস্যারই উল্টে আমাকে স্যার ডাকতে লাগলেন। বলছিলেন, আমি আগেকার স্যারদের কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি। আপনি এই স্কুলের শুধু নয়, এ তল্লাটের গৌরব। আমিও এই স্কুলেরই ছেলে। আপনি যেবার স্কুল ছাড়লেন, আমি সেবার ক্লাস ফাইবে ভর্তি হলাম। আমার বাড়ি মহেশতলা। আপনার গাঁয়ের পাশেই। আপনি এসেছেন, আমাদের কী সৌভাগ্য! এখন তো ক্লাশ হচ্ছে, টিচাররা সবাই ক্লাশে। আপনি কাইণ্ডলি একটু বসুন, আমি টিচারদের ডাকি, ছাত্রদেরও মাঠে ডাকছি। আপনি ওদের কিছু বলুন। ওরা উৎসাহ পাবে। ওরা নিজের চোখে দেখাবে এই অঞ্চলের মানুষ এখন আমেরিকায় গিয়ে....

আমি বলি, ওসব করার দরকার নেই। তবে আমি এখনো আমার নিজের ঘরে যাইনি। ওখানে যাচ্ছি। চল্লিশ বছর পর বাড়ি যাচ্ছি। তবে বেশিক্ষণ থাকব না। ফেরার সময় স্কুলে নামব। কথা আছে।

হেডস্যার বল্লেন, চল্লিশ বছর প্রথম যাচ্ছেন? ইতিমধ্যে যাননি?

আমি মাথা নাড়াই।

—খবর-টবর রাখেন তো?

আমি বলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এক কাকা মারা গিয়েছিলেন খবর পেয়েছি। খুড়তুতো ভাইদের খবর জানি না। আমি আমার ভিটেটা একটু দেখব, দেখতে ইচ্ছে করছে।

—তা হলে ওসব কিছু জানেন না।

—ও সব মানে?

—গেলেই দেখতে পাবেন।

একথা বলেই চুপ করে গেলেন হেডস্যার।

কীরকম একটা সাসপেন্স্ গায়ে মেখে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাই। হেডস্যারও আমার পিছন পিছন আসেন। সঙ্গে কেরানি, পিওন, আরও তিন চারজন মাস্টারমশাই। ওরা বল্লেন আপনার অপেক্ষায় থাকব। আমি গাড়িতে ওঠার আগে বস্তা জড়ানো টিউবওয়েলটা দেখি। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করি ছেলেরা কী জল খায় তাহলে? হেডস্যার বলেন, কেন এই জলই খায়। কী করবে। বস্তাটায় কলের মুখের কাছে ফুটো করে নিয়েছে স্যার। বাড়ি থেকে জল আনলেও তো ঐ একই ব্যাপার। এ তল্লাটে সব টিউবয়েলের জলেই তো আর্সেনিক।

একশো থেকে পাঁচশো ফুট পর্যন্ত জলে আর্সেনিক থাকতে পারে। এমনিতে মাটির তলায় আর্সেনিকের যে পিরাইট্স থাকে, সেটা জলের সঙ্গে থাকতে পারে না। অক্সিজেন মিশলে আস্তে আস্তে জলে মিশতে পারে। মাটির ভিতর থেকে জল তুলে নেয়া হচ্ছে বলে মাটি একটু করে ফোঁপড়া হচ্ছে, ফলে, অক্সিসজেন ঢুকছে। ঢুকে আর্সেনিক পিরাইট্স্কে ওয়াটার সল্যুবল করে দিচ্ছে। এ অঞ্চলে এটাই ফেনোমেনন। মাটির গভীরে পিরাইটস লেয়ার অক্সিডাইস্ড হতে পারে না, তাই সাত-আটশো ফিট তলার জলে আর্সেনিক কন্টামিনেশন হয় না। স্কুলে কি একটা লম্বা পাইপের টিউবওয়েল বসানো যায় না? টাকার অভাব? আমি দেব। কিন্তু স্কুলে নয় হ'ল। বাড়িতে?

গাড়ি এগোচ্ছে। আর একটু এগোলেই বাঁ দিকে গোমতী বাঁওড়টা দেখা গেল। অফুরন্ত সারফেস ওয়াটারের সোর্স। যদিও স্যালাইন, কিন্তু আয়নিক এক্সচেঞ্জের রেজিন দিয়ে স্যালাইনিটি নষ্ট করে দিতে কি খুব খরচ হবে? মিড্ল ইস্টে, আরবে সমুদ্রজল ডিসটিল করে দিচ্ছে। অথচ আমাদের এত জল। হাটতলা এলো। হাটতলায় রাস্তার ধারে ঝুপড়িগুলোর সামনে ওরা কারা দাঁড়িয়ে? দিন দুপুরে সাজগোজ করে? এরা কী রকম মেয়ে? ব্রথেল?

মিত্তিরদের বাড়ি। মিত্তিরমশাই, আমি রামু। মিলিয়নিয়ার। আমাকে মেরেছিলেন একদিন। ভটচায্যি বাড়ি। আপনাদের বাড়িতে আমার পরিবারের লোকেরা কাজ করত। আমাদের তোলা জলে আপনারা পা ধুতেন, স্নানও করতেন, পান করতেন না। ঐ বাড়ির সামনেই গাড়িটা দাঁড় করালাম।

ওখান থেকে আমদের বাড়িটা একটুখানি হেঁটে। বাঁশঝাড়ের পিছনে।

গাড়িটা থামতেই কয়েকজন ছুটে এলো। ওরা সবাই তিরিশের নীচে। আমায় দেখেনি। কী চাই? কাকে চাই জিজ্ঞাসা করল। আমি বল্লাম কবিরাজ বাড়ি যাব।

—কবিরাজ বাড়ি মানে?

কবিরাজ বাড়ি নামেই পরিচিত ছিল। আমার দাদু চিকিৎসা করতেন কিনা...আমি বলি মণ্ডল বাড়ি।

একটি ছেলে একটু বেশি এগিয়ে এলো। ভ্রূ কুঁচকালো। কিন্তু ওর ভ্রূতে চুল নেই বল্লেই হয়। বলল—ঐ কবরেজ বাড়ি যাবেন? কী কেস্? ঐ বাড়ি তো ডাকাত বাড়ি। শুধু বোবা

মণ্ডলের ফ্যামিলি রয়েছে, আর খাঁদু মণ্ডল। বাকিরা চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। কেউ কেস খেয়ে জেলে আছে। আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন?

আমি একটু চুপ করে যাই। আমার পরিচয়টা দেয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আমি শেষ অব্দি বলি—আমি ওদের আত্মীয়, বহুদিন পরে আসছি। ছেলেটি নিজের পরিচয় দেয়। ও নাকি মেম্বার। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ওর দেড় হাজার ভোটার আছে বলতে গিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো মেলে গ্রাম দেখাল। তখন দেখলাম ওর আঙুলগুলোয় কালচে ছোপ। আর্সেনিকোসিস হলে যেমন হয়। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার যে ভুরু চুল পড়ে যাচ্ছে, নখের রং কালচে হয়ে যাচ্ছে, কেন জানেন তো?

ছেলেটা মাছি তাড়াবার মতো কালচে আঙুল সমেত হাতটা বাতাসে নাড়িয়ে বলল—জানি তো। এ অঞ্চলে অনেকেরই আছে। হাটবারে হাটে গেলি বোঝতেন।

—চিকিৎসা করানো হয় না?

—হাসপাতালে যাই। ওষুধ নিয়ে আসি। সেই কবে ইস্তক শোনছি কলকাতার মতো পাইপে জল সাপ্লাই হবে। টাকার অভাবে হয় না। টাকা চলে যায় কলকাতার ওভারব্রীজে, কিম্বা ধরেন, কবিতা উৎসবে। শুনছি কী একটা ফিল্টার বসবে। বি. ডি. ও. সাহেব বলছিল। জানি না কবে হবে। হবে না। এখানে কিছু হবে না। এখন এটা আমাদের জীবনের অঙ্গ। এজন্যই তো এ অঞ্চলের অনেকে ডাকাত হয়ে যাচ্ছে।

—আর্সেনিকের সঙ্গে ডাকাতের সম্পর্ক কী? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ঐ মেম্বার নয়, অন্য একটা ছেলে অনেক কম বয়েস। বলল—কেন ডাকাতি করব না বলেন, এমনিও মরব, অমনিও মরব। কী দাম আছে জেবনের? ঐ তো একটা নিরীহ ছেলে আটতিরিশ বছরে জলের বিষে মরে গেল। ডাকাতি করতে গেলে রিস্ক রয়িচে। লোকে পিটিয়ে মেরি দিতি পারে। কিন্তু কিছু দোষ না করে শুধু তেষ্টার পানি খেয়েও মিত্যু। তা কী করব?

ছেলেটার বয়স কত? আঠার? আঠার বছর বয়স কী দুসঃহ। স্পর্দ্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি।

—জানেন, আমাদের বে-থা হয় না। কে আমাদের গাঁয়ে মেয়ে দেবে মরার জন্য? আমাদের কিচ্ছু নেই। ঘর, সংসার, জেবন, খালি ভোট আছে। একটা করে ভোট আছে।

আমার কিছু বলার ছিল না। তবে মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলেছি—দশ থেকে পনের লাখ খরচ করলে হাজার দশেক লোককে বাঁওড়ের জল ট্রিটমেন্ট করে সাপ্লাই করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েতের মেম্বার বলল—তো কী করব বলুন। যারা চুরি ডাকাতি করছে, কী বলবেন আপনি ওদের? যে সব ইয়ং ইয়ং ছেলেরা, বে-থা করতে পারছে না, ওরা যদি হাটতলায় চুমকিদের ঘরে যায়, কী বলবেন ওদের!

ছেলেটা একটু থামে। বলে স্যার, হাটতলায় আগে ওদের একটা দুটো ঘর ছিল। কাদের কথা বলছি বুঝছেন নিশ্চই, এখন ঘর বাড়ছে। বড় নেতারা এধারে এলে বলে ছি ছি, এসব কি, উঠায়ে দাও। আমরা বলি আগে খাবার জল দাও, পরে উঠোচ্চি। এই মেয়েছেলেগুলান কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কেউ নয়। দূর থেকে এসেচে। এই জলই খায়। খেতে বাধ্য। জেনেশুনেই খায়।

অন্য একটি ছেলে বলে এই পানি খেলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝা যায় না কিনা, আস্তে আস্তে মারে। আপনি স্যার কোথায় থাকেন, কলকাতা নিশ্চয়?

আমি মাথা নাড়াই।

—ডাকাত বাড়ির কেমন আত্মীয় আপনি, কিছুই জানি না। আপনি কি পুলিশের লোক?

আমি বলি একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বহুকাল আসিনি কিনা।

—সত্যি বলতেছেন?

—হ্যা, সত্যিই তো।

—ওদের বাড়ির একজন নাকি আমেরিকায় থাকে। সাইনটিস্ট। বোবা ওঝার সৎ ভাই-এর ছেলে। তার কুনো পাত্তা নাই। সে এলে নিচ্চই গাঁয়ের কিছু হ'ত। ওরা আমার সঙ্গেই থাকে। ওদের হঠাতে পারি না। মেম্বার ছেলেটি বলে—বোবা ওঝা যে, জলপড়া দিত, তার হাত নাই, দুটা হাতই নাই। কব্জি থেকে কাটা।

—কেন?

—ডাকাতি করার আগে বোবা মণ্ডলের কাছ থেকে বশীকরণ ধুলো নিয়ে যেত। অনেকের বিশ্বাস ঐ ধুলো ছড়িয়ে দিলে ডাকাতিতে বিঘ্ন হয় না। একবার এক ডাকাতের দল বোবা মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে গেছিল। পাঁচ বছর আগে। ও নাকি আলসে খিলেন করতে পারতো। মন্তর পড়ি দিলে ডাকাতদের কেউ ধরতে পারবে না। সেবারই ধরা পড়ল। খুব পিটুনি খেল স্বরূপনগরে। ঐ দলে ওই মণ্ডলবাড়ির গনা মণ্ডলের একটা ছেলে ছিল। বাচ্চু। মরে গেল। আর বোবা মণ্ডলের দুই হাত কব্জির তলা থেকে চপার দিয়ে কেটে দিল। হাসপাতাল, তারপর জেল। এখন বাড়িতেই আছে।

ফাঁসের গাছটা দেখলাম। আর সেই কদম গাছটাও। উঠোনের তিন দিকে ভাঙাচোরা ঘর। বোবা মণ্ডলের সামনে আমি দাঁড়াই। আমি দাঁড়াতেই আমার কাকার মুখ থেকে অদ্ভুত কিছু শব্দ বেরুতে থাকে। ওটা যে উচ্ছ্বাসের শব্দ, আমি বেশ বুঝতে পারি। সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙে পড়লে এরকম শব্দ হয়। কাকার কব্জি কাটা দু-হাত সামনে তোরণদ্বারের মতো। আমি কাকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে বাইরের কদম গাছ থেকে বুলবুলির শিস শুনি। কাকার কব্জি কাটা দু-হাত আমার দু-কাঁধে। চোখ থেকে জলের ধারা। তারপর হাত দুটো উঠে যায়। কখনো জয়ধ্বজার মতো উপরে ওঠে, কখনো নৌকোর বৈঠার মতো দুপাশে নড়ে। আর মুখ থেকে অনর্গল শব্দ, নানা রকমের। চল্লিশ বছরের ইতিবৃত্ত বলে যাচ্ছেন কাকা। ওর আর্তি, অভিমান, অভিযোগ.....।

অন্যান্য ঘর থেকেও সবাই এসে গেছে। বউ, ঝি, বাচ্চারা। ওরা সবাই আমার রক্তসম্পর্কের পরিজন, অথচ ওদের কারোরই নাম জানি না। আমি ওদের কারুর কারুর দাদা কারুর জেঠু। কারুর ভাসুর, কারুর দাদু। আমি কোনো বাচ্চার চুলে বিলি কেটে দিতে যাই, ওরা মাথা সরিয়ে নেয়। কোনো বাচ্চার থুতনি ধরে আদর করতে যাই, ওরা মুখ সরিয়ে নেয়। বোবাকাকু ওদের কিছু বলেই চলেছে। আমি বাচ্চাগুলোকে দেখি। ওদের নখগুলো এখনো সাদা। হাতগুলো এখনো নরম। চোখের ভ্রূগুলো সুন্দর। বউ ঝিরা সবাই মোটামুটি ভালোই রয়েছে দেখলাম। একজনকে দেখলাম মুখ ফুলেছে। চোখের পাতায় চুল নেই, হাতগুলো খরখরে। ওর চক্ষুপলকহীন চোখের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে রামুদা আপনি এলেন? আমি নীরবে মাথা নাড়ি।

লোকটা বল্ল—আপনি আমাকে বিয়োগ অংক শিকিয়েছিলেন। বোবাকাকুর মুখটা তখন হাসিতে ভরে উঠল। উনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন আমাকে। ওদেরকেও চিনতে পেরেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ও গত ছ' বছর ধরে ভুগছে। হালে ওর কিডনি দুটো গ্যাছে। আর্সেনিক কিডনি খারাপ করে দেয়। আমি জানি। ওর নামই খাঁদু। আমার কোনো এক কাকার ছেলে। ও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বছর আটদশের ছোট হবে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আমার চেয়েও বুড়ো। ও আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। ওর হাঁটতে কষ্ট হয়। কথা বলতেও। ও জিজ্ঞাসা করল, কী মনে করে এলেন। আমি বল্লাম কিছু নয়, এমনিই দেখতে এসেছি।

ওর কাছে অনেক কথাই শুনলাম। দুই কাকার ছেলেরা কীভাবে ডাকাতদলে ভিড়ে গেল, মার খেয়ে কী করে একজন মরে গেল, দুই কাকার মৃত্যু......অনেক কথা। কিচ্ছু চাইল না। টাকা পয়সা কিছু না। বউকে বল্ল চা করতে। চা খেলাম। আর্সেনিক আছে, তবে একদিন খেলে কি হবে?

খাঁদুর ভালো নাম বিলাস। ও বল্ল দেরিতে বাচ্চা হয়েছে। একটাই বাচ্চা। বাচ্চাটা দেখলাম। সাত আট বছর বয়েস মনে হ'ল। ঘাড়টা হেলে রয়েছে। মুখ দিয়ে লোল গড়াচ্ছে। হাত পা দুটো সরু সরু। স্প্যাসটিক? খাঁদু বলল অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছে সারবে না। বলছে প্লাসটিক বাচ্চা।

দুর্গাপুরের একটা সংস্থাকে আমি অলরেডি অনেক টাকা ডোনেট করেছি। ওরা বলেছিল আমি যদি কোনো স্প্যাসটিক ও প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে রেকমেণ্ড করি, ওরা নিয়ে নেবে। এই বাচ্চাটাকে ওখানে দিয়ে দিতে পারি।

আমি বলি বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি স্প্যাসটিক সোসাইটিতে দিয়ে দেব। বাচ্চাটা ভালো থাকবে। চিকিৎসারও চেষ্টা হবে যতটা পারা যায়। বাচ্চাটার ভার আমি নিচ্ছি। বলেই মনে হ'ল এতক্ষণে দেশের জন্য বোধহয় কিছু করতে পারলাম।

খাঁদু কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল—নারে দাদা। সেটা হবে না। আমি তো আর ক'দিন পরেই মরে যাব। তারপর বউ কী নিয়ে থাকবে। বাচ্চাটাকে খাওয়ানো হাগানো শোয়ানো.....। আমার বাচ্চাটা তো বড় হবে না কখনো...বউটা আরও কিছুদিন বাচ্চা নিয়ে থাকতে পারবে।

ফিরব। গাড়িতে উঠলাম। কদমগাছটা বলল আবার এসো। পাখিটা বলল সি ইউ এগেইন। একটা প্রজেক্ট কি দেব? দশ বারো লাখ টাকার। তিরিশ হাজার ডলার। এতগুলো টাকা এই গ্রামের জন্য, যেখানে আর আসব না কোনোদিন। নাকি ইস্কুলটায় কিছু দিয়ে দি, একটা পাথরে ডোনার হিসেবে বাবার নাম থেকে যাবে...

সুন্দরপুর স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। আমার গাড়িটার জন্য অপেক্ষা করছিল বোধহয়। এত কম সময়ের মধ্যে পাতা দিয়ে তোরণ তৈরি করে ফেলেছে। স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ছেলে। কাগজে লাল কালি দিয়ে লিখেছে স্বাগতম।

মনে হ'ল ড্রাইভারকে বলি চলে চলো। এখানে নামব না। এতগুলো বাচ্চার সামনে কী বলব? আমি কি বলতে পারব তোমাদের বিশুদ্ধ খাবার জলের ব্যবস্থা করে দেব আমি? আমি একজন কেমিকাল ইনজিনিয়ার, জন্মভূমির জন্য দশ বারো লাখ টাকা খরচ করতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? আমার তো অনেক টাকা। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি বিশুদ্ধ জল পান করছি। আর্সেনিক আস্তে আস্তে মারে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশুদ্ধ জল।

জীবাণুহীন জল কি আমার আত্মাকে আস্তে আস্তে মেরেছে?

ড্রাইভারকে বলি গাড়ি থামাতে। শুনি ঢাক বাজছে।

জয়নাল জয়নাল ঢাক বাজাচ্ছে। জয়নালকে কোথায় পেল ওরা।

জয়নালের সামনে দাঁড়ালাম। ভাবা যায়? এত বছর পর। জয়লালের মুখে মুচকি হাসি। জয়নাল হাতের কাঠিটা ধরেছে মুঠো করে। যে ভাবে ঢাকিরা কাঠি ধরে ওরকম নয়। জয়নালের আঙুলগুলো ফুলে রয়েছে, চামড়া খড়খড়ে, কালচে।

আমায় দেখে জয়নাল বাজনা থামায় না। ও বাজিয়ে চলে। ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি জয়নাল জিজ্ঞাসা করছে আমায়, বলতো কী বাজাচ্ছি? জয়নাল বাজিয়ে চলেছে। আমি জয়নালের দিকে তাকিয়ে আছি। ও বাজাচ্ছে। কথা বেরিয়ে আসছে ওর ঢাক থেকে। নিবিড়, গভীর কোনো কথা। কিন্তু কী কথা বুঝতে পারছি না। এতদিনে কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছে অনেক। আমি ওর বাজনার বোল বুঝতে পারতাম, এখন পারছি না। তবে ওর প্রত্যেকটা শব্দ আমার বুকে এসে লাগছে। ঐ শব্দের মধ্যে ভীষণ আর্তি টের পাই আমি।

ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষায়। ময়লা আঁচল বিছিয়ে বসে আছে আমার আর্সেনিক ভূমি। কেন চেয়ে আছ গো মা....

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমি বলব। আমি একটা প্রজেক্ট-এর কথা বলব। দায়-দায়িত্ব সমেত। তারপর পড়ে থাকবে অনেক কাজ।

জয়নালের ঢাকের কথা এবার আমি বুঝতে পারি। ঢাক বাজছে আকাশে বাতাসে।

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে......

# দুখে কেওড়ার বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

—'বুদ্ধি' হল পরম ধন। ওটি না থাকলে কালিদাসের মতন যে ডালটিতে বসে আছেন ওটিই কাটবেন। আর বুদ্ধি যদি বলেন তাহলে গোপাল ভাঁড়ের জোড়টি পাবেননি।

—সে সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। একখানি শোনেন। গোপালের বাপ মরে গেছে। সে কি দুঃখু গোপালের! রগুড়ে মানুষটার বুক ভেসে যায় কান্নায়! বাপ-মা হল মাথার চাল। ওটি সরে গেলে চাঁদির ওপর নেড়া আকাশটি। ঝড়, বাদল, রোদ সব নিজে সামলাও। শ্মশানঘাট থেকে যেই না ঘরমুখো হলেন মনে হবে বয়সটি বিশ বছর বেড়ে গেল। 'বাপধন' বলে ডাকার কেউ রইলনি।

—হ্যাঁ গাঁয়ের লোক কাঁদছিল বইকি। বুক ভাসিয়ে কাঁদছিল। কাঁদারই কথা, মানুষটিকে আর কাল থেকে দেখতে পাবেনি। রক্ত-মাংসের মানুষ ধুঁয়ো হয়ে গেল। তবে কুচুটে লোকও থাকে। তেমনই লোক ছিল গাঁয়ে একজনা, বামুনপাড়ায়।

—না, এসেছিল। সে কি গুড় মাখানো কথা! গোপালকে বলছিল, 'তোর দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছেরে গোপলা। কান্না পাচ্ছে।' গোপাল বুঝল এ হল বদলোকের মিছে মায়া। গোপাল বলল, 'হ্যাঁ, বাপ আমার বলেছিল বটে তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুরও কাঁদবে।' গোপালের বুদ্ধিটা দেখলেন?

—'বুদ্ধিজীবী'? না, শুনিনি আজ্ঞে। তবে সব জাতের মধ্যে সেরা বুদ্ধি নাপিতদের। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে কেউ পারবেনি। নাপিত আর শেয়াল একসঙ্গে পড়লে সে খেলার মতন খেলা। মুকুন্দ ওঝা নাকি দুধে-গোগরো কাবু হয় দেখেন এবার।

—কিসের মাংস খাচ্ছেন? ঘুঘুর। এই বিকেলবেলা ছোট ছেলেটা ধরেছে। বললুম, 'বাবু আসবে, রেঁধে দে।' কাঁচির সঙ্গে খুব জমে। খাওয়াও ভালো, বুদ্ধি খোলে। পাকের ভেতর সেরা মাথা ঘুঘুর। যত খাবেন তত মাথা খুলবে। দুমাস খেলে ঘাগু হয়ে যাবেন।

—না, কৃষিজীবী শুনিনি। 'কৃষক' শুনেছি। বইয়ে লেখা ছিল। 'চাষীদের' বইতে 'কৃষক' বলে।

—অ, বুঝেছি। শুধু 'কৃষক' 'নাপিত' 'বামুন' বললে ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। একখানি টোপর লাগবে। 'কৃষকজীবী' 'নাপিতজীবী' 'বামুনজীবী' হলে ব্যাপারটি শুনতে ভালো, ওজনেও বাড়ল। পঞ্চু মেদ্যা জল দিয়ে এমন ভিয়েনটি করবে যে আধকেজি পুঁইশাকটি কাঁটায় এক কেজি দেখবেন।

—গোলমাল হচ্ছে? বলেন, আপনিই বলেন।

—বুঝেছি, যে কাজ করে সে 'শ্রমজীবী' আর যে কাজ করেনি সে 'বুদ্ধিজীবী'।

—আচ্ছা, কাজ করে, মাথার কাজ। মাথার কাজ বেশি করলে টাঁক পড়ে যায়।

—কেউ বলেনি আজ্ঞে, দেখে দেখে শিখেছি। বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন, ছবিটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন।

—তাঁর নাম জানবনি, কী যে বলেন! বিদ্যাসাগর মেদনিপুরের লোক, আমার ছোটখোকার শ্বশুরঘরের দেশ।

—হ্যাঁ, আজ্ঞে, তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। খুব দানধ্যান করতেন। এখন মানুষজনের দেয়ার মন নাই। বরপণ লিচ্ছে লাখ টাকা আর খাওয়াবার সময় ফ্যারফ্যারে ডাল আর চারা পোনার ঝোল।

—অ, শ্রমজীবীর আবার ভাগ আছে। বেশ, বেশ। যে চাষ করে সে 'কৃষিজীবী'। 'কৃষকজীবী' বললে হবেনি। যে চুল কাটে সে 'ক্ষৌরজীবী'। ভালো তবে ঝিলিপির ধাতটি কড়া হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হনুমানকে লোকে 'চিরজীবী' বলে, কথাটা সত্যি?

—ঠিকই তো, এ হল শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রের এক কথার সাত মানে, কোনটি বুঝবেন বুঝেন। আচ্ছা আপনি বলছেন বিদ্যার কথা কিন্তু দু-পাক ঘুরেই চলে আসছেন বুদ্ধিজীবীতে। বিদ্যার কথায় যখন হচ্ছে 'বিদ্যাজীবী' বলেন। আপনি মেয়েছেলে হলে না হয় বুঝতুম ওটি শ্বশুর কিংবা ভাসুরের নাম, মুখে আনবেনি। আপনার তো আর বাধা নাই।

—যার যে নামটি পছন্দ সেটি বলবে, লাখ কথার এক কথা বললেন। আমার বউকে কেউ 'ফুল' বলে কেউ 'ফুলু'।

—তোলা নাম? ওটি হল 'ফুলেশ্বরী'। বিনোদের শাউড়ি বলে নেপলার মা। কেউ কেউ দুখের মাগও বলে।

—আমি? আজ্ঞে 'ফুলি' বলি। বেপাকে পড়লে লোকে মাগকে 'মা'-ও বলে।

—শুনেননি? শুনেন। গোপালের একটি গরু ছিল। গোপাল নিজের হাত তার সেবা করত। একদিন গরুটি মাঠে চরতে গিয়ে আর ফিরলনি। সারাটা দিন হন্যে হয়ে খুঁজে সন্ধেয় ঘরে ফিরল গোপাল। উঠোনে বসে ছেলেটাকে বলল, 'একবার বনের ধারটা দেখে আয় না ভাই।' কথা শুনে গোপালের বউ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'নিজের ছেলেকে কেউ ভাই বলে? 'গোপাল বলল, আজ্ঞে. কী বলল বলেন দিকি?

—পারলেননি তো? গোপাল বলল, 'দুধের গরু হারালে অমনই হয় মা।'

—হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবীর আরো কথা বলব তার আগে আসেন দুজনে খানিক গলায় ঢালি। আজকের চাটটি খেয়ে সুখ পাবেন। ঘুঘুর মাংস খুব মিষ্টি। মধ্যে মধ্যে পোড়া লংকাটি জিবে ছুঁইয়ে নেন। আজ্ঞে, আপনি কি বুদ্ধিজীবী?

—না, হাসলে চলবেনি। পাঁচজনে বলে আপনি সাদা পোশাকের পুলিশ। আমি বলি কিছু জানিসনি। মানুষের সঙ্গে কথা না বললে কি করে বুঝবি কে কী? দেখে চোরটিকে মনে হবে সাধু, সাধুটিকে চোর। কত লোককে দেখলুম গুরুভাই হয়ে ঢুকে শালপতিভাই হয়ে বেরলো।

—আপনি কী? বলব? যাত্রাদলের বিবেক। বলেন, ভুল বলেছি? গোঁফ নাই, ফোলাফোলা মুখ চোখ। চুলটি পাতলা তবে পরচুলো পরলে কেউ ধরতে পারবেনি। আর, আজ্ঞে, বিবেকরা তো বুদ্ধিজীবী। রাজা কম্ম করবে, খলচরিত্র বাগড়া দেবে আর বিবেক ভবিষ্যৎটিতে কী হবে বলে যাবে। তার জ্ঞানের মাপ নাই। আপনিও বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই।

—'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই' পদ্যটি? পড়িনি, শুনেছি। সাক্ষরতার মেয়েছেলেটা বলেছিল। শোনেন। একবার এক বাবু বইপত্র লিয়ে নৌকোয় উঠেছে। মাঝিকে নানান গোলমেলে প্রশ্ন করছে, 'সূয্যি ঘোরে নাকি পৃথিবী ঘোরে' 'কেনে জোয়ার-ভাটি হয়''! মাঝির পেটে তো

বিদ্যা নাই, ভ্যালভ্যাল করে তাকায়। বিদ্যেমশাই বলে, 'মাঝিরে তোর জীবনটা বার আনাই ফাঁকি।' ওদিকে মেঘ উঠেছে। নৌকো ডুবুডুবু। মাঝি বাবুকে বলে, 'সাঁতার জানো কত্তা'? বাবু মাথা লাড়ে, জানেনি।

—কার লেখা? বলতে পারবিনি। মুখ্যু মানুষ আজ্ঞে।

—সুকুমার রায়? আপনি গপ্পোটা জানেন? তা তো জানবেনই। বিপদের কথা কি চাপা থাকে?

—কেমন লেগেছিল? খুব খারাপ। এতো আজ্ঞে প্রকৃতির নিয়ম যে গরমকালে কালবোশেখী আর বর্ষাকালে বান। কত নৌকো যে এদিক-সেদিক উল্টোয় কী বলব আপনাকে। বাচ্চাকাচ্চা অবদি জলে তলিয়ে যায়। তেমন উল্টোলে সাঁতার জানলেও উঠতে পারবেননি।

—কেনে উল্টোয়? অত লোক চাপলে টাল সামালবে কেমন করে? জলের চোরা টানও আছে। মানুষও মরে মাঝিও মরে। তবে আপনার রায়মশাই কাজটি ভাল করেননি। কী ঘটল সে খবরটি দিলেননি। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে কতরকম ঝগড়াঝাটি হয়—দাম লিয়ে, মাল লিয়ে, নৌকো ছাড়ার দেরি লিয়ে। মন থাকলে মালিন্য হবে তবে কেউ মরতে বলবেনি। মরণের বাড়া গাল নাই। রায়মশাই মাঝদরিয়ায় নৌকো ছেড়ে চলে গেলেন, এ কেমন কথা।

—হ্যাঁ, পদ্য, তাতে কী? পদ্য বলে গাছে তুলে মইটি কেড়ে লিবেন নাকি? মাঝরাতে কেওড়াতলায় বসিয়ে পালিয়ে আসবেন? সীতা আগুনে পুড়বে আর পদ্যটি গুটিয়ে দেবেন? দ্রৌপদীর কাপড়টি খোলা দেখাবেন আর দুঃশাসনের ঊরুভঙ্গটি দেখাবেননি? আদ্ধেক কথা পেটে আর আদ্ধেক কথা মুখে? খোলসা করে বলতে হবেনি?

—হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবী। না, এখনো ব্যাপারটি পরিষ্কার হলনি। বিদ্যাচর্চা করলে না হয় বিদ্যাজীবী হল কিন্তু বুদ্ধিজীবী হবে কেমন করে?

—একই? এ আমাকে বোকাসোকা মানুষ পেয়ে আপনি ভুল বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমি সত্যি কথা বলতে গেলে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। বিদ্যা আর বুদ্ধি এক হয়? বাসরাস্তার গায়ে লোহা-লক্কড় বালি-সিমেন্টের দোকানটি দেখেছেন? ওটি মদন রায়ের। আগে মুনিস-মান্দারে চাষবাস করাতো। বিঘে পনের জমি, এক হালে উঠে যেত। তবে লোকের হাতে লাঙলের বোঁটা ধরিয়ে চাষে লাভ নাই। ব্যবসা করার কথা ভাবছিল।

—না, না। ভাবল আর করে ফেলল, একি হয় আজ্ঞে। বসার জায়গা চায়। কী ব্যবসা করবে তার হিসেব চায়, হাতে টাকা চায়। মদনা আমার স্যাঙাৎ। তা মনের কথা বলত। বাসরাস্তার গায়ে বটতলার বেদীতে দু-জনে গিয়ে বসতুম। মদনার বাতিক ছিল কতজনা বাসে ওঠে আর কতজনা নামে তার হিসেব করা। গেলে দেখবেন বটগাছের গুঁড়িতে দশ-পনের-বিশ-বাইশ এমন দিন-প্রতি হিসেব লেখা আছে।

—পড়াশুনো? আমি দিন পাঁচেক গেসলুম, মদনা বছরখানেক। তারপর দুজনারই আবার মিলন খালধারে। ওদের গরু-ছাগল লিয়ে ও যেত, আমি পাঁচজনার গরু-ছাগল ছাড়তুম। মদনা বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় শেষ করেছিল। যোগ-বিয়োগে খুব মাথা ছিল। এখনও মুখে মুখে বলে দিবে।

—আসছি, বিদ্যাতে আসছি। আমাদের গাঁয়ের বিদ্যাসাগর হল বিশু চৌধুরী। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক সবেতেই পোথম। বড় ইস্কুলের পরীক্ষায় পোথম হয়েছিল। সে একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড। কালীপুর কলেজে পড়াত। কদিন হল রিটার করেছে। মুখ দিয়ে সব্বদা সরস্বতীর

বাণী বেরোচ্ছে। শুধু মদনাকে দেখলে 'শালা, হারামজাদা' বলে বিড়বিড় করে।

—বলছি, সে ঘটনা বলছি। আগে গাঁয়ের ভিতরটি ছিল জমজমাট। ওখানেই হাট ওখানেই বাজার দোকান। এখনকার মরা চেহারা দেখলে বুঝছেননি একদিন গাঁয়ের ভিতরটি কেমন ছিল। তখন বাসরাস্তার গায়ে ঐ ডাঙার একপাশটিতে লাইবেরী আর পচার চায়ের দোকান। ঐ যারা বাস থেকে নামতো কি বাসে উঠতো তারাই পচার দোকানে কখনো-সখনো চা খেত। বিশু চৌধুরীর চায়ের নাম লিতনি পচা। বিশুদের ডাঙাতেই পচার চায়ের দোকান। লাইবেরীটিও তাই।

—না, বিশু চৌধুরীদের ধানজমি তখন ছিলনি। কেনা চালে খাওয়া। মদনা সে কথা বলতও বিশুকে। কলেজের অতো টাকা অথচ কেনা চালে ভাত। মদনার দুঃখে বিশু জমি খুঁজতে বেরলো। খুঁজলেই কি জমি মেলে? তিনবছর খরা নাই ঝরা নাই, কে বেচবে জমি। শেষে মদনা নিজেই রাজি হল। বামুনের উপকার সে করবেই। তিন বিঘে ধেনো জমির বদলে ছ'বিঘে ডাঙাটা কিনে নিল। মদনা বাঁশের গোলা করবে।

—না, গোলা করেনি। জমিকে জল খাওয়াল আর বটগাছের গায়ে নম্বর লিখে গেল। নম্বর বাড়ছে—দশ, বিশ, তিরিশ। বাসরাস্তার গায়ে পঞ্চায়েত অফিস হল, ব্যাঙ্ক হল, কলকাতার বাসের ইস্টপ হল। ডাঙার এককোণে ইট-বালির দোকান করল মদনা। বাকি ডাঙাটা তিনকাঠা করে ভাগা ফেলে দিল। ব্যাস, বিশ হাজার টাকা কাঠা পড়তে পেলনি। বাইরের লোক ঘর করল। গাঁ-ভিতরের লোক রাস্তা ধারে ঘর তুলল। ভাই-ভায়াদের মুয়ে আগুন, রাস্তাধারে পাকা ঘরে শুবো। মাস্টার, হুয়োইপাথি ডাক্তার, পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী সবার ঘর উঠলো। ইঁট-বালি, সিমেন্ট-রড সব দিল মদনা। ওদিকে বিশু চৌধুরীর জমি ভাগ-রেকর্ড হয়ে গেল। এখন বলেন 'বুদ্ধিজীবী' আর 'বিদ্যেজীবী' এক কথা? কিরে গেলে বলেন দিকি বিশু 'বুদ্ধিজীবী' না মদনা?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা, এ হল ব্যবসা। জায়গা-জমি কেনাবেচা হচ্ছে ব্যবসা। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাবসাদার কে বলেন দিকি?

—টাটা-বিড়লা? ওরা জমির ব্যবসা করে? টাটা কম্পানি লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করে জানি। টাটার কারখানায় পঞ্চু নাপিত কাজ করতো। পঞ্চু নাপিতের বিয়ের সময় সারা গাঁ তিনদিন পাত পেড়ে খাইয়েছিল। হালুইকর এসেছিল চুঁচুড়া থেকে। সে যা খাসি রেঁধেছিল ভাবতে পারবেননি। গোলমাল করেছিল শুক্তোটাতে। রং সাদা আর স্বাদটি মিষ্টি। ভালো লাগেনি। তবে সেতো আর বলা চলবেনি। মান দিয়ে ডেকে লিয়ে গেছে, আপনাকেও তার মানটি রাখতে হবে। পঞ্চু এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন রেঁধেছে যে দুখে?' বললুম, 'তোমার বামুনটির হাতটি হচ্ছে মধু'। এবার যা বোঝে বুঝুক।

—হ্যাঁ, টাটা। না, টাটার জমি কেনাবেচার কথা বলতে পারবনি। বলছিলুম বিশুর ডাঙা আর মদনার জমি অদল-বদলের কথা। এবার আর একজনের কথা শোনেন। তার যেমন বিদ্যে, তেমন বুদ্ধি।

—নাম? বলছি। নাম বললেই চিন্তে পারবেন, ডাক্তার বিধান রায়।

—না, বিধান রায় এ-গাঁয়ে জমি কেনাবেচা করতে আসেনি। লোকমুখে শুনেছি মদনা যেমন ডাঙা কিনেছিল, বিধান রায় কিনেছিল নোনাজমি। সেখানে এখন বিরাট শহর নাম বিধাননগর। শশী চৌধুরীর ছেলে ওখানে জমি কিনেছে, লাখ টাকা কাঠা। বিধান রায় মদনার

এক কাঠি উপরে।

—অ, বিধান রায় কেনেনি? ওটি সরকারি জমি? এ আপনি বেশ রঙ্গ করছেন। মড়ল বাঁদির জমি তো মড়লদেরই হবে। এখন না হয় নন্দী, পাল কি চৌধুরীরা দু-পাঁচ বিঘে কিনেছে।

—হ্যাঁ, ইস্কুল-কলেজের নাম বড় মানুষদের নামে হয় শুনেছি কিন্তু জমিও হবে? রেকর্ডের সময় নাম লিয়ে গোলমাল হবেনি? মালিক আর ভাগচাষীর মাঝে বিধান রায় ঢুকে যাবে, ব্যাপারটি কোর্ট-কাছারির আগে মিটবে তো?

—তা ঠিক, কোর্টের ব্যাপার কী করে জানবেন? উকিলরা জানে। তবে সবাই জানেনি। অর্ধেক উকিল জানে।

—আজ্ঞে, অর্ধেকই তো হবে। একটি কেসে দুটি উকিল। তার মধ্যে একজন জেতে, একজন হারে। যে হারল সে তো আজ্ঞে ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি। বুঝলে কেউ হারতে যায়?

—না, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আম-জনতার কোনো সম্পর্ক নাই।

—শুধু আম কেনে জাম, কাঁঠাল, বেল কোনো সম্পর্ক নাই।

—হ্যাঁ, গাঁয়ের মিটিঙে শহর থেকে বুদ্ধিজীবীরা আসে, ভাষণ দেয়, চলে যায়। হ্যাঁ, কলকাতার মিটিঙে আমরা যাই, চলে আসি, কোনো সম্পর্ক নাই।

—এতেই সম্পর্ক হচ্ছে? কাল সকাল থেকে আপনাকে 'শালা' কি 'ভগ্নিপোত' বলব?

—আজ্ঞে, রাগবো কেনে? কথা বলব অথচ মনের কথাটি বলবনি? বিশু ডাক্তারকে চেনেন? গো-বদ্যি। আমাদের পাশের ঘরের নোদোর বউটির সঙ্গে খানিক গোলমেলে ব্যাপার আছে। এটি সম্পর্ক, সে ভালোই হোক কি মন্দ।

—হ্যাঁ, সম্পর্ক হল কাকা-কাকি, মামা-মামি, সই-স্যাঙাৎ। নাড়টিও সম্পর্ক আজ্ঞে। আপনি এলেন, কাঁচি খেলেন, তারপর মাঝরাতে ঘরের মেয়েছেলেটিকে টানতে গেলেন, এটি সম্পর্ক লয়। একে বলে ঢ্যামনামো। আজ্ঞে একটি কথা বলেন দিকি চালে আগুন লাগলে আপনি কলসী লিয়ে কি ডাকাত পড়লে লাঠি লিয়ে?

—আর 'বি' 'বি' করবেননি, বড় বেশি খেয়ে ফেলেছেন আজ্ঞে। ছুটতে গেলে পড়ে যাবেন। তবে আপনার বেশ বুদ্ধি। আপনিও বুদ্ধিজীবী। ভগবান আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে। আপনাকে আমার বড় দরকার।

—কীসের দরকার? বলছি। এখন এমন শরীরের হাল যে খাটতে পারিনি।

—না, না, টাকার দরকার নাই। দরকার লোন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলেছিলুম পাঁচটি ছাগল পুষবো। ওগুলিকে লিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরবো ফিরবো। বড় হলে বেচে দু-পয়সা হাতে আসবে। ম্যানেজারকে বললুম, 'হাজার দুয়েক টাকা লোন দেন আজ্ঞে'।

—না, ম্যানেজার 'না' বলেনি। মুখ ফুটে 'হ্যাঁ'টিও কবুল করেনি। বাংলা ইংরেজির চালে-ডালে করে যা বলল তাতে আপনি নিজের মতন বুঝে নেন।

—হ্যাঁ, বলল গবমেন্টের ব্যাপার। তার অনুমতি লাগবে। পোথম পোথম ভেবেছিলুম পুলিশ, পরে বুঝলুম পঞ্চায়েত।

—আপনি দেখছি সবই জানেন। এর জন্যেই বলে বিদ্যার বড় গুণ নাই। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।

—দেয়ালে লিখে গিয়ে গেছে আজ্ঞে, জ্বলজ্বল করছে। কী ভাল কথা!

—হ্যাঁ, ম্যানেজার বলল পঞ্চায়েতে যেতে। গেলুম। দুদিন মিটিং হচ্ছিল বলে কথা হলনি। এক বুধবারে দেখা হল। বললে ব্যাঙ্ক হচ্ছে দিল্লির ব্যাপার। কেন্দ্র সব ঠিক করে। ফিরে আর একদিন ম্যানেজারের কাছে গেলুম। বেশি কথা শুনলনি। আমার মুখ থেকে কথা খসেছে কি খসেনি, ম্যানেজার বলল—রাজপেয়ী কি ছাগল কিনে দেয়?

—কথাটা আবার পঞ্চায়েতে বলতে গেলুম। প্রধান ছিলনি। একজন মেম্বার ম্যানেজারের কথাটি শুনে বাখান-চুয়োড়ি করতে করতে বলল," শালারা দেশটাকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, আবার বড় বড় কথা!

—হ্যাঁ, আজ্ঞে, তারপরেও তিন-চারবার এর দুয়োর আর ওর দুয়োর করলুম। শেষে হাঁপিয়ে ভেজা পাঁপড়টি হয়ে গেলুম।

—আপনি আর কী করবেন! তবে ব্যাঙ্ক আর পঞ্চায়েতের মতন আপনার কথাতেও বেশ মারপ্যাঁচ। রাঘব বোয়ালটি বোলে বুঝতে দেননি। আপনার বুদ্ধি ওদের তিনপো ওপরে। আমার সঙ্গে একবারটি ব্যাঙ্ক আর পঞ্চায়েতে যাবেন? বাপের কিরে, লোনের টাকায় কাঁচি করবনি।

# মঞ্চে ও নেপথ্যে

## লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

১

...আর তিনি বললেন, একজন লোকের দশটি রৌপ্য মুদ্রা আছে। সে যদি একটি হারিয়ে ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে সে তার হারানো মুদ্রাটি না-পাওয়া পর্যন্ত কি আতিপাঁতি করে খুঁজবে না? আর পাওয়ার পর সে তার বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদের ডেকে বলবে না আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কেননা আমি হারানো মুদ্রাটি পেয়েছি...।

২

আলুথালু বাতাস। মোম ঘষা অন্ধকার। ডোবা চাঁদ। আকাশের অনেক ওপর দিকে দু-একটি তারা। নদী থেকে শব্দ উঠে আসছে কলকল ছলছল। উজানে বইছে। নদীর বুকে অনেক দূরে তখন একটি নৌকা দেখা যাচ্ছিল। মাছধরা বোধহয়। তার কাঁপা কাঁপা আলো জলের ওপর পড়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। যেন নৌকা থেকে কেউ একটুকরো আলো গড়িয়ে দিয়েছে নদীতে। আর নদীর পাড়ে তখন চিতায় আগুন বুকে করে একটু একটু পুড়ে যাচ্ছে আমার মা। মন ভালো না থাকলেই এই ছবিটা আমি দেখতে পাই।

৩

মা মারা যাওয়ার পর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। তবু মাঝে মাঝে কীরকম একা-একা লাগে। মনে হয় এই বিরাট পৃথিবীটাতে আমার মতো নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর কেউ নেই। আমার কোথাও কোনও শিকড় নেই। অতীতবিহীন লুপ্ত-ভবিষ্যৎ। শুধু একটা খণ্ডিত বর্তমান আঁকড়ে চোরের মতো, অপরাধীর মতো দণ্ডিত বন্দীর মতো দিন কাটানো। এইরকম সময়ে আমার বুকের ভেতর ছমছম করে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হাত-পা কাঁপে। মনে হয় আমার হাত ছুঁয়ে বকুল সারাটা দিন বসে থাকুক। আমি বকুলের পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকি। হাতে হাতে এটা-সেটা এগিয়ে দিই। আমি জানি, ও বিরক্ত হয়। অফিস যাওয়ার সময় এমনিতেই তাড়া থাকে। তার ওপর আমি কাজের চেয়ে অকাজ বেশি করি। ওর কোঁচকানো কপাল দেখেও আমার কাজের উৎসাহ কমে না। আসলে আমি তো চাই ও রেগে যাক। রেগে যেতে যেতে একটা বিস্ফোরণ ঘটাক। আর সেই বিস্ফোরণের আগুনে গলে যাক আমার জমাট বাঁধা ভয়। মুছে যাক আমার নিঃসঙ্গ প্রহর। কিন্তু বকুলের রাগ কখনও বিস্ফোরণ হয় না। ও জানে একটা অক্ষম অপদার্থ অকেজো মানুষের জন্য আর যাই হোক বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না। বরং তাকে তীব্র তীক্ষ্ণ উপেক্ষাজর্জর করে রাখার শিল্প, তার আঙ্গিক বকুলের অনেকখানি আয়ত্ত। তাই, আমি যখন নিতান্ত ভয়হীন বেঁচে থাকার তাগিদে বকুলের হাউসকোটের একটা প্রান্ত ছুঁয়ে বলি—আজ তুমি অফিসে যেও না বকুল। আজ আমাকে একলা রেখে কোথাও যেও না। বকুল কিন্তু তেতে ওঠে না। মুখঝামটা দেয় না। শুধু ঠাণ্ডা চোখে তাকায়। তারপর আগের মতোই আর পাঁচটা কাজ সারতে সারতে একেবারে স্বাভাবিক গলায়, গলার পর্দা এক ধাপও না চড়িয়ে বলে—ঘরে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে সময় না কাটলে পাগলামি করো। কিন্তু আমাকে বিরক্ত কোরো না। তারপর অন্যদিনের মতোই ঘাড়ে-গলায়

পাউডার মেখে পাটভাঙা শাড়ি পরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বকুল অফিসে চলে যায়। আমি কোনও কাজ খুঁজে না পেয়ে বকুলের ছেড়ে রাখা নাইটি আর হাউসকোট ভাঁজ করে আলনায় রাখি। ব্রা-টা চোখের সামনে মেলে ধরি। হাত বোলাই। সেদিন যেমন ব্রা-এর স্ট্র্যাপের সঙ্গে একটা চুল জড়িয়ে ছিল। চুলটা ফেলে দিতে গিয়ে আমার হাত কাঁপতে লাগল। মনে হল বকুল ঠিক বুঝতে পারবে আমি ওর অনুপস্থিতিতে ওর ব্রা-য়ে হাত দিয়েছি। আর তখন ঠিক শ্লীলতাহানির দায়ে বকুল আমাকে..., যদিও ইদানীং বকুল আমার সামনেই জামা-কাপড় ছাড়ে। বাথরুম থেকে স্নান করে শায়ার দড়িটা বুকের কাছে বেঁধেই বেরিয়ে পড়ে। তারপর আমার সামনেই ব্রা পরে। সায়ার দড়ি পেটের কাছে নামিয়ে বাঁধে। শাড়ি পরে। আমি বকুলের বুকের মাঝখানের ভাঁজ দেখতে পাই। সামান্য আনত দুটি পুরন্ত স্তন দেখতে পাই। স্তনবৃন্তে জলের ফোঁটা দেখতে পাই। তখন আমার কোনও যৌন উত্তেজনা হয় না। কিন্তু বকুল চলে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওর শায়া-ব্লাউজ-ব্রায়ে মুখ ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে। আমি তীব্রভাবে বকুলের ছেড়ে রাখা অন্তর্বাস থেকে একটা মেয়ে-গন্ধ কামনা করি।

৪

সেদিন দুপুরে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। জানলা-দরজা বন্ধ ঘরে পাখার একটানা শব্দ আস্তে আস্তে থেমে এলো। ঘুলঘুলির ফাঁকে কাঠকুটো মুখে করে একটা চড়াই বাসা বাঁধছিল। দরজা-জানলা খোলার শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে পালাল। বাসা বাঁধার ব্যাপারে পাখিও মানুষের মতো নির্জনতা প্রিয় বুঝি? বাইরেটা রোদে ঝাপসা হয়ে আছে। চোখ খুলে তাকানো যায় না। নিঃস্তব্ধ ঝিমধরা দুপুর। জানলার ওপারে নির্জন নিঃশব্দ পথ। উল্টোদিকের মাঠটা রোদে ধুঁকছে। আকাশ যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাঠের গায়ের স্কুলবাড়িটার সারি সারি তালাবন্ধ ঘর। গরমের ছুটি। স্কুলের উঠোনে একটা হাতল ভাঙা টিউবওয়েল আকাশমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী করি কী করি ভাব নিয়ে ঘরের চারদিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, প্রথমেই ঘরের যে অংশ বা যে জিনিসে চোখ পড়বে, সেই অংশ বা সেই জিনিস পরিষ্কার করব। পরিষ্কার থাকলে আবার নতুন করে ঝাড়মোছ করব। চোখ পড়ল বুকশেলফের দিকে। না, ওটা অনেকদিন কেউ খোলেনি। নিশ্চয়ই খুব ধুলো জমেছে। পাল্লা খুলে বই বার করলাম। মোটা ধুলোর স্তর জমে আছে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একটা বইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল তারকেশ্বরের লাল সুতো। শুকিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়া কী একটা পাতা। মা-র কাজ। আমি রাগারাগি করতাম তাই লুকিয়ে লুকিয়ে...। জিনিস দুটো হাতে করে বসে রইলাম। সময় চলে যাচ্ছে। বাইরে বিকেল নামছে। বকুলের ফেরার সময় হয়ে আসছে। বিছানাময় বই ছড়ানো-ছেটানো। ঘরের মেঝে ধুলো ময়লায় একাকার। বকুল ফিরে এসে ঘরের এরকম চেহারা দেখলে খেপে আগুন হয়ে যাবে। তবু আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘর পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করছে না। আমি জিনিসদুটো বুকের ভেতর চেপে ধরলাম। বুকের ভেতর উষ্ণ শিরশির। ছড়িয়ে পড়ছে...ছড়িয়ে পড়ছে সবটুকু বুক জুড়ে। বুকের ভেতর কে হাত বোলাচ্ছে! কার হাত এমন নরম অথচ উষ্ণ! কার স্পর্শে এমন ভরসা আর আশ্বাস! বুকের ভেতর কে ফিসফিস করছে—'ভালো হয়ে যা, খোকা ভালো হয়ে যা।' মনে হচ্ছে আমি যেন হাজার বছরের পুরনো জিনিস খোঁড়াখুঁড়ি করে একটা আস্ত প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করে ফেলেছি। ঘুলঘুলিতে চড়াইটা আবার ফিরে এসেছে। ও কোন সময়ের?

৫

বাবার মুখ দেখে মনে হল ভোঁ বাজিয়ে কোনও স্টিমার বুঝি চলে যাচ্ছে বাবার বুকের ভেতর দিয়ে। তাই অমন উথাল-পাথাল, অস্থির। ছলাৎ-ছলাৎ। বাবার অনেক স্বপ্ন অনেক আশা আমাকে নিয়ে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে একটা দুর্দান্ত রেজাল্ট করে ফেলায় সে আশা পুষ্পে-পত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবার স্বপ্ন আমি মেঘনাদ সাহা বা আইনস্টাইন হবো। নতুন কিছু আবিষ্কার করে পৃথিবীর বুকে দাগ রেখে যাবো। নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি বাবার সব স্বপ্ন, সব আশার বুকে কাঠুরের কুঠার চালিয়ে দিল যে পাষণ্ড, সে আর কেউ নয়, তারই আত্মজ। মাঝপথে বিজ্ঞান পড়া বন্ধ করে সে নাটক শেখার কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাবা অনেকক্ষণ মাথায় হাত রেখে ঝিম মেরে বসে রইল। তারপর বারকতক অস্থির পায়চারি করে মা-কে বলল—আগেই জানতুম। পই পই করে বলেছিলুম ঘরের দরজা বন্ধ করে পাড়ার ছেলেছোকরা জুটিয়ে নাটকের মহড়া বন্ধ করো। এর জন্য তুমি, তুমিই দায়ী। বাবার দু'চোখ জুড়ে এখন ধান-কাটা হেমন্তের মাঠের মতো শূন্যতা। বাবা কি জল কেটে কেটে চলে যাওয়া স্টিমারের ভোঁ শুনতে পাচ্ছে এখনও? আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—পারঘাটা ছাড়িয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সব স্টিমারকেই একদিন বেরিয়ে পড়তে হয় বাবা। নদীর বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশায় একদিন হয়ত স্টিমারটা ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু তার বাঁশির সুর লেগে থাকে মানুষের বুকে। জাগরণে না হোক ঘুমে আর স্বপ্নে সে ফিরে ফিরে আসবেই।

৬

সেদিন কলেজ ছুটি ছিল। দুপুরবেলায় মা-র ঘরে এলাম। মা-র ঘরে তখন মধ্যবেলার রোদ। বিছানার পায়ের দিকে রোদের গুঁড়ো গুঁড়ো কণা অভ্রের মতো চিকচিক করছিল। একটা সোনার মতো রং-ঝলমল ছোট প্রজাপতি বাগান থেকে ঘরে ঢুকে পাখা মেলে উড়তে চেষ্টা করছে। নতুন ওড়া শিখেছে। মা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে। গায়ে নীল ফুলছাপ চাদর। মাথার দুদিকে নদীর মতো চুলের ঢল। কপালে রূপোর আধুলির মতো সিঁদুরের ফোঁটা। ঠোঁট পানের রসে লাল। আমি মায়ের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলাম। মা পা গুটিয়ে শুল। মাথার চুলে বিলি কেটে দিলাম। মা-র ঘুম ভাঙছে না। মাথার কাছে কালো চামড়ার মলাট দেওয়া বাইবেল। একটা পাতার ভেতর থেকে বাসের টিকিট উঁকি দিচ্ছে। তার মানে মা ওই জায়গাটা পড়ছিল। মায়ের ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে কোনও বাছবিচার নেই। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল এমনকি কোরাণ হাদিসও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। ওই ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে মা কি নিজের জীবনের কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়? নাকি কোনও হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসকে খুঁজে পেতে চায় ওইসব বইয়ের পাতায় পাতায়। মা যে পাতাটা টিকিট দিয়ে বন্ধ করেছে সেই পাতাটা খুললাম। একটা জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগানো :

...'কেননা, ঈশ্বর আমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তার গুণে, আমি তোমাদিগের প্রতিজনকেই বলি, নিজের বিষয়ে যেমত বোধ করা যুক্তিসংগত, সে যেন নিজেকে তা হতে বড় বোধ না করে; ঈশ্বর যাকে যে-পরিমাণ বিশ্বাস প্রদান করেছেন, তদনুসারে সে নিজের বিষয়ে সংযত ধারণা পোষণ করুক।' বইটা নামিয়ে রাখার সময় মা চোখ মেলল। দু-চোখে তখনও ঘুম। মা-র পাশে বসলাম। মা বলল—কিরে, বেরবি বলেছিলি?

—হ্যাঁ, আর একটু পরে। মা, তুমি বাইবেল পড়ছিলে?

—ওই একটু দেখছিলাম নেড়েচেড়ে।

—এসব তোমার বিশ্বাস হয়?

—কী সব?

—ওই যে যিশু মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন, কুষ্ঠরোগীকে ছুঁয়ে দিলেই তার অসুখ সেরে যেত। এসব গাঁজাখুরি বোঝ না?

—বিশ্বাস যার যার নিজের। সুখী মানুষের সব আছে। দুঃখী মানুষ শুধু বিশ্বাসটুকু নিয়েই বেঁচে থাকে। শান্তি পায়।

—তুমি কি দুঃখী নাকি?

—তাই বললাম বুঝি?

মা কথা ঘুরিয়ে নিল। মায়ের বিছানা থেকে শেষ দুপুরের গন্ধ উঠে আসছে। নরম, ঠাণ্ডা জবাকুসুম তেল আর নিম সাবানের ফিকে গন্ধ। দুপুর আর মায়ের শরীর থেকে আসা সুবাস সব মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। মা উঠে বসল। বলল—তোর বাবা আজকাল রাতে ভালো করে ঘুমোন না। অনেক রাত অবধি জেগে শুয়ে থাকেন। বিছানায় ছটফট করেন।

—কেন?

—মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। তুই পড়াটা মাঝপথে থামিয়ে দিলি।

—আচ্ছা মা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক বিজ্ঞান পড়ে। গবেষণা করে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে। তাতে সভ্যতা হয়ত খানিকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু, একজন নাট্যকার বা একজন অভিনেতা বা একজন গায়ক, ছবি আঁকিয়ে তারা মানুষের অন্তরের কথা বলে, সভ্যতার দর্শনের কথা বলে, সেটা অনেক বড়ো। এরা মানুষের চৈতন্যের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়।

মা চুপ হয়ে যায়। কী বোঝে কে জানে। জিজ্ঞেস করি—তুমি কী বলো?

—কীসের?

—আমি নাটক নিয়ে থাকতে চাই। খুব বড় নির্দেশক হতে চাই। অভিনেতা তৈরি করতে চাই। পারব না? মা?

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে—আবার কিন্তু সেই বিশ্বাসের কথাটা এসে গেল। যিশুর অলৌকিক ক্ষমতা আমি দেখিনি। তুমি কী পারবে, কতটা পারবে তা-ও জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করতে চাই। তাতে অশান্তিটা দূর হয়।

মা-র শরীর থেকে তেল-সাবান-ধুনোর গন্ধ ছাড়াও এই শীতের শান্ত অপরাহ্নে অন্য একটি গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় নাকে এসে লাগছিল। যাকে অন্য সময় মনে হয় মা-মা গন্ধ। এই গন্ধটা কি মায়ের মায়া-মমতা মাখানো বিশ্বাসের গন্ধ?

৭

সেদিন রিহার্সাল সবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টি কমেনি তাই তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে নানা কথা চলছে। আমি দলের ছেলেদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে নাটক ব্যাপারটা হল বিনয়ের ফলিত রূপ। নাট্যকারের রচনায় অনেক না-বলা কথা থাকে। চরিত্রগুলির সংলাপে আচরণে নানা ইশারা থাকে। একটি সংলাপের ভেতরে গভীর ব্যঞ্জনা থাকে। কাজেই নাটককে ঠিক-ঠাক মানুষের কাছে পৌঁছতে হলে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ-বিন্যাস-আলো-সঙ্গীত-পোশাক এগুলোকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। মঞ্চে চরিত্রগুলোর হাঁটা-চলা, কথা বলা না-বলা সবটাকেই শিল্প করে তুলতে হবে। মোদ্দা কথাটা হল ভারসাম্য। দল একটা সংসার। সেই সংসারের

প্রত্যেক সদস্য, যে নাটকে অংশ নিক, না-নিক নাটককে সার্থক করে তুলতে সমান দায়িত্ব নেবে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ির সামনেটা ভরা-ভাদ্দর হয়ে রয়েছে। এক হাঁটু জল। তখনও বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ ছিরছির। রাত প্রায় এগারোটা। গেটের আওয়াজে বাইরে তাকালাম। গেট খুলে এক হাঁটু জল ভেঙে ঘাড় গুঁজে বাবা বাড়ি ঢুকছে। বাবার দুটো হাত আটকা। বাজারের ব্যাগ। রাত্রের দিকে সস্তা পড়ে। দুটো হাতই আটকা থাকায় বোধহয় বাবা ছাতা খুলতে পারেনি। বারান্দার কম পাওয়ারের ভেজা ভেজা আলো জলীয় বাতাস, বৃষ্টি ভেদ করে বাবার গায়ে পড়েছে। বাবাকে বয়স্ক দেখাচ্ছে। বাবাও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে? বাবা অন্যদিন অনেক আগে ফেরে। আজ বোধহয় ট্রেনের তার ছিঁড়েছে আবার। বারান্দায় উঠে বাবা জানলা দিয়ে ঘরে তাকাল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। বাবা কিছু বলল না। আমিও। দুজনের এই না-বলা কথায় কি বলার রয়ে গেল কিছু? বাবা কি আমার ভারসাম্যের ব্যাখ্যা শুনতে পেয়েছে?

৮

এখন আমার নাটকের দলের খানিকটা নাম-ডাক হয়েছে। দু-তিনটে নাটক দর্শক নিয়েছে। রিহার্সাল, ওয়ার্কশপ, স্টেজ শো, কলশো এর মধ্যেই দিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছিল। একদিন রাতে বকুল এলো—স্বপ্নে। বলল, তুমি অমন পরের মতো তাকাও কেন আমার দিকে? আমি তাকিয়ে রইলাম। ও আস্তে আস্তে ওর শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিল। আরিব্বাস। ঘোমটা দিলে তো ওকে দারুণ দেখায়। বেশ ডিগনিফায়েড। অথচ কী এক রহস্য ঘিরে রয়েছে ঘোমটার আড়ালে। তাহলে ডিগনিফায়েড যারা হয় তাদেরই কিছু রহস্য থাকে? নাকি রহস্য থাকলে তবেই ডিগনিফায়েড হওয়া যায়। দ্যুততেরিকা ঘুমের মধ্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

৯

একদিন পড়ন্ত বেলায় বাড়ি ফিরছি। দূর থেকে দেখলাম আমাদের গেটের কাছে বকুল দাঁড়িয়ে আছে। আমার বোনের সঙ্গে গল্প করছে। বকুল আমাদের পাড়ার মেয়ে। সু-সম্পর্কের সুবাদে মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়ি। মা আর বোনও বকুল বলতে অজ্ঞান। ওদের কথা থেকে মনে হয় পৃথিবীতে আদর্শ ভালো মেয়ের সংজ্ঞা মানেই বকুল। এমনকি বাবাকেও কখনও-সখনও বলতে শুনেছি বকুল আসে না? বকুল আমাকে এড়িয়ে চলে—সমীহ। আমিও—অবজ্ঞা। গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম উঠোনের শিশু গাছের ফাঁকে কাঁসার মতো একটুকরো আকাশ ঝুলে আছে। বকুল ভেতরে চলে গেল। বোন বলল—দাদা, বকুলদি চাকরি পেয়েছে। আমি ঠিক জানার চেষ্টা করিনি কখনও, ও কী করে? ওর কতদূর পড়াশুনো? সাইন্স না আর্টস, পাস না অনার্স? তবে মার কথা থেকে আর রাস্তাঘাটে ব্যস্ত চলাচল চোখে পড়ে গেলে মনে হোত ও বোধহয় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অনেকগুলো টিউশনি করে।

বকুল নিজের হাতে ডিশে করে দুটো সন্দেশ নিয়ে এলো। এক গ্লাস জল। টেবিলে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। অবাক আমাকে দেখে বলল—ফুল মা বাড়ি নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে। আমার মা-কে পাড়ার ছেলেমেয়েরা ফুল-মা বলে ডাকে। বললাম—কীসের মিষ্টি? চাকরির। বকুল নতমুখে শাড়ির আঁচল নখে জড়াতে লাগল। বর্ষাকাল। তেমন গরম নেই। মাথার ওপর ফুলস্পিডে ফ্যান চলছে। তবুও ও ঘামছিল কেন, কে বলবে। বকুল কি আজ অন্যদিনের তুলনায় বেশি সেজেছে? কপালে এই এত্ত বড়ো খয়েরি টিপ। আকাশ-নীল শাড়ি।

জানলা দিয়ে গোধূলির আলো পড়ে ওকে কেমন অন্যরকম লাগছে। এই সময়টাকেই কনে-দেখা বলে না? ভেতরে ভেতরে একটা বেখাপ্পা ইচ্ছে হল আমার। স্বপ্নে যেমন মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিল ও, মনে হল আজ একবার আমি নিজের হাতে ওর মাথায় আঁচল তুলে দিই। ও অনেকক্ষণ পর বলল—পুজোর প্রসাদ। আমার ইচ্ছের ঘোর তখনও কাটেনি। অপলক তাকিয়ে আছি। ও বোধহয় কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই বলল—তুমিই প্রথম।

আমি এই বাক্যটাকে মনের মধ্যে নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এর ভেতরের মানেটা বুঝতে চাইছি। তুমিই প্রথম মানে কি ওর জীবনের প্রথম পুরুষ নাকি ওর পুজোর প্রসাদের আমিই প্রথম।

ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে সন্ধে এলো। বর্ষাকালে এরকম হয়। আলো আর অন্ধকারের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। বকুল চলে গেছে অনেকক্ষণ। আমি চোখ বুজে শুয়ে আছি। আজ রিহার্সাল নেই। মনে মনে বললাম—এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে যেন সেদিনের স্বপ্নটা আর একবার দেখি। নাহ, ঘুম এলো না। স্বপ্নও। মা ঘরে এসে আলো জ্বালাল। কপাল থেকে হাত সরালাম। দেখলাম মার হাতে একটা হলুদ খোলের চওড়া লাল পাড়ের নতুন তাঁতের শাড়ি। মা শাড়িটা আমার চোখের সামনে বিছানার ওপর মেলে জিজ্ঞেস করল—দেখ তো কেমন হয়েছে? উত্তর না পেয়ে একা একাই বকবক করে গেল—আহা, মেয়েটা কত করে আমাদের জন্য। আজ ওর চাকরির প্রথম দিন। কী যে আনন্দ হচ্ছে। কী আর দেব, তাই...

সেদিন স্বপ্নটা ভোরে ছিল না মাঝরাতে?

১০

শম্ভু মিত্র বলতেন : অভিনয় অন্যান্য শিল্পকর্মের মতোই বাস্তবের প্রতিফলন এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ে রূপ পায় আমাদের রক্তে অন্তর্নিহিত অতি গোপন আশা-আকাংখা যা বাস্তবে পরিণত করার কামনা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে। যা লব্ধ ও অলব্ধ এবং যা লভ্য ও অলভ্য—এইসব বিপরীতের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে এক অবর্ণনীয় জটিল প্যাটার্ণ তৈরি হয় আমাদের মনে—বাস্তবের ও স্বপ্নের এই নিগূঢ় সংঘাতের ফলে।

১১

ছাদে বসেছিলাম। আমি আর মা। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। বোনও কি? জানি না। প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েদের ঘুম অথবা জেগে থাকার কথা কখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিশেষ করে যেদিন চাঁদ ওঠে। আজ আমাদের ভাঙাচোরা মলিন বাড়িও চন্দ্রালোকে হাসি-খুশি। মা বলল—বকুলের দেখাশোনা চলছে। আমি উত্তর দিলাম না। মা হাঁটু ভেঙে বসে আছে। হাঁটুতে চিবুক। মায়ের চাউনির ভেতর একটা বলতে চাওয়া কথা কাঁপছে তিরতির। হয়ত এই নির্জনতা নৈঃশব্দে মা-র খানিকটা সংকোচ হচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের সংকোচ। নির্জনতায় প্রত্যাখ্যান অনেক বেশি পরিধি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয় পাচ্ছে নাকি মা? মা-র বাঁদিকের গালে একটা লম্বা ছায়া পড়েছে। ওদিকটায় মাধবীলতা গাছ। মায়ের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ছায়াটাও কাঁপছে—ভাঙছে—জুড়ছে। এই মানুষটাকে আমার এক একসময় ঈশ্বর সেজে বর দিতে ইচ্ছে হয়। আমি যদি বলি—তুমি তিনটে বর চাও, তাহলে মা বলবে—ঈশ্বর, আমার স্বামীকে ভালো রাখ। ঈশ্বর আমার সন্তানদের ভালো রাখ। ঈশ্বর পৃথিবীর সকলকে ভালো রাখ। মাকে যদি অনন্ত বরদান করা যায় তাহলেও মা নিজের জন্য কখ্খনো কিছু

চাইতে পারবে না।

আকাশ জুড়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভরা জ্যোৎস্নার চারপাশ তছনছ। একেই কি বলে জ্যোৎস্নার রাহাজানি? কোথাও কোনও অন্ধকার নেই। মালিন্য নেই। অথচ মায়ের বসে থাকার ভঙ্গিমায় কেমন এক বিষণ্ণতা। আমার ইচ্ছে হল এই বিষণ্ণতা গুঁড়ো গুঁড়ো করে উড়িয়ে দিই ভাসিয়ে দিই পৃথিবীর মধ্যে। মা-র শরীর ছেড়ে ওরা ডুবে যাক এই জোছনা রাতের সমাহিত প্রকৃতির ভেতর। খুব হালকা গলায় বললাম—বলো মা, কী বর চাও তুমি? মা হাঁটু থেকে মুখ তুলল। বলল—ঠিক? দিবি?

—ঠিক।

—পরে মত পালটাবি না?

—তেমন কিছু তুমি চাইবেই না।

—বকুলকে বিয়ে কর।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুই। বড়ো ভালো মেয়ে। তুই তো রোজগারপাতির দিকে মন দিবি না। ও চাকরি করে।

—শুধু সেইজন্য?

—না। বকুলও তোকে মনে মনে...। আমি মা। সব বুঝতে পারি।

১২

অন্ধকারে ছায়ানারীর মতো পাশে শুয়েছিল বকুল। বাইরের আলোর যে ছিঁটেফোঁটা আভা আসছিল তাতে ওর শরীরের বড়ো অস্থির দুর্বল ও ভঙ্গুর ছায়ারেখা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মুখ যেহেতু ফেরানো ছিল আলোর একেবারে বিপরীতে, তাই মুখের এমনকি কোনও অতি দুর্বল ক্ষীণ সামান্যতম রেখারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না। বকুলের কোথাও একবিন্দু প্রতিরোধ ছিল না। যে নগ্নতা উপযুক্ত লগন ছাড়া উদ্‌ঘাটন করা যায় না, আজ সেই উপযুক্ত লগনে একেবারে প্রতিরোধহীন উজারা শুয়ে আছে বকুল। কিন্তু, আমার তো অসম্পূর্ণ নয়, পুরো বকুলকেই চাই। আমি বকুলের মুখ আলোর দিকে ফেরাতে চাইলাম। বকুলের যত প্রতিরোধ কি ওই মুখটুকুতে? বিপন্ন আমি ওই অনুসন্ধান পর্বের মধ্যেই কেন জানি না, দুঃসহ একাকীত্ববোধে আক্রান্ত হতে লাগলাম। একাকীত্ববোধ থেকেই কি ক্লান্তি আসে?

১৩

বিয়ের ঠিক সপ্তাহখানেকের মধ্যে বকুল এ-সংসারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। রান্নাঘর থেকে মা-কে ছুটি দেওয়া, অফিস বেরনোর সময় বাবার টিফিন-জলের বোতল এগিয়ে দেওয়া, অগোছালো এলোমেলো স্বভাবের বোনের জামা-কাপড় ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখা এমনকি কী কী ধোপার বাড়ি যাবে, কাজের মাসী রান্নাঘরের তাক কোনদিন পরিষ্কার করবে, এ-সবও সেই ঠিক করে দিতে লাগল।

১৪

বকুল আসার কয়েক মাসের মধ্যেই এ বাড়িতে কয়েকটা বড়ো ঘটনা ঘটে গেল। বকুল তার এক সহকর্মীর সঙ্গে একেবারে বিনা দেওয়া-থোওয়ায় তুলতুলি মানে আমার বোনের বিয়ে ঠিক করে ফেলল। মা হঠাৎ কয়েকদিনের পেটের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। আর বাবার রিটায়ারমেন্টের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। বকুল এ সংসারে আসার দ্বিতীয় মাস

থেকেই বাবা ওর হাতে সংসার খরচের টাকা তুলে দিত। ওর সঙ্গে নিজের টাকা মিশিয়ে বকুল ম্যানেজ করছিল। মায়ের অসুখ, বোনের বিয়ে, ঘরে-বাইরে পরিশ্রম—বকুল দিনদিন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। আর গম্ভীর মানুষদেরই তো বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়।

১৫

নাটক চলছিল। স্টেজ, কল-শো, রিহার্সাল। সঙ্গে কিছু অডিও-ভিসুয়ালের কাজ। টাকা রোজগারে সহজ ও মেধাহীন পথ। সংসার আর দল দুদিকের কথা ভেবেই। একদিন বকুলের হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দিলাম। বকুলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, ভালোবাসা মানে আমার কাছে কমিটমেন্ট, দায়বদ্ধতা।

১৬

একটা আশ্চর্য সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। এই মাত্র কিছুদিন আগেও কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শ পৃথিবীতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। অনেকগুলো দেশ এই তত্ত্বকে আঁকড়ে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রচিন্তাকে গঠন করতে চেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপের ভাঙন একটা বড় ধাক্কা দিল।

১৭

সোভিয়েতকে কেন্দ্র করে যে সমাজতান্ত্রিক শিবির সত্তর বছর ধরে গড়ে উঠেছিল তার ভাঙন দুনিয়ার প্রগতিশীল আন্দোলনকে নব্বই দশক-এর শেষে তছনছ করে দিল। সেই অস্থির কম্পনে এমনকি রোজের দেখা চেনামুখগুলোও বদলে যেতে থাকল। একদিকে এই ভাঙন অন্যদিকে নয়া উপনিবেশবাদের চেহারায় ভুবনায়নের প্রতিরোধহীন ব্যাপ্তি—তৃতীয় দুনিয়ার ছন্নছাড়া পরিস্থিতিকে বে-আব্রু করে দিয়েছে। সকলেই এখন গণতন্ত্র খোঁজে। কিন্তু, তারও কি কোনও সুনির্দিষ্ট চেহারা তৈরি হয়েছে? গণতান্ত্রিক হতে গিয়ে বন্ধু আর শত্রু সবই তো মিলে মিশে যাচ্ছে। কে গ্যারাণ্টি করতে পারে গণতন্ত্রের গলায় ফ্যাসিবাদ কথা বলে উঠছে না? এখন সামনে কোনও পরিষ্কার পথ নেই। কোনও আদর্শ নেই। বিশ্বাসের লাইট-হাউস নেই। একদিকে এই আবিশ্ব রাজনৈতিক সংকট অন্যদিকে বিজ্ঞান-জগতের মাল্টিমিডিয়া। এর সঙ্গে তাল রেখে পালটে যাচ্ছে মানুষে মানুষে সম্পর্কের রূপরেখা, মূল্যবোধ। এই পালটে যাওয়া সময়, পালটে যাওয়া সম্পর্ককে নাটকে ধরতে চাইছিলাম ভীষণভাবে। মা-র মুখ থেকে, শরীর থেকে ক্রমশ সমস্ত রক্তকণাগুলি যেন নির্বাসনে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে হারিয়ে যেতে লাগল অতিগোপন ইচ্ছে, নিভৃত বাসনা। চোখ দুটো দিনে দিনে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল। চোয়ালের হাড় উঁচু। দূরে বৃষ্টি নামলে যেমন সব শাদা ঝাপসা হয়ে আসে, মায়ের মুখ তেমনি সবটুকু ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ হয়ে উঠছিল। মায়ের চোখের রং এখন সবসময়েই মেঘলা দিনের মতো নিষ্প্রভ আর ফিকে হয়ে থাকে। সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে মা। কেমো শুরু হওয়ার পর কষ্টটা আরও বাড়ল। এই শেষের দিনগুলো আমি যতটা পারতাম মার থেকে দূরে থাকতাম। নতুন নাটকের রিহার্সালে ডুবে থাকার চেষ্টা করতাম। আসলে ওই মাকে আমি দেখতে চাইতাম না। সহ্য করতে পারতাম না। বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে মাঝে মাঝে এসে বকুলকে সাহায্য করত। আর আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা। বকুল একদিন অনুযোগ করল—তোমাদের শিল্প বুঝি নিজের মায়ের মৃত্যুশয্যাকেও স্পেয়ার করে না?

১৮

মা চলে গেল। খুব আড়ম্বরহীন। দাহ করে ফেরার পর ছাদে বসেছিলাম। কেউ আমাকে ডাকেনি। কত রাত তাও জানি না। পেছনে পায়ের শব্দ পেলাম—বাবা। দুর্বল রেখায় আঁকা ছবির মতো ভাঙাচোরা চেহারার বাবাকে দেখে, এই প্রথম, মা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম বুক ঠেলে কান্না এলো। বাবা বলল—খোকা তোর সঙ্গে কটা কথা বলতাম। তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল—নিয়ম পালনের ব্যাপারে তোর যা ইচ্ছে তাই হবে। বিশ্বাসের বাইরে কিছু করলে তোর মা কষ্ট পাবে। আমি তাকিয়েছিলাম বাবার দিকে। কতদিন বাবাকে ভালো করে দেখিনি। এত রোগা আর অবসন্ন হয়ে গেছে বাবা? কখন? বাবা বলল—আমি আর সংসারে থাকব না খোকা। তোর মা-র জন্য আটকে ছিলাম। এবার একটু এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াব। আসব। মাঝে মাঝে আসব। তোর মা শেষপর্যন্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকেছে। অবিশ্বাসী মানুষ আমি। সংসারের বাইরে থেকে দেখি বিশ্বাসটা খুঁজে পাই কিনা। বাবা যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল। মা বিশ্বাসী। বাবা অবিশ্বাসী। আর বকুল? সেকি এ-দুইয়ের মাঝখানে?

নতুন নাটকের জন্য তেইশ চব্বিশের একটা মেয়ের খোঁজ চলছিল। পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিকঠাক। একদিন গগন বলল, পেয়েছি। দারুণ গায়। স্মার্ট। ঝকঝকে। ইনটেলিজেণ্ট। ঠিক যেরকম তুমি চাইছ। গার্গি এলো। ফেডেড নীল জিনস। গোলাপী বাটিক ছাপ পাঞ্জাবি। হর্সটেইল।

প্রথামাফিক আলাপ-পরিচয়ের পর দলের সকলের অনুরোধে গার্গি গান একটা গাইল। 'তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে/আমার ভাঙল যা-তা ধন্য হল চরণ পাতে'। ঘরের নিবিড় আবহাওয়ায় গানটি শুনতে শুনতে সকলে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। গার্গির স্বরনালীর মধ্যে কী যে এক মিহি পর্দা আছে, যখন চড়ার দিকে গাইছিল তখন ওর আর্তি আর আকুতিতে বুকের ভেতরটা এক অলৌকিক কষ্টে এমন করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চারদিকে ভুবনজোড়া ভাঙনের মাঝে ও কি সত্যিই কোনও সবুজ দ্বীপের খোঁজ পেয়েছে?

১৯

আমাদের তিন ঘরের বাড়িতে এখন আমি আর বকুল। আমরা এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাত-পা মেলে থাকি। রাতেও।

২০

গার্গি জানে না, বুঝতে পারে না, যে সে যখন কথা বলে তখন আমি গান শুনতে পাই। তার সব কথাই আমার কাছে গান হয়ে আসে। আর সেই কথাময় গানে সুরের ঘাটতিটুকু পূরণ করার জন্য আমি তাতে কান্না মিশাই। কান্না থেকে সুর ওঠে। গার্গি তুমি কি বোঝো, আমার যাবতীয় সংকট, আর অবিশ্বাস থেকে পরিত্রাণ পেতে কী ভীষণ ভাবে আমি তোমাকেই আঁকড়ে থাকতে চাইছি? তুমি তো দেখোনি ছিল কত দীর্ঘ পর্যটন। স্বর স্বপ্ন কাম।

২১

এক একসময় খুব কষ্ট পেতাম। গার্গি বলত, ক্রিয়েটিভ মেনোপস। আমার মনে হোত, শিল্পে মাঝারি মাপের মানুষদের দিয়ে কিচ্ছু হয় না। ট্যালেণ্ট চাই ট্যালেণ্ট। সেই ট্যালেণ্ট আমার নেই। অথচ আমি যে নিজের হাতে আসা-যাওয়া দুদিকেরই নৌকো পুড়িয়ে দিয়েছি, মোমের দুদিকের সলতেই একসঙ্গে জ্বালিয়ে বহ্ন্যুৎসব পালন করেছি। আমার ভীষণভাবে মোহিতদার

কণ্ঠনালীতে সূর্য নাটকের কথা মনে পড়ত। একটা মানুষের গলায় সূর্য আটকে গেছে। মাঝে মাঝে কাশি হয়। তখন কিছু কিছু খণ্ডাংশ বেরিয়ে আসে। কিন্তু, সূর্যটা নয়। সেই সূর্যটা কিন্তু তার ভেতরে ক্রমাগত যন্ত্রণার আলোড়ন চালিয়ে যায়, চালিয়েই যায়।

গার্গি বলত, জিনিয়াসরা বহু যুগ পর পর হঠাৎ আসে। কিন্তু মাঝের এই সময়টায় আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য মাঝারি মাপের শিল্পকর্মীদেরই সব থেকে দরকার। এরাই প্রবহমানতা রক্ষা করে।

২২

গার্গি তুমি আমার বিশ্বাসের বাতিঘর হয়ে উঠছ দিন দিন।

২৩

সেদিন গার্গি বার বার সংলাপ ভুল করছিল। বিরক্ত হয়ে খুব রূঢ় আচরণ করে ফেললাম। পরে নিজেরই খারাপ লাগছিল। গার্গির হাতদুটো ধরে ক্ষমা চাইলাম। গার্গি বলল—তোমাকে এসব মানায় না।

—কেন?

—শোক-দুঃখ-আনন্দ-ভালোবাসা-লোকাচার এইসব কিছুর অনেক ওপরে থাকবে তুমি।

গার্গির চলে যাওয়ার দিন কি তখন থেকেই ঠিক ছিল? গার্গি কি বুঝতে পেরেছিল, ও চলে গেলে আমি কিছুতেই...

২৪

একটা লোক কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছিল। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম জানলার ওদিকে একটা ছায়া। ওমা, লোকটাকে অবিকল আমার মতো দেখতে। লোকটার হাত-পা-বুক-পিঠ দেখা যাচ্ছে না। শুধু আগুনের ভাটার মতো বড়ো বড়ো দুটো চোখ গোটা জানলাজোড়া বিরাট বড়ো মুখটার ওপর ভাসছে। আর তা থেকে জল ঝরছে টপটপ। ভয় পেয়ে দু-হাতে চোখ ঢাকলাম। এই লোকটারও কি লাইট-হাউস হরিয়ে গেছে? হঠাৎ লোকটার মুখটা মিলিয়ে গিয়ে জানলায় রং ঝলমল বেগুনি প্রজাপতি। তার ডানায় গোল দুটি চক্র। আমি প্রজাপতিটাকে ধরতে গেলাম। দেখলাম জানলায় গার্গি দাঁড়িয়ে আছে। আমি দু-হাত দিয়ে ছোট শিশুর মতো গার্গিকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। ওমা, কোথায় গার্গি। আবার সেই লোকটা। কাঁদছে গুঙিয়ে গুঙিয়ে।

বকুল ধাক্কা দিচ্ছে। বললাম—ধাক্কাচ্ছ কেন? আমি তো জেগেই আছি। কিন্তু বকুল বোধহয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। ওর তো অন্য কারোর কথা শোনার অভ্যেস নেই। কোনওদিন। গজগজ করছে— ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে। কদিন নাচিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ড্যাং ড্যাং করে বরের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে সংসার করছে। কেঁদে মরো এখন।

২৫

সেই থেকে কী যে ভয় বাসা বেঁধেছে বুকে। একা থাকলেই মনে হয় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। বুকের ধকধকানি বেড়ে যায়। নিত্যকার বুকভাঙা এই ভয় আর সহ্য হয় না। আর ওই লোকটার গোঙানি কান্না।

২৬

দল ভেঙে গেছে অনেকদিন। বাতিঘরের আলো নিভে যাওয়ার পরই।

২৭

এখন অষ্টপ্রহর বুকে ভয় নিয়ে আর বকুলের সংসারের কাজকম্মো করে দিয়ে সময় কাটে। বকুল বলে না। তা বলে নিজেরও তো একটা বিবেক আছে। শুধু শুধু কারোর অন্নধ্বংস করা যায়? বকুল অবশ্য তাড়িয়ে দিতে পারত। দেয় না। অশেষ দয়া ওর।

২৮

বকুলের আসার সময় পার হতে চলল। এবার না উঠলেই নয়। বইগুলো না হয় পরে গুছোব। আগে টাইম-কলের জলটা ভরে নিই। বকুল তোলা জলে চান করে।

২৯

ঘুমের গহন থেকে যেমন স্বপ্ন উঠে আসে, তেমন মাঝে মাঝে সেই মেয়ে। যেমন এখন। ও যেন আমার পাশে পাশে থেকেও ছুটছে। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে। তুমি অমন সবসময় ছোটো কেন, গার্গি?

—ছুটব না? পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে হলে গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে যে। যে পারবে না, সে হেরে যাবে। যেমন তুমি। দুয়ো দুয়ো দুয়ো। আকাশ বাতাস জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল শব্দ ক'টি। দুয়ো, দুয়ো, দুয়ো।

৩০

...আর সেনারা তাঁকে নিয়ে গেলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ রাজবাটি মধ্যে, আর সেথায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত সেনাকে ডেকে এনে একত্রিত করলো। তারা তাঁকে বেগুনি বর্ণের পরিধেয় পরিধান করালো আর তার মস্তকে পরিয়ে দিলো কাঁটার মুকুট। আর তারা নলখাগড়া দিয়ে তাঁর মস্তকে আঘাত করলো, তাঁর দেহে থুথু নিক্ষেপ করলো...আর তারপর তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার পর তারা সেই বেগুনি বর্ণের পরিধেয় খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলো তাঁর নিজের বস্ত্র আর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে গেল। ...তারপর তারা তাঁকে ক্রুশে স্থাপন করলো, আর তাঁর পরিধেয় বস্ত্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল, ভাগ্য পরীক্ষা করে স্থির করলো, তারা কে কোন অংশ নেবে। ...আর তৃতীয় ঘটিকার সময় তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলো।

# টিয়া

## পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

'আচ্ছা বেয়াদপ হয়েছে তো পাখিটা। নতুন খাঁচাটা কেটে পালিয়েছে।'—সাত সকালে নমিতার তাতস্বরে ঘুম ভেঙে অমিত দেখল খাঁচাটা শূন্য।

বছর খানেক হল পাখিটা কিনে এনেছে অমিত, গ্যালিফ স্ট্রিটের খালপাড়ে বসা রোববারের হাট থেকে। হাটটা আগে বসতো হাতিবাগানে রাস্তার দুধারে, 'অপারেশন সান-সাইন'-এর দৌলতে এই স্থান পরিবর্তন। বহুদিন ধরেই নমিতা বলছিল একটা পাখির কথা। নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে এই পাখি কেনা।

'এটা নাকি বিরল প্রজাতির টিয়া। এদের পোষ মানানো কঠিন'—বলেছিল পাখি বিক্রেতা। অমিতের মনে পড়লো ঐ সাবধানবাণী। নমিতার জেদাজেদিতেই তবুও কেনা। গায়ের রঙ টিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে গাঢ় সবুজ। রঙের বিশেষত্ব বলতে অনন্ত ঐ সবুজের মধ্যে দু'একটা কালো ছোপ। ঠোঁটের রঙ লাল-এর বদলে একটু গোলাপি ঘেঁষা।

'সিঁদুরে লালের প্রতি আমার ঝোঁক বেশি। আর তাছাড়া টিয়ার ঠোঁট সিঁদুরে লাল না হলে কি টিয়াকে মানায়?'—অমিত প্রশ্ন রেখেছিল নমিতার কাছে। নমিতা আধুনিকা। নমিতার সিঁদুর তেমন পছন্দ নয়। হয়ত সেই কারণেই সিঁদুরে লাল-এর প্রতি অমিতের পক্ষপাতিত্বকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। উত্তরে নমিতা বলেছিল,

—কেন সিঁদুরে লাল না হলে কি লাল হতে পারে না? লালের আল্‌তো ভাব, আছে বা নেই,—এটাই বা মন্দ কি?

—তবে লাল না হলেও তো আর ক্ষতি ছিল না।

—বলো কি? তবে কি টিয়ার ঠোঁট বলে বোঝা যেত?

—কেন, টিয়ার ঠোঁট বলে না বুঝতে পারলেই বা ক্ষতি কি?

—তবে তো ওটাকে টিয়াপাখি বলেই বোঝা যেত না।

—কেন, টিয়াপাখি বলে না বুঝতে পারলেই বা ক্ষতি কি? ওটাকে তো পাখি বলে চেনা যেত।

—তা, যেত। তবে আমার পছন্দ যে টিয়া। অন্য কোনো পাখি নয়।

—অন্য কোনো পাখি নয় কেন?

—সহজে পোষ মানে বলে।

—কেন, আরো তো পোষমানা পাখি আছে। যেমন ময়না, কাকাতুয়া।

—ওদের পোষা কঠিন।

—কঠিন কেন?

—যদি কঠিন-ই না হতো, তবে বেশিরভাগ লোক টিয়া পোষে কেন মশাই? কজনকে ময়না, কাকাতুয়া পুষতে দেখেছো?

—দেখিনি বটে, তবে কারণটা নিয়ে ভাবিওনি।

—আমি ভেবেছি।

—কী?

কিছুক্ষণ চুপ থাকে নমিতা। তারপর বলে, 'জানি না।'

—বলোই না। যখন ভেবেছো, কী ভেবেছো? একটু তো বলো।

—না কিচ্ছু না।

—আরে কিছু তো ভেবেছো?

—ভেবেছি...., না থাক

—যা ভেবেছো, বলোই না বাবা, এটা তো আর কোনো থিসিস পেপার নয় যে সামান্য ভুলের জন্য ডক্টরেট বরবাদ হয়ে যাবে?

নমিতা কিছুতেই মুখ খোলে না। নমিতার মৌনতা আরো পেয়ে বসে। অমিতও চুপচাপ। নমিতার মৌনতা নিয়ে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর আবার নিজের ভাবনায় হারিয়ে যায়। প্রসঙ্গে ফিরে আসে। নমিতার তাতস্বরে চিৎকারের প্রসঙ্গে।

—এতো সাতসকালে আবার কার সঙ্গে চেঁচাচ্ছো। বিত্তির মা বাসন মাজতে আসেনি বুঝি?

—আরে না, না, সে মহারাণী তো আজ আসবেন না বলেই গেছেন।

—তাহলে তোমার রোষের কারণ কী? বুবাই কি পড়তে না বসে দুষ্টুমি করছে?

—তাও না। শুয়ে শুয়ে সাংবাদিক-এর মতো প্রশ্ন না করে উঠে এসে দেখো, কী হয়েছে?

—আরে, বলোই না কী হয়েছে?

—পাখিটা খাঁচা কেটে পালিয়েছে।

—কদিন আগেই তো নতুন খাঁচা এনে দিলাম, কীভাবে কাটলো?

—সেটাই এসে স্বচক্ষে দেখে যাও। অন্যের মুখে শুনে সংবাদ লিখে লিখে সরজমিন দেখার অভ্যাসটাই তোমার চলে গেছে।

এরকম মোক্ষম খোঁচা খেয়ে আর শুয়ে থাকতে পারল না অমিত। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

—কটা বাজলো রে বুবাই?

—ছোট কাঁটাটা আটটার ঘরে আর....

—বড় কাঁটাটা কটার ঘরে বল? এতদিন চেষ্টা করেও ঘড়ি দেখাটা শিখতে পারলি না?

—আটটা কুড়ি।

—এটাও ঢোক গিলে বলতে হয়?

—একটু মজা করছিলাম।

—বাবার সঙ্গে মজা?

—মজা করলে তুমি যে রেগে যাও।

—আমি রেগে গেলে তোর কি ভালো লাগে?

—তুমি রাগলে আমি মজা পাই।

—তবে মার সঙ্গে মজা করিস না কেন?

—মা রাগলে ভয় পাই।

—মজা পেতে তোর খুব ভালো লাগে, তাই না?

—ভয় পেতে আমার ইচ্ছে করে না।

পিতাপুত্রের কথোপকথনের মধ্যে অনির্বাণের আগমন। অনির্বাণ অমিতের বাল্যবন্ধু। সরকারি উচ্চপদে আসীন।

—কীরে বাবা-ছেলের ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে কী কথা হচ্ছিল?

—আরে, আর বলিস না। বুবাইটা যা ডেঁপো হয়েছে না, বলে কিনা আমি রাগলে মজা পায় আর মা রাগলে ভয়।

—সে আবার কী?

—হ্যাঁরে, আরো বলে কিনা, মজা পেতে খুব ভালো লাগে, ভয় পেতে একদম ইচ্ছে করে না।

—তাই, বুবাইবাবু, মাকে তোমার খুব ভয় করে?

বুবাই কোনো উত্তর দেয় না। আবার অনির্বাণ বলে,

—আর মা তোমাকে বকার সুযোগই পাবে না।

—কেন?

—মা চাকরিতে যাবে।

অনির্বাণের মুখে চাকরির কথা শুনে বুবাই চমকে ওঠে। অমিতও। অমিত প্রশ্ন করে,

—সত্যি সত্যি নমিতার চাকরি হচ্ছে?

—হ্যাঁ তবে আর বলছি কি?

—কোথায়?

—একটা স্কুলে। এখন বেসরকারি আছে। খবর আছে, বছরখানেকের মধ্যে সরকারি হয়ে যাবে, তখন পাকাপোক্ত সরকারি শিক্ষিকা।

নমিতা এতক্ষণ শূন্য খাঁচার দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করছিল। অনির্বাণের আগমনে মনের মধ্যে হা-হুতাশ বদলে আনন্দের ঝিলিক। কিছুটা খটকাও। এত সকালে অনির্বাণের আসা। হয়ত কোনো সুখবর আছে। মনের নিভৃতে এরকম একটা অজানা সম্ভবনা ধীর লয়ে বাজছিল। কিন্তু সেই ভাবনা এমনভাবে মিলে যাবে সত্যিই ভাবেনি নমিতা। এই বাজারে চাকরি তো আর সহজলভ্য নয়। তাছাড়া নমিতার আবার যে কোনো চাকরি পছন্দ নয়, অনির্বাণ জানে। তবুও অনির্বাণকে বলেছিল নমিতা, যদি হয়।

চাকরির বিষয় অমিত বিশেষ কিছুই জানতো না। এই চাকরি-প্রাপ্তির প্রস্তুতি যে বহুদিনের, অমিত টের পায়নি। পাবার কথাও নয় অমিতের। একটা দৈনিকে সাংবাদিকতার কাজ করে অমিত। পেশাগত কারণে তার সময় কম। তার উপর লেখার বাতিক। গল্প লেখার, সে জন্যও সময় খুঁজে বার করে নিতে হয়। নমিতার নিশ্চয় চাকরির প্রয়োজন ছিল। আর্থিক কারণে না হলেও নিশ্চয় স্বনির্ভরতার প্রশ্নে। নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল নয়ত অনির্বাণকে...!

'—কী খবর অনির্বাণদা, এত সকালে?'—নমিতা প্রশ্ন করে।

—তোমার জন্য একটা সুখবর এনেছি।

—কী সেই সুখবর?

—আগে এক কাপ 'জম্পেস' চা খাওয়াও, তারপর বলছি।

নমিতা চাকরি-প্রাপ্তির সংবাদ আগেই আড়াল থেকে শুনেছে। তাই বিশেষ কৌতূহল

না দেখিয়ে 'চা'-এর তদারকিতে ব্যস্ত হল। বুবাই এতক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ নজরে এলো তাদের টিয়াপাখিটা পাশের বাড়ির ছাদ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল বুবাই,

—বাবা, বাবা, ঐ দেখ আমাদের টিয়াটা।

—ওতো বাঁধা ছিল এতদিন। ওকে উড়তে দাও।

—কেন ওকে ধরে আনবে না?

—আকাশে উড়ে যাওয়া কোনো পাখি কি ধরে আনা যায়?

—তবে তুমি যে বলেছিলে, পাখিটা ধরে এনেছো?

—সে তো, পাখিটা তখন নিজে এসে ধরা দিয়েছিল বলে।

—তবে ওকি কোনোদিন আর আসবে না?

—হয়ত কোনোদিনই আসবে না হয়ত ইচ্ছে হলে আসবে।

অনির্বাণ বসে পাখি বিষয়ক কথা মন দিয়ে শুনছিল।

—কেন তোদের পাখিটা কি উড়ে গেছে?

—হ্যাঁরে, আর বলিস কেন। নমিতার জেদাজেদিতে পাখিটা এনেছিলাম, দু'দুবার খাঁচা কেটে পালাতে চেয়েছে। আমার নজরদারিতে তা সম্ভব হয়নি। খাঁচা বদল করে পালাতে দিইনি। কিন্তু এবার যেন কীভাবে....

—হয়ত তুই একটু অন্যমনস্ক ছিলি।

—হয়ত আমাদের প্রতি পাখিটার টান কমে গিয়েছিল।

'দুটোর কোনোটাও তো না হতে পারে মশাই'—তিন কাপ চা নিয়ে নমিতা ঢোকে। নমিতাকে আজ একটু অন্যরকম লাগছে। সকালে পাখির বেদনায় যে নমিতা বিষণ্ণ ছিল, অনির্বাণের 'আসা'-তে তা নিমেষে উধাও। চাকরির আনন্দে নমিতা আজ একটু অন্যরকম। তিনজনে চা নিয়ে বসে। চা-এর কাপে প্রথম চুমুক মেরে অনির্বাণ কথা শুরু করে, 'তোমাকে চাকরির খবরটা দিতে এসেছিলাম।' ভেতরে তীব্র ভালোলাগা অনুভূতি, বাইরে যথাসম্ভব সংযত নমিতা বলে—'কোথায়?'

—যাদবপুরে।

অমিত জিজ্ঞাসা করে—'মাইনে কত?'

—আপাতত হাজার দেড়েক।

—মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য নমিতা...?

'—কটার মধ্যে যেতে হবে?' কথা থামিয়ে নমিতার প্রশ্ন।

—এগারটা।

—কী পড়াতে হবে?

—ইতিহাস।

—'কিন্তু নমিতার অনার্স তো পলিটিকাল সায়েন্স', অমিত প্রশ্ন করে।

—'হিস্ট্রি আমার এ্যাডিসনাল ছিল। তখনই দারুণ লাগতো। ইতিহাস পড়াতে পারবো ভেবে কী যে আনন্দ হচ্ছে', নমিতা বলে।

—কিন্তু ঐ সামান্য মাইনের জন্য তুমি:..?

—তবু তো ইতিহাস।

—ইতিহাস তোমার এত ভালো লাগে, আগে তো বলোনি?

—কেন, বুবাই-এর ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বলিনি?

—ক্লাস-টু-এর ইতিহাস পড়াতে পড়াতেই তুমি ইতিহাস পড়ানোর মজা খুঁজে পেয়েছিলে?

—আমার যে কী মজা হচ্ছে।

—কেন? ইতিহাস পড়ানোর জন্য না চাকরি পাওয়ার জন্য?

—যদি বলি চাকরি, তুমি রাগ করবে?

—রাগ করবো কেন? তবে তোমার মধ্যে চাকরির যে এমন তীব্র তাগিদ, তাতো আগে জানতাম না।

—'কেন অমিত, তুই জানিস না নমিতা চাকরি করতে চায়?' অনির্বাণ প্রশ্ন করে।

—'ঠিক জানতাম না তা নয়। তবে তেমনভাবে নয়।' বন্ধুর কাছে ধরা দিতে চায় না অমিত।

অমিত নমিতার বিয়ে হয়েছে বছর দশেক। একমাত্র পুত্র। পেশার কারণে অমিতকে যে একটু বেশি বাইরে থাকতে হয় এহেন অমিতের 'বিবাহ' যুক্তিযুক্ত কিনা? বিচারে বসেছিল কৃষ্ণাদি। অমিতের অফিসের সাব-এডিটর। অমিত বাল্যেই মাতৃহীন। কলকাতার মেসে একাকী জীবনযাপন, পড়াশুনা এবং চাকরি। সে সময় পাত্রী প্রসঙ্গে অমিত কৃষ্ণাদিকে বলেছিল,

—চাকুরিরতা না হলেই আমার ভালো হয় কৃষ্ণাদি।

—কেন? এখন ডবল ইন্‌কাম গ্রুপ-ই তো সকলে প্রেফার করে।

—চাকুরিরতা ঠিক আমার পছন্দ নয়।' অমিত যেন গভীর বিপন্নতায় উত্তর দেয়।

—কেন, তুই চাকরি করলে দোষ নেই, আর তোর বউ চাকরি করলেই যত দোষ? তোদের পুরুষদের এই ভণ্ডামি তোর মধ্যেও পেয়ে বসেছে। তোকে একটু অন্যরকম ভাবতাম অমিত।

কৃষ্ণাদির ঝাঁঝালো উত্তরে অমিত কিছুটা থমকে যায়। বিব্রত হয়। বলে,

—দোষের কথা কে বলেছে? বহু মেয়ে তো আছে যারা চাকরি করতে চায় না। কিম্বা চাকরি পায়নি। যাদের ক্ষেত্রে চাকরিটা কমপাল্‌শন্‌ নয়, এমন কাউকে বিয়ে করলে...।

এইভাবে আলোচনা চলতে চলতে কৃষ্ণাদির মাধ্যমেই নমিতার সঙ্গে আলাপ এবং বিবাহ। তারপর সন্তান প্রসব। লালন পালন। একজন সর্বক্ষণের এবং দুজন আংশিক কাজের লোক নিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম সামাল দিতে দিতে নমিতা হাঁফিয়ে উঠেছে।

বি. এ পাশ করা কৃষ্ণাদির স্নেহধন্যা নমিতা হঠাৎ দেখতে পেল তাদের সদ্য উড়ে যাওয়া টিয়াটা বাড়ির পাঁচিলে এসে বসেছে।

—অমিত, অমিত, ঐ দেখ টিয়াটা আবার এসেছে। বোধহয় খাবার সময় হয়েছে। ছোলার বাটিটা নিয়ে এসো তো, দেখি ধরা যায় কিনা?

—ওকে কি তুমি উড়িয়ে দিয়েছো?

—না, কেন বলো তো?

—ও কি নিজের ইচ্ছেয় উড়ে গেছে?

—দেখছোই তো, নতুন খাঁচাটা কেটে পালিয়েছে।

—তবে ওকে ধরার চেষ্টা কেন?

—বা! ওটা আমাদের টিয়া না! তুমিই তো কিনে এনেছিলে।

—কিনে আনলেই তো আর আমাদের হয় না। ওকে পোষ মানাতে হয়। এখানে যদি ওর মন বসে, তবে ও ঠিক চলে আসবে।

—যদি না আসে, তবে এতো কাছে পেয়েও কি ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ।

—তোমারই তো অতোগুলো টাকা জলে যাবে।

—নিয়ে এলেই তো আর অধিকার জন্মায় না, ওদেরও একটা মনের ইচ্ছে আছে।

—তবে অতো লোক যে পোষে!

—হয়ত ওগুলো পোষমানা টিয়া। পোষ মানে বলে আকাশের বদলে খাঁচাটাকেই আকাশ ভাবে। কথা শিখে কথা বলে আনন্দ পায়। আনন্দ পায় বলে হয়ত উড়ে যেতে চায় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। মানসীদি-দের টিয়াটা তো সারাক্ষণ বক্‌বক্ করে আনন্দ পায়, চেনা কেউ এলে ফূর্তি আর ধরে না। অথচ দেখো অসীমদা তো সারাক্ষণ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। আর মানসীদির ছেলের পড়া। তবুও টিয়াটা এতটুকু 'বোর' হয় না।

—অসীমের টিয়াটা মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে, আকাশে উড়তে নয়।

—কিন্তু পাখি তো আকাশে উড়তে চাইবেই।

—কিন্তু পাখিদেরও ব্যতিক্রম আছে।

অমিত সেদিন বিশেষ কোনো চেষ্টা করল না টিয়াটাকে ধরার। বুবাই আর নমিতা মিলে, ছোলার বাটি, পাকা লাল লঙ্কার লোভ দেখিয়েও পারল না, টিয়াটা উড়ে গেল। অমিত বলল, 'আগেই বলেছিলাম না, চেষ্টা করে লাভ নেই। ওভাবে জোর করে পশুপাখি বেঁধে রাখতে নেই।'

নমিতার চাকরি হয়েছে। জয়নিং ডেট সেকেণ্ড মে। নমিতার চাকরির অনারে পয়লা মে সকলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, সস্ত্রীক অনির্বাণও সঙ্গে ছিল। বাড়ি ফিরেই বুবাই-এর ধুম জ্বর। সেই রাতে আর ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়নি। এমনিতেই নমিতা একটু টেনশনে। কাল চাকরির জয়নিং ডেট। প্রথম চাকরিতে যাওয়া। একটু ভয় ভয় করছে, কলেজে পড়ার সময় তবুও একটু বাইরে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। তারপর পাক্কা দশ বছর সংসারে গিন্নিপনা করে এই চাকরি। 'কিন্তু এখন যা অবস্থা কাল যেতে পারলে হয়। একে তো কাজের লোক আসবে না। তাও না হয় অমিতকে বলে ম্যানেজ করে নিতাম, কিন্তু বুবাই-এর এই অবস্থা!'—দোলাচলে নমিতা ভাবে। চিন্তায় চিন্তায় সারারাত ঘুমই এলো না, শুধুই জাগরণ আর ছটফটানি। অথচ বুবাই ধুম জ্বর নিয়ে ঘুমে অচৈতন্য। মাঝে মাঝে মাথায় হাত দিয়ে দেখছে জ্বর কমেছে কিনা? একটু একটু করে জ্বর কমছে, আর নমিতাও ক্রমশ আশায় বুক বাঁধছে, কাল যেতে পারবে।

রোগাক্রান্ত সন্তানের শিয়রে বসে মাতা সন্তানের রোগ নিবারণ কামনা করছে সন্তানের জন্য, নিজের জন্য। মানব সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্যন্ত এমন ব্যতিক্রম কতবার ঘটেছে নমিতার জানা নেই। তবুও নমিতা ভাবছে—"কাল যেতে পারবে তো?"

পরদিন সকালে বুবাই-এর জ্বর কমেছে, তবু থার্মোমিটারের পারা দিয়ে মেপে নিয়ে নিশ্চিত হতে চায় নমিতা।

—'কত হলে তোমার যাওয়া আটকাবে না বলো? গায়ে হাত দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি তার থেকে কম না বেশি।' অমিত রসিকতা করে।

—ফাজলামি করো না তো; আমি বুবাই-এর চিন্তায় জেরবার আর তুমি...

—থার্মোমিটারটা দাও আমি দেখে দিচ্ছি।

থার্মোমিটার দিয়ে অমিত জ্বর মাপে। বলে,

—নিরানব্বুই পয়েন্ট এক।

—'নরমাল', হাঁফ ছাড়ার শব্দ শোনা যায় নমিতার।

—নিরানব্বুই পয়েন্ট এক তো নরমাল নয় নমিতা।

—ওই হলো। একশ হলে জ্বর আছে বলা যেত।

—তোমার যাত্রা স্থগিতের জন্য নিরানব্বুই পয়েন্ট এক জ্বরটা যথেষ্ট নয় জানি। একটু মজা করছিলাম। যাও তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি চা করে আনি।

—তুমি যাবে কেন? আমি যাচ্ছি।

—তোমার দেরি হয়ে যাবে।

—দ্যুর। সবে তো সাতটা। এগারটায় যাদবপুর। আচ্ছা যাদবপুর এগারটায় পৌঁছতে হলে কটায় রওনা হতে হবে?

—কীসে যাবে বলো? বাসে না ট্রেনে?

—অনির্বাণদা তো বলেছিল, বাসে গেলে সুবিধে।

—তাহলে ন'টা।

—তাহলে তো সত্যিই দেরি হয়ে যাবে। অমিত তুমিই চা করে নিয়ে এসো। আমি স্নানে যাই।

নটা বাজতে পাঁচ, নমিতা তৈরি। কাজের লোক আসেনি। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অমিত কথা বলছে। বুবাই জানলার ধারে চুপ।

'—বুবাই, টা-টা'। নমিতা দরজা খুলে এগোয়। 'অমিত এলাম। পারলে আজ আর অফিসে যেও না, বুবাই তো এই অবস্থায় একা থাকতে পারবে না।'

—ঠিক আছে তুমি সাবধানে যেও। বুবাই-এর জন্য আমি তো আছি।' কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অমিত।

—পারলে বুবাইকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে এসো। জ্বর তো এখনও কিছুটা আছে।

—ঠিক আছে তুমি কোনো চিন্তা কোরো না।

নমিতা বেরিয়ে যায়। বুবাই দরজা বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। অমিত দুধ গরম করে বুবাই-এর সামনে।

'ঐ দেখ বাবা টিয়াটা বারান্দায়।'—বুবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

—ওকে জোর করে সেদিনের মতো ধরতে যেও না। উড়ে পালাবে।

—দেখো না শূন্য খাঁচার সামনে ঘুরঘুর করছে।

—হয়ত আবার খাঁচায় ঢুকতে চায়।

—খাঁচার মুখটা বন্ধ করে দেবো?

—কেন? তোর কি টিয়াটার ওপর রাগ আছে?

—সেদিন খাঁচা কেটে পালিয়েছিল কেন?

—ইচ্ছে হয়েছিল তাই।

—পালিয়ে একবার যখন গেছে, আর ঢুকতে দেবো না।

—তা হয় না, তুই না ওকে প্রতিদিন ছোলা খাওয়াতিস, কথা শেখাতিস? হয়ত তোর টানেই আবার এসেছে। আজ যদি তুই ওকে ঢুকতে না দিস, ও মনে কষ্ট পাবে না?

—কেন, যেদিন ও পালিয়ে গিয়েছিল, আমি মনে কষ্ট পাইনি?

—হয়ত তখন পায়নি। এখন পাচ্ছে। তাই আবার ফিরে এসেছে। খাঁচার মুখটা ভালো করে খুলে দে। ও মনে হচ্ছে খাঁচায় ঢুকবে।

—খাঁচায় ঢুকলে অমনি খাঁচা বন্ধ করে দেবো।

—না খাঁচার মুখ আর বন্ধ করবি না। যখন ইচ্ছে যাবে, যখন ইচ্ছে আসবে। ওকে কিনে এনেছি বলে ওকে তো ওভাবে আটকে রাখতে পারি না!

অমিতের চোখের কোণে জল। এ জলের কারণ হয়ত পাখিটাই একমাত্র বুঝতে পেরেছিল। পিতা-পুত্রের এই কথার মাঝে পাখিটা যে কখন খাঁচার ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্তে বসে আছে, অমিত কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি।

# রূপকথার চোখ

## তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন বাস্তবে বাস করার পর তমিস্রা বলল, ধুর, আর এখানে একদম ভালো লাগছে না, চলো আমরা আবার ক'দিন রূপকথার দেশে বেড়াতে যাই।

বহুকাল ঘরকন্না করে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে তমিস্রা। তার শরীরটা যদিও এখনো বেশ তন্বী, মুখের হাসিটি এখনো বুকে গড়িয়ে দেয় ঠাণ্ডা ঝর্ণাস্রোত, তবু এরকম অদ্ভুত একটা কথা বলায় আমি বেশ ধন্দে আবর্তিত। তমিস্রাই তো বছর কুড়ি আগে একদিন বিরক্ত হয়ে চোখমুখ কুঁচকে এর ঠিক বিপরীত বাক্যটিই উচ্চারণ করেছিল আমার বিভ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে। তখন ঘোর বৈশাখ মাস। একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শরীর। ঘামে আইঢাই করছিল আমার ঘুম ও জাগরণ। রূপকথাটা আর নীলাভ থাকছিল না, তবু ভাবছিলাম শীত আসুক, সাপেরা ঘুমোতে চলে যাক তাদের যার-যার নীড়ে, তাদের খোলস পাকতে থাকুক, বৃতির ভেতর পাপড়িরা আরো যৌবনবতী হোক, তারপর। না হলে যতই বলুক, রূপকথা ছেড়ে হঠাৎ বাস্তবে গেলে বাস্তবের অবশ্যম্ভাবী ধকল সইতে বড্ড কষ্ট পাবে নরম মনের মেয়েটি। তমিস্রার সঙ্গে কম দিন তো রূপকথা করলাম না। ওর মনের ভাবসাব আমার চেয়ে কে আর বেশি জানে। বলেছিলাম, ঠিক আছে, সাইবেরিয়া থেকে হাঁসেরা যেদিন রওনা দেবে, সে সময় একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে—

—না, অনেকদিন রাজপুত্তুর সেজে থেকেছ, এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই, তোমাকে রাজা না করে আর ছাড়ছি না।

রাজা হওয়ার সেই দিনগুলোও কিছুদিন রূপকথায় মোড়া ছিল। তমিস্রাকে তখনো মনে হত কোনো এক দূরদ্বীপবাসিনী। তার শরীর থেকে বেরোতো গুগগুলের গন্ধ। তার শরীরের ওমে বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে মনে হতো আমার পায়ের নীচে সসাগরা ধরিত্রী। তমিস্রাকে পেতে কম মেহনত তো করতে হয়নি! তাকে উদ্ধার করতে অতিক্রম করেছি কত যে পাহাড়পথ, কত কাঁকরের দিন, কত গলনাঙ্ক-ছোঁয়া মুহূর্ত। অধরা তমিস্রার জন্য এই রূপকথা পেরোনোর দিন কী যে রোমাঞ্চে ভরভরন্ত ছিল! সেই আগুন-শরীরের মেয়েটি হাতের মুঠোয় এসে যেতে রাজা হয়ে ওঠা ছাড়া আর কী উপায়! রাজপুত্র হয়ে উঠল রাজা, আর রাজকন্যা রূপান্তরিত রাজরানিতে। রাজা তখন জয় করে চলেছে একের পর এক দেশ। রাশি রাশি রঙিন পাল উড়িয়ে রাজা তখন ময়ূরপঙ্খী জাহাজ চালিয়ে চলেছেন তাঁর শৌর্যবীর্য প্রকাশ করতে করতে। পালে হাওয়া ধরতে জাহাজের গতিও তুঙ্গে। জাহাজের মাস্তুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে চক্রাকারে গাংচিল। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রাজা পাড়ি দিচ্ছেন সাত সমুদ্র তেরো নদী। তমিস্রার শরীর তখন একটা বর্ণাঢ্য রূপকথাই। তাকে আবিষ্কার করার মোহে রাজা তখন বিহ্বল, সম্মোহিত। সেই ভালোবাসাবাসির দিনগুলোয় তমিস্রা জন্ম দিল আর এক আশ্চর্য রূপকথার।

রূপকথাটা ভাঙতে শুরু করে আমাদের রাজপুত্র দেবঋক একটু বড় হয়ে উঠতেই।

দেবঋক কথা বলা শুরু করতে তাকে তমিস্রা ইঁদুর হয়ে উঠতে শেখাল। কেন না আমাদের চেনাজানা সব বাচ্চাই ইঁদুর হয়ে উঠছে দ্রুত। ইঁদুরের গতি, লোলুপতা, চাতুর্য সন্তানের শরীরে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য কী আকুলতা বাবা-মাদের! তমিস্রা হাঁসফাঁস করে উঠে বলল, ইঁদুর না হতে পারলে ও কোথাও কোনো সুযোগ পাবে না।

আমাদের চোখের সামনে দেবঋক কাঁধে ভারী স্কুলব্যাগ চাপিয়ে সেই হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার পিছু পিছু ছুটতে শুরু করল ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাকে নিয়ে শুরু হল উদ্বেগ। কিছুতেই যেন আমাদের ইঁদুরটা না পিছিয়ে পড়ে। দৌড়োও, আরো জোরে দৌড়োও। গতিই জীবনের মূল লক্ষ্য। শরীরে যত গতি সঞ্চারিত করতে পারবে তত দ্রুত ছুঁতে পারবে হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার কোটের আস্তিন।

রূপকথার খোলস ভেঙে আমরা কখন যে বেরিয়ে পড়েছি তা না-আমি না-তমিস্রা কেউই বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা তখনো ভাঙছিলাম একটা কাঁকুরে পথ। ভাবছিলাম রূপকথাটা আমাদের ছাড়েনি। দেবঋকের সঙ্গে আমি আর তমিস্রাও শামিল হয়েছি দৌড়ে। আমি জড়িয়ে পড়েছি অফিসে আর তমিস্রা তার ঘরকন্নায়। পৃথিবীর তাপ যে বাড়ছে তা প্রথমে বুঝতে পারিনি এতই নিবিষ্ট ছিলাম আমাদের বৃত্তের ভিতর। কিন্তু পারা আর পাপের মতো তাপও এড়িয়ে থাকা যায় না। কয়েকদিনের মধ্যে তমিস্রা আমাকে দেখাল, দ্যাখো, কী হয়েছে হাতে!

তমিস্রার হাত টেনে নিয়ে দেখি বড় বড় ফোস্কা। আমার নিজেরও অনুভবে তখন প্রবল তাত। কিন্তু তমিস্রার শরীর নরম বলে তার শরীরে তাপের এমন রূঢ় প্রকাশ। দুজনে অবাক হয়ে বলাবলি করছিলাম এ বছর খুব গরম পড়েছে। পৃথিবীর ভেতরে লাভা ফুটছে। লাভা হয়ত বেরিয়ে আসতে চাইবে হু হু করে। আগ্নেয়গিরির মুখ খুঁজবে। আগ্নেয়গিরির মুখ না পেলে ভয়ংকর চটে যাবে পৃথিবীর ওপর। তখন হয়ত ভূমিকম্প হবে।

এত সব বলাবলির দিনে তমিস্রা আমাকে একদিন বলল, দ্যাখো দ্যাখো, ওটা কী?

আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। চোখমুখ কুঁচকে দেখছিলাম দুটো চোখ কীরকম ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমাদের দুজনের দিকে। চোখদুটো কীরকম মায়াময় আর স্বপ্নালু। কী নরম চাউনি! কিন্তু এই মুহূর্তে সেই দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত করুণা। তমিস্রা ফিসফিস করে বলল, কী আশ্চর্য দ্যাখো, মনে হচ্ছে আমাদের খুব চেনা অথচ চেনা নয়।

—আমারও তাই ধারণা। ওও আমাদের চেনে।

—কিন্তু কে হতে পারে!

চোখদুটো কার এ নিয়ে প্রবল গবেষণার ফুরসতে সেই চোখজোড়া করুণা ছেটাতে শুরু করে আমাদের দুজনের উদ্দেশে। যেন আমরা কোনো নিশ্চিত সৌভাগ্য ছেড়ে পৌঁছে গিয়েছি কোনো রূঢ়তায়। সামনেই আরো রুক্ষ কাঁকুরে পথ।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় আমাকেই চমকে দিয়ে বলল, তমিস্রা, ওই চোখদুটো রূপকথার।

তমিস্রা কেঁপে উঠে বলল, সেকি!

সেও বিস্ময়ে অনড় থাকে কিছুক্ষণ। দূরে জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখদুটোর দিকে কীরকম বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন আমাদের কিছু একটা সুন্দর ছিল এখন নেই। একটা নরম মখমলের চাদরে ঢাকা ছিল আমাদের দুজনের শরীব, কেউ এক ঝটকায় তা সরিয়ে নিয়েছে সহসা।

কিন্তু সেই কাঁপিয়ে দেওয়া ভাবনাটাও বেশিদিন ভাবা গেল না। কাঁকুরে পথ ভাঙাটাই তখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে আমাদের জীবনে। পায়ের পাতায় কাঁকর ফুটে রক্তাক্ত, গায়ে বড় বড় ফোস্কা, শরীর পুড়ে যাচ্ছে প্রবল তাতে, তবু থামবার উপায় নেই। হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার পিছু পিছু ছুটে চলেছে দেবঋক, তার পিছনে আমি আর তমিস্রা।

কতকাল পর দেবঋক জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সুযোগ পেয়ে হোস্টেলে ঢুকতে তবে তমিস্রা আমার দিকে আমি তমিস্রার দিকে তাকানোর সুযোগ পাই। এতদিন ধুলো ধোঁয়া ভরছিলাম নিশ্বাসের সঙ্গে, এখন চাই কিছু সবুজ। তখনই তমিস্রা উসিবিসি করে উঠে বলল, ধুর—

রূপকথার কথা বলতেই আমিও কেমন চনমন করে উঠি। বহু মানুষই তো চায় জীবনটা রূপকথা হয়েই থাকুক। কিন্তু ভাবলেই তো তা আর সত্যি হয়ে ওঠে না। তবে আমরা দুজনেই খেয়াল করেছি আমরা ভুলতে চাইলেও সেই দুটো আশ্চর্য চোখ কিন্তু আমাদের ভোলেনি। চোখদুটোর অদূরেই একটা ছেঁড়া খোঁড়া নরম খোলস। খোলসটার দিকে চোখ পড়তেই যেমন ছ্যাঁত করে ওঠে বুকের ভেতর, তেমনই চোখদুটোর দিকে চোখ পড়তেই দেখেছি সে নিঃশব্দে করুণা ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের দিকে।

তমিস্রার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলি, তা বেশ তো, চলোই না, কদিন ধরেই ওটা খুব জ্বালাচ্ছে।

—ওটা মানে?

—ওই চোখদুটো।

—যা বলেছ! ও নিশ্চয়ই চাইছে আমরা আবার সেই রূপকথার দেশে যাই। রূপকথার দেশে গিয়ে আমরাও রূপকথা হয়ে উঠি।

ততদিনে পৃথিবীর জ্বর একটু কমের দিকে। মিলিয়ে এসেছে তমিস্রার গায়ের ফোস্কা। একদিন বৃষ্টিও হয়ে গেল সারারাত। ভোরে উঠে দেখি পৃথিবীর শরীরে সবুজ রং ধরেছে। সেই রং সঞ্চারিত হচ্ছে আমার আর তমিস্রার চোখেও। কেমন যেন ঘোর লেগে গেল আমাদের বহু বছরের পুরোনো চোখে। সেই কবে শৈশবে রূপকথার দেশে বাস করতাম। সে এক আশ্চর্য পেলব ঘোরের দিন। নরম ঘেরাটোপের ভেতর বাস করার দিন। শীতের ভোরে লেপের ভেতর ওম হয়ে থাকার দিন। তারপর তমিস্রার সঙ্গে দেখা হতে শুরু হয়েছিল আর এক রূপকথার গল্প। বোশেখি তাতের দিন ঝাঁকড়া আমগাছের ছায়ায় বসে তাপ জুড়োনোর দিন। আবার এতদিন পরে রূপকথার গন্ধ। সেই গন্ধে দুজনে ওতপ্রোত হই। তমিস্রার হাত ধরে পাড়ি দিতে শুরু করি সেই নরম মখমলে মোড়া দিনের উদ্দেশে। কিন্তু কীভাবে রূপকথার দেশে যাব তা নিয়ে দুজনে বহু জল্পনা-কল্পনা করতে থাকি রাত জেগে। সত্যিই কি ইচ্ছে করলে যাওয়া যায় সেই অদ্ভুত, আশ্চর্য ঘোরের ভিতর! ইতিমধ্যে দুজনের বয়স গড়িয়ে গেছে জীবনের অর্ধেক পথ। আমার চুলে যদিও পাক ধরেনি, কিন্তু তাতেও বা আর কত দেরি!

তমিস্রার উৎসাহে অবশ্য খামতি নেই। রাতে বিছানায় শুয়ে জল্পনা চালিয়ে যায় কী ভাবে সবাইকে অবাক করে পাড়ি দেবে সেই অফুরন্ত পথ। তার ভীষণ শখ আবার রাজকন্যা হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে এক বিশাল পুরীর ভেতর, আর আমি বহু পথ উজিয়ে বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তার কাছে পৌঁছে যাব ঠিকঠাক। রাত তখন এমন কিছু আহামরি ঘন হয়নি, কিন্তু তমিস্রার কথায় কী ছিল কে জানে, হঠাৎ মশারির বাইরে তাকিয়ে দেখি দুটো চোখ

জ্বলজ্বল করছে ঘরের কোণে। সেই চোখ যা ক'দিন আগে তমিস্রাকে উসকেছিল রূপকথার দেশে যাওয়ার জন্য। বুঝতে অসুবিধে হয় না তমিস্রার এ হেন উদঘট কল্পনার বহর দেখে চোখদুটো মিটিমিটি হাসছে।

তমিস্রার উৎসাহে জল ঢেলে বলি, তার চেয়ে অফিসের ছুটির পর আমি প্লানেটোরিয়ামের সামনে দাঁড়াই, তুমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে চোখমুখ ফুলিয়ে বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। তারপর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাথিড্রাল চার্চ পেরিয়ে ঢুকে পড়ব নন্দন চত্বরে। কিছুক্ষণ বসব কোনো রেলিঙে। গল্প করব, চাতালার কাছ থেকে চা কিনে খাব। বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া থাকবে না। খুব মজা হবে বেশ।

তমিস্রা আঁতকে উঠে বলল, ধুর, ওখানে কচি-কচি ছেলেমেয়েরা বসে থাকে, তারা কী ভাববে!

—কী আর ভাববে! বড়ো জোর ভাববে লোকটা কোনো পরস্ত্রী জুটিয়ে প্রেম করতে এসেছে।

—ধুর, সে হয় না। আমাকেও তাহলে নিশ্চয়ই খুব খারাপ ভাববে। তা ছাড়া চেনা কেউ দেখে ফেললে সে আরো লজ্জার। তার চেয়ে—

তমিস্রা তার বুদ্ধিতে শাণ দিতে চেষ্টা করে, তার চেয়ে অন্য কোথাও যাই। যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না। একদম নতুন জায়গায়।

—তা হলে চলো কোনো শৈলশহরে যাই। ধরো হিমালয়ের কোনো চমৎকার ট্যুরিস্ট স্পটে। রুদ্রপ্রয়াগ, কিংবা উত্তরকাশী বা মানালিতে। যে শহরে কেউ আমাদের চিনবে না। সেখানে যা খুশি করতে পারি আমরা।

—ধুর ধুর, ছেলে হোস্টেলে একা থাকবে, আর আমরা কিনা ওকে ফেলে বেড়াতে চলে যাব! কী ভাববে ও শুনলে! ভাববে মা-বাবা আমাকে বাদ দিয়ে—, উঁহু সে হয় না।

রূপকথার দেশে যাওয়া যে খুবই কঠিন তা খুব দ্রুত আবিষ্কার করে ফেলি দুজনে। রাতটাই বাড়তে থাকে শুধু। রাত ঘন হয়ে ওঠে দ্রুত, তবু কোনো দিশে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তমিস্রা পিছু হঠবার পাত্রী নয়। তার তন্বী শরীরে আলো জ্বালতে চায় এই ঘনান্ধকারে। তার শরীরে ঘনিয়ে আনতে চায় প্রাক-বিবাহের ধার। তাকে এভাবে ধারালো হয়ে উঠতে দেখে আমার শরীরেও উৎসাহ জাগে। ইচ্ছে হয় রূপকথা হয়ে উঠি। ভাবি আমিও লালকমল-নীলকমল সেজে পেরোতে পারব অন্তহীন পাহাড়ি পথ।

তো সেরকমই জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। আমরা দুজনে হাঁটতে থাকব কলকাতার অচেনা পথঘাট। কলকাতাটাই নতুন করে আবিষ্কারে মত্ত হব। কলকাতা আবিষ্কার করতে করতে নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকব আমি তমিস্রাকে তমিস্রা আমাকে। কলকাতা আবিষ্কার করা অত সহজ কাজ নয়। কলকাতা একটা বিশাল সমুদ্র। কলকাতা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে বদলায়। তমিস্রা বলল ওও নিজেকে বদলাবে। রোজ নতুন নতুন শাড়ি পরবে। কোনোদিন কচি কলাপাতা রঙের তো পরদিন ঘন সমুদ্ররঙা। তার পরদিন গাঢ় কমলা। তার পরদিন ফিকে ফিরোজা। কোনোদিন বিকেলে রবীন্দ্র সরোবর থেকে বেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ঢুকে পড়ব কেয়াতলা রোডে। কোনোদিন বিজন সেতু পার হয়ে ঢুকে পড়ব কসবার নতুন গড়ে ওঠা জনপদে। কোনোদিন সল্টলেকের ঝকঝকে সাজানো লোকালয় টুঁড়ে ফেলব প্রবল উৎসাহে। হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলব পথ। হারানো

পথ খোঁজাটাও হবে ভারী উল্লাসের। সল্টলেক আমাদের কাছে সবসময়ই একটা গোলোকধাঁধা। পাখির খাঁচা আর জলের ট্যাঙ্ক চিনতে চিনতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে। রাত্রির সল্টলেক আরো উত্তেজনার। যেন আমরা আর কলকাতা শহরে নেই। কোনো বিদেশি শহরে ঘুরে বেড়াব ইচ্ছেমতো। এক ভুল পথ থেকে আর এক ভুল পথে ঢুঁ দিতে দিতে আমরা পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকব।

একের পর এক ভাবনায় গেরো দিতে দিতে তমিস্রা উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠতে নামতে থাকে তার ভারী বুক। আমিও তমিস্রার উৎসাহে তা দিতে থাকি লম্বা লম্বা পা ফেলে।

এভাবেই একদিন বিকেল দেখে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। খুব বোকা বোকা লাগছিল। এত হাঁটা তো অভ্যেস নেইই, তার ওপর অনেকখানি হাঁটার পর কীভাবে যেন ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। তাকিয়ে দেখি কাছেপিঠে কোনো ছাউনি নেই। বড় বড় ফোঁটায় ভরে যেতে থাকে দুজনের শরীর। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়াই একটা পরিত্যক্ত চা-দোকানের ভাঙা কার্নিসের নীচে। তবু বৃষ্টি মানে না। প্রবল ছাঁটে ভিজে একশা হতে থাকি। তমিস্রা হাসতে হাসতে বলে, তোমার মনে পড়ে বিয়ের আগে একদিন এমনই ভিজেছিলাম!

উহ্ মনে নেই। কী সাংঘাতিক বৃষ্টির পাল্লায় সেদিন পড়েছিলাম। রাত ঘনিয়ে যাচ্ছিল অতি দ্রুত। নিজেকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে তমিস্রা ক্রমশ ঘন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল আমার শরীর ঘেঁসে। সেটা ছিল একটা মন্দিরের শেড। তমিস্রা শীতে কাঁপছে দেখে আমি ওকে টেনে নিচ্ছিলাম কাছে। আরো কাছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। উপুড়ঝুপুড় বৃষ্টি বলে কেউ বেরোচ্ছেও না পথে। এরকম শুনশান পথ কখনো পাইনি আমরা। এমন নগ্ন নির্জনতা কী যে ঈপ্সিত ছিল আমাদের। আমরা তাতে সাহস পেয়ে আরো ঘন হচ্ছিলাম। ঘন হয়ে ক্রমশ রূপকথা হচ্ছিলাম। অনুভব করছিলাম তমিস্রার শরীরে যেন ব্লেডের ধার। ধারেকাছে একটা শালিক কিংবা চড়ুইও ছিল না। আমরা চাইছিলাম বৃষ্টি যেন না থামে। তবু তমিস্রা আমার বুকের ভেতর ঘন হতে হতে আশঙ্কা প্রকাশ করছিল বৃষ্টি না থামলে কী করে বাড়ি ফিরবে! তারপর কখন যে বৃষ্টি থেমে গেছে, শান্ত হয়েছে ধরণী তা কেউই বুঝতে পারিনি। সংবিত ফিরল যখন ছাতা মাথায় দিয়ে একটা লোক পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ শব্দ করে বন্ধ করল ছাতাটা। আমাদের দুজনের ঘনবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর দৃশ্যটা দেখলও একনজর।

তমিস্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলেছিল, ইস, লোকটা কী ভাবল কে জানে!

আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, কী আর ভাববে! বড় জোর মনে মনে ঈর্ষান্বিত হবে।

সেদিন বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় খুব আপশোশ হচ্ছিল যদিও, তবু বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল দুজনেরই। মন্দিরের শেড থেকে বেরিয়ে পা চালিয়ে ফিরেছিলাম অন্ধকারে। আজ কিন্তু ফেরার তাড়া ছিল না। সেদিনের মতো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু খেয়াল করে দেখি তমিস্রার শরীরে সেই আগের ধার নেই। তমিস্রা প্রাণপণ চেষ্টা করছিল আগের মতো রূপকথা হয়ে উঠতে। পেখম মেলে হয়ে উঠতে চাইছিল আগুনের ডেলা। ঘন করতে চাইছিল নিঃশ্বাস। কিন্তু কী যে হল, আগুন হয়ে ওঠার পরিবর্তে ভিজে জবজবে হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে হঠাৎ হাঁচতে শুরু করল তমিস্রা।

বললাম, চলো, বাড়ি যাই। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

তমিস্রা হাসছিল, বলল, রূপকথার রাজকন্যার কি ঠাণ্ডা লাগে?

আমি আশেপাশে চোখ পেতে খুঁজছিলাম সেই চোখদুটোকে। তমিস্রার কথা শুনে নিশ্চিত হাসি ঘনিয়ে আসছে রূপকথার চোখে। কিন্তু আপাতত তার দেখা না পেতে স্বস্তির শ্বাস ফেলি। হয়ত রূপকথার খোলসের মধ্যে আমরা আবার ঢুকে পড়তে পেরেছি তাই চোখদুটো আর কোথাও নেই।

বৃষ্টির ধরন হতে আমরা বেরিয়ে আসি সেই চা-দোকানের ভাঙা কার্নিসের আড়াল থেকে। জায়গাটা ভারী অচেনা লাগছিল। একটা লাইটপোস্ট আছে ঠিকই কিন্তু তার আলো কেমন অস্পষ্ট আর ভূতুড়ে। হয়ত তা নয় তবু তেমনই মনে হচ্ছিল জায়গাটা অসম্ভব নির্জন বলে। তমিস্রা বলল, কোথায় এলাম বলো তো?

—কী জানি! নিশ্চয়ই কোনো রূপকথার দেশ।

—যাহ্, ইয়ার্কি নয়। ওই দ্যাখো ক'টা ছেলে এদিকে আসছে।

—আসুক গে, বেশ বীরপুরুষ সাজার চেষ্টা করি, হয়ত ওরাও আমাদের মতো কোনো অভিযানে বেরিয়েছে। হয়ত রূপকথা খুঁজছে।

বললাম বটে, কিন্তু ছেলেগুলোর হাঁটার ভঙ্গি মোটেই ভালো নয়। যেন টলায়মান পা। সংখ্যায় চারজন, না পাঁচজন! এদিকেই আসছে অসংলগ্ন চলনে। যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে না গিয়ে উল্টোপথে যাব কি না ভাবছি, তবু তমিস্রার সামনে অতটা কাপুরুষ হতে পারলাম না। তমিস্রা কিন্তু বলল, এই, আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

এতক্ষণে আমিও একটু দ্বিধায়। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। ছেলেগুলো খুব কাছে এসে পড়েছে। বললাম, ওদিকে না তাকিয়ে নিজেরা গল্প করতে করতে চলে যাই।

সেরকমই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তারা রাস্তার ওপাশ দিয়ে যেতে যেতে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বয়স বাইশ-চব্বিশের মধ্যে। তাদেরই একজন আমাদের পথ রোধ করে বলল, এই বুবলা, এতক্ষণে মেয়েছেলে-মেয়েছেলে করে চেঁচাচ্ছিলি না? বলতে বলতে তোদের সামনে একটা জ্যান্ত মেয়েছেলে।

আশঙ্কার একটা হিমস্রোত বয়ে গেল আমার রক্তের গভীরে। এই যুবকেরা তমিস্রার প্রায় অর্ধেক বয়সের। তাদের মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা শোনা আমাদের কল্পনার বাইরে। তবু দিনকাল এরকমটাই পড়েছে। এখন কী করা যায় তা ভাবতে গিয়ে দেখি ঠকঠক করে কাঁপছে তমিস্রা। হাঁটতে হাঁটতে কোন পথ থেকে কোথায় যে এসে পড়েছি তা বিন্দুমাত্র বোধগম্য হচ্ছে না। কিছু ভেবে ঠিক করার আগেই আর একটি রোগা-পাতলা ছেলে তমিস্রার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এসো ডার্লিং, একটু হা-ডু-ডু খেলি।

মাথার ভেতর চলাৎ করে উঠল রক্ত। সব ক'জনই এত মত্ত যে কোনো কথা বলারই মানে হয় না। তবু চেঁচিয়ে বলি, ছাড়ো, ছাড়ো, কী হচ্ছে এ সব?

খুব গুঁট চেহারার এক যুবক আমাকে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, হঠ শালা, হঠাৎ মওকা একটা মেয়েছেলে পেয়ে গেছি, এখন উনি এয়েছেন বাগড়া দিতে, বলতে বলতে আমার চোয়াল লক্ষ্য করে একটা ঘুষি ছুঁড়ল আচমকা। আমি মুখটা সরিয়ে নিতে চাইলাম, তবু একেবারে আত্মরক্ষা করতে পারলাম তা নয়, ঘুষিটা সামান্য লাগল চিবুকের কাছে। সেই সুযোগে রোগা-পাতলা ছেলেটা তমিস্রার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করল। তমিস্রা চিৎকার করতেই তার গালে একটা প্রকাণ্ড চড়। তমিস্রা চিৎকার করে উঠল।

আমি সেদিকে ছুটে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই কী করে যেন আমি মুখ থুবড়ে রাস্তার

ওপর। সংবিত ফিরতে বুঝলাম ওদেরই মধ্যে কেউ একজন পেছন থেকে ল্যাং মেরেছে। কোমরে পায়ে ভীষণ চোট লেগেছে, তবু হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠতে গিয়ে দেখি উঠতে পারছি না। কেউ বোধহয় একটা হাত টেনে রেখেছে যাতে আমি উঠতে না পারি। ওদিকে তমিস্রাকে কোথায় কতদূরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারছি নে। তার ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। কী ভীষণ অসহায় লাগছে তখন। সেই মুহূর্তে কী যে হল, আমাকে যে-ছেলেটি টেনে ধরে রেখেছিল সে 'শালারা একাই ভোগ করে নিল রে, আমি বাদ পড়ে গেলাম' বলতে বলতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুট লাগাল অন্ধকারে। আমার সমস্ত শরীরে তখন যন্ত্রণা। তবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটলাম যেদিক থেকে তমিস্রার চিৎকার ভেসে আসছিল।

চার-চারটে রাক্ষস তখন তমিস্রাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। তমিস্রার শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে পিচরাস্তার জলে-কাদায়। তবু তমিস্রা একা প্রতিরোধ করছে চারজনের দাঁত-নখ। পঞ্চমজনও ততক্ষণে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু তাদের আক্রমণে সহসা ভাঁটা পড়ল আরো কয়েকজন যুবকের আবির্ভাব ঘটায়। বৃষ্টি ধরতেই তারা কোথাও যাচ্ছিল অথবা ফিরছিল। পথের মাঝখানে এ হেন ভয়ংকর কাণ্ড দেখে তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই— মুহূর্তে তমিস্রাকে রেহাই দিয়ে রাক্ষসগুলো উধাও হয়ে গেল অন্ধকারে। বিস্রস্ত তমিস্রা থরথর করে কাঁপছে দুহাতে মুখ ঢেকে। আমি গিয়ে তার শরীর ধরে ঝাঁকাতেই আমাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলল হু হু করে।

যে-যুবকেরা প্রায় দৈববলে আবির্ভূত হল, তাদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন যে এদিকে আসেন! এলাকাটা খুব খারাপ তা জানেন না?

তমিস্রা তখন হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কী যে বলছে তা বোধগম্য হল না। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে রাত গড়াতে গড়াতে অনেকখানি হয়ে গেছে তা খেয়াল হয়নি আমাদের। বৃষ্টির মধ্যে বেরোনোর উপায়ও ছিল না। তবু কী এক ঘোরের ভেতর দুজনে পৌঁছে গিয়েছিলাম নিজেদেরই অজান্তে। হয়ত কিছুক্ষণের জন্য সেই রূপকথার দেশে। খোলসের ভেতর ঢুকে পড়ার সময় উপলব্ধি করিনি যে খোলসটা আগেই ছিঁড়ে ফালাফালা ছিল। ছেঁড়া খোলসের ভেতর ঢুকে তা আর সেলাই করা যায় না।

অন্ধকারের ভেতর দুজনে টলোমলো পায়ে তখন হাঁটছি। যেতে যেতে চোখে না পড়লেও বুঝতে পারছিলাম আমাদের পেছনে মুচকি হেসে অনুসরণ করছে সেই চোখজোড়া।

# হরিয়াল-হরিয়াল

## সোহারাব হোসেন

হাট থেকে ফিরে এসে লোকটা, পেখুড়ে ইয়ার আলি সাহাজী, প্রথমে অবিক্রিত পাখিগুলোকে ঝাঁকের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ঝাঁক মানে একটা বড় খাঁচায় বন্দী পাখির দঙ্গল। পাখিগুলো মৌনীতা ভেঙে একটু হুল্লোড় করে নেয়। যারা ঝিমিয়ে ছিল চনমনে হয়ে ওঠে। ইয়ার চোখ মটকে দেখে। হাসে পাখিদের চঞ্চল তরঙ্গে। ফের ভিজে ছোলা, কিছু চাল, কিছু ভাত বাটিতে বাটিতে খেতে দেয়। তারপর নজর করে তার বর্তমান সমৃদ্ধির মূল—হরিয়াল ঘুঘুটার ওপর। বিচিত্র নক্‌শীদার, তেলতেলে দেহের, হরিয়ালটাকে ইয়ার আলি ভেন্ন খাঁচায় রাখে। খাঁচাটাও নক্‌শীদার। ওপরে ঝালর দেওয়া কাপড়ের কারুকাজে খাঁচাটা ঢাকা। নীচের দিকে ইয়ার ঝুলিয়ে দিয়েছে কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট ঘন্টা। মধুর সুরে টুং টাং করে বাজে। শুনতে ভালো লাগে ইয়ারের। এবার সে পাখিটার পরিচর্যায় মাতে। খাঁচার দরজা খুলে বাইরে আনে। বালতির জলে স্নান করায়। ঠোঁটে চুমু খায়। ফের খাঁচায় ভরে তাকে খেতে দেয়। তখন তরঙ্গময় হাসির ঠোঁটে তার আসমানের পরীরা নাচে। চোখে নামে কামনার মায়া। সে কামুক-নজরে পাখিটাকে দেখতে থাকে। অবশ-অবশ লাগে যেন সারাটা অঙ্গ। হঠাৎ সেই আবেশ ভেঙে যায় একটি নারী-কণ্ঠের ঝলকে :

—পোড়া কপাল আমার। যেদি ঐরাম হরিয়াল হয়ে জন্মাতি পারতুম্।—বউ মারুফা অনেক সময় ধরে স্বামীর পাখি-যত্নের দিকে লক্ষ্য করে একটু কাঁটা বিঁধিয়েই রা ছাড়ল।

—ক্যানো? কীসির লালোচ তোর, হ্যারা?—ইয়ার আলিও পাল্টা মশকরা করে ওঠে।

—বোঝো না?—বউ ওম-মাখা ঠোঁটে ভেন্ন এক জগতের দিকে ইঙ্গিত করে।

—নাহ্!—ইয়ার না-বোঝার ভান করে মিচকে হাসে।

—সরে এসো, বুঝগে দিচ্ছি।

—দে তেবে!—খাঁচা ছেড়ে এক ঝটকায় এক্কেবারে বউয়ের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায় ইয়ার—বল কীসির লালোচ তোর?

—ঐরাম মহব্বত পাবার।

—মহব্বত তো করি তোরে!

—ঐ পাখিডার চেয়েও!—বউয়ের ঠোঁটে ঝরে ছদ্ম-অভিমান।

—হ্যাঁ।

—না। তুমি মিথ্যে বলতোছো।

বউ অভিমানে জেদি হয়। ছদ্ম-অভিমান রাজবেশ পরে নেয়। ঠোঁটের কোণে রঙ্গ ছড়ায়। স্বামীর গায়ে যৌবনের ঠোনা মারে। নাল ফুলের বাঁকানো পাপড়ির মতোন ঠোঁট খুলে বলে—'পাখিডাই দেখতিছি তোমার এক লম্বর বউ, আর আমি তার সতীন!' কথাটা ইয়ারের বুকে ধাক্কা মারে। সে এবার মারুফার মুখে পূর্ণ নজর ফেলে। এক লহমায় বুঝে নেয়. রঙ্গের সর মুছে গিয়ে সত্যি সত্যিই এখন মহব্বত-উপোসী মেঘ জমেছে বউয়ের মুখে। সে তাই জলদি বলে ওঠে :

—হেই মারুফা, ছেলেমানুষ নাকিস তুই? পাখি পাখি তুই তুই। দু'জোনার মধ্যি ফারাক অনেক!

—সত্যি বলতোছো?

—হ্যাঁ।

—আমার গা-ছুঁয়ে বলোদিনি!

—এই তোর গা ছুঁয়ে বলতিছি। শোন্, ও পাখি আমার ব্যওসার লক্ষ্মী। হাটে-ঘাটে ্যাখন হুস করে হাত ফসকে কোনো পাখি উড়ে পেলগে যায়, তারে ফের ধরে আনার জন্যি ওরে কাজে লাগাই। হরিয়াল তারে ধরে আনে।

—মানে?

—মানে ধর...এই আজগের কথাডাই ধর না। মেটের হাটে গোটা দুই খয়রা পাখি বেচতিছি। খদ্দের উল্ডে-পেল্ডে দেখতেছে। দরাদরি করতেছে। অমনি ফস করে এট্টা উড়ে পালালে। খদ্দেরের গালে তো একগাল মাছি!

—উড়ে পালালে? তারপর? দামডা আদাই কোরোছো তো তার কাছ থে?

—ধ্যাস্, শোন্ না! তা আমি ত্যাখন হেসতিছি!

—হেসতোছো?

—হ্যাঁ হেসতিছি। আমি তো জানি ও পাখি ফের ফিরে আসবে। আলেও।

—ফিরে আলে? কেঙ্করে?—বউ গাঢ় আগ্রহে জানতে চায়।

—এডাই মজা। হরিয়ালডারে যত্ন-আত্তি কী সাধে করি? দুম করে খাঁচা খুলে ওডারে উড়গে দিলুম। ঘুঘুডা, ঐ রূপ-যৌবন লে আকাশে ওড়লে। ব্যস্, চোখের পলক পড়লে কী পড়লে না খয়রা পাখিভারে সুঙ্গে লে হরিয়াল ফিরে এসে বসলে আমার কাঁধে।

—সত্যি বলতোছো তো হ্যাগা?

—সত্যি না তা কী মিথ্যে? ঐ রূপ-চ্যায়রা দেখে কেউ ফিরে যাতি পারে নাকিন?

বউ মারুফার বাক রোহিত। সে বোবা মেরে গেছে। স্থির নজরে খাঁচা-বন্দী হরিয়ালটাকে দেখছে। মাত্তর মাস-ছয়েক হল ইয়ার পাখিটাকে ধরেছে। পায়রামারির মাঠ থেকে। ধরে অব্দি ওর প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিয়েছে। দিয়েছে দিয়েছে মারুফা কেয়ার করেনি। বরং হিংসে করেছে। কেন, কী তা অতো ভাবেনি। এখন পাখিটার গুণ-বাখানি শুনে সেও তার মায়ায় পড়ে গেল। বলল :

—পাখিডার যে এত গুণ তা বুঝলে কেঙ্করে?

—ও আমি বুঝদি পারি!—ইয়ার রহস্য বাড়ায়।

—কেঙ্করে সেডা বলো না!

—বলবো?

—বলো।

—না। তুইও চেষ্টা কর, তুইও বুঝদি পারবি।

—না তুমি বলো।

—বেশ তেবে নিশেষ টান।

—ক্যানো?

—টান, দ্যাখ্ পাখিডার গা দে কীরাম ম-ম করা গোন্ধো পাবি দ্যাখ।

—কই পাচ্ছিনে তো।—মারুফা দু'নাকে শ্বাস টানে—কই তোমার গোন্ধো?

—পাচ্ছিস নে?

—না।

—যোবতী নারীর ম-ম গোন্ধো পাচ্ছিস নে?

—না।

—না পাস না পা। শোন্, ঐ গোন্ধোডাই চোমকের মতোন অন্য পাখিগা, মানে যে পাখি এট্টাবার অন্তত ওর সঙ্গতে থেকেছে তারে টেনে আনে। ওর গা'র গোন্ধো যাদু গোন্ধো।

—সে না'য় বুঝলুম। কিন্তুক তুমি এ বিদ্যে শিখলে কেক্করে?

—ঐ গোন্ধো শুঁকে।

—শুধু গোন্ধো শুঁকে?

—না। আরু সপ সয়াল আছে। বাপ-পিতেমোর সয়াল। আমি তেবু পাখিমারা ছাড়া ভেন্ন পেশাও ধারণ করি। কিন্তুক বাপটা ছেল ওস্তাদ পেখুড়ে। তা পাখি উড়গে পাখি বশ করার কৌশল আমি বাপের কাছথেই শিখিছি।

—সে জোনাও জেনতো এ বিদ্যে?

—জেনতো মানে? এ-বিদ্যে খরচ করে সে জোনা জেবনডাও চালাতো। এট্টুস ভালো করে শোঁকদিনি তুই। দ্যাখ তুইও গোন্ধো পাবি!

—না পাচ্ছি নে।—মারুফা ফের শ্বাস টেনে মাথা নেড়েছিল।

—তেবে আর তোর পাতি হবে না। ও গোন্ধো সবাই পায় না।—বুকের গভীর থেকে তীব্র বোধময় কথা বের করে ইয়ার এবার মাটিতে ফেরে—তুই ওঠ্। বেলা ডুবে এয়েছে। ভাত দে, বিলি বেরোবো। কথা থামিয়ে ইয়ার আলি তার দৈনন্দিন কাজে নামার উদ্যোগ নেয়। সে পাখি-মারা। আশ্বিনের শেষাশিষি থেকে মাস পাঁচ-ছয় এই-ই তার পেশা। বিলকে বিল ঘুরে বেড়ায়। জাল-ঘণ্টা-মশাল নিয়ে মেতে থাকে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে হাজির হয় ধু-ধু শূন্য মাঠে। মশাল জ্বালে। ছোট ছেলেটার হাতে থাকে একটা কাঁসার থালা। ওটাই একটা কাঠের ডাং দিয়ে সে পেটাতে থাকে। উল্টোদিকে লগার মাথায় বাঁধা আয়তাকার জাল নিয়ে তৈরি থাকে ইয়ার। ঘণ্টার তাড়া খেয়ে মশালের আগুনের দিকে ছুটে আসা পাখিরা তখন অনায়াসে জালবন্দী হয়ে পড়ে। ইয়ার বিশ্বাস করে—পাখি ধরায় বরকত আছে। হালি-হালি সরকার পাখিমারা বে-আইনী করলেও, ইয়ার ওসব ভ্রুক্ষেপ করে না—'সরকার তো আর সন্ধ্যেবেলা মাঠে এসে বসে থাকপে না!'

পাখি ধরার মরসুমে ইয়ার সরেস থাকে বেশ। এ সময় তার দিন-রাত্তির চক্রে চক্রে এগিয়ে যায়। রাতে পাখি ধরে। বিচিত্র সব পাখি। খয়রা, বাটাং, কাদাখোঁচা, কাঁক, বক, শামুকখোল, পানকৌড়ি, হাঁসপাখি কত সব নরম নরম পাখি। মাঝরাতে বাড়ি আসে। বড় খাঁচায় তাদের বন্দী করে। হাটে যায়। তবে অন্য পেখুড়েদের মতো সকালে গোলাবাড়ির পাখি-হাটে সে যায় না। সে দুপুর দুপুর নানান হাটে বেরিয়ে পড়ে। পাখি বেচে। এতে লাভ বেশি। এভাবেই তিন মেয়ে, দু'ছেলে সমেত নিজেদের সাতজনের সংসারের হাল ইয়ার নিজ হাতেই ধরে রেখেছে। এতে খাটা-খাট্নি বহুত। অবশ্যি বড় ছেলেটা ইদানীং রাজনীতিতে মাথা গলিয়ে দু'পয়সা ঘরে আনতে শুরু করেছে। তাতে খানিকটা আশান পায় ইয়ার।

তবুও এক মুহূর্ত ইয়ার অলস বসে থাকে না। গতরে না হোক বিল-বাঁওড়ের চক্কর সদাসর্বদা তার মাথায় পাক মেরে বেড়ায়। সেই সয়ালে এখন ফের সে তাড়া দেয়—'হেই মারুফা ওঠ্। ভাত বাড়। সকাল সকাল না গেলি, অন্য পেখুড়েরা বিল দখল করে লেবে

যে!' মারুফা ওঠে। থালা সাজিয়ে স্বামীকে খেতে দেয়।

হাটে হাটে দেশে দেশে ইয়ার আলির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটাকে সবাই খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলেই মনে করছে। এখন হাটে গেলে তাকে ঘিরে ধরে কৌতূহলী জনতা। পাখি কেনা যেমন-তেমন সবাই হরিয়াল উড়িয়ে পাখি ফিরিয়ে আনার খেল্ দেখার বায়না ধরে। হরিয়ালের খাঁচাটার দিকে লোভাতুর নজরে চায়। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে খাঁচাটার গায় হাত বোলায়। বাবু-কসম-মার্কা কেউ কেউ আলগোছে জিজ্ঞাসা করে :

—হরিয়ালডা ব্যাচপা নাকিন ব্যাপারী ভাই?

—নাহ্!—চেষ্টাকৃত উদাসীনতায় ইয়ার উত্তর দেয়।

—ভালো দাম দিতুম!

—দাম দে কি সপ পাবা যায়?

—তা যায় না। তেবু যেদি ব্যাচো...!

—বেচলি তোমারে আগে খবর দোবো, বুয়োছো ভায়রাভাই।

এইভাবে খানিকটা রঙ্গ খানিকটা বিদ্রূপের মিশেলে বাক্য হেনে ঘ্যাচ করে ইয়ার কথার ব্রেক চেপে দেয়। কেউ কেউ হেসে ওঠে। বাবু-কসম-মার্কা যুবক নীরবে সটকে পড়ে। ইয়ার খরিদ্দারের সঙ্গে দরদামে মগ্ন হয়। বেচাকেনা করে। ফের বাড়ি ফেরে। বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরলে ফের পাড়ার লোকরা তাকে ঘিরে ধরে। বিশেষ করে ছেলেপিলের দল আর বউ-ঝিরা। ঘিরে ধরে কিন্তু প্রথম প্রথম কোনো কথা বলে না। হরিয়ালটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। ইয়ার আলির কাজকম্ম দেখে। পাখিদের খোরাকি দেওয়া দেখে। হরিয়ালটার গোসল করানো দেখে। ফের হরিয়াল-কোলে ইয়ার আলির গুণ গুণ গান গাওয়া দেখে। শোনেও। তারপর একসময় মওকা বুঝে প্রস্তাব দেয় :

—খেলাডা এট্টুস দ্যাখাও না ইয়ার ভাই।

—নাহ্।

—এট্টুস দ্যাখাও! আমরা কখনো দেখিনি! দ্যাখাও এট্টুস।

—না।

—ক্যানো?

—দ্যাখাবো না—আমার মজ্জি!

—বাব্বা, এত দেমাক!—কেউ কেউ তাতিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়!

—বেশ তাই! দেমাক ভাবলি দেমাক!

পড়শিদের সঙ্গে স্বামীর কথোপকথনের এমন মুহূর্তে মারুফা হাজির হয়। দরজার আড়াল থেকে সে এত সময় সব দেখছিল। এখন হাসতে হাসতে স্বামীর পাশটাতে বসে। বলে—'ডেমাকই তো। অ্যাতো করে সব্বাই ধরেছে। দেখাও না তোমার যাদু বিদ্যেডা! আমিও তো কখ্খোনো দেখিনি!' এবার ইয়ার নরম হয়। ধাঁই করে উঠে পড়ে। বড় খাঁচার ভেতর থেকে ধরে আনে একটা হাঁসপাখি। ফস করে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা বাতাস কাটতে কাটতে ওপরে ওঠে। অনেক ওপরে। সবার নজর যখন সেদিকে তখন ইয়ার হরিয়ালটাকে হাতে নেয়। বুকে চেপে ধরে। ফের ঠোঁটে চুমু দেয়। তারপর তাকেও ছুঁড়ে দেয় আকাশে। হরিয়াল সাঁই-সাঁই ছোটে। সবার নজর এখন ঊর্ধ্বমুখী। সবাই হরিয়ালটাকে দেখছে! হাঁসপাখিটাকে

দেখছে। উড়তে উড়তে দুটো বিন্দু হয়ে গেছে পাখিদুটো। সবাই দুটো বিন্দুর দাবা-ওলা দেখছে আকাশে। বিন্দু দুটো ওপর-নীচে আড়াআড়ি গোঁত্তা খাচ্ছে। একটা সময় পাখি দুটো সবার নজরের আড়ালেই চলে যায়। দেখা যায় না। কেউ দেখতে পায় না। অনেকক্ষণ। ব্যাপার দেখে মারুফা উদ্বিগ্ন হয় :

—হ্যাগা মিলগে গ্যালো যে!

—যাক।

—যেদি না ফেরে!

—ফেরবে। এট্টু খেল্‌তি দে। যৈবনবতী গোন্ধোড়া ছাড়তি দে।

ইয়ারের নজর আকাশে। দেখাদেখি অন্যরাও আকাশ-মুখো হয়। এবং অবাক নজরে দেখে ফের দুটো বিন্দু স্পষ্ট হচ্ছে। এবার তারা পাশাপাশি। ক্রমশ বড় হচ্ছে। বিন্দু থেকে মার্বেল, মার্বেল থেকে বল, বল থেকে লম্বা একটা পেন্‌সিল, ফের পেন্‌সিলদুটো হরিয়াল আর হাঁসপাখি হয়ে ইয়ারের কাঁধে ফিরে আসে। খুশিতে ভরে যায় সবার চোখ। ছেলেপিলে বউ-ঝিরা হাততালি দেয়। আনন্দের ঢেউ তুলে ওরা চলেও যায়। তখন স্বামী-স্ত্রী চোখোচোখি তাকায়। দুই নজরের সম্মিলনে প্রথমে মায়া সৃষ্টি হয়। মহব্বতের মায়া। তারপর সময় গেলে মায়ার রঙ ফিকে হয়ে যায়। ফের মারুফার চোখে উদ্বেগের জন্ম হয়। সে বলে :

—শুধু পাখি লে পড়ে থাকলি চলবে?

—ক্যানোরে হ্যারা?—ইয়ার জানতে চায়—কী হয়েছে?

—বড় ছেলেডার সম্বন্ধে ভাবা-ভাবনা করলে কিছু?

—তা তো করতিছি!

—কই করতোছো? ওতো যে কে সেই চলতেছে, ফের রাজনীতি লে মাতামাতি করতেছে।

—হুঁ এডা চিন্তার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এট্টা ব্রেক মারা দরকার।

—কবে মারবা? শুনতিছি নেতার ডান হাত হয়েছে। মোস্তানি করতেছে। এখনো সোমায় আছে। নড়ে চড়ে বোসো। কিছু এট্টা করো।

—করবো। এবার আসল বিদ্যেডাই ঝাড়বো ওর ওপর।

—কবে? কবে ঝাড়বা? এতো কাণ্ডোর পরও তো তোমার সাড় দেখতিছি নে। এই সেদিন ওর বেপক্ষির পার্টি এসে বাড়ি চড়াও হ'লে। ভাঙচুর করলে। বাধা দিতি গে আমি মার খালুম। সেসপে হুঁশ আছে তোংগা বাপ-ব্যাটায়?

—হুঁশ নিকো?—ইয়ার একটু উত্তেজিত জিজ্ঞাসা করে।

—কনে আছে? থাকলি ওরে থেবড়ে-থুবড়ে লে বাড়ি ফিরগে এনতে।

—বেশ মানলুম তোর কথা। কিন্তুক তুই তো মা। তুই তো বারণ করলি পারিস।

—আমার কথা সে পাছাদেও পোঁছে না।

—বলিছিস কখনো?

—বলিছি। বলে পাল্ডা শুনতি হয়েছে। বলেছে—'তোংগা জামানা শেষ, আমি ওরাম মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতি পারবো না। আমার ভেন্ন ভাও।'

—কী বলে শুনি!

—বলে, জানের রিস্কি না লিলি আয়-উন্নতি হয় না এখন।

—হুঁ। বেশ বেড়েছে দেখতিছি।

—তুমি এট্টুস বারণ করো!—মারুফা কণ্ঠ পাল্টিয়ে স্বরে মায়া আনে—রাজনীতি এখোন ভারী বেপদ। তার ওপর ও ওইরাম হোঁকাকাটা। তুমি দ্যাখো এট্টু! ও বোধায় আর ফেরবে না।

—ফেরবে। ও তো ও ওর বাপ ফেরবে!—ইয়ার এবার জেদি হয়ে ওঠে।

—কেঙ্করে। শুধু মুখ চালালি হবে?

—ফেরবে খুপ সহজে।

—মানে?

—বললুম তো এবার আসল বিদ্যেডা ঝাড়বো ওর ওপর। এই হরিয়াল যেরাম করে অন্য পাখিগা ফিরগে ল্যাসে সেইরাম করে ওরে ঘরে আনবো।

—মানে? কেঙ্করে?

—এট্টার পেছনে আর এট্টা উড়গে দে।

—বুঝলুম না। ও কি পাখি নাকিন? ভেদড়া ভেঙে বলো না!

—পাখি, আবার পাখি না। ওর পেছনে আমি মানুষ লিল্‌গে দোবো।

—মানে?

—মানে ছোটোডারেও ওপথে ঠেলে দোবো। ও হরিয়াল হয়ে বড়ডারে ফিরগে আনবে।

—তুমি হরিয়াল লেই থাকো। ওসপ আবার হয় নাকিন মানুষির ক্ষেত্রে!

—ক্যানো হবে না? হবে। হোতিই হবে। আমার বংশে তিন পুরুষির খবে রয়েছে।

—খবে?

—হ্যাঁ খবে। আমার বংশে তিন পুরুষির বর আছে। পাখিগা কাছ থে আমরা তিনপুরুষি তিনবার মহা উপগার পাবো। মানে য্যাখন আমারগা জীবন-মরণের কোচ্চেন দেখা দেবে ত্যাখন এই বিদ্যে খেটকে আমরা পার পাবো।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। পেথমে আমার বাপ এই বিদ্যে খেটকেছে। তারপর আমি। দু'জনাই ফল পেইছি।

—সত্যি?

—সত্যি না তা কী? শোন্‌ তেবে!

কথা থামিয়ে ইয়ার আলি এক অলৌকিক গল্পের জগতে চলে যায়। ঢুকে যায় তার বাপের বৃত্তান্তে। একটা ঘোরের মধ্য থেকে সে বলে যেতে থাকে—'এ বেত্তান্ত আমার দু'ফুবুর বেত্তান্ত। বুইলি, বড় ফুবু সাবালোক হয়ে পুব পাড়ার হেদায়েতের সুঙ্গে ভাবলাব করেলো। হেদায়েতের নামে সারা তল্লাট ত্যাখন থরহরি কাঁপে। ডাকসাইটে মোস্তান ছেল সে। সে সপ মেলাই বছর আগেগার কেচ্ছা। তার ফেরে নেতা—এম. এল. এ-র সুঙ্গে ছেল তার দোস্তি। ফলে তারে ঘাটানে অতোডা সহজ ছেল না। বড় ফুবুর কী কাণ্ড তার সুঙ্গেই লটঘট বেধগে বসলে। মেয়েরে লে দাদা পড়ে গেল বেপদে। অমন পাষাণ-ডাকাতির হাতেই বা মেয়েরে তুলে দেয় কী করে? তাই শুরু হল বড় ফুবুর ওপর অত্যেচার। মারধর। মার বলে মার, গোন্দোরূপ মার চালাতি লাগলে দাদা। কিন্তুক কিছুতিই কিছু হয় না। শেষটায় এগগে আলে বাপ। পাখ-পাখালির সুঙ্গে ত্যাখন বাপের দহরম-মহরম। সেই সয়ালে ত্যাতোদিনি বাপের হাতে এসে গেছে এই লক্ষ্মী হরিয়ালের মতোন সাদা-ধবল আর ঘি-

রঙের নক্‌শীদার এট্‌টা পায়রা। বাপ সেই পায়রা দে হারানে পাখি সপ খুঁজে এনতো। তা বাপ এই বিদ্যে বড় ফুবু আর হেদায়েতের ওপর খাটালে। কী করলে, না ছোট ফুবুরি এগ্‌গে দেলে। উড়গে দেলে হেদায়েতের দিকি। ছোট ফুবু ত্যাখন যৈবনবতী হবার গোন্ধে সারা গ্রামে ম-ম সুবাস ছড়াচ্ছে। তা শিখ্‌কে-পড়গে বাপ ছোট ফুবুরি যেভাবে উড়গে দেলে, ছোট ফুবু সেভাবেই ওড়লে। ব্যাস, বেধে গেল ধুন্ধুমার। দুই বুনির লাটা-ঝামটা শুরু হলে। আর হেদায়েত পড়লে বিপদে। কারে ছেড়ে কারে ধরে। এরে ধরে তা ও পেছনে কল করে, ওরে ধরে তো এ সামনে কাঠি করে। হেদায়েত পেথমে খুব সাবধানে ছলবল করে আড়ালে-আড়ালে দু'ফুবুর সুঙ্গি মিলমিশ করতো। কিন্তুক হেদায়েতের মতোন লোক এরাম লুকো-ছাপা করে কদ্দিন চলবে? চললে নাও বেশিদিন। দূর করে একদিন দু'জনার সঙ্গ ছেড়ে দেলে। দে ভেন্ন ফুলি বসলে। ত্যাখন দুই ফুবু আমার পিঠোপিঠি ফিরে আলে।'—স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে পায়রা দিয়ে পাখি ধরার সয়ালে মানুষ দিয়ে মানুষ ফেরানোর কাহিনী বলে গেছিল। শেষে মারুফাকে প্রশ্ন করেছিল :

—বুইলি কিছু?

—বুইছি। ফের তোমার বেত্তান্তখানা বলোদিনি শুনি।

—শুনবি?—ইয়ারের মুখে হালকা হাসির স্বর জমে।

—শোনবো।

—তেবে শোন্, আমি এ বিদ্যে খেটকুলুম তোর ওপর।

—আমার ওপর?—মারুফা বিস্মিত হয়—ক্যানো? কখন?

—বের সোমায়। তোর ওপর, আবার তোর ওপর না। তোরে বে করার জন্যি আমি ত্যাখন পাগল। কী রূপ-চ্যায়রা ছেল তোর। শুধু আমি ক্যানো, আমারগা গেরামের ছোটো-কালোও উঠে পড়ে লেগেলো তোরে ঘরে তোলবে বলে। সত্যি বলতি কী তোরে দখল লোবার দোড়োদোড়োতি ওইতিই এগ্‌গে ছেল। আমি হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছিলুম। মনের মধ্যি ত্যাখন আগুন। ছটফট করতি করতি বাপের বিদ্যে খাটালুম ছোটো-কালোর ওপর। ওরে ফিরগে আনলুম তোর পথথে। পথের কাঁটা তুলে তোরে ঘরে আনলুম।

—এতোডা কাণ্ড তুমি ঘটকিলে?—মারুফা হেসে হেসে বলে—তালি তো বিদ্যেডারে গড় করতি হয়।

—হ্যাঁ। তিনির দু'টো লোবা হয়ে গেছে। এবার বড় খোকার ওপর উড়ো দেওড় করবো।

—খাটপে তো?

—খাটপে। নিশ্চিত্ খাটপে। তেবে আমার হাতে কাজ হবে না। তিন পুরুষির হিসেব ধরলি এবার ছোট খোকার পালা দাঁড়ায়। বুইলি?

—হুঁ!

—হুঁ কী? ভেদ বুইলি তো?

—বুইছি। বড় খোকারে ফেরাতি ছোটডারেও রাজনীতির গভেভ উড়গে দিতি হবে। তাই তো?

—ঠিক ধরিছিস!

—দ্যাখো ঝা ভালো বোঝ তাই কর। দেওড় করো আর বিদ্যে ঝাড়ো ছেলেডারে ফেরাও।

তারপর ইয়ার শুরু করেছিল তার বিদ্যের ওস্তাদি। পাখি মারার কাজ থেকে ছাড়ান

করে ছোটছেলেটাকেও উড়িয়ে দিয়েছিল। ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়েও দিয়েছিল। দাঁতে-নখে-ঠোঁটে দিয়েছিল যাদুবিদ্যার ছোঁয়া। বলেছিল—'হরিয়ালডার মতোন ঠিক ঠিক ডিউটি পালন করিস বাপ। তোর ঠোঁটে আছে মেহেন্দি চোমক, থাবায় আছে ধারালো ছুরি, নখে আছে শানানে কোঁচের ছাট্‌রা-ছররা ধার। তুই আমার শিকারী হরিয়াল। যা উড়ে যা। গোন্ধো ছড়া। বড়ডারে ফিরগে ল্যায়।'

ছোট ছেলে ভাইয়ের সয়াল নিলে ইয়ার ফের মশাল, কাঁসার থালা-ঘণ্টা, জালতিতে মন দিয়েছিল। ব্যস্ত হয়েছিল বিল-বাঁওড়ে। ফি-রোজ শুরু করেছিল পাখি ধরা। হরেক কিসিমের পাখি। নিয়ম করে এ বিলে যায়, ও বিলে যায়। মাথার ভেতর হরিয়ালের চক্কর। মাথার ভেতর বড় ছেলে—ছোট ছেলের ওড়াউড়ি। ছোটছেলের দেহ এখন হরিয়াল। সে গন্ধ ছড়াচ্ছে। ম-ম। তাতে বড় ছেলে বিরক্ত হচ্ছে। এটা আশার কথা। বিদ্যেটা ঠিক ঠিক জায়গায় কাজ করা শুরু করেছে। ইয়ার এক বিল থেকে আর একে আড়কা মারতে মারতে ফুরফুরে হয়। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার সেই ফুরফুরে মেজাজের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ায় কিছু যণ্ড। রাজনীতির যণ্ড। বিলের আঁধারে তারা সাইরেন বাজায়। তার পথ আঁটকায়। বলে :

—কড়া কথা ছেল ইয়ারচা'।

—কী কথা?—ইয়ার স্বাভাবিক জানতে চেয়েছিল।

—ব্যাঙের মাথা।—যণ্ডদের সর্দার তামাশা করে।

—মানে?

—মানেডা সোদা। ছেলেরে সাবধান করো। নালি বিলা করে দোবো।

—মানে?—ইয়ার এবার গেঙ্‌ড়িয়ে ওঠে।

—আরু মানে শুনতি চাও? এই মানেডা তোরা চাচারে ভালো করে শুনগে দে দিনি!

একটা যণ্ড একথা বলামাত্রই অন্য দুটো যণ্ডর মুখে খই ফুটতে শুরু করে। দুজনে নাটকে মাতে—গীতিনাট্য। একে বলে অন্যে রা দেয় :

—এট্‌টা কতা!

—কী কতা?

—ছেলের মাথা!

—কী ছেলে?

—গুণ্ডা ছেলে।

—কী গুণ্ডা?

—রঙিল পাণ্ডা!

—কী রঙিল?

—বোমাবাজি রঙিল।

—কী বোমা?

—দানা বোমা!

—কোন্ দানা?

—রাজনীতির খানা।

—কীরাম খানা?

—বাড়-বাড়ন্তি মানা।

—কীসির বাড়?

—তেলের বাড়।

—কী তেল?

—খতম খেল্।

আর দাঁড়ায়নি ষণ্ডগুলো। ঝুঝকো আঁধারের মধ্যে মিলিয়ে গেছিল। যাবার আগে বলে গেছিল কোরাসে—'বুইলে তো চাচা, খেল্ খতমের কতাখান বলতিছি।' সেদিন আর মাঠে মন রাখতে পারেনি ইয়ার। কেমন যেন একটা অশুভ বার্তা তার মাথায় মুগুর মারছিল।

ফের আস্তে আস্তে সব ভুলে যায় ইয়ার। সব কিছুকে বুকের গহীনে চালান করে পাখ্‌-পাখালিতে মন দেয়। পাখি ধরে। খাঁচায় পোরে। দুপুর দুপুর হাটে যায়। হাটে যায়—হাত ফসকে পাখি উড়ে গেলে হরিয়ালটাকে পিছু পাঠায়। হারানো পাখি ফিরে পায়। হাট-ফেরতা বাড়ি এসে হরিয়ালটাকে গোসল করায়। তখন তার পাশ ঘেঁষে বসে মারুফা :

—আমার মনডা কিন্তুক ভালোবেসতেছে না।

—ক্যানো?

—ছেলে দুটো ফেরবে তো?

—ফেরবে।—মাঠের হুমকি ফের চিন চিন করে বাজলেও তাকে ইয়ার হজম করে ফেলে। বলে—নিশ্চয়ই ফেরবে।

—ফেরবে তো সুপথে?

—তোর সন্ধ হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—ক্যানো?

—দিনকাল খারাপ। রাজনীতি এখোন সব্বখাগি। ছেলে দুটোরে পায় খেলাচ্ছে। জিবি লিতি কত্‌খুন?

—খেলাক খেলাক। তাতি কিছু ফায়দা করতি পারবে না। ওরা ফেরবে।

—কই ফিরতেছে?

—ফিরতেছে তো। আগের থে কি এট্টু বেশি-বেশি, মানে ঘোনো-ঘোনো বড় খোকা বাড়ি ফিরতেছে না?

—তা অবশ্যি ঠিক। তার ফেরে সেদিন ছোটখোকা বলতেলো, বড় খোকা নাকি্ন এখোন প্রাই-প্রাই তোমার-আমার খবর ল্যায়।

—তেবে? ফেরার এই শুরু। এবার ফাইনাল ফেরা ফেরবে।

ইয়ার তারপর কথা থামিয়ে বউয়ের হাতে বাড়া ভাতের থালাতে মন দেয়। গপাগপ খায়। মশাল-ঘণ্টা হাতে নেয়। মনে মনে নতুন বিলের সন্ধান করে। সয়াল খোঁজে। বউরে বুকে টেনে নেয়। বলে—'অতো ভাবিস নে। আমার এ বিদ্যে মহাযাদু। এ বিদ্যেয় সবাই ঘায়েল হয়। হোতি বাধ্য।' ফের বউরে সোহাগ করে। বউয়ের হাতে হাত রাখে। বউয়ের হাতে হরিয়ালডারে তুলে দেয়। বলে—'নে এরে এট্টুস আদর কর। মনডা ভালো হব্যানি।' তারপর বাতাস কেটে বেরিয়ে পড়ে। নতুন মাঠের সয়াল ধরে।

সেদিন সে ট' মারতে মারতে হাজির হয় গৌরীভোজের মাঠে। মাঠে পা দিয়েই বুঝতে পারে—এ মাঠে সোনা আছে। পাখির রাজ্য এ মাঠ। ইয়ার দেরি করে না। মশাল জ্বালে।

জাল পাতে। ঘণ্টা বাজায়। ঝপাঝপ পাখি ধরে। আধঘণ্টাটাক হয়েছে কী হয়নি—খানকুড়ি পাখি তার খারা-বন্দী হয়ে যায়। খুশিতে থাবা গ্যাঁদা ফুলের মতোন ফুটে ওঠে ইয়ারের বুক। আরো পাখির নেশায় সে মাঠের দিক পরিবর্তন করে। আর সেখানে জাল পাততে গিয়েই সামনে আজদেহ বিপদ দেখে সে। দেখে সন্ধ্যার পাতলা আঁধারে একটা দোনলা বন্দুক উঁচিয়ে তার কপালে ধরেছে সেই আজদেহ। সঙ্গে দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে খর শীৎকার :

—মাথার খুলি উড়ি দেব একদম।

—কে-কেডা? ক্যা-ক্যা-ক্যানো?—ভয়ার্ত ইয়ার তোতলায়। মশাল-ঘণ্টা খসে পড়ে।

—জানো না?

—না। আমার কী অন্যায়।—ইয়ার খানিকটা ধাতস্থ জিজ্ঞাসা রাখে।

—পাখি-মারা বে-আইনি তা জানো না।

—জানি।

—তবে ধরছ কেন?

—গরিপ মানুষ। এড়াই আমার রুটি-রুজি, তাই।

—ওসব বুঝিনে। এমাঠে ওসব চলবে না। এরা প্রকৃতি। এরা প্রাণ। এরা সুন্দর। এরা ফুল। এরা গান গায়। এরা বন্ধু। আর তুমি জল্লাদ। খুনী। পাখি মারো।

—আর হবে না ছার।—অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়ার নত হয়।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ ছার। আমি এক্ষুনিই গেবরযাচ্ছি।

—যাও।

—যাচ্ছি ছার,—ইয়ার দু'পা এগোয়।

—দাঁড়াও।—ফের দাঁতের ওপর দাঁত রাখা চেরা গলা—যে ক'টা ধরেছ ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে দোবো?

—হ্যাঁ।

—কষ্ট করে ধরা ছার।

—ছাড়ো বলছি। নইলে...!

বাজ ফেলা গলায় লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দোনলা বন্দুকে উড়ো দেওড় হয়। খারা-বন্দী পাখিগুলো ঝটপট করে ওঠে। ঠক ঠক করে কেঁপে ওঠে ইয়ার। বুকের ভেতর চড়াই পাখির কাঁপন। এবার লোকটাকে চিনতে পারে সে। লোকটা পাখি-বন্ধু। খুব নামডাকয়লা লোক। অন্য পেখুড়েদের মুখে এনার কথা শুনেছে ইয়ার। পেখুড়েদের যম ইনি। মনে মনে আওড়ায় ইয়ার—'শালা পড়বি তো একেবারে যমের মুখি।' কিছুটা সময় নীরব কাটে। ফের লোকটা হাঁকার দেয়—'কী হল? ছাড়্। ছেড়ে দে পাখিগুলোকে।' কপাল-লেখন পড়ে নিয়েছে ইয়ার। তাই আর দেরি করে না। এক এক করে কুড়িটা পাখি ছেড়ে দেয়। তারপর মাথা নিচু করে বিল ছাড়ে সে।

মনটা দমে যায়। কলিকালের ওপর রাগ হয়। লোকটাকে গালাগালি করে মনে মনে—'উহুঁ! শালো পাখি-বন্ধু মেরগেছে! পোঙায় রস থাকলি ওরাম বন্ধু শালো আমি একশ' হাজার বার হোতি পারি, বুইলে!' হাঁটতে হাঁটতে একবার ভেন্ন মাঠে যাবার কথা ভাবে। পরক্ষণে সে ভাবনা বাতিল করে। সটান বাড়ি ফিরে আসে। শূন্য হাতে—শূন্য খাঁচায়। ফের অবাক

হয়। দেখে—ঘর-দোর সব অন্ধকার। বাতি জ্বলেনি। ইয়ারের প্রাণটা কেঁপে ওঠে—'কোনো বেপত্তি ঘটিনি তো?' জাল-মশাল-ঘন্টা সব উঠোনে রেখে সে দ্রুত ঘরে ওঠে। মারুফা বসে আছে চুপচাপ। ইয়ার জিজ্ঞাসা করে :

—কীরা বউ? কী হয়েছে?

—তোমার যাদু মিথ্যে হয়ে গেছে!—মারুফার গলায় কান্না চলকে ওঠে।

—মানে?

—তোমার সাধের হরিয়াল একলা ঘরে ফিরে এয়েছে।

—মানে?

মারুফা কোনো উত্তর দেয় না। পাশে বসে থাকা ছোট ছেলের দিকে ইশারা করে। ইয়ার তার সামনে দাঁড়ায়—'কী হয়েছে রে ছোট খোকা?' ছোট খোকা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দেয় না। যেন বোবা। ইয়ার এবার তাকে ধরে নাকড়া-ঝাকড়া দেয়—'বড় খোকা কই? বাড়ি আসিনি ক্যানো সে?'

—আর আসপে না বাপ।—ছোটছেলে ফিস ফিস করে উত্তর দেয়।

—মানে?

—আজ সন্ধ্যেয় পঞ্চাৎ-মেম্বার খুন হয়েছ্। ভাইগা দ'লের কাজ। তাই এলাকা ছেড়ে গেছে। এলাকায় থাকলি বাঁচতি পারবে না।

ইয়ারের সারা দেহ শিথিল হয়ে আসে। ধ্বস নামে তার মনে। দেহটা ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। বসে পড়ে দাওয়ার ওপর। বুকের মধ্যে তীব্র কাঁপন। বুকের মধ্যে তাড়া খাওয়া, হাত ফসকে উড়ে যাওয়া বড় ছেলে। তার পাশে বন্দুকয়লা পাখিবন্ধু—তার দাঁতের শীৎকার। ইয়ার দেখতে পায় তার থাবার মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটার পর একটা পাখি ছেড়ে দিচ্ছে সে। ইয়ার কাতরিয়ে ওঠে :

—বাপের পায়রা, আমার হরিয়াল?

—সপ মিথ্যে হয়ে গেছে!—পাশ থেকে মারুফা জবাব কাটে।

—ওরা যে হারানে মানিক খুঁজে আনে!

—কলিকালে ওরা নিগোন্ধে হয়ে গেছে!

—আমার বড় খোকা?

—উড়তি উড়তি কল্‌জেয় আঘাত খেয়ে লাট খেয়ে পড়বে।

—আমার বড় খোকা?

—কোনোদিন বাড়ি ফেরবে না।

—আমার হরিয়াল?

—মিথ্যে!

ইয়ার কথা বন্ধ করে। মাটি খামচায়। মুখে গোঙানির শব্দ ওঠে। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে যায়। সাধের খাঁচাটা আনে। এক হ্যাঁচকায় নক্‌শীদার আচ্ছাদনটাকে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর দরজাটা খুলে দেয়। হরিয়ালটাকে বাইরে আনে। আকাশে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা উড়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে। তার ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। চাপ চাপ নৈঃশব্দ নামে। তারপর সেই শব্দহীন রাত্রি এক সময় ফালা ফালা হয়ে যায়। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ইয়ার।

## মতভেদ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দূরের পথ সুরের পথ একই পথ একই পথ,
এখান থেকেই ভাগ হয়ে যায় তোমার মত আমার মত,
এখান থেকেই ছন্দ ওঠে রাত্রি যখন মত্ত হয়,
এখান থেকেই আগুন বাজে এখান থেকেই সমস্ত ভয়
উড়িয়ে দিক কুটুম্বিতায় কঠিন রীতির রাস্তা খুলে,
একাত্মতার সরোদ ঘিরে রাগরাগিণীর নোঙর তুলে,
বাঁকানো পথ কব্জা করে খামচে নিলে লুটের মাল
পরোয়াহীন তিমির দল ছিঁড়বে চতুর লোহার জাল,
রক্তপলাশ জ্বেলে দিচ্ছে তোমার পথ আমার পথ,
মধ্যপথে কুস্তি করে ভেঙে দিচ্ছ আত্মরথ,
তোমার পথই আমার পথ এমন আশা নাই বা করি,
মৃচ্ছকটিক বুঝতে গিয়ে চৌর্যরীতি নাই বা ধরি,
মিলের মধ্যে সখ্য খুঁজি তোমার মিল আমার মিল
ঝঞ্ঝারাতে কেইবা খোঁজে ঠোঁটের মিল বুকের তিল,
তবুও কোনো সংজ্ঞাসরিক আঙুল তুলে প্রশ্ন করে—
দুঃসময়ে দোল খাবে কি ছিন্ন মতের সূত্র ধরে,
তারপরও কি প্রশ্ন ওঠে একমতেরই অন্য মত,
ছন্দমিলের চাপা তুফান সমগ্র পথ সারাটি পথ।

# কে কোথায় চলে যায়

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কে কোথায় চলে যায়, কার জন্যে কে আছে দাঁড়িয়ে?
আমরা সফলকাম হ'তে গিয়ে
দু'পায়ে মাড়িয়ে
চ'লে যাই। লঘুগুরু বিচারের কাল
এ নয়—তা' ভেবে নির্বিচারে।

অতসী অপরাজিতা ফুটে আছে পথের দু'ধারে;
এদিকে নির্মেঘ শূন্যে নির্জলা মেঘের হানাদারী;
ভিখারী বালক হাঁটছে ফুটপাত দাপিয়ে;
খড়ের উনুনে ফুটছে ভাত।
সকলেই ছুটছে ঘামে জব্‌জবে শরীরে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রঙিন টিভির পর্দা জুড়ে
যৌনপসারিণী ভাসে!
সমুদ্রমন্থন ক'রে লক্ষ্মী নয়, উঠে আসে
পণ্যা নারী, বিষকুম্ভ হাতে।

চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায় বিপরীত চিন্তার সংঘাতে;
বিপর্যস্ত, একা হ'তে থাকি;
দৈনিক কাগজে চোখ, যদি
প্রত্যাশিত কিছু
ঘটে যায়, মেলে!

বিক্ষুব্ধ কেরাণী শূন্যে মুঠো তুলে মিছিলে, পা ফেলে
জানায়—ওরাও প্রতিবাদী,
এবং রাজার অনুগামী—
কোনোখানে স্ববিরোধ নেই।

কোথাও হয় না যাওয়া। যে-ই
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি অর্বাচীন,
থাকি—
সেখানেই।

## আলো ভিক্ষা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বুকে রোদ্দুর নিয়ে
সমুদ্রের মুখোমুখি
হাঁটু মুড়ে বসে আছি;

দূর জাহাজের মাস্তুল ছোঁয়া
পাখিদের ছায়া লাগে দূরে;
হাওয়া মেঘে ছায়া দীর্ঘতর,
দূর থেকে আলো
আলোময় জলাঞ্চল
আলোময় বিভাজন রেখা
আলো ভাগাভাগি করে
ছুঁড়ে দিই সমুদ্রে; ছায়াপথে
আলো লেগে যায়;
এভাবে আলো ছড়াতে ছড়াতে
একেবারে হাত খালি হয়ে যায়;

সমুদ্রের মুখোমুখি ঠায় বসে
আলোর ভিক্ষায় করতল পেতে!!

## রামাশ্যামাদের আসা-যাওয়া

রত্নেশ্বর হাজরা

আসে তো প্রত্যেকে—তবে প্রত্যেকের আসা
নজরে পড়ে না
মাঝেমধ্যে একজন বা দু'জনের আসা
আবির্ভাব হয়ে ওঠে বলে
মানুষেরা দেখে—মনে রাখে। যেরকম
সকলেই যায়—তবে
মাঝেমধ্যে একজন বা দু'জনের যাওয়া

তিরোধান অথবা নির্বাণ হয় বলে
আ-মেরু পৃথিবী চেয়ে দেখে—দেখতে পায়।
দরজায় প্রহরী থাকে—তবে
তার কিছু করার থাকে না
কারণ যাঁদের এই আবির্ভাব অথবা নির্বাণ
তাঁরা তার চেনা—তাঁরা বিষুবরেখারও খুব চেনা।
কিন্তু যারা শুধু আসে—শুধু জন্ম নেয়
এবং যাদের যাওয়া মৃত্যুর অধিক কিছু নয়
তাদের সামান্য এই আসা ও যাওয়ার মধ্যে
নিছক বৈশিষ্ট্যহীন—এলেবেলে একটুখানি বাঁচা
মাটি জল হাওয়া দেখে আর কেউ দেখে না—চেনে না
তারা যে নিতান্ত রামাশ্যামা—জনসাধারণ
খড়কুটো—আগাছা-পরগাছা—

## দুটি কবিতা

সুশান্ত বসু

### ১. কতদিন স্তব্ধ ও উড়ান

স্তব্ধ উড়ানের এ মুখর বিকেল ছুঁয়ে আজ
দ্যাখো কত আত্মঘাত গুঞ্জিত শিহর বুকে নিয়ে
হেসে ওঠে ভাঙা গোষ্ঠে পাতার বাঁশিটি বেজে-ওঠা
ছিন্ন পতাকার নিচে শুয়ে থাকা হিরণ্ময় সুখের উঠোনে!

ও পাখি, তোমার কাছে আমারও তো দীক্ষা ছিল নাকি?
পথের ধুলোয় রক্ত বলে আজ কোন কথামালা?
প্রতিদিন মর্ষকাম যাদবেরা পরস্পর দুয়ো দেয় পৈশাচী প্রাকৃতে!
দুয়ো দেয় টীকা ও ভাষ্যের যতো ওগ্‌রানো শব্দের চাতুরিকে!
ধর্ষণশিল্পের এই ভুবনভাঙার রঙ্গনাটে
হিতৈষী মার্জার তার বৈতালিক গেয়ে চলে অন্তহীন—
কতদিন স্তব্ধ এ উড়ান!

## ২. সারিন্দার গাঢ় ইন্দ্রজালে

এই তো তোমার বুক থেকে আজ
জেগে ওঠে আর এক পৃথিবী
যেখানে অনন্ত তৃষ্ণা গোধূলির রঙ মেখে আলো
কেবলই ছড়িয়ে দেয় কালো হয়ে আসা এক মায়াবী বিকেলে
এ মরুঝঞ্ঝার বুকে সারিন্দার গাঢ় ইন্দ্রজালে।

## স্বেচ্ছাচার

**গণেশ বসু**

মগজে ঘিলু নেই অজানা অবসাদ শূন্যতার
পঙ্গু করে দেয় ক্রমেই অসহায় অনিশ্চিত
মিনার ভেঙে যায় কেবল কুরে খায় বিতৃষ্ণার
অথচ মানে নেই ভাগাড়ে পড়ে থাকি সম্মোহিত।

ভাগাড়ে অনাচার ভাগাড়ে অপমান শিল্পকলা
গাধার পিঠে চেপে পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার
স্বপ্ন নড়ে যায় কেচ্ছা কারুময় শকুনিশলা
ক্লান্ত প্রতিবাদ শ্রান্ত প্রতিশোধ স্বেচ্ছাচার।

কোথাও দিশা নেই নিজের কাছে তাই অচেনা নিজে
জমানো হাড়গোড় নিবিদে ভুলে যায় তিরস্কার
এখানে কঙ্কাল শীতল কঙ্কাল ছড়ানো ব্রিজে
ভাগাড়ে অনাচার ভাগাড়ে প্রতিরোধ স্বেচ্ছাচার।

## লাবণ্য ও বন্যা

### উৎপলকুমার গুপ্ত

আজ জলের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছ তুমি
যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখি
কেঁপে উঠেছে ঘর
ভেসে যাচ্ছে আসবার, সম্বৎসরের ধান
অসময়ের সম্বল—
এমন কি সাধ-করে-লাগানো গোলাপের চারা
সেটুকুও বাদ রাখোনি,
আজ তুমি এত ভয়ংকর

জানি বলবে, 'এ আমার প্রতিশোধ, আমি লাবণ্য থেকে বন্যা নই—
আমাকেও ফিরে যেতে হয়েছিল সর্বস্ব হারিয়ে
সেদিন তুমি ফিরেও তাকাও নি—
বরং ঠেলে দিয়েছিলে অন্ধকার খাদে,
মনে নেই?'
অট্টহাসি আজ আকাশে বাতাসে
আর তা নিয়ে আলো অন্ধকারে মিশে
বুঝিবা ক্রুর পায়ে এগিয়ে আসছ তুমি, পরিত্রাণহীন

## সাপলুডো

### শুভ বসু

জীবনভর নিরন্তর হাঁটায় কোনো ক্লান্তি নেই, মজা সেখানেই—তাই না?
যেদিকে চাই মই-এর সিঁড়ি, সাপের মুখ, ভুলভুলাইয়া!

অথচ দ্যাখো থুড়ি বলার, এড়িয়ে চলার, ক্ষান্তি মানার—
সময় নেই, কেননা তাও বলতে বলতে আবার সেই,
একই চক্কর...মই-এর সিঁড়ি, সাপের মুখ, ভুলভুলাইয়া...
বুঝতে বুঝতে কখন যেন সময় শেষ, পাড়ে যাবার
ডাক পড়লো, উলু বাজলো, মনের ভেতর ছলাৎ ছল, মনের ভেতর—

'পার করো আমারে' সুর, তাতেই বা কী, এমন হবে জানাই ছিলো
যাবার ডাকে যখন একদিন বার হয়েছি, না-হিসাবের গহন রাত্রে,
ঠিক শেষ তক যেতে পারাটাই হিম্মত তথা মরদকা বাত,
জ্বলতে জ্বলতে যখন বিষে সবই জেরবার তখন কি যম নিজের হাতে
অগ্নিচিতায় শুইয়ে দেবার আগে একটুও থামার আছে?

## রণজিৎ সিংহের জন্য কয়েকটি বিনিদ্র স্তবক

### কালীকৃষ্ণ গুহ

হঠাৎ কোথায় গেলেন তিনি চলে
রাত্রি যখন গভীর,
এই কথাটা ভাবতে ভাবতে দেখি
তারারা সব স্থির।

তিনি যেসব গল্প বলেছিলেন
যেসব কাব্যপাঠ
সে সবকিছুই পেরিয়ে যাচ্ছে দেখি
গহন রাস্তাঘাট।

তাঁর সেসকল গল্প-বলার রাতে
চমকে উঠেছি যে!
ভাবতে ভাবতে দেখি অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে তিনি নিজে।

বলি, কোথায়, কোনখানে ঠিক আছেন
বুঝতে পারছি না—
বিশুদ্ধ মদ অবিমিশ্র মদ
পাত্রে আছে কিনা

বেরিয়ে এসে দেখুন এইখানে'
বলেই দেখি ডুবে
গিয়েছে সব তারা। আবার ভোর
দেখা দিচ্ছে পুবে।

# বুলবুলিতে ধান খেয়েছে

প্রদীপ দাশশর্মা

সত্যসাধন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অথচ হাতে সময় কম। যা কিছু করবার দ্রুত করতে হবে। যে সিদ্ধান্তই সে নিক না কেন, তা সঠিক কিনা—এই মুহূর্তে বলা যাবে না। জীবনের এত নদী-নালা-পাহাড় ডিঙিয়ে, এই ৫৪ বছর বয়সে সে সিদ্ধান্তহীন জগন্নাথ। এরকম তো কথা ছিলো না। অথচ ২১ বছর বয়সে যখন সে সদ্য ফিফ্‌থ ইয়ার, সিনেট হল যখন ভাঙা হয়ে গেছে, গায়ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে বৌবাজারের কালো সাইনবোর্ড লাগানো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার অফিসে সই করেছিলো। হাত কাঁপেনি। বন্ধুরা ছিলো। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসের পাশে ছিল দিশি-মদের দোকান। পরিবেশটায় কেমন যেন অপরাধ ছড়িয়ে ছিলো। তবু বুক কাঁপেনি। গায়ত্রীর তখন ২২। ওর চেয়ে ১ বছরের বড়ো। একই ক্লাসে পড়তো। কথা ছিলো যে যার বাড়িতে এখন থাকবে। বিয়ের ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখা হবে। পরীক্ষায় পাশ করার পর, চাকরি জুটে গেলে—যার কপালে জুটুক না কেন—একসঙ্গে থাকা যাবে। তখন তারা ফ্যামিলি হবে। এসব সিদ্ধান্ত রক্তে লোনা ঢেউ থাকলে নেওয়া যায়। নিয়েও ছিল। সেই ঢেউ কবে মিহি হয়ে গেছে। এখন সত্যসাধনের রক্তে চিনি। শরীরে ঢিলেমি। গলা শুকনো। জল খেয়ে তবে সে ক্লাসে ঢোকে। সুগার-ফ্রি দিয়ে গায়ত্রী রান্নাবান্না করে। তারও তো এখন ৫৫। চশমার কাচের নীচে কোলেস্টরল। হাঁটু মুড়তে কষ্ট। আর্থারাইটিস। ভাবাই যায় না তারা একদা কলেজ স্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাটায়। তারপর আরও সামান্য হেঁটে গায়ত্রীর ফার্ণ রোড আর ট্রামলাইন যেখানে মাজা ভেঙে ঘুরে গেছে মন্থরার মতো তার উল্টোদিকের গলির ভেতরে সত্যসাধনের ১৯বি জানির লেন। সে কবেকার কথা!

সিদ্ধান্ত তো অনেক বিকল্পের মধ্য থেকে হয়। বিকল্প না থাকলে তাকে আর সিদ্ধান্ত কী করে বলা যাবে! যেমন প্রথম দিকে তার কোনও বিকল্প ছিলো না। মফস্বলের কলেজে সে যখন প্রথম চাকরি পেলো তখন হাতে পেতো দুশো সাড়ে সতেরো টাকা। আর ৩ মাস পরপর আরও মাসিক সাড়ে সাঁইত্রিশ। গায়ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই আসানসোলে আসতে হলো। অনন্যোপায়। লাভের মধ্যে গায়ত্রী আর পরীক্ষা দেয়নি। হাউজ-ওয়াইফই থেকে গেছে। তখন অবশ্য আসানসোলে বাসা ভাড়া কম। ছোটো ছোটো দুটো রুম, চিলতে ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর আর কমন বাথরুমে মাত্র নব্বুই টাকা। কমন-বাথরুমে গায়ত্রীর ঘোর আপত্তি ছিলো। কিন্তু উপায় ছিলো না। তবু সে বড়ো সুখের সময়। অন্তত ছোটোখাটো সিদ্ধান্ত তো নেওয়াই যেতো। প্রথম রাতের কথা এখনও কম্পিউটার স্ক্রিনে...। সারাদিন কেনাকাটা। আমকাঠের রেডিমেড ভিজে তক্তপোশ। চালডালনুন স্টোভ কেরোসিন ফুলঝাড়ু বালতি, মগ ২...। অবেলায় দাসুর রোডসাইড-হোটেলে চালু-সব্জি, ডাল-ভাত। আহ্ অমৃত। রাতে খিচুড়ি রেঁধেছিলো গায়ত্রী। খেতে পারেনি তেমন সত্যসাধন। অবেলায় খাওয়া হয়েছিলো বলেই না, কেরোসিনের গন্ধ নাকে এসেছিলো বারবার। মা'র মুখ মনে পড়েছিলো তখন। গায়ত্রীকে বিয়ে করা মা মেনে নিতে পারেননি। অপরাধ, সে ১ বছরের বড়ো। ধিঙ্গি। যাদু জানে।

সত্যসাধনের ওতে ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। তার নিজের মনে হয় দ্রৌপদির বয়স বেশি ছিলো। অন্তত নকুল-সহদেবের চাইতে তো বটেই। নয়ত, এতগুলি স্বামী ম্যানেজ করা কি অতো সহজ। তাছাড়া ফ্র্যাটার্নাল পলিঅ্যান্ড্রিতে ওরকম আকছার হয়। মেয়েদের বয়স বেশি হওয়ার কতকগুলি সুবিধে আছে। ঝক্কি থাকে না। প্রতিশ্রুতি-পতনেও ঝামেলা ততো হয় না। ন্যাকামি কম। গায়ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে এসব সে সার বুঝেছে। এখনও বোঝে। ২১ বছরের ফেনিল সিদ্ধান্তে ভুল হয়নি। গায়ত্রী এখনও তাকে রোজ রাতে বুকে নেয়।

সত্যসাধন চক্কোত্তি, এস. জি. এল ইন পোলিটিক্যাল সায়েন্স, একদা মাঝ-মাঠ থেকে উঠে এসে গোল করে যেতে পারতো। কিছুই পারছে না আজ। এর চেয়ে শঙ্খ যদি ফেল করতো তবেই বোধহয় ভালো ছিলো। অন্তত এই দ'-এর পরিস্থিতি থেকে ভালো। দুই সন্তান তাদের। শঙ্খ আর বৃতি। বৃতি ক্লাস নাইনে। এ শহরের সবচেয়ে ভালো স্কুলে ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। শঙ্খ জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ২২৫২। আই. টি বা কমপিউটার টেকনলজি নিতে গেলে নির্ঘাৎ প্রাইভেট ইনজিনিয়ারিং কলেজ ভাগ্যে ঝুলছে। আর. ই কলেজে, ভিন্ রাজ্যে, 'সিভিল' পেলেও পেতে পারে। প্রাইভেট ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলি তো হাঁ করে আছে। গোল্ডফিশের মতো। টুপ্ করে জলে পড়লেই গিলে ফেলবে।

শঙ্খের ইচ্ছে কমপিউটার নিয়ে পড়বে। সত্যসাধন জানে শঙ্খ এর চেয়েও ভালো ফল করতে পারতো। নেহাৎ পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। টনসিল শাদা হয়ে গিয়েছিলো। পাড়ার ডাক্তার বলেছিলো ডিপথেরিয়া। ভাগ্যিস তা হয়নি। জ্বর আর প্রচণ্ড গলা-ব্যথা নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। ট্যাক্সি করে সেন্টারে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। রেজাল্ট ভালো হয়নি। কস্ট দিতে হচ্ছে। শঙ্খকে প্রাইভেট ইনজিনিয়ারিং কলেজে পড়াতে হলে অনেক টাকা লাগবে। এল. আই. সি থেকে লোন নিয়ে সে বাড়ি করেছে। না করলেই হতো। এখন EMI-এ লোন শোধ দিতে দিতে মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্যুইশন করলে না হয় এসব হ্যাপা পোহানো যেতো।

রাতে সব কাজ সেরে গায়ত্রী শুতে এলে সত্যসাধনকে উশখুশ করতে দেখে। পাশের ঘরে বৃতি ঘুমিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির ওপরে চিলেকোঠায় শঙ্খর ঘরে আলো জ্বলছে।

—কী হোল, অতো ছটফট্ করছো কেন?

—নেক্স্ট উইকে শঙ্খের কাউন্সেলিং, ভাবছি।

—ভাবার আর কী আছে। ওতো যেতেই হবে। বুড়ির ক্লাসটেস্ট না থাকলে আমিও সঙ্গে যেতাম। দু'বছর ফার্ন রোডে যাইনি। ছেলে একবার ইনজিনিয়র হয়ে বেরুলে আমাদের কষ্ট থাকবে না কোনও। বাঃ বা, শঙ্খকে কলেজে মাস্টারি করতে হবে না তোমার মতো।

—বলো কী! কলেজের চাকরি অতো সোজা! স্লেট/নেট পাশ করো তো দেখি! আমাদের সময় ওসব ছিলো না। ডি. পি. আই অফিসে আধঘণ্টা/চল্লিশ মিনিটের ইণ্টারভ্যু। প্যানেলে নাম উঠলে চাকরি। লারে লাপ্পা। এখন অনেক কঠিন। ফার্স্ট ক্লাসরাই মুখ থুবড়ে পড়ছে। অবশ্য এখন স্কেল অনেক চওড়া।

—কী যে বলো বুঝিনা বাবা, এই সেদিন বলছিলে নতুন যারা আসছে কলেজে ১ লাইন শুদ্ধ করে ইংরেজি লিখতে পারে না, কোনও অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্সে নেই, ডি. এ-র হিসেব মুখে মুখে, ফল্স হাউসরেণ্ট ডিক্লারেশন দেয়, কে যেন এক মহিলা টিচার বলেছিলেন হাউসরেণ্ট-এর জন্য উনি ডিভোর্স নেবেন। এমনিতে একসঙ্গে থাকবেন। কোর্ট

নাকি সম্প্রতি এক রায়ে বলেছে লিভ টুগেদার লীগ্যালি ও. কে.।

কথার উত্তর না দিয়ে সত্যসাধন পাশ ফিরে শোয়। পেছন ফিরেই বলে,

—কী করবো বুঝতে পারছি না। চার লাখ! এতো টাকা আসবে কী করে! প্যাট্রিমনি তো আর নেই। পি. এফ. থেকে বড় জোর লাখখানেক পেতে পারি। নন-রিফাণ্ডেবল্। না হয় তুললাম। তা দিয়েও তো শেষ সামলানো যাবে না।

—ওসব ভেবো না। আমার ওর্নামেন্টস আছে। হয়ে যাবে।

—বৃতির কথা ভুলে যাচ্ছো! ওর পড়াশুনো, বিয়ে...

—কেন শঙ্খ দাঁড়ালে, খুকির বিয়ে আটকাবে নাকি!

—'যদি না দেয়...।' কথাটা সত্যসাধনের মনে হলেও, মুখে কিছু বললো না। এ যেন পেডিগ্রিহীন ঘোড়ার পেছনে জীবনের সব কিছু বাজী ধরা।

আজকাল ঘুমোলে গায়ত্রীর বিশ্রী নাক ডাকে। বুকের ওপরে হাত থাকলে তো কথাই নেই। বুক থেকে হাত নামিয়ে দেয় সত্যসাধন। ঘুম আসে না। আসতে চায় না। বিষণ্ণ জলযানের মতো দুশ্চিন্তা কুলকুচি করতে করতে অন্ধকারে একই জায়গায় ঘোরে।

ক'মাস যাবত একটা জিনিস লক্ষ্য করছে সত্যসাধন। বড়ো বড়ো লিড কাগজগুলিতে—স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে—একাধিক পৃষ্ঠায় ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ভর্তির বিজ্ঞাপন। ওয়েস্টবেঙ্গল ছাড়াও, বাঙ্গালোর, সিকিমের মনিপাল, কর্ণাটক, উড়িষ্যা থেকে। ফিজিক্স-এর শিবকুমার চক্রবর্তী পরামর্শ দিয়েছেন, 'সত্যদা, দেখেশুনে ছেলেকে ভর্তি করাবেন। AICTEর অনুমোদন না থাকলে দেবেন না কিন্তু। সত্যসাধন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। সে আর কি করে জানবে AICTE-র মানে! অধুনা ছেলের কল্যাণে, ক্রমেই শিক্ষিত হচ্ছে। অ্যাড দেখতে দেখতে তার আজকাল মনে হচ্ছে ওয়েস্টবেঙ্গলে প্রাইভেট ইনজিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা যেন রোজ বাড়ছে। NRI-রা এডুকেশনে লগ্নি করছে। আহ্ NRI-রা কতো ভালো। দেশের কথা ভাবে। একেকজন গণেশ দেউস্কর। কলকাতার সল্টলেকে এখন আর সল্ট নেই, সিলিকন। আরেক সত্যসাধনের বক্তৃতায় তো তেমনই মালুম হয়। টি. ভি. স্ক্রিনে প্রায়ই দেখে একটা পোলার বিয়ার হালুম-হুলুম করছে। চারদিকে বরফ আর বরফ নাকি সিলিকন আর সিলিকন! এই শ্রাবণেও শীত শীত করে তার।

NRI-এর কথা উঠলে গায়ত্রীর পালক ফুলে ওঠে। তার মাসতুতো ভাই সুব্রত সান জোস-এ। গ্রীন-কার্ড হোল্ডার। ১৮ বছর হয়ে গেল। এইচ. এস-এ অর্ডিনারি সেকেণ্ড ডিভিশন। প্রথমে কানাডায় যায়। পরে কমপিউটার কোর্স করে। শেষাবধি ঐ সান জোস-এ। আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির অলিন্দে। ১বৈশাখে প্রতিবছর নিয়ম করে চিঠি দেয়। সব চিঠির উত্তর আসে না। তবে মাঝে মাঝে ফোন করে। সুব্রত বলে দিয়েছে তোমরা ফোন করো না। আমিই করবো। শঙ্খ যখন বছর আটেকের তখন একবার সুব্রত দেশে ফিরেছিলো। দিন কুড়ি ছিলো। দুদিনের জন্য আসানসোলে আসে। গায়ত্রী ছাড়া ওর তো দিদি বা বোন নেই। শঙ্খকে ১টা কমপিউটার গেমস্ দিয়ে গেছে। বলে গেছে বড় হ, আমার ওখানে চলে যাবি। গায়ত্রী তখন আহ্লাদে আটখানা। স্কুল ফাইন্যালে শঙ্খ স্টার পাওয়াতে সুব্রতর ঐসব কথা প্রথম বৃষ্টির ফোঁটার মতো টস্ করে গায়ে পড়েছিলো যেন। শঙ্খ তবে ঠিক ট্র্যাকেই দৌড়চ্ছে। জয়েণ্ট এনট্র্যান্সে ২২৫২। গায়ত্রী সব জানিয়ে সুব্রতকে চিঠি দেয়। শঙ্খ যে কমপিউটার নিয়েই পড়বে—জানাতে ভোলে না। পরে সুব্রতকে যে সব ব্যবস্থা করে দিতে

হবে তাও লেখে। সত্যসাধন বা গায়ত্রীর তো আর ডলার নেই।

স্টাফরুমে কথা হচ্ছিলো NRIদের নিয়ে। এদেশের নিও-ব্রাহ্মণ। সরকার অনেক কিছু থেকে ছাড় দিয়েছে তাদের। স্টেট ব্যাঙ্কের নিয়ম বিদেশে ১ বছর থাকলেই হলো। গ্রীনকার্ড-হোল্ডার হোক বা না হোক। যায় আসে না। অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। ট্যাক্সেও নানা ছাড়। এক আজব দ্বিনাগরিকত্ব! কেন্দ্রীয় সরকার NRIদের চায়। রাজ্য সরকার NRIদের চায়। বাজপেয়ী চান, বুদ্ধদেবও চান। এখন সরকারের সঙ্গে NRIদের হনিমুন। চারিদিক ফুল্ল কুসুমিত। ইকনমিকস্-এর বিজিত মুখুজ্যে হাসেন ঃ

—মশাই, এডুকেশন-বিজনেস-এ রিসক্-ফ্যাক্টর নেই, একেবারে nil। ডানলপ এখন ICU-তে, কাচ কারখানা মমি, সেন-র‍্যালের ক্যাটার‍্যাক্ট, ওয়াগনে অর্ডার নেই, ই. সি. এল.-এর সূর্য ডুবুডুবু করছে! কিন্তু শুনেছেন কখনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় উঠে গেল! লাল বাতি জ্বললো! রিস্ক নেই বলেই NRIরা কর্ণাটক বা পশ্চিমবঙ্গে, এডুকেশনে, ডলার উপুড় করে দিচ্ছে, অর্থ লগ্নি করছে। সবটা ঘুমঘোরে নয়। নিউজপেপার স্ক্যান করুন। প্রতিদিন শুধুমাত্র অ্যাড্-এ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে প্রাইভেট ইনজিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলি।

—সোজা কথা বলুন তো, এসব ভালো না মন্দ?

—ভালো-মন্দ—দুই-ই।

—এক্সপ্লেন...

—দেখুন, সরকারের তো প্রয়োজনীয় পুঁজি নেই। পুঁজি চাই। এই পুঁজি এক্সপোর্ট করছে উন্নত দেশগুলি। কার্টেল বলুন, MNC বলুন বা World Bank বলুন...। এতো চড়া সুদ যে সরকার পেরে উঠছে না তেমন। বরং কিছু পুঁজি সরকার বিনা সুদে পাচ্ছে NRIদের কাছ থেকে। বদলে তাদের কিছু কিছু সুবিধে দিতে হচ্ছে। এই যেমন ট্যাক্স ছাড়, প্রায় বিনাপয়সায় সরকারি জমি...। NRIদের পোয়াবারো, সরকারেরও পোয়াবারো। আনপ্রোডাক্টিভ সেক্টরে শর্ত মতো টাকা ঢালতে হচ্ছে না আর। তাছাড়া NRIদের টাকা তো আমাদের ছেলেদেরই টাকা। ঐ টাকা, অন্তত যতটা নিখরচায় দেশে আনা যায়। ডেভেলপমেণ্ট তো একটা হচ্ছেই। সরকারের মুস্কিল একটাই। NRI-রা সরকারের হাতে ডলার না দিয়ে নিজেরাই সরাসরি বিজনেসে ঢুকে পড়ছে। সরকার আয় করলে জনগণের জন্য ব্যয় করতো। এখন আর তার উপায় নেই। ফলে যা হচ্ছে তা হলো নেপোয় মারে দই। পার্টির জন্য মোটা চাঁদা, মন্ত্রীর ভাগ, মিডলম্যানের পাওনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরোক্রাটদের পাওনা—সব দিতে হচ্ছে। এতে NRI-রা ভ্রুক্ষেপ করে না। ওসব সব দেশেই দিতে হয়। মার্কিন মুলুকে তো আরো বেশি। সরকার সরাসরি নিজে নামলে ভালো হতো! একজন ছাত্রের এতো টাকাপয়সা লাগতো না...। সত্যদা, আপনার কতো লাগবে হিসেব করেছেন?

—না করিনি। তবে সাকুল্যে চার বছরে চার লাখ চিপ্স...। বেশিও হতে পারে। মাঝখানে যদি ফি হাইক করে তবে কিছু করার উপায় থাকবে না। ভাবতে পারছি না কিছু। সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কোথায় এতো টাকা পাবো ভাই। বাপের সম্পত্তি তো নেই। ট্যুইশন করিনি জীবনে। তার ওপর মেয়ে আছে। তার পড়াশুনো, বিয়ে...

—কেন পি. এফ. আছে, আমাদের স্টাফ কো-অপারেটিভ...

—হুঁ...

—একবারে তো আর চার লাখ লাগছে না।

—সেটাই যা ভরসা।

—হ্যাঁ, NRI-রা এসব ভালো জানে। বোঝে। কীভাবে পিঁপড়ের পাছা টিপে চিনি বার করে নিতে হয়। মেরে ফেল্লে চলে না। সরকারও এসব জানে। NRI-রা বর্গি। সরকার বুলবুলি...। মধ্যবিত্তের ধান খেয়ে নিচ্ছে। বিজিত মুখুজ্জের এসব বিশ্লেষণে ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায় সত্যসাধনের। রাতে এসব কথা পাশের শরীরকে বল্লে ঝাঁঝিয়ে ওঠে গায়ত্রী;

—ওসব ছাড়ো। তুমি শুধু দেখবে আমাদের লাভ। তোমার ছেলের লাভ। NRI কতটা লাভ করলো, পার্টি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কত টাকা হ'লো—ওসবে আমাদের কী। শঙ্খকে নিয়ে কাউন্সেলিং-এ যাও। আমরা কি যাবো?

—দরকার নেই।

সত্যসাধন মনে মনে খরচের কথা ভাবে। সবাই মিলে কলকাতা গেলে কতো খরচ। ট্রেন ভাড়া-ট্যাক্সি এসব তো শুধু নয়...শ্বশুরবাড়ি বলে কথা। সে পি. এফ. লোনের জন্য দরখাস্ত করবে। লাখ টাকা। সে তবে মরা হাতি। অরূপ পি. এফ. অ্যাকাউন্টস্ দেখে। ভালো ছেলে। একদিনেই সব হিসেবনিকেশ করে দেবে। লোন মঞ্জুর হলে ২।৩ দিনের মধ্যে ট্রেজারি থেকে টাকা তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে। ব্যাঙ্কেই তো তাদের মায়না জমা পড়ে। পাশ-বইয়ে মাত্র ৩ হাজার ৭০০ টাকা। ভেতরে ভেতরে অস্থির বোধ করে। বেশি রিস্‌ক নেওয়া হয়ে যাচ্ছে না তো! প্রাইভেট কলেজ থেকে পাশ করবে। 'ক্যাম্পাস' হবে তো। নইলে চিত্তির! চাকরি পাওয়া সোজা ব্যাপার না। এর চেয়ে কলেজে ফিজিক্স অনার্স পড়া ভালো। সত্যসাধনের কলেজে পড়লে মায়না পর্যন্ত লাগবে না। স্টাফেদের এটুকুই ছাড়। অবশ্য অনার্স পেতে গেলে মেরিটে আসতে হবে। টিচারদের কোটা নেই। এসব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। H.S-এ শঙ্খ তো আর কম নম্বর পায়নি। ৮৪৫। মেরিট লিস্টের উঁচু দিকেই ওর নাম আসবে। ফিজিক্স-এ লেটারও পেয়েছে। যাদবপুর থেকে B.S.C-র ফর্ম নেবে কিনা মুহূর্তের জন্য ভাবলো সত্যসাধন। 'স্টেটসম্যান'-এ একটা চমকপ্রদ খবর বেরিয়েছে আজ :

'The UGC is, finally showing concern over the drain of talented students from basic sciences in higher studies to other lucrative and employment-oriented professions. To rejuvenate science education and research in Indian universities, the UGC is now offering a post of adjunct professorship to suitable persons in industry, research, establishment and universities. It is also offering a national lectureship to students who get first class first in Msc. in basic science subjects. The scheme is supposed to start from the academic session 2001-2002.

নিউজটা কেটে পকেটে রাখে সত্যসাধন। শঙ্খকে দেখাতে হবে। বাড়ি ফিরে দ্যাখে শঙ্খ নেই। শমিতের কাছে গেছে জানতে পারে। শমিতের র‍্যাংক খুব ভালো হয়েছে। ২১৯। যাদবপুরে না পেলে শিবপুরে কমপিউটার বা আই. টি. পেয়ে যাবে। ওকে এখন পায় কে! শঙ্খ অবশ্য এসব নিয়ে হিংসে করে না। ওর মতে শমিত একস্ট্রা-অর্ডিনারি। শমিতও নাকি ওকে বলেছে কমপিউটার টেকনলজির জন্য। দরকার পড়লে, জাহান্নামে যাবি।

শঙ্খর পড়ার টেবিলে পেপার-কাটিংটা চাপা দিয়ে রাখে সত্যসাধনে। যাতে টেবিলের

সাম্নে প্রথমে নজরে পড়ে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার টেবিলে পাশাপাশি বসে সত্যসাধন আর শঙ্খ। শঙ্খ একবার বাপের দিকে তাকায়। মুখ নিচু করে। কিছু বলে না। ঐ মুখাবয়বে সত্যসাধন মেঘ টের পায়। সে জানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তো আর বিজ্ঞান না। প্রযুক্তি তো দূরের কথা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোনও প্রযুক্তিই শেষ পর্যন্ত খাটেনি। শঙ্খ হয়ত সেসব ভাবছে। ভেতরে ভেতরে মৃদু গুটিয়ে যায় সে। এই মুহূর্তে নিউজ-ক্লিপটা শঙ্খ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে তেমন সাহস পায় না। যদি চেঁচামেচি শুরু করে তো ডিনার মাটি। বরং সকালে দেখা যাবে।

শঙ্খের কথা আর কীইবা হতে পারে। একটা ১৮ বছরের ছেলে! দোহারা গড়ন। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে এলেও ব্লেড পড়েনি। এলেমেলো দুচারটে দাড়ি ঈষৎ লম্বা থুতনিতে। তার আবার কীইবা কথা থাকতে পারে। তার কথা সত্যসাধন জানে না, গায়ত্রী জানে না। বৃতি, ছোট বোন হওয়ায়, কিছু জানে। সবটা বোঝে না। সে ফুটবল খেলেনি, আশ্চর্য ক্রিকেটেও না। যদিও দরজায় সৌরভের একটা বড়ো ব্লো-আপ। সে কম্পিউটারস্ গেম্‌সে পাখি মেরেছে মাত্র। বাবাকে সে ভয় পায়, যদিও সত্যসাধন প্যাট্রিয়ার্কাল না। মাকে সে ভয় পায়, যদিও গায়ত্রী বদমেজাজি মহিলা না। অনেক বেশি নরম, সফ্‌ট, অনেকটা হলুদ পুডিং-এর মতো। ওঁদের ভয় পাওয়ার কারণ ওকে নিয়ে ওঁদের অহোরাত্র ভয়। শঙ্খর প্রথম স্কুলে যাওয়া থেকেই ওঁরা স্কেয়ার্ড। ফার্স্ট হবে তো, এরপর কী হবে, কী পড়বে, কার কাছে প্রাইভেটে অঙ্ক পড়বে, স্টার পাবে তো, জয়েন্ট....? আসলে সোশ্যাল-সিকিউরিটি বলে তো এখন ছিটেফোঁটা কিছু নেই। আগে যৌথ পরিবার ছিলো। সামাজিক নিরাপত্তা, রাষ্ট্র না হোক, ফ্যামিলি দিতো। এখন সেরকম নেই। সিকিউরিটি না দিচ্ছে সরকার, না ফ্যামিলি। আনন্দ বলে জীবনে কিছু নেই। জীবন রুবিক কিউবের মতো। মিলবে না। অথচ, সত্যসাধন দেখেছে, শঙ্খ আনন্দ চায়। হিন্দি ফিল্ম ভালোবাসে। কারিনা কাপুরের কথা বলে। লাকি আলি থেকে সাগরিকা—তার পছন্দ। ঋত্বিকের জন্য পাগল। সত্যসাধন এসব কী করে বুঝবে! তাদের সময় তো সেই সুচিত্রা-উত্তম, হেমন্ত, সন্ধ্যা, শ্যামল, বড়ো জোর কীন্ কর্তা.....।

শঙ্খের মাঝে মাঝে মনে হয় কমপিউটরের জীবন আছে, স্নায়ুতন্ত্র আছে, কম্পিউটর হাসে, কাঁদে, গান গায়, শিহরিত হয়। মানুষের জীবনে অধুনা কোনও শিহরণ নেই। হাই তোলে শঙ্খ। তার ঘুম পায়। টেবিল থেকে পেপার-কাটিং উড়ে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। শঙ্খ ভাবে, কম্পিউটর কি অনুভব করতে পারে কিছু! একটা কৃত্রিম extra-sensory perception মানে ESP কি তাতে জুড়ে দেওয়া যায় না। যায়। তখন কম্পিউটার নিজে থেকেই বুঝে নেবে শঙ্খ এখন কী চাইছে। সত্যসাধন কি বোঝেন শঙ্খ কী চাইছে? বোঝেন না। কম্পিউটার কিন্তু বুঝে নেবে। স্যারের কাছ থেকে সে শুনেছে psychokinesis (PK) ও তারপর micro-pk, macro-pk. retro-pk-র কথা। কম্পিউটরের তো মেমরি আছে, বুদ্ধি আছে, স্পষ্টতা আছে। পাশ করার পর সে কম্পিউটারের অনুভব শক্তি নিয়ে কাজ করতে চায়। মানুষের মস্তিষ্কও তো এক ধরনের হার্ডওয়্যার। স্যার লিখিয়েছেন, 'The human brain contains about 1011 neurons. Each neuron has about 103 Synapses. Signals are transmitted along these synapses at an average frequency of 102Hz. Each signal contains, say 5 bits. This

equals 1017 ops. আসলে মানুষের মস্তিষ্ক যদি হার্ডওয়্যার হয়ে থাকে তবে কম্পিউটা মস্তিষ্ক তৈরি করা যাবে না কেন? কম্পিউটারও তো সিগন্যাল পাঠাতে পারে। তবে ি ও ফ্লেক্সিবিলিটি একটা প্রবলেম। শঙ্খ ভাবে যে স্পিডে বাবা একবার ইনজিনিয়ারিং ( ফিজিক্স পড়ার কথায় যাওয়া-আসা করছেন তাতে মাথা ঠিক রাখা দায়। সত্যসাধন ( কাশছেন না। mind-uploading হচ্ছে না....আহ্।

গায়ত্রী চেয়েছিলেন শঙ্খ ডাক্তার হোক। ১০০ কোটির দেশে ডাক্তাররা কখনও না ( থাকে না। কিন্তু শঙ্খের বায়োলজিতে মন নেই। ম্যাথস তার ফার্স্ট লাভ। MD ক করতে, সে জানে, বুড়ো হয়ে যাবে। তারপর চেম্বার। সরকারি হাসপাতালে কাজ। প যখন হবে তখন ৪৯ বায়ু। তখন মুখ তোলার সময় থাকবে না। বউ-ছেলেমেয়ে ফূর্তি কর তার নিজের কাঁচকলা। টাকা তো দরকার ২৪।২৫-এ। তাছাড়া ডাক্তারি পড়তে আজ সহজে বাইরে যাওয়া যায় না। ওরা তো এদেশের ডিগ্রি মানতেই নারাজ। অথচ কম্পিউ ইনজিনিয়রদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আয় বাবা, দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা.....ইত্য ডাক্তার হতে চায়নি বলেই শঙ্খ H. S-এ বায়োলজির বদলে স্ট্যাটিসটিকস নেয়।

কদিন ধরে বৃতি ঘ্যান ঘ্যান করছে। কেনাকাটার জন্য। ১টা বই কিনতে হবে। বই ি ক্লাসে না এলে দুর্গা দিদিমণি মা-দুগ্গা, দশপ্রহরিণী। ফলে বৃতিকে নিয়ে গায়ত্রী মার্কেটে। কেনার পর বৃতি বলে, মা কমপিউটার টিপ-এর কয়েকটা পাতা কিনবো। গায়ত্রীর হ'ল বাজারে যখন এসেছে তখন মেয়ের জন্য সালোয়ার-কামিজ কিনবে, নাকি লাচ্ছা। দো ঘুরে ঘুরে সালোয়ার-কামিজ দেখলো। ১টা বেশ পছন্দও হ'ল। পিওর সিল্কের ও কম্পিউটার প্রিন্ট। ভেতরে লাইনিং। ব্যাগে বেশি টাকা না থাকায় দোকানের বাইরে রাখলো। পরে কিনবে। বৃতির মুখে মেঘ :

—পুজোর সময় কিনে দেবো তোকে।

—আহা, তখন যেন থাকবে।

—কতো নতুন নতুন ভালো ভালো জিনিস আসবে, পুজোর সময় আসে।

—সিল্কের ওপর কম্পিউটার প্রিন্ট সহজে পাওয়া যায় না।

—কী যে বলিস, এখন তো কম্পিউটারের বাজার। সুব্রত জানিয়েছে শঙ্খের জন্য ল্যাপটপ আনবে।

—আগে আনুক তো। সেই কবে কম্পিউটার গেমস্ দিয়েছে বলে, ল্যাপটপ দে কতো দাম জানো?

—ওদের কাছে আবার দাম! কত ডলার মায়না—তা জানিস! উপরি-পাওনা শে আছে। ওসব তুই ভাবতে পারবি না।

মা যে কী বলে? বৃতি কম্পিউটার জানে না! সব 'জানলা'ই জানে। এখন বাজ Pentium IV। টি. ভি. তে রাত দিন অ্যাড্ দিচ্ছে। বাবা ট্যুইশন করলে ১ পলকে ও কিনে ফেলতো। দাদা বলে, 'ঘাবড়াস না, সব হবে'।

সত্যসাধন ছেলেকে ডাকে।

—আমাদের এ. কে. ডি. র ছেলেকে তুই চিনিস?

—বাঃ, চিনবো না কেন! অশেষদা আমাকে কতবার প্রবলেমস দেখিয়ে দিয়ে Irodov পর্যন্ত। আমি তো ওদের বাড়ি যাই।

—অশেষ এই কলেজ থেকে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পায়। শেষ পর্যন্ত J. U. থেকে রিসার্চের পর এখন কোথায় জানিস?

—জানবো না কেন? লেকচার-টুরে। এখন ফ্রান্সে। বহু দেশ ঘুরবে।

—ও তো ইনজিনিয়ারিং-এ যায়নি। বেসিক সায়েন্স একটা অদ্ভুত আকর্ষণের জায়গা। অথচ য়্যু ওয়ান্ট টু বি আ কগ্ ইন দি মেশিন। ও দেশেও ঐ এক ট্রেন্ড। বৃটেনে এখন বেসিক সায়েন্সের টিচার নেই। ওরা গোটা এশিয়া থেকে প্রচুর টিচার নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দেশে।

—জানি। টাইম্স অফ ইণ্ডিয়াতে দেখেছি। তাতে কী হলো! আমাকে কি তবে ফিজিক্স পড়তে হবে? তবে জয়েন্ট দিলাম কেন? রাগত চোখে তাকায় শঙ্খ।

—না আমি সে কথা বলছি না। শর্টকাটও ভাবছি না। কম্পিউটার পড়লেই যে তুমি দুল্কি চালে স্টেটসে যাবে তা নয়। ফিজিক্স পড়লেই সব হবে, মনে করি না। যা-ই করো না কেন ভালো করে করতে হবে।

—সে তো সবাই জানে

—না জানে না। ভালো করার ব্যাপারটা শুধু তোমার ওপরে নির্ভর করে না। এনভায়রনমেন্টের ওপর নির্ভর করে.....

—মানে?

—এই যেমন জয়েন্টে ভালো র‍্যাংক করা শক্ত। কারণ এখন কম্পিটিশন অনেক টাফ। জয়েন্টে লাট খেতে খেতে ছিন্ন ঘুড়ির মতো কত ছেলেমেয়েকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। অথচ তাদের মধ্যে কেউ যদি ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করতো, তাদের লাভ হতো। হাসতে হাসতে স্কুল-কলেজে চাকরি পেয়ে যেতো। যেতো কী না! ফলে এনভায়রনমেণ্টটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে।

—আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হবো। আমার শেষ কথা।

মাঝে মাঝে এমন অনেক দেশলাই পাওয়া যায় যার ভেতরের কাঠিগুলিতে নামমাত্র বারুদ। স্ট্রোক করলেও জ্বলে না। জ্বললেও স্টে করে না। মধ্যবিত্ত বাবাদের অবস্থা ঠিক এরকম। প্রথম প্রথম জোরের সঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করলেও শেষে স্বর কীরকম যেন ফিকে হয়ে আসে। ছেলেমেয়েদের তো এখন সোনায়-সোহাগা। তারা সর্বদাই তাদের মাকে সঙ্গে পায়। জিয়ল গাছের আঠার মতো। তিনি প্রায় প্রমাণ করেই বসেন সত্যসাধনের মতো অপদার্থ কেউ নেই। সারা জীবন সে একথা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও সত্যসাধন গায়ত্রীকে বলে :

—সিদ্ধান্তটা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না।

—তুমি ১ নম্বরের কঞ্জুষ। পি. এফ.-এ হাত দিতে চাও না।

—হ্যাঁ। ওটুকুই তো সম্বল। আমাদের মায়না আগে কতই বা ছিলো? তুমি জানো। তারপর ৬৫রে রুটি কামড়ে নিয়ে ৬০ করে দিলো।

—তুমি একটা বিচ্ছিরি। সেলফিশ জায়ান্ট। টাকা কার জন্য রোজগার করছো? ছেলেমেয়েদের জন্য নয়!

—তা ঠিক। ধরো সবটাই ওদের জন্য খরচ করলাম। তারপর বুড়ো বয়সে তোমাকে-আমাকে ওরা বুড়ো আঙুল দেখালো, তখন কী করবে? মেডিক্লেম পর্যন্ত করিনি।

—কেন পেনশন তো আছে।

—কমিউট করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তারপর ১ বছর চালাও। ১ বছরের আগে তো পেনশনের মুখ দেখবে না। মাঝে মাঝে অবশ্য আয়নার পদ্মাবতীর মুখ দেখার মতো পেনশনের ঝল্কানি পাবে। আমাদের রামজয়বাবু ওল্ড স্কেলে পেনশন পাচ্ছেন। নিউ স্কেলে পেনশন কনভার্ট করার কথা বলতে গিয়ে ডি. পি. আই. অফিসে ধমক খেয়েছেন প্রিন্সিপাল। 'ডাল-ভাত জুটছে, আবার বিরিয়ানির শখ!' ভাগ্যিস রামজয়বাবু ট্যুইশন করেন। নইলে হরিমটর। জ্বর হলে কুকুরে-গোঙানি শুনেছো। মধ্যবিত্তের এখন সেই গোঙানি। মধ্যবিত্তকে কিনারায় ফেলতে চায় রাষ্ট্রযন্ত্র। গরিব লোকেদের কাছ থেকে আর কতটা খাবে! হাতের নাগালে মধ্যবিত্ত। জানো, ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স পে করে মধ্যবিত্ত। বেশি কনজিউমার গুড্স কেনে মিড্ল ক্লাস। আয়ের সবচেয়ে বেশি অংশ ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ করে মধ্যবিত্ত। অথচ, এই ঝুঁকি-সমাজে তাদের হাতে ফক্কা ছাড়া কিছু জোটে না।

—বকবক ক'রো না তো। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। পাশ ফিরে শোয় গায়ত্রী। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্নোরিং। আধো-অন্ধকারে তার শাদা শাঁখা, প্রায় অলঙ্কারহীন হাত সত্যসাধনের বুকে। ধীরে ধীরে ঐ হাত সে নামিয়ে দেয়।

সকালে উঠে চায়ের কাপ জুড়োতে দিয়ে সে ১টা দরখাস্ত লেখে। পি. এফ. লোনের। ১ লাখ টাকা। লেখা হবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস। চা সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গায়ত্রীকে চেঁচিয়ে বলে, 'গায়ত্রী, আর এক কাপ চা।'

কলেজ থেকে ফিরে লোনের চেক গায়ত্রীর হাতে দেয়। সাবধানে রেখো। কাল ট্রেজারি গিয়ে এনডোর্স করে আনতে হবে। ট্রেজারি স্টেট ব্যাঙ্ককে অ্যাডভাইস দেবে। ওসব হয়ে গেলে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দাও। ফর্সা।

শঙ্খকে কাউন্সেলিং-এর পর, প্রাইভেট কলেজে দিতে হ'লো। সত্যসাধনের আর উপায় ছিলো না। দেশের কোন R.E. কলেজেই, ঐ র‍্যাংকে C. E পাওয়া গেল না। ফলে এই সিদ্ধান্ত। দুর্গাপুরের প্রাইভেট কলেজে ভর্তি করার পর একটু ভালো লাগছে। নাহ্ ছেলেটা কাছে থাকলো। শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসতে পারবে। গায়ত্রী খুশি। ১ প্রস্থ বিছানাপত্র কিনতে হ'লো। খরচ তো হবেই।

র‍্যাগিং-পর্ব চুকে গেছে। শঙ্খরা মোজেইকের পাথরের মতো ফার্স্ট ইয়ারে সেট্‌ল করে গেছে। ও বাড়ি এলে হৈ চৈ পড়ে যায়। কলেজের গল্প বলে। র‍্যাগিং-এর গল্প বলে।

সুব্রতর চিঠি এসেছে। লিখেছে, আমেরিকার মার্কেট, সফট্‌ওয়্যার মার্কেট এখন ডাউন। যত্রতত্র কম্পিউটার-ইনজিনিয়রদের যেমন হায়ার করা হয়েছিলো, এখন ফায়ার করা হচ্ছে। শেয়ারের দাম হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বুশ আসার পর অবস্থাটা খারাপের দিকে। আরো খারাপ হলে সে দেশে ফিরবে। সল্ট-লেকে কিছু করার চেষ্টা করবে। নতুবা পুনেতে বন্ধুর ফার্মে জয়েন করবে। এছাড়াও ওর নতুন অ্যাড্রেস জানিয়েছে। বড় ফ্ল্যাট থেকে ও এখন ছোট ফ্ল্যাটে। বিলাসিতার কোনও মানে হয় না। চিঠিটা প্রথমে পড়ে গায়ত্রী। তার নামেই তো চিঠি। শূন্য দৃষ্টি সামনে রেখে চিঠিটা সত্যসাধনের হাতে তুলে দেয়। এই চিঠি কি তাকে স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে! মানসিকভাবে!

—হ্যাঁ গো, ভর্তি তো হ'লো। চাকরি পাবে তো! অ্যাতোগুলি টাকা!

—পড়ুক। ভালো করতে পারলে চাকরি পাবে না কেন! এখন তো

ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড। গান্ধারীর মতো শত পুত্র বিয়োবে। আই. টি. আর কম্পিউটারে অনেক চাকরি হবে।

—তবে তুমি যে অ্যাদ্দিন অন্য কথা বলতে।

—বলতাম। দেশে key industry না হলে কম্পিউটার আর কী করবে? ধরো, সুতো দিয়ে তোমার মেয়ের জামা হবে তা যদি দেশ উৎপাদন না করতে পারে, তবে তার উপর কম্পিউটার প্রিন্টিং হবে কী করে! ব্যাঙ্ক-ক্যাপিটাল না থাকলে ব্যাঙ্কগুলিতে কম্পিউটারের জঙ্গল বানিয়ে লাভ কি! যাক গে, এসব তুমি বুঝবে না। শঙ্খ এলে এই চিঠির কথা বলো না ওকে। উৎসাহ নষ্ট ক'রো না। এই রিসেশন হয়ত কেটে যাবে। তুমি বরং পুজো-টুজো করো, ঠাকুর-ঘরে একটু বেশি সময় দাও।

সত্যসাধন মনে মনে ভাবে, বৃতিকে ইংরেজি অনার্সে দেবে। মনে মনে অস্থির বোধ করে সত্যসাধন। ফের ভাবে জীবনে আনন্দই বড়ো কথা। শঙ্খ যদি এই ট্রেড বেছে নিয়ে আনন্দ পায়, পাক। রিসক্ তো নিতেই হবে। 'নো-রিস্‌ক সোসাইটি' বলে তো এখন আর কিছু নেই। সবটাই রিস্‌ক।

বৃতির ঘরে আলো জ্বলছে। টি. ভি. স্ক্রিনে কম্পিউটার গেম্‌স খেলছে বৃতি। সত্যসাধন ঘরে ঢুকতেই অফ্ করে দেয়। লজ্জিতভাবে বাবাকে বলে, 'দাদা, এটা আমাকে দিয়ে গেছে।

—তো, বন্ধ করলি কেন? দেখি দেখি। চেঁচিয়ে বলে, গায়ত্রী এ ঘরে ১ কাপ চা দাও তো।

অমনি টি. ভি. স্ক্রিন জ্বলে ওঠে। একটা পাখি আঁখি-পল্লবের মতো ডানা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে সাইবেরিয়া থেকে। একজন শিকারি বন্দুক তুলছে। পেছনের ব্যাকগ্রাউণ্ড সবুজ। সময়মতো তোমায় শট্ নিতে হবে। টার্গেট ঠিক হলে পাখি মরবে। ব্যাকগ্রাউণ্ড লাল হয়ে যাবে।

—বাবা তুমি শট নাও দিকি।

কয়েকবার চেষ্টা করলো সত্যসাধন। একবারও টার্গেট হ'লো না। আর প্রতিবারই সে ধক দেখলো।

—দাও দাও আমার হাতে। তুমি পারবে না। সত্যসাধনকে অবাক করে দিয়ে প্রতিবারই বৃতি পাখিতে শট ডাউন করে। পাখি দুই ডানা ভেঙে ঝোপের আড়ালে পড়ে যায়, মৃত।

হঠাৎ সত্যসাধনের মনে হয় পাখির চোখ কীরকম যেন পিঙ্গল। তার নিজের চোখের মণিও তো কপিশ। তবে কি ঐ চোখ তার! সত্যসাধন বৃতিকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে,

—তুই কী পড়বি, মা?

—কেন, কম্পিউটার টেকনলজি।

# সিঁড়ি

## অজয় চট্টোপাধ্যায়

—স্যার। একটা লকার চাই। কর্কশ পুরুষালি গলা। কোনও সাড়া নেই। নথিতে অনুধ্যানের ঘোর এমন।

—স্যার আমাদের একটা লকার দিন। ছন্দোময় নিদানধ্বনি। কোমল মেয়েলি গলা আবেদনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পাঠের ঘোর ছিন্ন। গোবিন্দ মুখ তোলে।—লকার আছে ডিপোজিট দিতে হবে।

—কতো! যুবকের দৃষ্টি প্রশ্নবোধক।

গোবিন্দ জাতে ব্যাঙ্কার। নিজের কোলে ঝোল টানে।—পঞ্চাশ হাজার। শোনা মাত্র যুবকটির চোখে যে অভিব্যক্তি ফুটল তা পড়ে গোবিন্দ বুঝল পার্টির সংগতি নেই। হাবভাব এবং পোশাক যদি ছলনাময় না হয় তাহলে গ্রাহ্য যে মণ্ডলায়নের ফসল। অতএব দরাদরির অযোগ্য।

মেয়েটি বলিয়ে-কইয়ে। সে হাল ছাড়ে না। পারসির্ভ করে।—ও এক বছর হল স্কুলে মাস্টারি পেয়েছে। বোঝেন তো অনেক হাজার চাঁদা। থোক নয়, কিস্তিতে কিস্তিতে। বাবারও কিছু কর্জ ছিল। সব দেনা মাসকাবারি থেকে শুধছি। সংসারে আটজন খাইয়ে। জমা কিছু থাকে না। পুরীতে হনিমুনও করতে যাইনি। বিয়েতে আমার বাবা একগাদা গয়না দিয়েছে এদের ঘরদোরের যা ছিরি যে কোনও দিন লুঠ হয়ে যাবে। লকার পেলে বেঁচে যাই। মেয়েটি কাঁইকুঁই করে।

টেবিলের ওপর শোয়ানো ছোট্ট পুটলি,—গোবিন্দ বুঝল ওর ভেতর আছে যৌতুক স্বর্ণপুঁজি। না বাতিল না মঞ্জুর এই টানাপোড়েনে সময় কাটছে। বাড়তি প্রশ্রয় পাচ্ছে। পাচ্ছে যেহেতু আজ শুক্রবার। জুম্মাবার। বড় নামাজ বার। এটা মুসলিম প্রধান গঞ্জ। দোকানপাট বন্ধ। বেচাকেনা নেই। কারবার ঢিলেঢালা। এদিক বাদ দিলে আর একটা দিক আছে। যা মেয়েটির নিজস্ব যোগ্যতা। ব্যক্তিত্ব। পাড়াগাঁর সারল্য এবং শহুরে ধূর্ততার রসায়ন। পুরুষ বধ সূচক বিলোল দৃষ্টি, এক্ষণে আঙুল মুড়ে ঘন ঘন নাকের ডগা ভাঙছে। মনোরম মুদ্রাদোষ কপালে বাড়াবাড়ি সিঁদুরের ফোঁটা। চোখে সমৃদ্ধ ঘোর। সে যে আনাড়ি এবং আহ্লাদিত তারই দ্যোতক। চড়া রঙ শাড়ি এবং আমোদিত কাঠামো যে শ্রী বিয়ের জল পড়া আনকোরা উৎপাদন। উদাসীন থাকার স্পর্ধা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। মুগ্ধতা আসে। যা একপ্রকার বশ্যতাও বটে।

নিয়ম আছে। নিয়ম ছাড়া প্রথাও আছে অনেক। এটা ঠিক। আবার এটাও ঠিক পদবলে অনেক কিছু এধার ওধার করা যায়। গোবিন্দ ক্ষমতা প্রয়োগ করল। আবেদনপত্র ভরাট করে, "মঞ্জুর" লিখে সই করে পাঠিয়ে দেয় যথাযথ টেবিলে।

হাতের কাজ সারবে। প্রস্তুতি হিসেবে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামার্থী গোবিন্দ। ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং... অলস হাতে গোবিন্দ রিসিভার তোলে,—মে আই গেট দ্য লাইন মিঃ হাজরা।

—স্পিকিং।

—নমস্কার। আমি বিজিত সেন বলছি। চিনতে পারেন?

গোবিন্দ গদগদ হয়।—কী যে বলেন দাদা। একে ডিরেক্টর তায় কর্মচারীদের কবচকুণ্ডল।

—ওভাবে বলবে প্রচার হয়। আমরা সহকর্মী। যাকগে, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট আছে।

গোবিন্দ উৎকর্ণ।—সেবা তোমাদের পার্টি। আউটস্ট্যাণ্ডিং ব্যালেন্স এবং কী অবস্থায় আছে এ্যাকাউন্টটা? এ ধরনের তথ্য গোবিন্দুর জিভে লেপটে থাকে। টকাটক বলে যায় ইতিহাস।—ব্যালেন্স সত্তর লাখ প্লাস ইনটারেস্ট। এন পি এ হয়ে পড়ে আছে। আমি এসে ফলো-আপ করছি। হাত পাতলে ফুল্লরা হয়ে যায়। একটা বড় ধরনের প্রজেক্টে নামছে। ব্যাঙ্কার অন্য। ২ কোটি স্যাংশন হয় হয়। বি এল বি সি মিটিংয়ে টিপে দিয়েছি। ওর প্রেজেন্ট ব্যাঙ্কার সর্ত দিয়েছে পাস্ট ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে ক্লীয়ারেন্স আনতে হবে। ওপেনিং সেরিমনি হয় হয়। এখন বাছাধন খাবি খাচ্ছে।

কথার ফ্লো ঘা খায় ওপাশ থেকে ভেসে আসা ধাতানির চোটে।—একসেস হয়ে যাচ্ছে। অতটা ড্রাইভ দিতে হবে না। ও আমার ভগ্নিপোত। আরো অনেক কিছু বলল। গোদা বাংলায় যার মানে কেসটা ধামা চাপা দাও। কী মনে করে সাংস্কৃতিক উপবীত ছিঁড়ে ফেলে।—ভেবো না মাগনা হেল্প।

অর্থাৎ তুমি আছো আমি আছি। পরস্পরে গিঁট দিয়ে ব্যবস্থাকে টেকসই করার ইসারা। ভাবা যায়। এদিকে এন পি এ-কে চাঁদমারি করে ইউনিয়ন এবং কর্তৃপক্ষ যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে। ধুয়ে দাও। অল আউট ড্রাইভ টু রিকভারি। প্রবুদ্ধ হয়ে ঝাঁপ দিলেই পেছন থেকে ছুরির পোঁচ। আয়ুদান—আয়ু হরণের সফরী। কোম্পানি কি এমনি মাজা ভাঙা! গঙ্গাযাত্রা কি এমনি এমনি!

প্রসঙ্গে ইতি টানতে গিয়ে বিজিত সেন ফের মনে করিয়ে দেয়,—আমার ব্যাপারটা মনে থাকে যেন। এ্যাণ্ড কিপ ইট সিক্রেট। রা...খি...ই...।

একটা সন্দেহ টুকি দেয়। একি নিছক স্বজনপোষণ নাকি আত্মতোষণ। ভগ্নিপোত যে সুবিধে পাবে তার মধ্যে নেতারও বখরা আছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় জাগে।

অবশ্য এই স্বাভাবিক। মুক্ত অর্থনীতির জরায়ু ফাটিয়ে জন্ম নিয়েছে নতুন ঘরানা। বিদ্যাচর্চায় মাটো। বুদ্ধিতে জড়। মনে সংকীর্ণতা। ঐতিহ্যে ভুঁইফোড়। গতরখাটনি, কর্মী পরিষেবা, বাকপটুত্ব, বিতর্ক ইত্যাদি নিয়ে ইউনিয়নের যে সাবেকী ঘরকন্না তার সহবাস ছিন্ন। পছন্দের কিছু লোক নিয়ে গুটি তৈরি করে ইউনিয়ন অফিসে বসে। গড়ে তোলে নিজের বেলা আঁটিসুঁটির উৎপাদন কেন্দ্র। ইউনিয়ন সত্তা থেকে বিচ্যুত। প্রশাসনিক হওয়ার দিকে ঝোঁক প্রবল। অথচ নেপথ্য প্রস্তুতি নেই। পেডিগ্রি নেই। অর্থাৎ ঠাটবাট এবং অনুশীলন — সমূহ প্রক্রিয়া যা আভিজাত্যে প্রথার দ্যোতক তার অভাবে এ লাইনে ডাহা ফেল। ফলে নষ্ট চরিত্র। একদিকে এই। আর একদিকে আছে যাদের হাজিরা খাতায় নাম নেই। অবসরভোগী। মাও অবতার। অভ্রান্ত মনোবিকলনে ভোগে। ঘাটে যাবার সময় হলেও ঘাট মানতে নারাজ। হরির ভরসায় দিন গুণছে। অহরহ মরণ-বিহ্বল। হলে হবে কি আকাঙ্ক্ষার লয় নেই। চাই চাই হাহাকারে ইস্তফা নেই। এরা ষড় করে কর্মীনেতৃত্বের সঙ্গে। সহায় হয়। নবিস এবং পোড়া উভয় ইউনিয়নজীবীর সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কর্মী সেবা? লাটে। গ্রাহক পরিষেবা? রকের ভাষায়—সব চলে যায় মায়ের ভোগে। এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই। এই

হচ্ছে লোকায়ত দর্শন। অন্য দিকটাও খরা। খালি টার্গেট। লগ্নী টার্গেট। আমানত টার্গেট। রিকভারি টার্গেট। আর এম অফিসের চাপে চাপে অন্তর্ভূমি ছারখার। লগ্নী করলে মাথার ওপর ঝুলছে অনাদায়ের দন্ত। না দিলে অযোগ্যতার কালিমা। পিছড়ে বর্গ পরিষেবায় অবহেলা। বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন যাদের তাক করে সেই জনগোষ্ঠীর হিসেবটা হচ্ছে ঃ হাইস্কুল—৩। জুনিয়র হাই—১। প্রাইমারী—৫। কলেজ—১। সিনেমা হল—২। মাড়াই কল—১। দর্জি—২৫। দোকান—২৩০। পেট্রোল পাম্প—২। ভাতের হোটেল—৮। পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিস—৩। বসতি এবং আসাযাওয়া সব মিলে কমবেশি ষোল হাজার মানবগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ। সঞ্চয় দাদন জমা তোলা ইত্যাদি প্রকল্পের শিকার। শিকারি হিসেবে ব্যাঙ্ক আছে ৩টে। পোস্ট অফিস ১টা। অতএব হাজার ষোল গ্রাহককুল নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। টানাহ্যাচড়া। বেশ্যারাও বাবুদের নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি করে না।

আধিকারিকরা কিছু সুবিধে ভোগ করে। অন্যতম হল ইচ্ছে করলে কাজের ছলে কাজ ভুলে থাকা বা এড়ান যায়। ম্যানেজার হিসেবে গোবিন্দ এখন সুযোগটা নিল। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছত্রাকার। ডাঁই হয়ে আছে ফাইল। যে যেমন আছে থাক পড়ে। গোবিন্দ মাথাটা এলিয়ে দেয় চেয়ারে। আধবোজা চোখ। জটিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সন্ধিক্ষণে যেমন হয় মুখশ্রী মুখে সেই ভঙ্গি এঁটে দিল। কিছু বাছাই অভিজ্ঞতা চোখে ভর করে। ঝরাতে চায়। ঝরে না। একে একে হানা দিচ্ছে :

একদিন। বুধবার। ননব্যাঙ্কিং ডে। গ্রাহক পরিষেবা থেকে মুক্ত। ভাবছি এন পি এ ইরোশন কীভাবে সম্ভব। ব্যাঙ্কের নোটিশ চোতা জ্ঞান করে বাহ্যি পেচ্ছাব পরিষ্কারের কাজে লাগায়। পঞ্চায়েত-পার্টি কর্মীরা লোন গায়েব করতে লোনীদের তোল্লাই দেয়। তোয়াজ নিরামিষি নয়। গুষ্টি শুদ্ধ খাওয়া পার্টি। ওদের বলে লাভ নেই। অগত্যা তিন সহকর্মীকে সাথী করে আদায় অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

প্রথম গ্রাম হিসেবে নির্বাচনে সচ্ছল পল্লী। ধসা গ্রাম, যেন বর্গি এসেছে। রটে গেল বার্তা। পুরুষ বলতে কেউ নেই। ঠেকা দিতে রয়ে গেছে মেয়েরা। তাদের পায়ে সস্তা চটি। অন্দর থেকে উঁকি দিচ্ছে খাট-আলমারি-ফ্যান-টিভি-গ্যাস-ওভেন, অর্থাৎ আধুনিক জীবনযাপনের সুলভ সংস্করণ। ধার শোধ দিতে পারে। না দিয়ে পার পাচ্ছে তাই দিচ্ছে না। ভাবটা দিতে পারি কিন্তু কেন দেব। অনেক চাপাচাপিতে পাল্টা আক্রমণ,

—বাঁধের জল ছেড়ে গভমেন্ট সব্বস্ব কেড়ে নিল। ভিটে গেল। ফসল গেল। গবাদি পশু গেল। সব গেল আর তোমরা এয়েছো চাইতে। হাতের অনন্ত খেলিয়ে দাবিতে মুখর হল,—বাবুগো লোন দাও। নাহলে ছেলেপুলে নিয়ে শুকিয়ে মরব।

দায়িত্ব দিয়েছিল ঠেকা দিতে। মেয়েরা গড়ে তুলল প্রতিরোধ।

—কিছু না দিলে ব্যাঙ্কের চলবে কী করে? অসহায় প্রশ্ন তুলতেই মুখ ঝামটায়।

—চলতে কে দিব্বি দিয়েছে। কনতো আমাগো কোঁচর ফাঁকা করতে আপনাগো এ্যাতো আঠা ক্যান? ব্যাঙ্কের কিছু অভাব আছে? অভাব আমাগো সর্বাঙ্গে। ভাত-কাপড় আছে। পড়ালেখা আছে। আমোদ-আহ্লাদ আছে। সংসার আছে। বিয়াসাদি আছে। মোদের ফকির করে ব্যাঙ্ককে বড়লোক করে কি লাভ! তার কি ঘরকন্না আছে? বালবাচ্চা আছে? বিয়া হয়? বউ মেয়ে আছে—পোয়াতি হয়? বাচ্চা পাড়ে!

বেল্ট ধরে টান দেয় সহযাত্রী সত্য।—চলেন গোবিন্দদা। ঘাম ঝরিয়ে লাভ নেই। আপনি

লেখেন-টেখেন। যোজনা কমিশনের সুপুত্তরদের বলবেন এসে দেখে যাক গ্লোবাইজেশনের কেমন গাঁড় ফাটছে।

সত্যি গ্লোবাইজেশন না ছাই। লোকালাইজেশনের বাড়বাড়ন্ত।

এরা সব জরি শিল্পী। শাড়ীর ওপর বুনে দেয় জরির নকশা। জোট বেঁধে কাজ করে। স্ব রোজগার যোজনা প্রকল্পের আওতায়। কারিগরি দক্ষতা আছে। বাজার আছে। পুঁজি যোগান দিচ্ছে ব্যাঙ্ক এবং সরকার। ধার এবং ভর্তুকিতে। হাতে কিছু পয়সা এলেই কাজে কামাই। ভীষণ কুঁড়ে। মার্কসকে ধার করে যে বলা হয় মানুষ কাজ করে কাজের আনন্দে। ধারণার সঙ্গে অভিজ্ঞতার ঠোক্কর লাগে। মনে হয় মার্কসবাদ এক ফাটকা তত্ত্ব এবং ইচ্ছাপূরণের তদগত দর্শন। তা না হলে তিনি বলেন ধনতন্ত্র যত পাকবে ততই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। কেননা ধনবাদ বিকাশের পথে পথে পুঁতে যাচ্ছে আত্মবিচ্ছেদের মারণ বীজ। উৎখাত চারা। তাই তাঁর মতে ধনতন্ত্রের তুঙ্গময় সময়ই তার বিনাশ কাল। কই ঘটল কি। ঘটল না। ধনতন্ত্র ধসল না। পরিবর্তনশীল উপাদানের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে কালের চাহিদাকে চমৎকার দত্তক নিয়ে টেকসই হল। নিজের আরোগ্যের সন্ধানে শেষহীন উৎসে তার অনলস খোঁজ। তাই সে বেঁচে যায়। আসলে দলিত শ্রেণীর অবস্থা মার্কসকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে তার তর সইছিল না। ধৈর্য এবং আস্থায় ঘাটতি ছিল। ফলে বলপ্রয়োগে নির্ভরতা এসেছে। যদি হঠাৎ ধাক্কায় আকস্মিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় ওলোটপালট করে দেওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের চলার ছন্দে অন্য ইশারা আছে। সমাজে মজাদার প্রথা হচ্ছে বহুত্বময়। আহতে টোক্করে অভিমানে প্রতিবাদে প্রতিরোধে উচ্ছলতায় বক্র প্রবাহ। নানান নকশা নানান অভিমুখের জটিল অনবদ্য বয়ন। এসব এড়িয়ে সর্টকার্টের প্রতি ঝোঁক অর্থাৎ রোমান্সধর্মিতা মার্কসবাদকে পরিণত করেছে বিচ্ছিন্ন দর্শনে।

হাঁটতে হাঁটতে দরিদ্র পল্লীর অন্তরে ঢুকছি। দামোদর থেকে ছিটকে এসেছে একটা খাড়ি। আদ্যিকাল থেকে মুখে মুখে স্থানীয় নাম কানী নদী। নামে নদী। ছিল খাল। এখন নালা। গড়ানর মুখে হড়কাতে হাত ধরল সঙ্গী। অমনি খিলখিলে হাসির তীক্ষ্ণ গলা বাতাস চিরে হৃদপিণ্ডে ঘা দিল,—ওমা বাবুও এ পাড়ায়। বলে তালুর ওপর তালু ঠুকে বিকৃত উচ্চারণে গাইতে থাকে, পিড়ীতের একী নীলা/মনের আগুন শরীলে দ্বাপায়। চমকে তাকাই। আরে, এ যে সেই মেয়ে। আমি শনাক্ত করতে পারি। সোহাগী দলুই। ওকে কয়েক মাস আগে ৮ হাজার টাকা লোন ডিসবার্স করেছি। "প্রকল্প" কলামে ভর্তি করেছিল "চালকে" বলে। অর্থাৎ ধান সেদ্ধ ভাঙান বিক্রি। কাঁচামাল—প্রসেসিং—বাজার। গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবেদক নিজে যুক্ত। মাঝে কোনো ফড়ে নেই। ব্যবসা করে যে নাফা হবে পুরোটা তার। গৃহস্থালী খরচ বাদ দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ দেবে। অর্ধেক ছাড়। কথা ছিল নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। স্বনির্ভর হবে। সাবালকত্ব ভোগে। প্রচেষ্টা ছত্রাকার। প্রচেষ্টা নেই। পড়ে আছে প্রচেষ্টার ভগ্নস্তূপ। তাহলে কি পঞ্চায়েত সদস্য মানে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আমলা, পার্টিযন্ত্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ঐক্য করে নেপো হয়ে মেরে দিল দই। না হলে এরই মধ্যে তুলসী মঞ্চ ছেড়ে খুপড়ি ঘরে গিয়ে ওঠে। সহচরী সত্য ঠ্যাটা।—সাহেব নিজে এসেছে। যা আছে অন্তত কিছু আজ দাও।

সোহাগী আরো এক কাঠি ওপরে যায়। চোখমুখ পাকিয়ে বলে,—ওমা যা আছে দিয়ে থুয়ে দিলে কাল খাব কী গো—।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘাড় ধাক্কা দিচ্ছে—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ। মেহের আলি চিৎকার করছে—তফাত যাও। স্ত্রী মুখ ঝামটা দিচ্ছে—তোমারই বা অত ঠেকাটা কি!

আমি টুপি খুলতে বাধ্য হই। সেলাম তব চরণে। ঘাট হয়েছে। টা-টা, সাইলকের বাণিজ্য বিস্তারে রণযাত্রার এখানেই ইতি।

গোবিন্দ ভাবে কাজের অন্দরমহলেও কি আছে তৃপ্তির পরিবেশ? কাজ মানে থোড়বড়িখাড়া। জমা-তোলা-শতাংশের হিসেব। অংক কষাকষি। রাশি রাশি ভাউচার নিয়ে যোগবিয়োগ গুণভাগ, মিলন প্রয়াস। সৃজনশীলতা নেই। মজা নেই। আছে সমৃদ্ধ শ্রান্তি।

একদিকে ইউনিয়নের দাদাগিরি। আর একদিকে কর্তৃপক্ষের গুরুগিরি। মাঝখানে বহে যায় সংখ্যার খেলা। বোর লাগে, বিচ্ছেদ তাকে টানছে। আট বছরের সিনিওরিটি? লস? অপচয়? হোক। লেট ইজ বেটার দ্যান নেভার। ক্লীন্ন জীবিকার অবসান জরুরী।

নিজেকে নিয়ে গোবিন্দ বিশ্লেষণাত্মক হয়। ভাবা প্রাকটিস করতে গিয়ে ধরা পড়ে মননের দিকে ওর প্রধান ঝোঁক। মননের মধ্য দিয়ে জীবনকে খোঁজে। এবং ঈদৃশ তাড়নায় শিক্ষকতাতেই ওর পক্ষপাত। ললিত শ্রী নিয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে হেঁটে পাটাতনের ওপর গিয়ে দাঁড়াবে। কচি কোমল প্রশ্নাতুর চোখের ওপর ছড়িয়ে দেবে অধীত বিদ্যা। মুগ্ধে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসায় চোখগুলো নাচবে। ক্ষণে ক্ষণে এই উৎফুল্ল এই বিষণ্ন। বহুশ্রুতিতে একঘেয়ে কথনে ভাব ও ভাষা অবসন্ন হয়ে যায়। তাই তত্ত্ব ও তথ্যের নব নব জিজ্ঞাসায় যুক্ত থাকবে। সৃজনশীলতার ছোঁয়া থাকবে। শিক্ষক-ছাত্র কেউ ক্লান্ত বোধ করবে না। ছাত্রসমাজ মানেই গতির প্রবাহ। এক ব্যাচ গত হবে আর এক ব্যাচ জাগবে। মর্মে মর্মে ও জীবন রসিক। জীবনের মধ্যে থেকে জীবন রসিক থাকতে চায়। শিক্ষকতা এবং কলেজ শিক্ষকতাই তার আরাধ্য জীবন দান করতে পারে, "ব্যাঙ্কজীবী"তে ও আড়ষ্ট। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় বসে না থেকে ভেতরে ভেতরে সক্রিয় ছিল। "নেট" হয়ে গেছে। "শ্লেট"ও উত্তীর্ণ। দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। একটা কলেজে, কলকাতার—অনেকদূর এগিয়েছে। এখন শেষ স্তরে। ভাইভাবোসির গাঁট পার হলেই মুক্তির মঞ্চ। প্রতিবন্ধকতার সবশেষ কিঞ্চিত আছে বৈকি। প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজন। ৪ থেকে ৩ নম্বরের হেরফের। সবটা নির্ভর করছে সরকারি বিশেষজ্ঞর ওপর। গোবিন্দও বসে নেই। তলে তলে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। হরিকাকু ওর খুঁটি। কাকু বলেছেন, আগুপিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নাও। তোমার যা এলেম এবং বয়স চচ্চর করে উঠবে। কলেজের চাকরি এখন মূল্যবান। তাহলেও সারাজীবন এক স্কেলে পচা, নো প্রমোশন। নো পার্কস। তলিয়ে ভাবো। ভেবে সিদ্ধান্ত নাও। সিদ্ধান্ত শিগ্রি আমায় জানাও। কোনো দোনামনা নেই। গোবিন্দ সিদ্ধান্ত নিল কলেজ মাস্টারিই কাম্য।

অভিজ্ঞ দুপুর এখন শরশয্যায়। পশ্চিম দিগন্তে শেষকৃত্যের মহাপ্রস্তুতি। জোর সাজছে সাঁজবেলা। উৎকণ্ঠার সদ্গতি করতে গোবিন্দ পথে নামল।

২

বাল্ব কেটে গেছে। বিদ্যুৎ বিরহে ছায়া ছায়া আবছা অঞ্চল। গোবিন্দ প্রথমটা ঠাহর করতে পারেনি, ফলে কুণ্ডলি পাকিয়ে সিঁড়ি আগলে মটকা মেরে পড়ে ছিল যে কুকুরটা তার গায়ে গোবিন্দর পা ঠোক্কর লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ। তেড়ে আসা। গোবিন্দ দু পা পেছোয়। ধাতস্থ হয়ে পায়ে পায়ে এগোয়। কুকুরের দিকে চোখ রেখে স্বগতোক্তি করে। আর তড়পাস

না। প্রভুভক্তি মারাচ্ছে। তোকে চিনতে আর বাকি নেই। শালা চোর, জুতো চুরি করে কেটে পড়েছিলি বলেই না দ্রপদীকে নিয়ে সে কী কেলো। দরজা খোলা। গোবিন্দ ভেতরে ঢুঁ মারতেই,—এসো এসো। ডাকে স্বাগত। ফর্সা ধুতি ভাঁজ করে লুঙির মতো করে কোমরে জড়ান। গায়ে হাফ হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি। এই হচ্ছে নরহরি সামন্ত। রাজ্যসভার এম. পি.। তার মুখোমুখি এবং ডাইনে বাঁয়ে মিলিয়ে ৬ জন। হরিকাকাকে নিয়ে সাত। সাতটি তারার তিমি... গোবিন্দ একা বসে রইল।

কথা চলছিল। কয়েক পল ছেদ নামে। আবার তা চালু হয়। হরিকাকু শুধোন,—বিল্টু তোমার চোখ বলছে পেটে অনেক জমে আছে। কথা হল সবচেয়ে কড়া পারগেটিভ। চাপাচাপিতে মাসুল দিতে হয় বেশি। আস্কারা পেয়ে উদ্বুদ্ধ হয় বিল্টু। তর্কাতর্কিতে জড়ায়, যুক্তি নিয়ে চলে মাকু ঠেলাঠেলি।—দিল্লীতে ঘনঘন বৈঠক হচ্ছে। এন আর আই, আর আই এবং এফ আই বেবাক রেওয়াজী শিল্পপতিদের ডাকা হচ্ছে। এসো, পশ্চিমবঙ্গের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উত্তম। পুঁজি ঢালো। প্রযুক্তি প্রয়োগ করো। কর্মী নিয়োগ করো। নাফা করো। বল্গাহীন প্রশ্রয়ে আঞ্চলিক কারিগরি দক্ষতা উৎপাদন ধ্বংস হয়ে যাবে নাকি! থাইলাণ্ড যদি চাল দেয় আমাদের চাষিদের কী হবে। এক সময় ম্যাঞ্চেস্টারকে বাঁচাতে ভারতীয় বয়ন শিল্পকে শেষ করেছিল ইংরেজ শাসক, মনে আছে! তেমন অবস্থাই কি ফিরে আসবে না!

পার্টি অনুগত হলেও বিল্টু ঠিক সেই জাতের নয় যাদের মাথা বন্ধকি। ও হচ্ছে প্রশ্নশীল এবং ঠ্যাটা। এরা হাতের কাছে নেতা পেলে রগড়ায়। নরহরি ব্যাখ্যায় সাবধানী হন।

—তোর আর দোষ কি পার্টি ক্লাস-ট্লাস তো ডকে। নইলে জানতি পুঁজির স্বভাব মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মতো অলস নয়। চঞ্চল। সিন্ধু সভ্যতা এবং ব্যাবিলন সভ্যতায় এমন অনেক চিহ্ন পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণ হয় উভয় দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য প্রথা চালু ছিল।

বিল্টু ঃ আমার প্রশ্নটা অন্য। পার্টির নীতি হচ্ছে ক্রেতাভিত্তিক বাজার, খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা হচ্ছে ব্যাপক মানুষের চাহিদা। সেদিকে তাকিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বাজার গড়ে তুলতে হবে। বহুজাতিক সংস্থা চায় পণ্যভিত্তিক বাজার। অর্থাৎ আগে পণ্য তৈরি তারপর সেগুলো মানুষের মধ্যে গছানোর ফন্দি ফিকির।

হরিকাকা ঃ অর্থনৈতিক গাঁট ছাড়াতে পার্টি কোনো সংস্কার আঁকড়ে থাকবে না। পার্টি হচ্ছে এ্যাকশন স্কোয়াড। কোনো একটি বেছে কর্মসূচী প্রয়োগ করতে হয়।

বিল্টু ঃ বিষয়টা যেহেতু অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদদের মতামত নিয়ে অর্থনৈতিক কর্মসূচী তৈরি হয়েছে কি!

হরিকাকা ঃ হাসালি। পাঁচজন অর্থনীতিবিদের কাছে সুপারিশ চাইলে পাঁচ রকম সুপারিশ আসবে। এ নিয়ে এক মজার ঘটনা আছে। শোন, ট্রুম্যান মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান তখন। তিনি হন্যে হয়ে একজন এক হাতওয়ালা অর্থনীতিবিদ খুঁজছেন। কেননা তাঁর অভিজ্ঞতা হচ্ছে কোনো এক বিষয়ে অর্থনীতিক সুপারিশের তাগিদে তিনি তিনজন অর্থনীতিবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। দেখা গেল তাঁরা তিনজন তিন রকম মত দিচ্ছেন। একজন ছাঁটাই করে দুজনের মত চাইলেন। লাভ হল না। দুরকম পরামর্শ এলো। বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে তিনি একজনের শরণ নিলেন। এখানেও আশার ছলনা। সেই অর্থনীতিবিদ জবাব দিচ্ছেন, On the one hand এটা ঘটতে পারে। On the other hand ওটাও ঘটতে পারে। বোঝো কাণ্ড। বিভ্রান্ত ট্রুম্যান অগত্যা একহাতওয়ালা অর্থনীতিবিদ খুঁজছেন। কী বুঝলি!

বিল্টু ঃ মাইরি তোমরা পারো বটে হরিদা। উপলব্ধি যদি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখতেই কেন অন্য গাওনা, পুরো পালটি। এটা কেন? পণ্য উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ চাই, বাজার অর্থনীতি চাই না। দিল্লীতে সবকিছুতে সায়, হ্যাঁ হ্যাঁ জাঁহাপনা, রাজ্যে না না চেঁচানি। কোনটা যে তোমাদের অস্ত্র।

হরিকাকু ঃ ঠিক ধরেছিস, এ হচ্ছে সেই মেঘনাদ বধের মতো। যতো অস্ত্র মজুত আছে মেঘের আড়াল থেকে একে একে সব ছোঁড়া হচ্ছে। যেটা লেগে যায়।

বিল্টু ঃ অর্থাৎ ধর্মে আছি জিরাফে আছি।

বেড়ে বলেছে। গোবিন্দর মুখ চুলবুল করে সমর্থনে। কী ভেবে ইচ্ছে ঠেলে দেয় গোপনে। প্রার্থী সে। আঁজলা বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃপা করো। দাও। একদিকে অনুগ্রহ আর একদিকে স্বাধীনতার স্বাদ—হয় না। একটা টিকলে অন্যটা পিছলে যায়। গোবিন্দ মাথা নোয়াল।

বাদল স্বাধীনতার অন্তর্জলী। আচমকা তার দিকে নজর দেন হরিকাকু। ভর্ৎসনা করেন,—হ্যাঁরে গঙ্গার ওপর দিয়ে কতো জল বহে গেল। সমাজে কতো ওলট-পালট হয়ে গেল, বাঙালি সেই এক স্বভাবে অনড়। সময় জ্ঞান নেই। আমি উঠবো উঠবো করছিলাম।

নেতাদের স্বভাব হচ্ছে আপন কীর্তি অভিজ্ঞতা রসবোধ জাহির করা। অন্য পক্ষের অভিজ্ঞতা কৌতুকপ্রিয়তা সম্পর্কে উদাসীন। অন্যমনস্ক। এতে একপ্রকার সুবিধের দিক আছে। তা হল অনেক অস্বস্তিকর দিক এড়ান যায়। চাপাচুপির কলংক গায়ে লাগে না। তা না হলে আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বলত তা হচ্ছে ঃ নলপুর থেকে সল্টলেক পাড়ি দিতে সময় লাগে মেরে কেটে ২ ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা বাড়তি সময় হাতে নিয়ে রওনা দি। প্লাটফরমে পা দিতে দেখি লোকে গিজগিজ করছে। ট্রেনের দেখা নেই। অনেক সময় কেটে যাচ্ছে। টানটান উত্তেজনা। যাত্রী বিক্ষোভ হবো হবো ঘোষণা। ট্রেন আসছে। ঢোকার আগে বিপুল আওয়াজে ঘন ঘন বাঁশি বাজিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ট্রেন এসে থামল। চকিতে প্লাটফরম কুরুক্ষেত্র। ধাক্কা চিৎকার আর্ততার হল্লা। কে কাকে টপকে কামরা দখল করে প্রতিযোগিতা। আমি হেরো। তীব্র হর্ন বাজিয়ে টা-টা জানিয়ে ট্রেন ছেড়ে যায়। দ্বিতীয় ট্রেন এলো। প্রচুর খাটলাম। এবারও ফেল। দশ মিনিট পর তৃতীয় ট্রেন ঢুকলো। এবার টায়েটুয়ে পাশ। ভেতরে সেঁটে আছি। ট্রেন বিপুল বিক্রমে শস্য ক্ষেতের বুক চিরে ধেয়ে যাচ্ছে। সাঁতরাগাছিতে থেমে আর নড়ে না। কী না যাত্রী বিক্ষোভ। অবরোধ। যারা ঝুলে ছিল পা রাখল প্লাটফরমে। হাওয়া লাগাচ্ছে গায়ে।

—বেশ তো আসছিল।

—এ হচ্ছে ভারতীয় স্পুটনিক। ষোল বার আছাড় খাবে। একবার উড়বে।

—কী হয়েছে বলুন তো? খোঁজ নিলে হয় না।

—কী আর হবে। সেই এক ব্রজ গীত। প্লাটফরম পাচ্ছে না। হাওড়া স্টেশন হচ্ছে ইস্টার্ণের বাবাকেলে তালুক। তার মেল-লোকাল সব জামাই নাতজামাই। আদর করে নিয়ে আসে প্লাটফরমে। সাউথ ইস্টার্ণ হচ্ছে বেকার ভাই। ফাঁকফোকর পেলে কল্কে পাবে। আরে মশাই গণতন্ত্র এদেশে অচল। ক্যালানি হচ্ছে মোক্ষম দাওয়াই। গুছিয়ে ক্যালালে ঠিক সিধে হবে। কাটা কাটা মন্তব্যে গমগম করে ভাপে সেদ্ধ হওয়া বগি।

গোটা সিনারিও তুলে ধরে লাভ হতো না। ভাবত, ধাপ্পা দিচ্ছে। বলত, বাহানা। কমরেড বনাম হরিকাকুর আলাপচারিতা ছিন্ন। নিরালা ঘরে নরহরি পূর্ণ মনঃসংযোগ

করলেন গোবিন্দতে।—কী সিদ্ধান্ত নিলে।

—কলেজ মাস্টারিই আমার পছন্দ।

—পেলে লেগে যা। এমন দশা তোমার নয়, ধরে নিচ্ছি সবদিক খতিয়ে এ লাইনে ঝুঁকছ।

—হ্যাঁ কাকু। শিক্ষকতাতেই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব। আত্মবিশ্বাসের সুযোগ পাব।

নরহরির চোখে ভাবনার ছায়া পড়ে। কয়েক পল কাবার হলে মুখ তোলেন।—আমি তোমার সঙ্গে এক মত। ইন টো টো। আমার রিডিং তোমার ঝোঁক মননের দিকে। বেশ। আমি দেখব।

দু'চোখ জুড়ে কৃতজ্ঞতা ফুটল। সে অন্যদিক। হরিকাকুকে বলিহারি দিতে হয়। কেননা ওর সম্পর্কে এমন যুৎসই মূল্যায়ন এর আগে কে আর করেছে। স্বভাবের গড়ন যা, তাতে ওরও নিজেকে মনোজীবী ভাবতে ভালো লাগে। গোবিন্দ দেখল ওর দিকে নরহরি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আসলে দৃষ্টির তাক গোবিন্দ। কিন্তু মনে মনে হিসেব কষছেন অন্য। বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাচ্ছে শম্ভু ভাদুড়ি। পাকা শব্দজীবী। বিশুদ্ধ অর্থনীতিতে খাপ খুলতে না পেরে সুইচ ওভার করে সোসিও-ইকনমিতে। এতে গণসমাজ এবং বিদ্ব সমাজ এক ঘাটে জল খায়। যশ ও অর্থ পাচ্ছে। যা পাচ্ছে তাতে তুষ্ট নয়। আরো চাই। প্রচণ্ড প্রাধান্য-কাঙাল। বিদেশ পাড়ির ইশারা পেলে লোভে ছোঁকছোঁক করে। আসছে মাসে পাঁচ সদস্যের এক কেন্দ্রীয় ডেলিগেশন যাচ্ছে রোম। এই ডেলিগেশনে পার্টির একটা কোটা আছে। আর আমি হচ্ছি সর্বভারতীয় এই সেলের প্রধান। শম্ভু খুব যোগাড়ে। খোঁজখবর রাখে। ইদানীং আমার কাছে ঘোরাঘুরি ছোটাছুটি করছে। যোগাযোগ রাখছে। এসব আমড়াগাছি আর কিছু নয় ধান্ধা সিদ্ধির গুপ্ত খসড়া। কথা হচ্ছে রাম শ্যাম যদু মধু কেউ না কেউ একজন ডেলিগেট হবে, মধুর জায়গায় শম্ভু তালিকায় ঢুকলে কি এসে যায়। বিনিময়ে গোবিন্দরটা করে দেওয়া জাস্ট এ ম্যাটার অফ টেলিফোন। নরহরি ঈষৎ টাল খান। বিনিময় হয়ে যাচ্ছে না! যাক না!

—রোববার সকালে আমি থাকব। ইউ জি সি-র এক্সপার্টকে বলে রাখব। মাকে নিয়ে এসো। অসহায় বিধবা দেখলে কাজ হয়।

৩

রোদের রাজত্বে কদিন ধরে খাবলা আক্রমণ চালাচ্ছিল মেঘ। রোদের চাপে ক্রমশ পিছু হটতে হটতে একসময় মেঘ সূর্যকে আবহপাট সঁপে দিয়ে কেটেছে। প্রসন্ন রোদের অনুদানে ঝলমল করছে ছাদ। এমন আবহাওয়া বড় সংক্রামক। শ্রমের ছন্দে নেচে ওঠে হাত-পা। পরে করবো বলে ফেলে রাখা কাজ সেরে ফেলতে তাড়া আসে।

এখন মায়াবতীরও গড়পড়তা অভিধা। দেখা যাচ্ছে বৃহৎ আকারের কাঁসার থালায় তার চোখ নিবদ্ধ। আঙুল ক্রিয়াশীল। হার-বাউটি-দুল-আংটি নানা গয়নার আদলে নির্মাণ হচ্ছে ডালের বড়ি।

—মা। ডাক শুনে মগ্নতা চিড় খায়। সাথে সাথে আঙুলের সঞ্চরণ স্থির। চকিত মায়াবতী মুখ ফেরায়। ঘাড় বেঁকায়। ঝাঁকুনিতে কাঁধের একপাশ থেকে আর একপাশে চুল ঝরে যায়। মুখে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা উথল হয়।—কিছু বলবি!

—মা তুমি হরিকাকুকে নিজে গিয়ে বলো তাহলে ব্যাকিংটা জোরদার হয়।

আঙুলের ডগা থেকে ডালের দলা চলকে পড়ে। মায়াবতী থ। মুখটা ছিল যেন ফোটা ফুল। মুহূর্তে ধসা। বলে কী...। অন্তস্থলে স্পন্দন জাগে। জিভে লেপটে যায় অতুলপ্রসাদ। না না না। যাব না যাব না...। পরমুহূর্তে গোবিন্দর মুখে চোখ পড়তেই কেমন হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা চুর চুর হয়। প্রতিরোধ ভাঙতে থাকে। নড়বড়ে হচ্ছে দৃঢ়তা। উৎস ঐ মুখ। গোবিন্দর বিষণ্ণ মুখ। এই ছেলেকে নাওয়ানো খাওয়ানো ছোঁচানো পড়ানো সব নিজের হাতে করেছি। অর্থবল লোকবল ছিল না। সয়ে সয়ে আগলে আগলে আদরে-শাসনে গড়ে তুলেছি। বাছা আমার একমাত্র ধন। মূলধন। ওর তৃপ্ত সুন্দর মুখ দেখতে আমার যদি সব ভেসে যায়, যাক। সন্তানের স্বার্থে বন্ধুত্বের যোগ্য হয়ে ওঠে মায়াবতী।—বেশ তুই যদি চাস আমি যাব। যে রজনীকান্ত পেয়ে বসেছিল একচ্ছত্র সেই ভরসা থেকে ছিটকে যায় মায়াবতী। গোবিন্দর মুখে যেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক ঝরছে। ঝরা পাতা গো, যেয়ো না ঝরে।

৪

বাস থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে গোবিন্দ। কোনো রিক্সার পাত্তা নেই। খানিক অপেক্ষার পর একটা রিক্সা এগিয়ে আসছে। কাছে এসে না থেমে থামার ছলনা করছে। গোবিন্দ ডাকল,—এই রিক্সা—। ডাকে উদাসীন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রিক্সাচালক।—যায়েগা কাঁহা। যেই শুনল "ই" ব্লক কোনো পাত্তা না দিয়ে প্যাডেলে পা না রেখে হাঁটি হাঁটি পা পা এগোতে থাকে।

—চলো না ভাই। কণ্ঠস্বর মহিলার। আবেদন বাড়তি মাত্রা পায়। রিক্সা থামে।—আইয়ে।

গোবিন্দ ও মায়াবতী রিক্সায় ওঠে। নির্দিষ্ট ব্লকে এসে রিক্সা থামল। রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে গেটের কাছে এসে গোবিন্দ ভাবল আজকের বৈঠকে সে বেকার। গেট খোলা আছে দেখে গোবিন্দ মাকে বলল,—মা তুমি ভেতরে যাও। কথাবার্তা হয়ে গেলে টানা বাসে চলে আসবে। আমি রাঙা পিসির বাড়ি অপেক্ষা করছি।

রোববার, সকাল ৯টা। গৃহস্থালী সবে ফুটছে। টুকটুক করে গৃহস্থ কাজ সবই সারা হচ্ছে কিন্তু আঁটোসাঁটো সময় শাসিত নয়। ছাড় আছে। গা-ছাড়া অলস উপভোগ। দ্বিতীয় দফা চা নিয়ে বসে আছেন নরহরি। একলা ঘরে। এই চা পান সারাদিনের ব্যস্ত পরিশ্রমের বিলাসী প্রস্তুতি। ঠোঁট সংলগ্ন কাপ থেকে চলকে পড়ে চা। মায়াবতীকে নজর করা মাত্র উৎসাহ-উত্তেজনায় স্বাগত জানান নরহরি।—এসো এসো, বোসো। কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে মায়াবতী আসন নেয়। বসে চারিদিকে চোখ বোলায়। নজর কাড়ছে আসবাবপত্র। সর্বত্র লোকসংস্কৃতির ছাপ। বর্ণাঢ্য কিন্তু চোখ টাটায় না। অর্থ এবং রুচি থাকলে যেমন হয়। মায়াবতীর বিস্ময় লাগে ভেবে কী থেকে কী। মায়াবতী প্রথম মুখ খোলে।—তুমি কিন্তু বদলে দিতে পারতে আমার জীবন।

—তুমিও অপেক্ষা করলে পারতে। সময় দিলে না মোটে।

—প্রমিস ছিল না। আশ্বাস ছিল না। এমন কোনো ইঙ্গিত পাইনি যার ওপর ভর করে চাপানো বিয়ে প্রতিরোধ করতে পারি। একথার পর নেমে আসে মৌনতা। মৌনতা খাক খাক করে দিচ্ছে আবহ। পরিস্থিতি চাপান-উতরে সংঘাত হতে পারে আঁচ করে নরহরি। সে আর বিষয়টা কচলায় না। আপসী স্বরে বলে,—চলো ওপরে যাওয়া যাক। যশো খুব-আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আগে আগে নরহরি। তার পায়ের পাতা প্রকাণ্ড। কোদাল কোদাল চাষাড়ে, থেৎলে চলে। চল্লে মনে হয় আশ্রয়ে গেঁথে যাচ্ছে পা। পা টেনে টেনে চলার ধরন এমন, এই সকালেও মনে হয় পরিশ্রান্ত। পিছে পিছে মায়াবতী। সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা রেখে মায়াবতীর পা ইতস্তত। বিবশ।—একী দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এসো—।

চমকে মায়াবতী মুখ তুলল। ব্রীড়াবদ্ধ বয়সিনী মুখ। কনে দৃষ্টিতে সে দেখল সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে এক অবয়ব। বাঁকা থুতনি, মোটা ঠোঁট, চাপা নাক, শ্যামলা, ডাগর ডাগর অবাক চোখের ঠিক "বাংলা মুখ"—যা ছোট্ট কপালের আলে এসে মৌলিকত্ব খুইয়েছে। কোনো পার্লার ননদিনীর পাল্লায় পড়ে ছুরি কাঁচির শৈলীতে চুলের সম্ভার ছাঁটাই। বব কাটে সংবদ্ধ বনসাই মাথা। ফুল্ল দৃষ্টি। প্রসারিত দুটি হাত আহ্বান জানাচ্ছে।

ওঠা নয়। যেন আরোহণ করছে মায়াবতী। সন্তর্পিত মন্থর পদপাত। বাহুর নাগালে আসা মাত্র, এসো আমার ঘরে। বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে। বলে স্লীভলেস জামা থেকে বয়ে আসা থলথলে বাহুর ঘেরে যশোদা মায়াবতীকে টেনে নেয়। কালো পেড়ে সাদা থানে মোড়া গদগদ কাঠামো এলিয়ে পড়ে। রূপসী নয় কেউ। তেমন গৌরীও নয়। আছে শুধু প্রসিদ্ধ লাবণ্য। এক লাবণ্যময়ী আর এক লাবণ্যময়ীর লগ্ন হল।

যশোদার কোলাকুলিতে পিষ্ট হতে হতে মায়াবতী ভাবে ঐ থলথলে বাহু নিছক চর্বির বাহুল্য নয়। ওতে জমে আছে পুঞ্জ পুঞ্জ স্নেহের স্তূপ। স্নিগ্ধতার স্ফীতি। তাছাড়া যে এ ভাবে ভাষা ধার করে সুরে চুবিয়ে মজা করে স্তরের আবরণে আদর করে স্বাগত জানায়। নিজেকে প্রকাশ করে এমন প্রকৃতিতে সে সন্দেহ নেই রসিকা এবং মনের দিক দিয়ে সাদা।

সুস্থির হয়ে বসার পর তরতর করে সময় বহে যায়। কথা-কথা-কথা। অনর্গলতার অবধি নেই। এক সময় যশোদা বলে,—কতোদিন ধরে পুষে রেখেছি কৌতূহল। তোমাকে দেখব। অপেক্ষা করতে করতে বুড়িয়ে গেলাম।

—আমারও ভাই এক দশা। তোমার সঙ্গে আলাপ করবো বলে ছটফট করেছি বছর বছর ধরে। সখ্যতা জমজমাট। কে বলবে এক পলকের একটু দেখাও হয়নি কোনো কালে। মানসিক নৈকট্য ছিল প্রবল। ফলে চাক্ষুষ হওয়া মাত্র "আপনি"র বেড়া টপকে "তুমি"তে পৌঁছে যায় এক বৈঠকে। শরণার্থী মনস্তত্ত্বে কুণ্ঠা কুণ্ঠা ভাব অবশ্য মায়াবতী পুরোপুরি ঝরাতে পারেনি। এগারটা বাজলে সে উঠি উঠি করে। যশোদা আপত্তি জানায়।—যাহোক দুটো মুখে গুঁজে একটু পিঠটান দিয়ে রোদ পড়লে যেও দিদি। এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে বেরুবে। কখন পৌঁছবে, কখন যে খাবে!

—কিছুই অসুবিধে নেই। এমনিতে আমি নিজেরটা যাহোক কিছু নিজেই ফুটিয়ে নি। ঠাকুরঝিও বিধবা। নিজের জন্য আগুন ধরাতে ওরও বেলা ২টো বেজে যায়। তাছাড়া আজ তো আমার ওসবের বালাই নেই। পেটে যা দিয়েছি আর কিছু দাঁতে কাটতে পারব না। এসেছিল লাজে। ফিরছে স্বচ্ছন্দে। যেতে যেতে মায়াবতী থমকে যায়। আফসোসী সুরে, মৃদু হলেও ধ্বনিত হয় নিজেকে লক্ষ্য করে। ইস একদম ভুলে গেছি। বলে বুটিকের কাজ করা সূতীর ব্যাগ হাতড়ে বার করে সন্দেশের বাক্স এবং চকলেট বার। আসার সময় হাওড়া ফ্লাই-ওভারের নীচে ট্যাক্সি থামিয়ে ভীম নাগ থেকে কিনে ওর হাতে দিয়েছিল গোবিন্দ। সন্দেশ এবং চকলেট বার সংকোচে বাড়িয়ে দেয় মায়াবতী।—মেয়ের জন্য এনেছিলাম। উপহার গ্রহণের ভঙ্গিতে যশোদা হাত পেতে নেয় প্যাকেট। তার চোখে ছায়া এবং মুখে মিষ্টি হাসি।—

আজ যাচ্ছ যাও। কথা দিচ্ছ আর একদিন আসবে।

—শিগ্রি আসব। ফোন করে জানিয়ে আসব।

—ওমা একী কথা! নিজের লোকেরা আসবে তা সার্কুলার জারি করে আসতে হবে নাকি। আঁচলে নাক মুছতে মুছতে নরহরিকে তাড়া দেয়।—গাড়ি বার করো। পৌঁছে দিয়ে এসো।

সোফার কভারে তখন পাছার দাগ সমান হয়নি এত তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিল মায়াবতী।

ছুটির দুপুর। নিত্যযাত্রীদের আনাগোনা নেই। কলরব। কোলাহল। হলাহল। দুর্গন্ধ। দূষণ। যানজট। যাবতীয় অনুষঙ্গ যা কলকাতার সঙ্গ শ্রীহীনতা সে সবের ছুটি। কোমায় আচ্ছন্ন পরিবেশ। ফলে তর তর করে বয়ে যাচ্ছে গাড়ি। সল্টলেক টু নাগেরবাজার। কতটুকুই বা পথ। তাছাড়া আসঙ্গ লিপ্সা যেখানে প্রগাঢ় সময় সেখানে আলোর গতি পায়। দূরত্ব হয় হ্রস্বতম। একটা গলির কাছে আসতে মায়াবতী থামতে বলে।—গলির ভেতর ঢুকতে হবে না। ওটুকু পথ হেঁটে যাব।

আজ্ঞা মাত্র গাড়ি থামল। প্রথমে বেগ কমিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তার কিনার ঘেঁষে। মায়াবতী নামলে নরহরি চালক আসন থেকে সরে আসে জানালার কাছে। যেতে যেতে যায় না মায়াবতী। পা সরে না। পিছুটানে আড়ষ্ট। জানালার কাছে স্থাবর। তার ক্লান্ত মুখশ্রী—অনেক বয়স ভাঁড়ানোর যোগ্য টানটান ঢেউ খেলান গঠন—যা দেখার লোভে দীনতা স্বীকার করেও ব্যবধান ঘুচিয়ে কাছাকাছি হচ্ছে পথচারীদের কেউ কেউ। দৃশ্যটা নজর করতে করতে মায়াবতীর জন্য গভীরে নরহরির টান উথলোয়। মায়াবতীর উজ্জ্বল অন্বেষী দৃষ্টি নরহরিকে বিদ্ধ করল। তারপর আবিষ্ট গলায় বলল,—গুণী বউ পেয়েছ। খুব সেবা পাও। কী মিষ্টি মেয়ে। আবার প্রেমিকাকেও পেলে। ভরাট জীবন তোমার। তুমি খুব লাকি!

এ কোনও জিজ্ঞাসা নয় যে জবাব দেবার দায় থাকে। নরহরি সয়ে যাচ্ছে মুহূর্ত। স্তব্ধ ক্ষণ বড় দীর্ঘ। যেন অবশেষ নেই। অবশেষে মায়াবতী মোচন করে স্তব্ধতা।—জয়ের আনন্দ নিয়ে খুশিতেই ছিলাম। সেই আমাকে টেনে আনলে। এখন আমি কী নিয়ে থাকি।

মায়াবতীর চোখে চোখ পড়তে নরহরির এই ভূগোল বোধ আসে, যে, ভূপ্রকৃতির তিন চতুর্থাংশ জল। সে বিহ্বল। চোখে লেপটে যায় মায়াময় ঘোর। মায়াবতী বোঝে নরহরি নরম হচ্ছে। নিজস্বতা হারাচ্ছে। ভাবের বশ হচ্ছে। আর অপেক্ষা নয় মায়াবতী সম্পর্ককে পণ্য করল। আড় হল।

—গোবিন্দ বড় আশা করে আছে। চাকরিটা যেন পায়।

বিস্ময় নয়। উল্লাস নরহরিকে প্লাবিত করল।—বোল তারে যেন ধরে নেয় হয়ে গেছে।

# স্মৃতি-বিস্মৃতির ঘ্রাণ

## বীরেন্দ্র দত্ত

যে কোনও যুদ্ধে দুটি সংগ্রামী গোষ্ঠী থাকেই। এক সময় মীমাংসায় তৃতীয় কোনও শক্তির সন্ধিচুক্তির সূত্র তারা মেনে নিতেও পারে। শুধু পারে নয়, নেয়ও। দুটি জীবনের মীমাংসা! বিয়ের ব্যাপারটাও তা-ই। মন্ত্র-পড়া পুরোহিত বা সরকারি আইনের রেজিস্ট্রার—দুয়ের কাজ সেই একই—দুই অ-সম জীবনের মধ্যে স্থায়ী মিলনের চুক্তি সই। সমস্ত বিরোধিতার শেষ!

কথাটা আজ দুপুর-গড়ানো বিকেলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে হঠাৎ মনে ভেসে ওঠে অনীশের। তখন খোলা কাগজ-পত্তর আর খাতায় সই শেষ স্বর্ণার। অনীশের সই করার পর চুক্তির কথাগুলো ওদের দুজনের রেজিস্ট্রারের বলা-মতো নির্ভুল বলা হয়ে গেছে! হঠাৎ রেজিস্ট্রার বললেন, 'মিঃ সেন, আপনি তো নিজেই বললেন, এসবেও আপনার বিশ্বাস নেই, তবু অবিশ্বাস দিয়ে একেও তো অস্বীকার করতে পারবেন না!' মুখে কৌতুক লেগে থাকে।

পাশে স্বর্ণার দিকে একবার তাকায় অনীশ, 'আপনার কথা মনে থাকবে। তবে আজ আর তর্কে যাচ্ছি না।'

সঙ্গে ছিল অনীশের বন্ধু বিমান, স্বর্ণার পৃথা। দুই সাক্ষী। পৃথা স্বর্ণার গভীর নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী।

বিমান মনে করায়, 'থাক ওসব। এর পর ওদের দুজনকে তাড়াতাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে।' রেজিস্ট্রারের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলোয়। পরেই বিমান মাথা নিচু নীরব স্বর্ণার ভঙ্গি দেখে অনীশের চোখে চোখ রাখে।

পৃথা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে চোখ রেখেছিল, 'যা মেঘ, একটু পরে বৃষ্টি নামবেই মনে হচ্ছে!' স্বর্ণার পাশে পৃথা। ডান বাহু দিয়ে স্বর্ণাকে আলতো ছোঁয়। 'স্বর্ণা যা আড়ষ্ট!'

'অনীশও নার্ভাস! কিছুটা।', বিমানের স্বরে কপটতা।

মধ্যবয়সী রেজিস্ট্রার। রসিক, এবং বন্ধুও। 'আজকের চুক্তির ক্রমও তো প্রাথমিক শর্ত! ইন্ ফ্যাক্ট চুক্তিপত্রে এটা লেখা নেই।' চাপা স্বভাবে স্বর।

হেসে উঠল সকলেই।

এর পর একসময় পার্ক স্ট্রিটের ওয়ালডর্ফে খাওয়া-দাওয়া। গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি অনীশ আজ। স্বর্ণার অপছন্দ। সাধারণ মানুষের মতোই ট্যাক্সির বিলাসে কিছু সময় কাটানো। অনীশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যবয়সের সীমা পার করেছে বছর দুয়েক। স্বর্ণা এই চল্লিশের শেষ! মধ্যবয়সের এমন শুরুর যৌথ জীবন নিয়ে কোনও কৌতুক নয়। ওদের মধ্যে ছিল বিচিত্র সব কথার ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান। এতদিন ছিল অনীশ আর স্বর্ণার মধ্যে স্বাদহীন শূন্যতা। আজ ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে সই-সাবুদ, কিছু শপথ নেওয়ার পর থেকে এতদিনের শূন্যতার একটা চেহারা অনুভব করে অনীশ। স্বর্ণার নীরবতা বুঝি তারই সমর্থন। আর এক চাপা উল্লাস, স্বস্তি-শান্তি আড়ালে অনুভব করে বিমান, পৃথা—দুজনেই! অনীশ-স্বর্ণার নতুন দ্বিতীয় সন্ধি—প্রত্যেকের দিক থেকে।

এসব অনীশ বিমান-পৃথার মুখ দেখে বুঝেছিল। বিমান পৃথাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে যাবে। অনীশ স্বর্ণাকে নিয়ে যাবে এ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে। তুমুল বৃষ্টি নামার আগেই ওরা সেইমতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একটু আগে বাইরে ডিনার খেয়ে ফিরেছে অনীশ স্বর্ণাকে নিয়ে। বৃষ্টির জন্যে বেশ রাত হয়েছে ফিরতে। রাস্তায় জমা জল, জ্যাম, অনীশের ফ্ল্যাটে ফিরে স্বর্ণা বেশি কথা বলেনি। নিজের নির্দিষ্ট ঘরে নিশ্চুপ। অনীশ ওর ঘরের ডিম লাইট জ্বেলে এমন বৃষ্টির মধ্যে বুঝিবা আর এক শূন্যতাকে উপভোগ করতে চাইছে।

বজ্রপাতে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ আর দুরন্ত হাওয়া সমুদ্রের আছড়ানো উল্লাস কানে আনে। অনীশ ভাবনার ভার ঠেলে যেন ভেসে ওঠে।

স্বর্ণা মাঝখানের দরজা ঠেলে অনীশের ঘরে ঢোকে। দূরে দাঁড়ায়। 'ঘরে বৃষ্টির ছাট্ আসছে না তো?'

অনীশ দূরে তাকায়। 'উঠে এলে?' কিছু সময় চুপ। 'তোমার কি ঘুম আসছে না?'

'আসবে।' স্বর্ণার গলা উদাসীন। 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? এত শব্দ!'

'না।' অনীশ নীল আলোয় দেখে। রাতের পোশাকে স্বর্ণার টান টান চেহারা নতুন করে এক রহস্যময় আলো ফেলে। 'অসুবিধে হলে বোলো।'

স্বর্ণা পাশের ঘরে আড়াল হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে অনীশের পূর্বাকে মনে পড়ে যায়। পূর্বা, আগের স্ত্রী। আজকের রেজিস্ট্রির আগে পর্যন্ত কদিন ধরে অনীশের মধ্যে যেভাবে পূর্বার কথা মনে হচ্ছিল, সেই শূন্যতার নৈঃশব্দ্য এখন সামনে পাথরের মতো অনড়। কঠিন রক্ষণশীল এক পুরুতবাড়ির মেয়ে পূর্বা। অনীশের বাবার পছন্দ। পূর্বা এসে অনীশের সমস্ত বিশ্বাস, বিবেক, সক্রিয়তা, জীবনের মানে—সব স্ত্রীর সম্পত্তি অধিকারের যুক্তিতে কেড়ে নিল। বিয়ের পর এমন মেয়েদের প্রথম কাজ এটাই। সন্দেহ, ঈর্ষা, অধিকারবোধ পূর্বার রক্তে ছিল হিমোগ্লোবিনের মতো। বিয়ের কদিন পরেই এক রাতে বাড়ি ফিরতেই পূর্বার প্রশ্ন, 'আজ কার সঙ্গে রাস্তায় বেড়াচ্ছিলে? মেয়েটা কে?'

এর উত্তর কী দেবে? তখনো কোম্পানির বড় পদ পায়নি অনীশ। এখন যেমন কোম্পানির একজন ডাইরেক্টরের সমান এক্সিকিউটিভ। তবু অফিসের ইয়াং যুবক-যুবতীদের নিয়ে ওর কাজ, ব্যস্ততা! সিঁড়ির ওপরের ধাপগুলোয় পা রাখার চাঞ্চল্য!

পূর্বার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

আবার একদিন, অন্য অনেক দিনের মতোই, প্রশ্ন, 'আর একটা বিয়ে করেছ বুঝি?'

'মানে!'

'বইমেলায় এক ম্যারেড মেয়ের সঙ্গে ঘুরছিলে যে! কে সে? মেলায় যাবে, আমাকে তো বলনি!'

অনীশের মধ্যে এতদিনে একটা গহ্বর তৈরি হতে শুরু করেছে। শূন্যতার, নিঃসঙ্গতার। মেয়েদের কাছে স্বামী মানেই অধিকারে ধরে রাখার মতো মূল্যবান সম্পত্তি। সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ভয়েই এমন আক্রমণ। আক্রমণ অনিশ্চয়তার, অনিয়মের, মিথ্যার মাটি ছুঁতে থাকলেও দাবি জোরালো করায় ক্ষান্তি নেই। আর এমন কথায় হেরে যাওয়ার অবস্থা যখন আসে, তখনি পূর্বার শরীরী পৌরুষ নয়, নিছক শরীর হয়ে ধরে রাখার তৃণাচ্ছাদিত জমি। আজ রেজিস্ট্রির মধ্যেই অনীশ নির্ভুল লক্ষ্য করেছে স্বর্ণার শরীর। পূর্বার সঙ্গে কোথাও তার মিল,

কোথাও বা বড় ধরনের অমিল। যে কোনও সময়েই হোক, বিয়ের আগে শরীরী পৌরুষের অপব্যবহার স্বর্ণার কাম্য নয়। তাই স্বর্ণার শরীর জীবন গড়ার মতো সুস্থ জমি—ফসলের সব সার সেখানেই। বীজ থেকে যে ফুল-ফল সবুজ পাতা, পাখিদের বাসার কোটর তৈরির শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হয়, পৃথিবীর জমিতেই তার সার, শ্রেষ্ঠ উৎস। স্বর্ণার শরীর তা-ই—পৌরুষে চুম্বক। পূর্বার ছিল শুধু শরীর—সবরকম নিবেদনের অনড় ঘট।

যা চেয়েছিল পূর্বা, তা-ই হল। পূর্বা জন্ম দিল তার প্রথম সন্তানের, কিন্তু নবজাতকের মৃত্যু ঘটনা পূর্বাকে পাগল করে দিল। ঠাকুরঘর, মন্ত্রপাঠ, জপ-তপ সব মিলে মিশে এক অদ্ভুত সংস্কার তাকে ঠেলে দিল আর এক দিকে। সেই মৃত সন্তানের স্মৃতিতেই সব সংস্কার, সব বিশ্বাসের আরতি। যেন পূর্বা শোধন করল হাতের নীলার আংটি, তাগা-তাবিজ, উপবাস, দেয়ালের তিরিশটা দেবতার সিঁদুর লেপা ছবি! আর এরই মধ্যে স্বামী অনীশের প্রতিদিনের জীবনে অবিশ্বাসের, সন্দেহের বিষজর্জর ব্রত-পালন।

অনীশ নির্ঘুম চোখে ঘরে চোখ বুলোয়। যে শূন্যতায় তার এতদিনের অসহায় দীক্ষা—তারই মধ্যে পূর্বার জীবন হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে শেষ! ভাবনার মধ্যেই বুকে একটা চাপ অনুভব করে অনীশ। বাইরে হাওয়া তেমন জোর নয়। শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমক। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও অনেক সময় যে স্মৃতির বেদনায় রঙ ধরায়, এই মুহূর্তে অনীশের সেরকম এক উপলব্ধি দেখা দেয়। সামনে ভাসে স্বর্ণার মুখ। ওর অফিসে পৃথা আসে একটা পদের প্রার্থী হিসেবে ইন্টারভিউ দিতে। ম্যারেড। চাকরিটা হয়ে যায় অনীশের চেষ্টাতেই। পৃথার সূত্রেই স্বর্ণার সঙ্গে একদিন আলাপ। স্বর্ণা কলেজে পড়ায়। ডিভোর্সী। একা থাকে উত্তর কলকাতার এক ফ্ল্যাটে। অনীশ তখন এত উদাসীন, এত অন্যমনস্ক আর শূন্যতার শিকার যে স্বর্ণার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেও অদ্ভুত নির্বিকার!

কিন্তু স্বর্ণার শরীর ওকে পূর্বার কথা মনে করায়। ভীষণভাবে! পূর্বার শরীর ছিল টান টান, কিন্তু পৌরুষ ছিল না। স্বর্ণা নয়, স্বর্ণার শরীর ক্রমশ যেন হিংসা তৈরি করে অনীশের মনে। হিংসা এক প্রতিহিংসা তৈরি করে। স্বর্ণা তার আশ্রয়। শরীরের এত সৌজন্য তার লাবণ্যকে সামনে আনে, কোমর থেকে নীচের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এমন এক বেতের টানা মাধুর্য তুলে ধরে, আঁচল ঢাকা বুকের দুই স্তনে এত গভীর রুচি শ্রী ভব্যতার মোহ তৈরি করে, এতটুকুও অশালীন মনে হয়নি স্বর্ণাকে। স্বর্ণার মধ্যে কোনও আকর্ষণ তৈরি করতে হয় না, যা পূর্বা প্রতি রাতে তৈরি করত। স্বর্ণার দুপাশের চিবুকের ত্বক ঢাকা নরম দুটি হাড় যেন চুম্বনের ঠোঁটকে ঠেলে দেয় ওর ঠোঁটের ওপর অবলীলায়, আর স্বর্ণার আয়ত কালো চোখের উন্মুখ কথা ওর ঠোঁট দুটোকে চুম্বকের সহজতায় শুইয়ে রাখে ভালোবাসার পুরুষের সামনে!

এইসব দেখতে দেখতেই ক্রমশ অনীশের মধ্যে জমে ওঠা শূন্যতার, এতদিনের নিঃসঙ্গতার পাথর গুঁড়ো হতে থাকে। মেয়েদের শরীর সম্পর্কহীন মানুষকে কাছে আসার বিশ্বাস জাগায়। সম্পর্কশূন্য কোনও পুরুষকে সম্পর্ক তৈরির শপথ শেখায়। স্বর্ণা সেইরকম।

রেজিস্ট্রির আগে শেষ দেখা হওয়ার দিন ছিল এমন এক রেস্তোরাঁতেই। এমন বৃষ্টিহীন মেঘলা দিন। অনির্দিষ্ট অচেনা বাতাস ছিল চারপাশে।

স্বর্ণা বলল, 'আমরা ঠিক করছি কিনা বুঝতে পারছি না।' স্বর্ণার চোখ টেবিলের খাদ্যতালিকার ওপর।

অনীশ গভীরভাবে স্বর্ণাকে দেখে। বোঝে, স্বর্ণা দুজনের বিশ্বাসের ওপরেই প্রশ্ন রাখতে চাইছে! শুধু বিশ্বাস নয়, আত্মবিশ্বাসের শক্ত দেওয়াল ভেঙে দুজনেই আজ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে! সেদিন অনীশ স্বর্ণার সামনে এসেছিল এতদিনের নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার শেষ অংশের কিছুটা সহনশীল করার বাসনা নিয়ে। স্বর্ণার স্বরে তার প্রতিশ্রুতি নেই কেন?

অনীশ বলল, 'আমাদের মনে হয় জটিল মাকড়সার জালটা থেকে এবার বেরিয়ে আসা জরুরী।'

'বেরিয়ে এসে দুজনে কোথায় দাঁড়াব?'

দাঁড়াবার মতো বয়সের অক্ষমতার কথা বলতে চায় কি স্বর্ণা? কোনও ইঙ্গিত? মধ্যবয়সে স্বর্ণা এখনো পূর্ণ ব্যক্তিত্বের নারী শুধু নয়, রমণী। আর অনীশ নিজে একজন পুরুষ। একজন পুরুষের শরীরী পৌরুষ কি হারিয়েছে অনীশ? না। স্বর্ণার কি আইনি বা সরকারি সহবাসে রুচি নেই? তা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়? কোথায়?

'আমাদের প্রস্তুতি তো খোলস!'

স্বর্ণা তাকায়। অনীশকে পূর্ণ চোখে দেখে। 'খোলস থেকে বেরুবার সময়টা কি সম্পর্কের দামে অনেক বড় অর্থ পাবে? আমার তো ভয় হয়।'

অনীশ হাসে। 'তুমি তো তোমার ফ্ল্যাটে থাকছ না?'

স্বর্ণা এবার সচ্ছল হয়। 'কাছাকাছি থাকাটা যদি পুরনো ক্লান্তি আনে? আপনি সামলাবেন?'

এখনো স্বর্ণা অনীশের সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধনে আসতে পারছে না এই মাসছয়েকের পরিচয়ের শেষ স্তরেও। অনীশ দু'চোখ ভরে দেখে স্বর্ণাকে। ছ'মাসে সংযত কথায় অনেক বিরোধিতা করেছে ও অনীশের। নিজের নিঃসঙ্গতাকে করেছে অনড়। বিশ্বাস, নির্ভরতা, দায়বদ্ধতার মাটিকে শক্ত হতে না দিয়ে স্বর্ণা যে আড়াল করতে চেয়েছে, কথায় কথায় অনীশ তা বুঝেছে। জোর খাটায়নি অনীশ। নিজেরও তো একটা শূন্য গহ্বর আছে চেতনার শেষ স্তরে! আজ রেজিস্ট্রির পরেও অনীশের মনে দোলাচল।

অনীশের মনে হয়, স্বর্ণা এতকাল পুরুষহীন জীবন কাটিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় নীরব হয়ে গেছে। এগোতে ভয় পায়।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ নেই। শুধু দামাল হাওয়া। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোয় চারপাশের অন্ধকার বুকচাপা ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তরল মন্থর পাথর। সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়।

'এখনো ঘুমোওনি?' আচমকা বারান্দার ওকোণে স্বর্ণাকে দেখে।

স্বর্ণা ওর দিকে তাকায়, 'ভাবছি একটা ঘুমের বড়ি খাব।'

'পুরনো অভ্যেস ছাড়।' অনীশের যেন বা উপদেশ, কিছুটা অনুরোধ।

'এখনো খাইনি।' স্বর্ণা নিজের ঘরে ঢোকে।

স্বর্ণাকে কেমন রহস্যময় মনে হয় অনীশের। এক অদ্ভুত অসহায়তা অনীশকে জড়িয়ে ধরে।

স্বর্ণা বিছানায় এসে শোয়। ঘুম নেই চোখে, ঘুম এতটুকুও নেই সারা শরীরের কোথাও। কেমন টান টান এক উত্তেজনায় স্বর্ণা ভিতরে ছটফট করে। তীর্থঙ্করের সঙ্গে পরস্পরের মিউচুয়াল ডিভোর্স নিয়ে সরে আসার পর স্বর্ণাকে যে এই এক নৌকোয় নাবিক হতে হবে, ভাবেনি কোনওদিন। ওপরের ঘুমের পাতলা পোশাকটুকু ছাড়া স্বর্ণা ভিতরের সব এক এক

করে খুলে ফেলে। যদি ঘুম আসে! ওর একার ফ্ল্যাটে এসবের প্রয়োজন ছিল না। ছিল শান্তির, স্বস্তির, নিঃসঙ্গতার সুখের ঘুম। ঘুম সেখানে স্বার্থপর। আজ এত যন্ত্রণা কেন?

তীর্থকে বিয়ে করার পর থেকেই মাস দুয়েকের মধ্যে স্বর্ণা বুঝেছিল ওকে একাই থাকতে হবে। তীর্থ গোপন করেছিল বলেই জ্বালা ছিল স্বর্ণার। পুরুষমানুষ অন্য মেয়ের কাছে যেতেই পারে, কিন্তু গোপন করা কেন? স্বর্ণা তো কোনও অনুযোগও করেনি! শুধু সম্পর্কের শ্রী আর পরিচ্ছন্নতা বোঝাপড়ায় বাঁচাতে চেয়েছিল।

'শোনো।' একদিন বিছানায় তীর্থ পাশে শুয়ে স্বর্ণার রাতের পোশাকের শিল্কের লেস খুলছিল। এটাই ওর ভালোবাসার প্রথম ধাপ। স্বর্ণা বলল, বাধা দিল না, বরং বললই, 'আমি একা থাকতে ভালোবাসি।'

'আমার স্ত্রী তুমি। আমার বউ।' শেষ দুটো শব্দ তীর্থের স্বর আদর মাখানো অন্তরঙ্গতায় ভেজা।

'মঞ্জু তোমার কে?' স্বর্ণা, মাস দুয়েক ধরে জেনেও যা বলতে পারেনি, বলল এতদিনে। এতদিন পরে না বলে থাকতে পারছে না বলেই। সারা শরীর মন জ্বলছে ওর।

তীর্থর হাত স্বর্ণার পিঠে থেমে যায়। 'কে মঞ্জু!' স্বরে বিস্ময়, তাৎক্ষণিক অস্বীকার! 'তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে ভাবতেই পারি না।'

'তোমাকে আমার ঘৃণা হয়।'

'হঠাৎ!'

'তর্ক আমার ভালো লাগছে না।' থামে স্বর্ণা। 'বিনতাকে কবে ছাড়লে?'

তীর্থ স্বর্ণার পিঠ থেকে হাত সরায়। শিথিল হাত স্বর্ণার পিঠ বরাবর বিছানায় শোয়ায়।

'নোংরা কথা বোলো না। তোমাকে মানায় না।' তীর্থ স্বর কঠিন করে। যেন শাসনের ভয় দেখিয়ে উপেক্ষার তুচ্ছতায় স্বর্ণার তদন্ত বন্ধ করতে চায়।

স্বর্ণা এবার শরীর শক্ত করে। ঠেলে সরাতে চায় তীর্থকে। সরাতে পারে না। 'বিনতার আগের মেয়েটিকেও আমি চিনি। সে আমার ছাত্রী। এম. এ. পড়ে। ভদ্রা।' স্বর্ণা চুপ করে যায়। 'এত নীচে নামতে পারছ?'

তীর্থ নীরব থেকে কিছু ভাবে। স্বর্ণার আক্রমণের অস্ত্র তৈরি করে। 'এসব দিয়ে কী বোঝাতে চাও?'

'আমি একা থাকতে চাই।'

'থাকতেই পারো!'

'ডিভোর্স।'

'কোর্টে কেস টিকবে না।' একটু থামে তীর্থ। 'মেয়েদের সঙ্গে মিশলেই স্বামী করাপ্টেড প্রমাণ করা যায় না।'

আর কোনও কথা হয়নি সে রাতে। তবু স্বর্ণা নিজের কাছে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। তীর্থকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকার ছাড়েনি। আইন নয়, পরস্পর পরস্পর কথা বলেই স্বর্ণা একা হয়ে যায়। তীর্থর বাবার কাছ থেকে পাওয়া বিরাট সম্পত্তি থেকে ফ্ল্যাট আদায় করে। সেখানেই একা এই কটা বছর কাটায় স্বর্ণা। কে জানত এমন ফ্ল্যাট-এর ব্যবস্থার পিছনে তীর্থর আরও গোপন খেলার বাসনা ছিল! পুরুষরাই বুঝি ভালো খেলোয়াড় হতে জানে।

সংসার ছেড়ে ডিভোর্স নিয়ে স্বর্ণার এমন একার জীবন, চাকরি, দিনযাপনকে শান্তি-

স্বস্তির হতে দেয়নি তীর্থ। রাতে দরজায় ধাক্কা দিত। যেন সে স্বর্ণাকে দিয়েছে রক্ষিতার মূল্যবান সম্পদ-সম্পত্তির জীবন। সেখানেও তীর্থকে ভিখিরি করে রেখে একসময়ে ঘৃণায় নয়, করুণায়-অনুকম্পায় অনেক দূরে নির্বাসন দেয়। নির্বাসন স্বর্ণার মনের শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। ভোগ, অর্থ, শরীরী চাহিদা দিয়ে তীর্থ জয় করতে চেয়েছিল তার সব বাসনার লক্ষ্যকে। পারেনি স্বর্ণাকে তার জয়ের স্বভাবে ধরে রাখতে।

আর তীর্থ ওর জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে যাওয়ার, মুছে যাওয়ার পরেই স্বর্ণা বোঝে ও কত নিঃসঙ্গ, শূন্য এক মানুষ। সঙ্গীহীন জীবন। ধরাবাঁধা চাকরির জীবনে নিজেকে বেঁধে রাখতে রাখতে যখন হাঁফ ধরে স্বর্ণার, তখন বোঝে, তার বাঁচার কোনও মানে নেই! কোথায় তার আশ্রয়। কারোর চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নেই তার, সেই শপথে; সেবায় তার জন্ম নয়, কিন্তু সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে রাখার একটা দায়বদ্ধ জীবন-চেতনা তো তার দরকার। এই অবস্থাতেই পৃথার সূত্রে অনীশ এলো। জীবনের একটা মানে আছে, তা ভুলেই গিয়েছিল, বা বলা ভালো, ভুলতে চেয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় ভুলকে ঠিক করে নিয়েছিল স্বর্ণা। তাই অনীশ আসার পর স্বর্ণা কেন যেন নড়ে-চড়ে উঠতে পারেনি!

একটা তীব্র অস্বস্তি স্বর্ণার মধ্যে সরু লিকলিকে সাপের স্বভাবে নড়েচড়ে ওঠে। এক ঘোরে স্বর্ণা ডুবে ছিল। সহজ নিদ্রাশূন্য হতেই শুনলো চারপাশে বিজবিজ বৃষ্টির শব্দ। ধীর স্থির শুয়ে রইল। ওর সেই নিজের ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। ওটা কি আর খোলার দরকার হবে? ওখানে যাওয়ার? না। না। নিজের মধ্যেই স্বর্ণার যেন উত্তর ঠেলে ওঠে। বালিশের ওপর মাথা নাড়ে এপাশ-ওপাশ।

সোজা হয়ে বসে স্বর্ণা। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বিছানা ছাড়ে। বারান্দায় আসে। নাকে আসে পোড়া সিগারেটের গন্ধ। তীব্র। একটু আগে, বা এখনি বুঝি অনীশ ওর ঘরে গেছে! স্বর্ণা অনীশের ঘরে আসে নিঃশব্দ পায়ে।

অনীশ শব্দহীন শুয়ে থাকে।

'ঘুমোলে!' এই প্রথম স্বর্ণা মধ্যমপুরুষে প্রশ্ন করে অনীশকে।

'না।' যেন অনীশ তৈরি হয়েই ছিল এই ডাক শোনার। 'এসো।'

স্বর্ণা চলে আসে অনীশের পাশে। টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। ডিম নীল আলোয় দুজনের প্রতীক্ষা। কোনও কথা নেই। নিথর, শব্দহীন, বাক্যহীন দুই অপরিচিত মানব-মানবী। বিপরীত দুই প্রান্ত থেকে পথ পিছনে ফেলে রেখে মুখোমুখি। জীর্ণ বসন ত্যাগ আর নতুন বস্ত্র গ্রহণের মাঝামাঝি অবসরে দুই শরীর, শুধু শরীর! দুয়ের মধ্যে অনেক দিনের শুকনো খাদ। অন্ধকার পাতলা ইস্পাতের মতো। চারদিক থেকে বৃষ্টির ভেজা শব্দ, ধ্বনি, মর্মর আভাস। খাদের মাঝখান ভরাট হতে থাকে। কখন বাইরে নতুন করে মেঘগর্জনের দিগন্ত ছোঁয়া তোড়জোড়, বিদ্যুতের চকিত পা-ফেলা, বর্ষণের তুমুল উথাল-পাথাল!

এমন বৃষ্টির মধ্যেই তো আদিম অরণ্যের মাটিতে পড়ে বীজ। অন্ধকারে তার লালন, বিকাশ, বৃদ্ধি, ফুল-ফলের জন্ম। গাছের মাথায় পৌঁছেও থাকে আকাশের আকর্ষণ, বাতাসের লুকোচুরি শাখা-প্রশাখায়, পাখিদের সমবেত স্বরে। মাটি আর আকাশের মাঝখানে সেই সেতুবন্ধ!

অনীশ-স্বর্ণা শক্ত মাটির বাঁধ-ভাঙা বন্যার শক্তিতে নিশ্চেতন জড়িয়ে যায়। পৌরুষের উর্বরতা পায় শিশির-স্বভাব। সারা ঘরে ছড়ায় নতুন দৃপ্ত পৌরুষের স্মৃতি-বিস্মৃতির ঘ্রাণ!

# অমরেশদা জিন্দাবাদ

সুদর্শন সেনশর্মা

অমরেশ টিভির দিকে তাকিয়েছিলেন। পর্দায় তখন পুলিস বেআইনি ঝুপড়ি ভাঙছে। তার ছেড়ে আসা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পেছনের দিকে বেআইনি নির্মাণের এক বাসিন্দা সদ্যভাঙা বাড়ির জঞ্জালের ভিতর থেকে নিজেদের জিনিসপত্র উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এই কাজটা অমরেশ করে আসতে পারেননি। সামনে তখন নির্বাচনও ছিল। যা হয়, কাজে হাত দিয়েই তাকে হাত গুটিয়ে উঠে আসতে হল। অমরেশ ব্যানার্জির ঠোঁটের কোণায় হাসি। দু'মাসের মধ্যেই হাসপাতালে একটা ত্রাহি রব উঠেছিল...এ লোকটা খুব বেশি দেখছে যে!

বিভাগীয় সভায় একদিন সুমেরু ভট্টাচার্য নামের এক শল্য চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন, আমরা চাই, আপনাকে দেখে আমাদের ভুল ভাঙুক।

অমরেশ পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, বলুন তো একজন হাসপাতাল-অধীক্ষকের সাফল্যের চাবিকাঠি কী?

ডাঃ কোনার হাত তুলেছিলেন, আমি বলছি স্যর, রাগ করবেন না। যা দেখি তাই বলব? না যা দেখা উচিত তাই বলব?

অমরেশ ব্যানার্জি তাঁর চেয়ারে বসে হাসিমুখে বললেন, দুটোই বলুন।

কোনার বললেন, যা দেখছি—এতদিন তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। অধীক্ষকদের অর্ধনারীশ্বর পর্যায়ে নেমে আসতে হচ্ছে, পরিচালন সমিতির ঢাকে কাঠি দিয়ে যাওয়া, হাসিমুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আজগুবি লোকেদের ডেপুটেশনে বসে থাকা। হাসপাতালের বাস্তুসাপদের, ঘুঘুদের একদম না ঘাঁটানো, বরঞ্চ তোল্লা দিয়ে যাওয়া...তাহলেই আপনি থাকলেন...নয় তো—

সুমেরু এবং ডাঃ কোনারদের আশ্চর্য করে দিয়ে অমরেশ বলেছিলেন, বাস্তুসাপ এবং ঘুঘুদের শনাক্ত করিয়ে দিতে কিন্তু আপনাদের ডাকিনি। আপনাদের ভাবনার আমি মূল্য দেব...আপনারাও আমার পাশে থাকুন...দুটো মাস যেতে দিন তারপর দেখুন কী হয়...তখন বলবেন যা দেখা উচিত তাই দেখছেন কিনা...কেমন? জঞ্জাল একরডিং টু প্রায়রিটি সরিয়ে দেব, দেখবেন প্রমিস...

সত্যি তো নতুন পরিবেশে সব কিছু বুঝেসুঝে নিতেও তো কত সময় লাগে। কত বড় হাসপাতাল যার এতগুলো বহির্বিভাগ। শয্যা সংখ্যা দু'হাজার হলেও ভর্তি থাকে আরও অনেক রোগী। কতগুলো বিভাগ! কত অপারেশন থিয়েটার! প্রতিদিন লাগোয়া রেল স্টেশনের প্রধান এবং দক্ষিণ ফটক বাহিত কয়েক সহস্র পীড়িত এই হাসপাতালে ভিড় করে। যে হাসপাতালে ইলেকট্রিক বিল দিতে হয় মাসে চোদ্দ লাখ টাকা—সে হাসপাতালে সরীসৃপ থাকবে না হয়! চোর ডাকাত থাকবে না হয়! সুমেরুরাও তো একবছরে কম দেখল না।

—আমি একটা গল্প বলি স্যর, একজনের কথাও এ প্রসঙ্গে বারে বারে আসবে। গল্প কেন ইটস এ ফ্যাক্ট। সুমেরু বলে উঠল।

এই হাসপাতালে দ্বিতীয় দফায় আমার বছর তিনেক হতে চলল। শীত গ্রীষ্ম ছ'ঋতুতেই রাতে ডিউটি না থাকলেও সকাল হয়ে ওঠা, ভোরের আলো ফোটার ব্যাপারটা তারিয়ে দেখা আমার শখ বলতে পারেন। অন্ধকারে ভুল করে একটা পাখি ডেকে উঠল। কোলে মার্কেটের রাতের ব্যস্ততা আস্তে আস্তে শেষ রাতের নিথর নৈঃশব্দে লীন হতে থাকে। হাসপাতালের উল্টোদিকের রাতের বেপারিদের তখন একটা ঝিম মারা ভাব। তারা দোকান তুলছে তখন। আমি ইমার্জেন্সি ঘুরি। কোনও দুর্ভাগা রোগী হয়ত দেখি শেষ ঘুম ঘুমোচ্ছে ইমার্জেন্সির টেবিলে...আসলে সে হতভাগ্য তো 'ব্রটডেড' তকমা পেয়ে গেছে। অন্য হাসপাতালও হয়ত তার ঘোরা। সেখানে হয়ত বেড ছিল না। ইমার্জেন্সি-ভর্তির দায়িত্বে থাকা সহকর্মীকে হয়ত জিজ্ঞেস করি কী হয়েছিল...সে হয়ত বলবে ইনি তো মৃতই এসেছিলেন। কিন্তু এর পরেই যে গ্যাস্পিং অবস্থায় এলেন তাকেও তো...ইঞ্জেকশন, অক্সিজেন দিয়ে ট্রলির খোঁজ করে দেখা গেল পান্না নেই। তার শাগরেদও নেই। ভর্তি করবে ডাক্তারবাবু আর ট্রলি থাকবে পান্না ওয়ার্ডমাস্টারের জিম্মায় এতো হয় না স্যর। পান্নাকে ভোরের শেয়ালের মতো কতদিন টেলিফোনের ঘর থেকে বেরতে দেখেছি। নিশ্চয়ই সেদিন তার ডিউটি ছিল সেই অপারেটরের...যিনি ডাক্তারদের কথা ওয়ার্ডমাস্টারকে জানিয়ে দিতেন। তিনতলায় আমার কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে আমি পান্নার বাজারের ব্যাগের মুখটা দেখতে পেতাম...আমরা অনেকেই দেখতে পেতাম—ব্যাগে ইলিশ বা ভেটকি ছাড়া কোনও মাছ...কী দেখেছি...স্যর একদিন ইমার্জেন্সিতে সবে রাতের ডিউটিতে ঢুকেছি হৈ চৈ করতে করতে শেয়ালদা স্টেশন থেকে দুজনকে নিয়ে এলো, দলে রেল মজুরদের দু'একজন, নিত্যযাত্রীদেরও কেউ কেউ ছিলেন হয়ত। প্রথমজন মৃত। সারা শরীরে বাইরে কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু একদম সাদা। ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। শেয়ালদা স্টেশনে ডাউন ট্রেন ঢুকছিল। ঐ দুজনই তাসের দলের। স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে স্পিড তখনও কমেনি...এই ট্রেনটাই আপ হয়ে কৃষ্ণনগর যাবে—ট্রেনে জায়গা রাখতে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অসাবধানে দুই কামরার মাঝখানে। যা বলছিলাম একজন মৃত। ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। শরীরের বাইরে কোনও আঘাত নেই। অথচ শেষ। ক্রাশ ইনজুরি। ভেতরের সবকিছু নির্ঘাৎ মণ্ড হয়ে গেছে। লোকটির পকেটে তিন বাণ্ডিল তাস। খুচরো পঁয়ষট্টি টাকা। নতুন অফিসে জয়েন করায় বোধহয় অন্য অফিসের লাস্ট পে সার্টিফিকেট। যে বেঁচেছিল তার ডান ঊরুসন্ধির এক বিঘৎ নীচ থেকে ডান পাটা আর চেনা যাচ্ছে না...অনেকইটাই নেই...লোকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কপালে ঘাম...ক্ষীণ কণ্ঠে, অস্ফুটে জল জল করে ঠোঁট চাটছিল। ইঞ্জেকশন দিয়ে, ইমার্জেন্সি স্লিপে ওটিতে পাঠাব ট্রলি নেই। বিচ্ছিরি বিজি ইমার্জেন্সি শুরু থেকেই। অথচ ট্রলি নেই। জিম্মাদার ট্রলির, ওয়ার্ডমাস্টার চুনী পান্না নেই। তার শাগরেদ নেই যার হাতে ট্রলির ঘরের চাবিটা থাকে। ওয়ার্ডমাস্টারের কোয়ার্টারে ফোন করা হল—কোয়ার্টার থেকে বলে দেওয়া হল উনি হাসপাতালেই আছেন। সেন্ট্রাল ওয়ার্ডমাস্টার অফিসে নেই...ফোন কেউ ধরছিল না...টেলিফোন অপারেটরকে বলা হল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওয়ার্ডমাস্টারকে ধরে দিতে...তিনি তার গজদন্ত বের করে হাসতে হাসতে বললেন, ওকে এখন পাবেন না... ইউনিয়ন অফিসে উনি ব্যস্ত আছেন...

কয়েকজন মিলে ইমার্জেন্সির ভাঙা ট্রলিতে ভদ্রলোককে ওটিতে দিয়ে এলো। ওয়ার্ডে কোনও বেড নেই...অপারেশন শুরু হয়ে শেষ হতে হতে একটা ট্রলি অবশ্য পেয়ে যাব ততক্ষণে...

রোগী ওটিতে চলে যাবার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওয়ার্ডমাস্টার শ্রীচুনী পান্না ডাক্তারদের বসার জায়গায় ঢুকে অ্যাডমিশন অফিসারকে কৈফিয়ৎ নেবার ঢং-এ বলল—আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

—এতো ঠিক নয় মরণাপন্ন রোগীর জন্য আমরা ট্রলি পাবো না...ভর্তি করবো আমরা আর ট্রলির চাবি থাকবে আপনার কাছে...তা থাকুক সময়মতো ট্রলি পেলে...

—এইজন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন...ফোনেও তো বলতে পারতেন।

—ফোনে আপনাকে পাওয়া যায়নি...

—আচ্ছা একটা ট্রলি বের করে দিচ্ছি...

—ইমার্জেন্সি আজকে খুব খারাপ যাচ্ছে...এরপরেও যদি এরকম রোগী আসে?...অ্যাডমিশন অফিসারের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি...

চুনী পান্না ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, হুমকির ভাষায়—শুনুন, ট্রলি আমার এক্তিয়ারে। কাকে ট্রলি দেব বা দেব না, কখন দেব আমি ঠিক করব।

—ঠিক আছে—ইমার্জেন্সি অফিসার বললেন—আমরা উঠে যাচ্ছি, আপনি এখন আমাদের চেয়ারে বসুন...কালে কালে আরও কত দেখব! আপনার ঔদ্ধত্য দেখতে দেখতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি...সুপারের চেয়ারটা দখল করুন এবার...

চুনী পান্না খরচোখে আমাদের দেখল, তারপর ট্রলির ঘরটা খুলে একটা ট্রলি যেন দয়া করে বার করে দিয়ে গেল।

কেউ কেউ বলেছিল—চল কাল সুপারের কাছে যাব। আমি বলেছিলাম কিছু হবে না...সুপারই তো ব্যাটাকে তোল্লা দিয়ে দিয়ে...

আর মৃত ব্যক্তির জন্য 'ব্রটডেড' তকমা দেয়া ফর্ম ফিলাপ করে সেন্ট্রাল ওয়ার্ডমাস্টার অফিসে খাতা পাঠানো হল। বডি মর্গে যাবে। পোস্টমর্টেম হবে। ছটপুজোর রাত ছিল সেটা। ডোমেদের অলিখিত ছুটি। তাই সারারাত টেবিলে পড়ে রইলেন সেই ফ্যাকাশে একদম সাদা, দুই বগির মাঝখানে চেপ্টে রক্তক্ষরণ, ক্রাশ ইনজুরিতে মৃত নতুন অফিসে কাজে যোগ দেয়া প্রায় মধ্যবয়সী। পকেটে তিন প্যাকেট তাস। পঁয়ষট্টি টাকা, লাস্ট পে সার্টিফিকেট। সুমেরু ফিস ফিস করে বলেছিল অ্যাডমিশন অফিসারকে, সিনেমা হলের পাশের মিষ্টির দোকানের দেয়াল ঘেঁষে খাতা পেন্সিল বিক্রি করে যে ছেলেটি—সে একদিন দুপুর একটা নাগাদ তার ফিমার ভাঙা বাবাকে নিয়ে এলো। সার্জারি, অর্থোপেডিক কোথাও সেদিন বেড নেই...লোকটাকে বললাম দুটো অব্দি অপেক্ষা করুন—দুটোর পরে একটা বিছানা খালি হবার কথা...আপনার বাবার ঊরুর হাড় ভেঙেছে, ভর্তি জরুরি...আমি আমার পরের জনকে বলে ঠিক ভর্তির ব্যবস্থা করে যাবো।

আমাকে দেড়টার সময় দোতলায় ওটিতে একবার যেতে হয়েছিল, ফেরার পথে দোতলার ওয়ার্ডে তাজ্জব হয়ে দেখি একটি বিছানায় লোকটার বাবা শুয়ে পড়েছে। সে লোকটা একগাল হেসে বলল, বাবু ভত্তি হইয়ে গেসে। তাকে আমি চেপে ধরলাম কী করে ভর্তি হল আমায় বলো—কত খরচ হল তোমার—ভর্তি তো আমার করার কথা—কে করে দিল?

সে দু'পাটি দাঁত বার করে বলল, বাবু সেই কবে থেকে আপনি আমার দোকানের কাগজ কিনেন। লেকিন ভত্তি করতে তো পারলেন না। এখন দিমাক খারাপ করে কী করবেন? ক'দিন বাদ আমার পরিবারকে ভি ভত্তি করতে হবে। এখন আপনাকে বলিয়া দিলে...তুখন?

মৃত ব্যক্তিটির বাড়ি কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি কোথাও। ভোর পাঁচটায় একটা ফোন এলো। এক মহিলার কান্নাভেজা গলা...আচ্ছা বরেন্দ্র নাগ বলে কেউ আপনাদের হাসপাতালে...কেমন আছেন...?

সুমেরুই ফোন ধরেছিল। বলল—আপনি কে বলছেন?

অনুমান নির্ভুল। ভদ্রমহিলা ধরা গলায় বলছেন ওঁর স্ত্রী আমি...খবর পেলাম না...কেমন...

ভোর পাঁচটার সময় নির্মম সত্যি কথাটা বলতে সুমেরুও পারল না। বলল—আপনার বাড়িতে আর কে আছেন তাকে দিন একটু...উনি ঘুমুচ্ছেন খুব...ঘুমিয়ে আছেন...

টেলিফোনের ওপারে কান্না। রিসিভার হাতবদল হয়ে গম্ভীর গলা ওপারে—আমি ওর দাদা বলছি আমরা সবাই...কী হয়েছে বলুন—প্লিজ...

সুমেরুর গলাও ধরে এসেছিল...আমি ওর মিসেসকে বলতে পারিনি জানেন...উই আর সরি...আমাদের কিছুই করার ছিল না—হি ওয়াজ ব্রটডেড...তাড়াতাড়ি চলে আসুন। মনোবেদনায় সুমেরু সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

নতুন একটা সকাল। অথচ কী বিবর্ণ এবং নির্মম এই মহিলার কাছে। যার স্বামী ইমার্জেন্সিতে মৃত অবস্থায় সারারাত পড়ে আছে...পকেটে তিন বাণ্ডিল তাস। কৃষ্ণনগরের মাসিক টিকিট। পঁয়ষট্টি টাকা...লাস্ট পে সার্টিফিকেট...এই সময়েই চুনী পান্না গট গট করতে করতে ঢুকে বিষণ্ণ নীরবতা ভেঙে চিৎকার করে উঠল, কী ভেবেছেন আপনারা—এই যে ডাক্তার ব্যানার্জি আপনি নাকি বলেছেন ট্রলি নিয়ে ব্যাওসা হয়। সকালে প্রতি ট্রলি হাজার টাকা...রাতে আরও বেশি।

সুমেরু বলল, দেখুন আমাদের মন মেজাজ এখন খুব খারাপ। পা মাড়িয়ে ঝগড়া করবেন না। তবে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—ট্রলি নিয়ে আমাদের একটা সন্দেহ আছেই...আমরা সুপারকে সে কথা বলেওছি...আবার জানাব তবে ট্রলি কত টাকায় বিক্রি হয় তা আমাদের জানার তো কথা নয়—ট্রলির চাবি তো আপনার কাছে থাকে তাই না।

ডাঃ কোনার বললেন, জরুরি বিভাগে আগে এক সুইপার ছিল বশিষ্ঠ বাল্মিকী...সব সময় নেশা করে টলতো আর ট্রলি নিয়ে যেতে বললেই বলত...যো কই হো হাম ট্রলি নাহি দেঙ্গে...একদিন আমাদের এক কলিগের জন্য ট্রলির প্রয়োজন হয়েছিল...সেদিনও আমাদের সেই মুমূর্ষু সহকর্মীকেও সে ট্রলি দেয়নি...

নতুন সুপার সোজা হয়ে বসলেন, কী নাম বললেন বশিষ্ঠ বাল্মিকী! রাইট?

সুপার হাসলেন, ও এখন তো নেই।

সবাই বলল, হ্যাঁ এখন দেখছি না। বেশ কিছুদিন। ও চুনী পান্নার খুব কাছের লোক ছিল...

—স্যর আপনার ফোন। স্টেনো ফোন ধরে সুপারকে ডাকলেন, অ্যাকাউন্টস সেকসনে প্রাণোজবাবুর কাছে এ. ও বসে আছেন। ইলেকট্রিসিটির। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

অমরেশ ব্যানার্জী বললেন, আমি চাই হাসপাতালটাকে নতুনভাবে দাঁড় করাতে। সাজাতেও। জঞ্জাল সওব দেখবেন খেদিয়ে দেব। ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার এসেছেন...একটা জরুরি মিটিং সেরে নেই কেমন?

—ও হ্যাঁ

অমরেশ ব্যানার্জি হাসলেন, আজ রাতের খাসখবরটা দেখবেন...

কী স্যর কী স্যর...

—আগে বলে দিলে...হয়েই গেল...

সবাই উঠল। নতুন সুপার বেল টিপলেন। দারোয়ান কার্তিক দলুই উঁকি দিল। সুপার বললেন প্রাণোজবাবুকে ভদ্রলোককে নিয়ে আসতে বল।

## দুই

ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার শ্রীরাধিকারঞ্জন মিত্র ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে অ্যাকাউন্টস-এর বড়বাবু প্রাণোজ ঘোষ।

সুপার সাহেব বললেন, বসুন, বসুন।

—আপনি আমায় তলব করেছেন? রাধিকাবাবু বললেন...

সুপার হাসছেন, সেকি আমি আপনাকে তলব করতে পারি! আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেয়েছি। আচ্ছা মিত্রমশাই আপনি খাসখবর দেখেন? সময় পান? আজকে একটু সময় করে।

রাধিকাবাবু বললেন, আচ্ছা দেখব...নতুন কিছু দেখাবে?

সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, দেখবেন কিন্তু ঠিক। আচ্ছা রাধিকাবাবু বলুন তো হাসপাতালের এ. বি. সি. ডি কী?

রাধিকাবাবু বললেন, আমি ইলেকট্রিসিটির এ. বি. সি. ডি কী বলার চেষ্টা করতে পারি। আপনার ধাঁধার উত্তর তো আমার দেবার কথা নয়!

ওয়েল, সুপার বললেন, আমি কিন্তু স্বাদেশিকতায় বিশ্বাসী—প্রাদেশিকতায় নয়...তবু বলছি ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের আর কেউ হাসপাতালের ছোট চাকরিতে ঢুকতে পারবে না। নার্সেস কোয়ার্টারের পেছনে ঝুপড়ি, হাউসস্টাফ কোয়ার্টারের পেছনে ঝুপড়ি—হাসপাতালের বাউণ্ডারি ওয়ালের বাইরে ঝুপড়ি, সবার ইলেকট্রিসিটি বিল হাসপাতাল মেটাবে তা তো চলতে পারে না। হাসপাতালের নীচের সারিতে জবরদস্তি পুরুষানুক্রমে পরিবার-তন্ত্র চলছে। দখলদারি চলছে। আপনি ইলেকট্রিসিটির লাইনটা কেটে দিন।

—এ. বি. সি. ডিটা তো বললেন না...

সুপার বললেন, আরা, বালিয়া, ছাপড়া, দ্বারভাঙ্গা—গ্রুপ ডি-তে এদেরই প্রাধান্য এখন। কাজে আসতেই পারে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে দিনে দিনে ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে সব।

—মুস্কিল হয়েছে কী-ডাঃ ব্যানার্জি, রাধিকাবাবুর গলায় দ্বিধা; অন্য কারুর বেলায় আমি হয়ত একমাসের বিলেই তারিখ মতো টাকা না পেলে নির্দ্বিধায় লাইন কেটে দিতে পারতাম। কিন্তু এটা হাসপাতালের ব্যাপার। আমাকে তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে। পর পর তিনমাস টাকা না পেলেই আপনাকে নোটিশ দেয়া হবে...

সুপার সাহেব উত্তেজিত হচ্ছিলেন—এই দেখুন কাশীপুরের আমার স্টাফ কোয়ার্টারে আমার বিয়াল্লিশটা ঘর। তার সাতটা ঘর জবরদখল। দুটো ঘরে কাশীপুরের দুই কুখ্যাত মাস্তান থাকে। আর পাঁচটা ঘর দখল করে আছে পাঁচ পুলিস—স্থানীয় থানার।

রাধিকাবাবু এইবার হাসলেন, এই তো সহাবস্থান চলছে—ঝুপড়ি নিয়ে আপনি আছেন আর কাশীপুরের কোয়ার্টারে মাস্তান নিয়ে পুলিস আছে।

সুপার বললেন, জানেন খবর আছে—কিচেনের মাছ মাংস বাইরে চলে যায়। এই মাছ, মাংসে রাস্তার ওধারের কিছু রোল সেন্টারে চিলি ফিস হয়, মাটন রোল হয়। হাসপাতালের ডাল-ভাত নিয়ে দক্ষিণ স্টেশনের প্লাটফর্মের হোটেল চলে...একমাসও হয়নি আমি এসেছি একটা কিং কোবরার দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হচ্ছে...ওটাকেই আগে, আর একটাকেও প্রায় ধরেছি...থাক ওসব থাক রাধিকাবাবু কাজের কথায় আসা যাক... আচ্ছা আমার কাশীপুরের স্টাফ কোয়ার্টারের কানেকশনটা প্রথম কেটে দিয়েই শুরু করা যাক না। পারবেন কাটতে? সুপার প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে এখন...

রাধিকাবাবু বললেন, কেটে দিলাম না হয়। তারপর উদ্ভূত পরিস্থিতি আপনি সামলাতে পারবেন? আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে না? তখন আপনি কিন্তু স্যার আপনার ওপরঅলার বকুনি খাবেন। সামনে ভোটটা না থাকলে তবু কথা ছিল...

—কী হবে?

—শুধু তো আপনার স্টাফ নয়। অন্য অনেকেই আছে। প্রথমেই ওরা জল, বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার জন্য বি টি রোড, কাশীপুর রোড অবরোধ করে দেবে। সকালবেলা। অফিস আওয়ারসে ভাঙচুর হবে...গাড়িটাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিল হয়ত, তিনটে ইউনিয়ন এই ইস্যুতে ফায়দা তোলার স্কোপ ছেড়ে দেবে ভেবেছেন?

সুপার ম্লান হাসলেন—আমি কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি কী বললেন জানেন আমি পুলিস দেব সে না হয় পাহারা দেবে। কিন্তু কাজ আপনাকেই করতে হবে। পুলিস কোনও ঝামেলায় যাবে না। এনকাউণ্টারে যাবে না।

—তবে বুঝতে পারছেন! রাধিকাবাবু বললেন।

বিষণ্ণ হাসেন সুপারিনটেনডেণ্ট, বলেন, বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে—বিল আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি—চোদ্দ লাখ টাকা ইলেকট্রিক বিল। আপনি দেখবেন রাধিকাবাবু আই মাস্ট গেট রিড অফ দিজ বাগারস্ এণ্ড ট্রেইটরস। আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ...আপনি তাহলে লাইন কাটলেন না।

দুজনেই হেসে হাল্কা হতে থাকেন।

## তিন

রাতে খাসখবরে দু'তিন মিনিট ধরে ছবি দেখাল। নতুন সুপারের বিবৃতি শোনাল—হাসপাতালের জন্য মাসে চোদ্দ লাখ টাকা ইলেকট্রিকের বিল পেমেণ্ট করতে হয়—তারপর ক্যামেরা দেখাল বৈদ্যুতিক তারের নানান জট—হাসপাতালের বিদ্যুৎ চুরির নানা ফিকির—হাসপাতাল থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে চতুর্দিকে। ঝুপড়ির আদল। দখলদারদের চেহারা। জীবনযাত্রা—অনেকেই বলল বেশ হয়েছে এবার নির্ঘাৎ ঝুপড়ি ভেঙে দেয়া হবে। লাইন কেটে দেয়া হবে। সুপার অর্থমন্ত্রকে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরেও—এবার নিশ্চয়ই...একটা জাল সুপার গুটিয়ে আনছেন...হাসপাতালের এক রাঘববোয়াল...এবার বোধহয়...

কলকাতায় সেদিন সাংঘাতিক দুর্যোগ। আগের দিন রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলেছিল সেদিন প্রায় বিকেল পর্যন্ত। চতুর্দিকে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওয়ার্ডমাস্টার ইনচার্জ চুনী পান্না ইমার্জেন্সির সুইপার ফুলমতিকে খুব বকাঝকা করেছির্লেন। দু'দিনের ছুটি নিয়ে ফুলমতি নাকি সাতদিন আসেনি, চুনী পান্না হাজিরা খাতায় কাটাকুটি করে অনুপস্থিত লিখে মাইনের বিল না দেওয়ায় ক্যাশে গিয়ে কান্নাকাটি করায় তারা ফুলমতিকে প্রাণোজ-বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেয় অ্যাকাউন্টস্-এ। প্রাণোজবাবুর কানেই ফুলমতি কথাটা প্রথম তুলেছিল—লেকিন হামে সব জানে। সাতদিন কামাই করিয়া হামি যদি টাকা না পাবে তরে দুই বরষ তক বাল্মিকী ক্যায়সে...?

পৌনে পাঁচটা নাগাদ সুপার অমরেশ ব্যানার্জির ঘরে এসে স্টাফেদেরই কেউ একটা ছোট্ট টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলে, স্যর এটা পরে সময়মতো একটু পড়ে দেখবেন। সুপার স্টেনোকে ডেকে বললেন দাশুবাবু কাউকে আর ডেট দেবেন না। দেখি ডেপুটেশন কে দেয় আর কে নেয়। পাঁচটা অব্দি আমার অফিসের কাজকর্ম থাকে কাজকর্ম ফেলে আমি আজগুবি লোকেদের বিল্কি-ছিল্কি কথা শুনি না। আচ্ছা কালকের ওই তিড়িং-বিড়িং লাফানো লাফাঙ্গা টাইপের ছেলেটা কে! দাশুবাবু?

—স্যার, ওতো...দাশুবাবু এবার বললেন, ডেপুটেশন দিয়েই বেড়ায় 'গ্রুপ ডি' ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অরূপ বর্মন নিউ সেক্রেটারিয়েটে লিফটম্যান। লিফ্‌ট্ চালানো ফেলে এখন অ্যাসোসিয়েশনকে লিফ্‌ট্ দিচ্ছে, সারা কলকাতায় ইউনিয়ন করে বেড়াচ্ছে।

সুপার ভ্রু বাঁকিয়ে বললেন, তবে? ওকি আমাদের স্টাফ? নয়ত। ওর কথা আমি শুনতে যাব কেন।

সামনে টেবিলে রাখা চিরকুটটা এবার খুললেন অমরেশবাবু...চোখ বড় হয়ে গেল। চুল খাড়া হয়ে গেল। কার্তিক দলুইকে ডাকলেন। বললেন, প্রাণোজবাবুকো বোলাও। হিন্দি বলে ফেললেন।

প্রাণোজবাবু পাঁচ মিনিট বাদে হাসতে হাসতে এলেন, কী স্যার রাঘববোয়ালটার জন্য জাল ফেলবেন না ছিপ ফেলবেন ঠিক করেছেন?

—আচ্ছা বাল্মিকী বশিষ্ঠ! সুপার বললেন।

প্রাণোজবাবু বললেন না না ও বশিষ্ঠ বাল্মিকী।

—আচ্ছা প্রাণোজবাবু, সুপারের গলায় সংশয়, নালিশ আমি পেলাম। কিন্তু বশিষ্ঠ বাল্মিকী যে দু'বছর হাসপাতালে নেই কিন্তু মাইনে পেয়ে যাচ্ছে...প্রমাণ করতে হবে তো!

প্রাণোজবাবু ফিসফিস করেন, তিনদিন অপেক্ষা করুন। শ্রীমান চুনী পান্না সামনের সোমবার সদলবলে কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছেন। উনি সোমবার রওনা হয়ে গেলে বুধ বা বৃহস্পতিবার নাগাদ আপনি সেন্ট্রাল ওয়ার্ডমাস্টার অফিসে গিয়ে গ্রুপ ডি স্টাফের লিস্টটা—অর্থাৎ যারা এখন হাসপাতালে আছে বাজেয়াপ্ত করুন...

—তারপর তারপর...

শুক্রবার বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ সুপারিনটেনডেন্ট ও তার দলবল সেন্ট্রাল ওয়ার্ডমাস্টার অফিসে গিয়ে জি. ডি. এ-দের অর্থাৎ গ্রুপ ডির নামের জাব্দা খাতাটা সিজ করে নিয়ে আসেন। সুপার খাতাপত্তর ঘেঁটে কোথাও গ্রুপ ডির নামের তালিকায় বশিষ্ঠ

বাল্মিকীর নাম পেলেন না...

নতুন সুপারিনটেণ্ডেন্টের কপালে চিন্তার আঁকিবুকি—ওর তো নাম নেই খাতায়, প্রাণোজবাবুকে বললেন। প্রাণোজবাবুর মুখে প্রশান্তি, বললেন, সেইজন্যই তো সুবিধে। প্রাণোজবাবু বলছেন চিন্তার কিছু নেই। ঘুঘু এখন ফাঁদে। ময়না তুমি গ্রুপ ডি-র গত দু'বছরের পে-বিলের হিসেবটা বের করতো দিদিমণি। দু'জন মোটা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়েন—ময়নার মোটা খাতাটা বের করতে মিনিট খানেকও লাগল না। এই দেখুন প্রাণোজবাবু বলছেন—নিরানব্বই-এর এপ্রিল থেকে—ঠিক দু'বছর বশিষ্ঠ বাল্মিকীর নামে কেউ মায়না তুলে আসছে। সুপার দেখলেন পে-স্লিপগুলি। বশিষ্ঠ বাল্মিকী দু'হাজার একশো দশ টাকা। পে-বিলে সব সই কার! চুনী পান্নার! সব পে-বিল খাতায় আটকানো আছে—সব ক'টায় চুনী পান্নার সই...সই কেন, পে-বিল বানানোই চুনী পান্নার...

—এই খাতাটাও আপনি সিজ করুন স্যার, প্রাণোজবাবু বললেন।

ফুলমতি রাগের জ্বালায় বলে দিল, টাকাটা বশিষ্ঠ বাল্মিকীর নামে চুনী পান্নাই একসময় তুলে নিত ক্যাশে ভিড় কম থাকার সময়—ফাঁকা থাকার সময়—তুলে নিজে আটশো টাকা নিচ্ছিলেন সার্ভিস চার্জ বাবদ।

আর কিছু তো জানার নেই। হাসপাতাল ফাঁড়ির পুলিশকে ডাকিয়ে সেন্ট্রাল ওয়ার্ডমাস্টার অফিসে তালা লাগিয়ে অন্যান্য ওয়ার্ডমাস্টারদের সঙ্গে একটা জরুরি মিটিং করলেন সুপার। ট্রলির ঘরের চাবি তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বললেন, মরণাপন্নর জন্য অবশ্যই ট্রলি পাওয়া যাবে যদি সে ওয়ার্ডে তখন বেড না থাকে। কিন্তু ভর্তির দরকার নেই এমন কেউ যেন ট্রলিতে...

ওয়ার্ডমাস্টার মিহিরবাবু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, ট্রলির ব্যাপারটা তো এতদিন চুনীর মনোপলি ছিল। আমাদের নালিশ ছিল...ডাক্তারবাবুদেরও নালিশ ছিল কিস্যু হয়নি। আসলে ওকে ঘাঁটাতে আগের কেউ সাহস পায়নি।

শুক্রবার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতেই হাসপাতালের বাস্তুসাপেরা, চুনী পান্নার তোষামোদকারীর এবং জবরদখলকারীরা ফিসফিস বলতে লাগল এ সুপার সাহেব বেশি দেখতে লেগেছেন—কাম করতে দিবেন না। তারপর পুলিস শনিবার হাসপাতালের বাইরে গজিয়ে ওঠা হাসপাতালের স্টাফ এবং তাদের আশ্রিতদের দোকানগুলো ভেঙে দিয়েছিল।

সোমবার সকাল পৌনে এগারোটায় সুপারের ঘরে ধ্বস্ত, ত্রস্ত চুনী পান্না ঢুকে পড়ে কেঁদে উঠল। এ চুনী পান্নার সঙ্গে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওয়ার্ডমাস্টার ইনচার্জ চুনী পান্নার কোনোই মিল নেই।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে অমরেশের পা ছুঁয়ে কাঁদতেও হয় তাকে—স্যর আপনি আমাকে বাঁচান। আপনি ওপরমহলে জানালে আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না...বেড়াতেও পারলাম না এরোপ্লেনে পালিয়ে আসতে হল।

—আপনাকে ছেড়ে দে-এ-ব! সুপারের গলা—আচ্ছা আপনি বলুন তো ক'জনকে এখান থেকে কলকাঠি নেড়ে তাড়িয়েছেন! আপনার এই মৌচাকটা পাকাতে!

—আমি স্যর, আমি তো...

—আচ্ছা আমিই বলছি...আপনার এত ক্ষমতা ছ'জনকে আপনি বদলি করেছেন।

আপনার জন্য এই হাসপাতালে কর্মরত এক সমাজকল্যাণ আধিকারিক পাগল হয়ে গেছেন। আপনাকে মিস্টার পান্না আজকেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে হবে...এখুনি। আমি জানি আপনার বদলীর আদেশ ওবাড়ি থেকে আপনিই করিয়ে আনতে পারবেন। আজ থেকে আপনি ফের ছুটিতে চলে যান। আর একটা কথা আপনার আলমারিটা আপনার সামনেই আমরা খুলতে চাই...ভিজিলেন্সের অফিসার থাকবেন...

—স্যর সাতদিন আমাকে সময় দিন।

—দুঃখিত। সুপার বলেছিলেন, আপনাকে সময় দিয়ে আমি বিপদে পড়তে পারব না...

রাতে খাসখবর দেখতে দেখতে সুমেরু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে স্বপ্নে দেখছিল চিড়িয়া-মোড়ের ওখানে কাশীপুর ও বি টি রোডে অবরোধ হয়েছে, কাশীপুরের কর্মচারী আবাসনের একটা দলের নেতৃত্বে। বাস, লরি, অটো, মিনি, ট্যাক্সি সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। হতভম্ব অফিস যাত্রীরা ছোটাছুটি করছেন। পুলিসের দলটা নামতেই ইঁট পাটকেল ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। সামনের লরির ছাদে দাঁড়ানো ছেলেটার মাথায় ধাঁ করে কোত্থেকে এসে একটা বড় ইটের টুকরো পড়ল। রক্ত...রক্ত...ভিড় ঠেলে কোনোক্রমে সবাই চলে যেতে চাইছে...অথচ রাস্তা বন্ধ। ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল একটা। রাস্তার পাশের একটা গ্যারেজে লোহার রডের ওপর কে যেন হাতুড়ি ঠুকছে।

সুমেরু ধড়মড় করে উঠে বসল। তার দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে। টিভিটাও সে বন্ধ করেনি...দরজার বাইরে ডাঃ কোনার দাঁড়িয়ে।—কীরে ঘুমিয়ে পড়েছিলি সুমেরু! চল্ দেখবি চল্ বাক্স-প্যাটরা, তল্পিতল্পা গুছিয়ে একদিনের নোটিশে লরি করে হাসপাতালের কুমেরু চলে যাচ্ছে...

—কি! সুমেরু বলল।

ওয়ার্ডমাস্টার চুনী পান্না চলে যাচ্ছে...কোয়ার্টার ছেড়ে। অন্তত কোয়ার্টারটা যাতে আর কিছুদিন তার দখলে থাকে তার জন্য সুপারের ওপর দিগ্বিদিকের কত চাপ!

—দিস সুপার ইজ ভেরি মাচ স্ট্রেইট এণ্ড আপরাইট।

সুমেরু চোখ ডলতে ডলতে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুই বস। একটু চা বলে আসি...সুমেরু বেসিনের দিকে এগোয়, চোখে মুখে জল দিতে দিতে বলে, চল গঙ্গাস্নান করে আসি—একটি মূর্তিমান কালাপাহাড় খসল। ঝণ্টু দু'কাপ চা—ভালো হয় যেন।

—আরও কয়েকটা আছে। এই সুপার সাহেব যদি থাকেন সব কটাকেই ডেরা পাল্টাতে হবে। এই শোন—ডাঃ কোনার বলছে পরশু বারোটায় ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুমে আসবি—আমরা সুপারকে শুভেচ্ছা জানাব।

## চার

যেন ঠিক ক্রিকেট মাঠের ছবি, যেমন দূরদর্শনের পর্দায় দেখা যায়। খুব দামি একটি উইকেট যেন পড়ল—ব্যাটসম্যান মাথা নিচু করে, হেলমেট এক হাতে, আর অন্য হাতে বিরক্তিতে মাটিতে ব্যাট ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে যাচ্ছে প্যাভিলিয়নের পথে; আর উইকেটের একপাশে, পিচের একপাশে দাঁড়িয়ে বোলারকে মধ্যমণি করে ফিল্ডাররা একজনের হাতের পাতায় আর একজন অদ্ভুত কায়দায় হাত মেলাচ্ছে। ক্যাপটেনের মাথার টুপিটা অন্যরকম। তাকে বেশ

চেনা যায়, সে বোলারের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে...

সুমেরু ফিক করে হাসল। ডাঃ সুমেরু ভট্টাচার্যর হঠাৎ কেন ক্রিকেট মাঠের কথা মনে পড়ল!

সুপার প্রাণোজবাবুকে বাহবা দিয়ে বললেন, অল ক্রেডিট গোজ টু ইউ...

প্রাণোজবাবু কৃতিত্ব নিতে নারাজ...না স্যর লজ্জা দেবেন না...সব তো আপনিই...

কোনার বলল, কায়েমি স্বার্থের রাঘববোয়ালটাকেই স্যর একদম ফার্স্ট ওভারেই প্যাভিলিয়ন পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মিটিংটা শুরু হয়েছিল বেশ স্বস্তির পরিবেশ নিয়ে। হাসপাতালের অভাব অভিযোগ নিয়ে সপ্তাহে একদিন সুপারের সঙ্গে সব বিভাগের ডাক্তারদের আলোচনা এ হাসপাতালের বহু দিনকার প্রথা। একজন কেউ মজার গলায় বলে উঠলেন, ভাববেন না চুনীবাবু চলে গেছেন বলে এ মিটিং-এ খাওয়াদাওয়া কিছু হবে না। একটা হাসির তরঙ্গ উঠল মিটিং-এ। কেননা এ কথাটা সবাই জেনে গেছে এখন, সবাইকে হাতে রাখতে চুনী পান্না এতদিন কর্মচারী সমিতির সব বাঘা ইউনিয়নের সবরকম মিটিং-এর খানার খরচ বহন করতেন। বিল মেটাতেন। আজকাল মাফিয়ারা যেমন শোনা যায় পুজোর সময় কম্বল-টম্বল দান করে সমাজসেবী তক্‌মাটা পেয়ে যায়। একদিন এক বড় মাপের নেতা সভাশেষে রসনা তৃপ্তি করতে করতে চুনী পান্নাকে অক্লেশে খানা-চুনীবাবু বলে অভিহিত করেছিলেন।

সুপার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বেশ হাসি হাসি মুখেই। কিন্তু মিনিট পাঁচেক বাদেই সুমেরুদের খটকা লাগে। তাল কেটেছে কোথাও মনে হতে থাকে। সুপার তখন বলছেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম, করছিলামও হাসপাতালটাকে রাহুমুক্ত করার। হাসপাতালের সর্বত্র বাস্তুসাপ, রাঘব বোয়াল কায়েমী স্বার্থের অবাধ বিচরণ...আপনারা জানেন আমি আর নাম করতে চাই না একজন কী দাপটে এবং অবাধে এতদিন অপকর্ম চালিয়ে গেছেন উচ্চরবে। আপনারা ভাববেন না রাহুমুক্তির কাজ, শুদ্ধিকরণ খুব সহজ—অনেক বাধা আসবে—আমিও পেয়েছি—আপনারাও পাবেন...কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিছুতেই দমবেন না।

ডাক্তাররা বলে উঠলেন—আমরা আপনাকে নিয়েই যুদ্ধটা চালিয়ে যাব। অমরেশদা জিন্দাবাদ।

অমরেশ ব্যানার্জী হাসলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আর থাকতে পারলাম না...

—তার মানে? বোমা পড়লেও কেউ হয়ত এত আশ্চর্য হত না।

অমরেশ ম্লান হাসলেন, আমাকে পুলিসের এক বড় দপ্তরের উচ্চ আধিকারিক করে দেওয়া হয়েছে।

—যাহ্‌ এরকম করা যায় নাকি। সবাই ব্যাপারটাকে রসিকতা ভাবল বোধহয়।

প্রাণোজবাবু একপাশে চুপচাপ এতক্ষণ বসেছিলেন। এবার ধরা গলায় তিনি বলে উঠলেন, সবই সম্ভব। সত্যি আজ সকালেই বিশেষ দূত মারফৎ স্যরের জরুরি বদলির এই আদেশ এসেছে। স্যর, কাল-পরশুই চলে যাবেন...

# অপহরণের পরে

## মলয় দাশগুপ্ত

### এক

অতীশ বুঝতে পারে নিশ্ছিদ্র, নীরব অন্ধকার। সে যে এতক্ষণ ঘুমের গভীরে মগ্ন ছিল তা বোঝে না, বরং তন্দ্রার মধ্যে ডুবতে ডুবতে লহমার জন্য এই অনুভূতিই হয় যে খুব হাল্কা কোনো স্বপ্নে আছে সে। হাল্কা স্বপ্নের অনুভব পেতে পেতে পুনরায় নিঃসীম আঁধার আর অপার নৈঃশব্দে তলিয়ে যায়।

আর একবার যখন আচ্ছন্নতা কাটিয়ে আত্মস্থতায় আসতে চায় মন, তখন সে শব্দ শোনে। পাখির শিসের শব্দ, একান্ত নিরালা সুরেলা সেই ডাক। তাতে ব্যাকুলতা নেই, অন্যকে মুগ্ধ করার চেষ্টা আছে। কিছুই বুঝতে না পারলেও পাখির ঐ সুর অতীশের ভাল লাগে। কিছুক্ষণ একটানা পাখির শিস্ শোনার পর চোখের ওপর আবার কালো আবছায়া নামে, আবার ঘুম এবং অতলে ডুব দেওয়া।

তৃতীয়বার যখন সম্বিতে ফেরে তখন অনেক স্পষ্টতা আসে। সেতারে বিলম্বিত একটা তান যেন বুঝতে পারে, যেন মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ চিনতে পারে এবং দুধ শাদা দেয়ালে আলো আঁধারীর খেলা স্পষ্ট দেখতে পায় সে। এতক্ষণে তার চেতনায় ধ্বনিত হয়, এ আমি কোথায়? এমন সুরম্য আলো, এমন মায়াময় ছায়া তো আমার ঘরে খেলে না। এ আমার ঘর না, আমি তা'লে—, ভাবতেই হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে মনে পড়ে সব কিছু। মুহূর্তে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় উঠে বসে। মাথাটা ভারী ভারী লাগে, কিন্তু মনের অতল থেকে উঠে আসা ব্যস্ততা মাথার ভার, তার ভোঁতা অনুভূতিকে সরিয়ে দেয়। আরো স্বচ্ছতা চায় মস্তিষ্ক।

শুয়ে থাকা অতীশ স্প্রিং-এর মত উঠে বসেছে। আর ঠিক অনুরূপ গতিতে একটি ছায়ামূর্তি এসে তার কাছে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তি নারী, পরনে চুরিদার, কিন্তু সিল্কের ঢাকনা দিয়ে মুখ ঢাকা। শরীর দেখে বয়স বোঝার মত এলেম অতীশের নেই, তবে মেয়েটি যে তন্বী এবং সুঠাম তা বুঝতে অতিরিক্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। আবরণে ঢাকা-মুখ সেই মূর্তি কাছে এসে দাঁড়িয়েই পাশের টেবিলে রাখা টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দেয়, কিছুক্ষণ খসখস করে চলার পর ঘ্যাসঘেসে গলায় একজনের কণ্ঠ ভেসে আসে, য়ু হ্যাভ্ বিন কিড্ন্যাপ্ট, ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য ইয়েস্টার নাইট্।

এই কণ্ঠ শোনার আগেই অবশ্য গত রাতের সব কিছু মনে পড়তে থাকে। হুবহু হিন্দি সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মত নিজের কানের পাশে চেপে ধরা রিভলভারের নলের শীতলতা বোধ আসে মনে। অতীশ ঢাকা-মুখ নারীর দিকে চোখ তুলে তাকায়, মেয়েটি এবার টেপকে ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করিয়ে আবার প্লে-অন করে। এবার আর ঘ্যাস ঘ্যাসে ইংরাজি নয় গম্ভীর কণ্ঠের বাংলায় নির্দেশের মত শোনায়, ঘরের এ্যাটাচ্ট্ বাথ আছে, য়ু ক্যান ইউজ ইট, ইফ য়ু লাইক। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না। মুক্তি-পণ পেয়ে গেলেই ছেড়ে দেব,

যতদিনে ফয়সালা না হবে ততদিন য়ু আর আওয়ার গেস্ট স্যার।

বাক্য শেষ হলে সেই মেয়ে টেপ বন্ধ করে। অতীশের খাটের কাছে রাখা একটা বেতের চেয়ারে বসে। মুখ দেখা যায় না, মুখে কথা ফোটে না, কিন্তু অপেক্ষার ভঙ্গীটি বেশ বোঝা যায় তাকে দেখলে। তালে এই মেয়েই আমার পাহারায়, ভেবে একধরনের বিষণ্ণ কৌতুক বোধ করে সে। আবার শুয়ে পড়ে, চিৎ না পাশ ফিরে শোয়। পাশ ফিরে দু'পায়ের ফাঁকে বালিশ গুঁজে শোয়ায় আরাম তার, এ অভ্যাসে সুখ। এখন বালিশ নেই, ভঙ্গীটি আছে। বাঁ পা ছড়িয়ে ডান পাটি ভাঁজ করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া। বাঁ পা যত টানটান করা যায় ততই কোমর আর পাছায় চাপ পড়ে, সেই চাপ তলপেট, তলপেটের নীচে পর্যন্ত পৌঁছয়, অনায়াসে শরীরী সুখ পাওয়া যায় এইভাবে। এই সুখসুখ অনুভূতি চাখতে চাখতে অতীশ তার অবস্থাটা জরিপ করে নিতে চায়।

কিড্‌ন্যাপিং, র‍্যানসাম-ইত্যাদি শব্দগুলি এখন শিশুরও অজানা নয়। ঘরে ঘরে টি. ভি.-তে টি, ভি-তে হিন্দি ছবির ফেরিওলারা এ দু'টিকে বেশ জনপ্রিয় করেছে। এই জনপ্রিয় প্রমোদ অতঃপর বাস্তব জীবনে এসে নিয়মিত হতে চলেছে। কিড্‌ন্যাপ হওয়ার গ্রামার আমার অজানা নয়। কিন্তু এরা আমায় বাছল কেন? আমার তো বড় বিজ্‌নেসও নেই কিম্বা কালো টাকার জিম্মাদারও আমি নই। একটা জাতীয় ব্যাঙ্কে প্রমোশন না নেওয়া কেরানী। আমার ওপর ওদের টার্গেট কেন? ঘরদোর, উদ্যোগ-আয়োজন দেখে তো খুব ছোট মাপের মনে হয় না এদের। আমায় বন্ধক রেখে কত আর দাবি করতে পারবে? অপহরণের ঝুঁকি-মানি আদায় হবে কীভাবে?

এইসব ভাবনাগুলি যে খুব সাজিয়ে গুছিয়ে আসে তা নয়। আলস্যে, উদ্বেগে মাখামাখি হয়ে ঘোরাফেরা করে মনের মধ্যে। একটা তন্দ্রার ভাব থাকায় ভাবনাগুলিকে সাজানোও সম্ভব হয় না। কেবল সর্বব্যাপ্ত এক চিন্তা দেহ-মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘুমোতেও পারি না জাগতেও পারি না, নীরবতা যে এত ধাতব হতে পারে এর আগে তা বুঝিনি।

ঘুম ভাঙলে বিছানায় বসেই দু'চারটে সহজ আসন করে অতীশ। রোজ ভোরে ওঠা সম্ভব হয় না, তবু যখনই উঠুক এই অভ্যাসকে মেনে চলে। বয়স বাড়লে কিছু নিয়ম মানতে হয় বলেই অভ্যাসকে মানে। এখন ঘুমই ভাঙতে চায় না তো আসন করবে কী? শবাসনে শয়ান ছাড়া অন্য কিছু করতেও ইচ্ছা করে না। শবাসনের অনুভূতি বড় আশ্চর্য, ঠিকভাবে 'রিল্যাক্স' করতে পারলে দেহ ভারহীন বোধ হয়, শূন্যে ভাসমানতার অনুভূতি জাগে। এই ঘুমে এই জাগরণে ঘোরাফেরা করতে করতে অতীশ শবাসনে ছেড়ে দেয় নিজেকে। ঘরের আলো আঁধার বদলায় না, নৈঃশব্দ বদলায় না, সেই নীরবতার মধ্যে তার শরীর তার মন ক্রমশ হাল্কা হতে থাকে। হলিউডের ছবি হয়ে যায় সারা ঘরটা। গ্রহান্তরের দুর্বৃত্তদের সঙ্গে কল্প-লড়াই করার সময় ছবির চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে যেমন ভাসমান হয়, অতীশের মনে হয়—আমিও তেমন শূন্যতায় ভাসছি। অকল্পনীয় শূন্যতায়।

ঘুম ভাঙে। ঘরের মধ্যে এখন অনেক লোক, এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। অনুচ্চে নিজেদের মধ্যে যা বলছে তার একটি শব্দও বুঝতে পারে না অতীশ। সমবেত গুঞ্জনধ্বনি কানে আসে কেবল, নীরবতার এ বিকল্পও খুব স্বস্তিদায়ক নয়। চোখ মেলে লোকগুলিকে দেখতে চাইল তার মন, চোখ মেলে বুঝতে চাইল কাল টাটা সুমোয় করে আনার সময় যারা তার কানের পাশের রগে পিস্তল ঠেকিয়েছিল এরা তারাই কিনা। ঘরের পাঁচজনের

একজনেরও মুখ দেখা যায় না, বাঁদুরে টুপির মত লম্বা মুখোশ ওদের সবার মুখে। ওরা খুব ধীরে চলাফেরা করছে, খুব নিচুস্বরে কথা বলছে, একে অপরের দিকে মুখ না রেখেই। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়ই অতীশ তার খাটের পাশে রাখা সেই চেয়ারের দিকে তাকায়, চেয়ার শূন্য। সেই তন্বী রমণী এখন নেই, এ ঘরেই নেই। এতগুলি লোক দেখে অতীশ এবার কথা বলতে চায়, 'আমি কোথায়। এখানে বন্দি করার মানে কী?'

গলার স্বর শুনে একসঙ্গে পাঁচ মূর্তি ঘুরে দাঁড়ায়। একসঙ্গে খাটের কাছে এগিয়ে এসে ওকে দেখে। কিন্তু মূক ও বধিরের মত আচরণ করে, অতীশ মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসে, তার অজ্ঞাতেই একটা বেপরোয়া ভাব ফোটে তাতে। লোকগুলি আরো কাছে এগিয়ে আসে। ওদের এগিয়ে আসা আর অতীশের ঝটকা দিয়ে দিয়ে উঠে বসা প্রায় যুগপৎ ঘটে যায়। এবং ওই পাঁচজন সমবেত গতিতে এগিয়ে আসায় অতীশ নিজে থেকেই শান্ত স্তিমিত হয়ে পড়ে। পাঁচজন কিন্তু নড়ে না, সিল্যুটে দেখা মার্কিনী বোম্বেটে ছবির মত যন্ত্রমানব হয়ে যায় বা।

সব মিলিয়ে অসহনীয় মানসিক কষ্ট। মন এত উদ্ব্যস্ত যে শরীর নিয়ে ভাবারই সময় পায় না। অথচ এখন, এসময়ে বেশ খিদে পাওয়ার কথা। এসময়ে এখন তলপেট ভারী হয়ে প্রস্রাবের চাপ আসার কথা। কিন্তু ওসব শরীরী নৈমিত্তিকতা টের পায় না। বরং বোঝার চেষ্টা করে তার অবস্থা, তার অবস্থান। এই বোঝার ইচ্ছা থেকেই আবারও জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে ধরে আনার মানে কী? কেন এখানে বন্দী করে রেখেছেন?'

এবার একজন তার খুব কাছে এগিয়ে এসে যান্ত্রিক চাপা গর্জনের মত স্বরে বলে, 'এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমরা কিছু বলতে পারি না। আমরা বসের অর্ডারে চলি।'

এবার সোজা উঠে বসে অতীশ। অনেক স্বচ্ছ শোনায় তার গলা, 'তবে বসকে ডাকো'।

'বস কি তোমার জন্য বসে আছে? সব রিমোটে চলে বাবা, সব রিমোটে চলে।'

অতীশ হতাশ হয়ে আবার শুয়ে পড়ে। চোখের ওপর দুই হাত মেলে রাখে পাখির জোড়া ডানার মতই। তখন নিজের মধ্যে নিজে চলে যেতে চায়। এতক্ষণ যা দেখেছে বা শুনেছে তা থেকে একটা কথা বুঝতে পারে কোনো অপরাধী চক্রের হাতে পড়েছি। আধুনিক জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে যাওয়া মুক্তিপণের বিনিময়ে আটক রাখার কালচারের ফাঁদে আমায় থাকতে হবে।

এ পর্যন্ত ভেবে আবার বিস্ময় বোধ করে অতীশ, আমি কেন? আমায় কেন টার্গেট বাছতে গেল? কুড়িয়ে বাড়িয়ে সাকুল্যে পাঁচলাখ টাকাও যোগাড় করতে পারবে না ইন্দ্রানী। আর পাঁচ লাখ টাকা পাওয়ার জন্য এত আঁটঘাট বেঁধে কিড্‌ন্যাপ করতে যাবে কেন একটা জবরদস্ত গ্যাং? এ বিস্ময় থেকেই যায় তবু।

ক্রমশ অতীশ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে সিদ্ধান্তে আসে, ওরা যেভাবে যা করবে তাতেই সায় দেওয়া ছাড়া আমার আর করার কিছুই নেই। এখন আমি ওদের কাছে টাকার বদলী একটা মানুষ। ওদের ডিম্যান্ড মেনে ইন্দ্রানী বা সন্বিত টাকাটা দিতে পারলেই আবার বাইরে যাব। আর দিতে না পারলে? যদি চাহিদাটা এত আকাশছোঁয়া হয় যে তা মেটাবার কোনো উপায়ই না থাকে তবে—?

তবে-র উত্তর না ভেবেই একবার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করে ঃ ধরা গেল ছেলে বৌ কেউই উদ্ধার করার মত উপযুক্ত কিছু করে

উঠতে পারল না। তাহলে কি এরা আমায় খুন করবে? খুন করলে এদের লাভ কী? একেবারে একটা ছা-পোষা কেরানির জীবন নিতে যাবে কেন? মানুষ মানুষকে নিছক অকারণে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়? একেবারে অকারণে?

ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়। অতীশ আর কিছুই চিন্তায় আনতে পারে না। মৃত্যুর কথাও না, বরং এই ঘরের ভেতরের লোকগুলির সঙ্গে দুটো কথা বলে একটানা ক্লান্তিকর ভোঁতা অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে চায় ঃ এই ভাই এদিকে শুনবেন? বেশ প্রত্যয়ী হতে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বোঝে যে যতটা সপ্রতিভ হবে বলে ঠিক করেছিল ততটা হতে পারে না। গলার স্বরে সংশয় আর হতাশা মাখামাখি হয়ে আসে। তবু যে কথাকটা বাক্য হয়ে বেরোতে পেরেছে এতেই স্বস্তি পায়। কণ্ঠস্বরে প্রত্যয় না এসে বরং করুণা ভিক্ষার মত একটা কিছু বেরোয়। অতীশ তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যাশা নিয়ে তাকায় যন্ত্রবৎ লোকগুলির দিকে।

ওরা এক পাও নড়ে না, একটা কথারও উত্তর দেয় না। অতীশের কথা শুনেছে বলেই মনে হয় না।

আর একবার ডাকব? ভেবে কথা বলতে যাবে এমন সময় ট্রলির মত একটা চাকায় চলা টেবিলে চা আর খাবার নিয়ে ঢোকে একজন। এ লোকটির হাতে গ্লাভস; মুখে যথারীতি বাঁদুরে টুপি—মুখের হনু পর্যন্ত টাইট করে বাঁধা। ট্রলির খাদ্য, চায়ের সরঞ্জাম একেবারে অতীশের মাথার কাছে এসে থামে। লোকটিও কথা বলে না, ঘাড় কাত করে এমন একটা ভঙ্গী করে যাতে মনে হয় সে অতীশকে ঐ চা, ঐ খাবার খেতে বলছে। চা-খাবার নিয়ে লোকটি ঘরে ঢোকার পরেই অন্য পাঁচজন একে একে সরে যায়, ঘরের একমাত্র দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। খাবার আনা লোকটি কেবল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। অতীশ এবার ভাল করে নজর করে, লোকটির উচ্চতা যা তাতে তাকে বেঁটেই বলা চলে, মুখ পুরো দেখতে না পাওয়ায় বয়স বোঝা যায় না, তবে ইংরাজিতে যাকে 'ওয়েল বিল্ট বডি' বলে ওর শরীরটিকে তা বলা যায়। শক্ত সমর্থ বেঁটে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি, যে ধোঁয়া ওঠা চা আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাবার দিচ্ছে সেই প্রয়োজনে কীভাবে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তাকে যমের দুয়ারে নিয়ে যাবে, একথা ভাবলেও মাথা ঝিমঝিম করে। অথচ মানুষের গড়া এ সভ্যতায় এটাই তো স্বাভাবিক। যে খাইয়ে দাইয়ে জীবনে টিকে থাকার রসদ যোগায় সেই আবার খুনের হাতিয়ার শানায়। এইই তবে মানুষের পরিচয়? কোনও ধ্রুব বিশ্বাস নেই, স্থির অবস্থানও না।

এই যে আমাকে খাইয়ে দাইয়ে আরামে রাখছে যারা তারা তো আসলে এই মুহূর্তে আমার আরাম চাইছে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। আবার মুক্তিপণ নামে নির্দিষ্ট অর্থ না পেলে পিস্তলের ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না। এই ধাঁধার কোনও শেষ নেই।

'এই ভাই শোন।' খুব ধীরে অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্বরে বলে অতীশ। একটু পিছন ফিরে দরজার দিকটা দেখে নিয়ে শক্তপোক্ত বেঁটে মাপের লোকটি খুব নিচু এবং মোলায়েম কণ্ঠে বলে, 'আপনি খেয়ে নিন স্যার, এর বেশি কিছু বলার হুকুম নেই।'

খাবার দেখে খিদের ভাবটা একটু একটু করে অনুভব করে। লোকটির মোলায়েম অসহায়তা এতক্ষণ বাদে মনের ওপর আশার প্রলেপ দেয়। আবারও অনুচ্চে বলে অতীশ,

'বাথরুমে যাব'। 'হাত মুখ' ধুয়ে আসতে হবে।'

লোকটির কণ্ঠে উদাসীনতা, 'বাঁ দিকে বাথরুম, ওখানে যান।'

'তুমি—আপনি কি এদেরই লোক?''

এবার বেশ বিরক্তি ফোটে লোকটির উত্তরে, 'এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। অন্য কোনো হুকুম নেই।'

মরিয়া হয়ে অতীশ বলে, 'কার হুকুম। কীসের হুকুম?'

এবার স্পষ্ট ধমকে ওঠে এতক্ষণ মোলায়েম স্বরে বলা লোকটি, 'আপনার সীমা ছাড়াবেন না। এখানে প্রত্যেকের একটা করে সীমা আছে। তার বাইরে কেউ যেতে পারে না।'

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে অতীশ জানতে চায়, 'আমার সীমা কী? কতদূর জানতে পারব আমি?'

'তা আমার বলার কথা নয়। আমি জানিও না।'

'এই অন্ধকার ছাঁয়াছায়া, ভাবটা থাকবে না আলো জ্বালা যাবে?'

'আমি তা জানি না।'

'তুমি কী জানো?' এবার আর আপনি-তুমির দ্বিধা থাকে না অতীশের।

'আপনার খাবার ব্যাপারটা, আমার জানার সীমা ওটাই।'

'অল বোগাস', বলে বাহ্যত বিরক্তি জানিয়ে অতীশ বাথরুমে ঢোকে।

## দুই

অতীশকে অপহরণ করা হয় একত্রিশে জুলাই-এর মধ্যরাতে। টানা তিনদিন চলে যাবার পরে তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। ছেলে সম্বিত যথারীতি থানায় ডায়েরি লিখিয়েছে। পুলিস অফিসার খুব একটা পাত্তা দিতে চায়নি, 'যাবে কোথায়, দেখুন ওর বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ নিয়ে। না হলে ওয়ার্স কিছু হলে হাসপাতাল-টাসপাতালে খুঁজুন। আমরা তো লিখে নিলামই, কোনো খবর পেলে জানাবো। আপনারাও খুঁজুন।'

ইন্দ্রানী খুবই অধৈর্য হয়ে পড়ে, 'এর বেশি, আর কিছু করার নেই আপনাদের?'

'আর কী?' চোখ কুঁচকে জানতে চান ও. সি।

'মানুষটা রাত দশটায় ফোন করে জানাল যে বন্ধু শশাঙ্কর অফিসে আছে। শশাঙ্কর গাড়িতেই বেরোচ্ছে, তারপর উড়ে গেল?'

'আঃ, বলেছি তো আপনারা যে রুটের কথা বলছেন সে রুটে গত সাত দিনেই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর বেশি ইনফর্মেশন আপনাদের কাছে থাকলে জানান।' বলে অফিসার এমন ভাব করলেন যে ইন্দ্রানীরা বেরিয়ে গিলে তিনি স্বস্তি পান। তবু সম্বিত আর ইন্দ্রানী ঠায় বসে থাকায় এবার বেশ কড়া পুলিসি স্বাভাবিকতায় বলেন, 'যান না ওই শশাঙ্কর কাছেই যান।'

'গিয়েছিলাম।'

'কী বললেন শশাঙ্ক?'

'শশাঙ্ক বলল যে তার গাড়িতেই ও ফিরেছিল। গড়িয়াহাটার মোড়ে ওকে নামিয়ে দিয়ে শশাঙ্ক নিজে রাসবিহারী হয়ে ওর বাড়ি চারু এ্যাভেন্যুতে যায়।' ইন্দ্রানী শশাঙ্কর কাছে যা

জেনেছে তা জানায় পুলিসকে।

'আচ্ছা।' বেশ টেনেটেনে উচ্চারণ করেন ও. সি, একটু যেন উৎসাহ বোধ করেন, 'এই শশাঙ্কটি কে, কী করেন?।

'শশাঙ্ককাকা বাবার বন্ধু। চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কমলালয় ভবনে ওঁর নিজের অফিস আছে।

অফিস ছুটির পরে উনি মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেন।'

'বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা—' বলে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকেন। তারপর হঠাৎই অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখিয়ে বলেন ও.সি, 'শুধু আড্ডা না আর কিছু আছে। রাত দশটা অবধি স্রেফ আড্ডা—ভাবা যায়?'

সম্বিত অধৈর্য হয়ে পড়ে। লোকটা কাজের কাজ কিছুই করছে না, অথচ উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিত করে বাবাকে ম্যালাইন করতে চাইছে; শশাঙ্ককাকা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইছে। অধৈর্য সম্বিত বলে, 'অনেক দিনের বন্ধু ওঁরা। আড্ডার জন্য অবসর সময়টা কাটাতে পারেন না?'

'দ্যাখো, আমরা যে প্রফেশনে আছি তাতে মানতে পারি না যে দুই, যাকে বলে প্রৌঢ় মানুষ রাতে নির্ভেজাল বা নির্জল খোশগল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে।'

সম্বিতের কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। নেহাৎ নিরুদ্দেশ বাবাকে খুঁজতে আসা তাই চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়, নইলে এই লোকটার মুখোমুখি বসে থাকাকেই অপরাধ বলে মনে হয় তার।

সম্বিতের দিকে না তাকিয়েই এবার ও.সি ইন্দ্রানীকে বলেন, 'একটা কাজ করুন প্রথমে হেস্টিংস থানায় পরে লালবাজারে মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে ডায়েরি করুন। আমাদের ওই শশাঙ্ককে দরকার, আমার থানা ওকে ধরতে পারবে না। যা বলি করুন, এখানে এর বেশি কিছু পাবেন না।'

'স্যার অন্য কোনও সম্ভাবনা নেই?' ইন্দ্রানী ভেঙে পড়ার আগে নুয়ে পড়ে।

ভুরু নাচিয়ে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে ও. সি. বলেন, 'অন্য সম্ভাবনা, মানে সুইসাইড—টুইসাইড? সে তো আপনারা ভাল বলতে পারবেন।'

পুলিশের বড়বাবু বলেই হয়ত নির্বিকারভাবে আত্মহত্যার কথা বলতে পারেন। কিন্তু উচ্চারিত শব্দের আঘাতে ইন্দ্রানী নিজেকে আর সামলাতে পারে না। এতক্ষণের সকল প্রতিরোধ নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়। কপালের দু'পাশের রগ টিপে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলে সে। সেই কান্নায় যে হাহাকার থাকে তাও স্পর্শ করে না ও. সিকে বরং অবিচলিত কণ্ঠে বলে, 'আমি তো অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি না।'

মায়ের কান্নায় সম্বিতও বিষণ্ণ হয়। এসময়ই তার বাবার শান্ত অথচ উজ্জ্বল চোখ দু'টি ভেসে ওঠে মনে। ছেলে বাবার মুখ মনে করে নীরব ব্যথায় ভিজতে থাকে। শিশিরের টুপটাপ পতনের মত তার মনের মধ্যেও দুঃখরা ঝরতে থাকে। তবু ভেঙে পড়ে না সে, সম্বিত জানে একসঙ্গে মা-ছেলে কান্নায় ভাসলে বাবাকে খোঁজায় বাধা পড়বে। ও. সি.-র ধাতব কাঠিন্য আহত করলেও শেষ চেষ্টার মত করে সে বলে, 'আজকাল তো কিড্ন্যাপিং চলছে বেশ।'

বড়বাবু থানা কাঁপিয়ে হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠেন; হাসতে হাসতে মুখের রঙে লাল

ছোপ লাগে। হাসতে হাসতেই বলেন, 'তোমার বাবার কী আছে যে কিড্‌ন্যাপ্‌ড্‌ হবেন? কত টাকা র‍্যানসাম যোগাতে পার তোমরা? কিড্‌ন্যাপ, কিড্‌ন্যাপ একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। আমার মেলাই কাজ আছে, এখন তোমরা যেতে পার।'

সম্বিত আর ইন্দ্রানী বাহ্যত বিপর্যস্ত হয়। পুলিশ তাদের কাছে একটা অবলম্বন ছিল। ওরা ভেবেছিল আর কিছু না হোক ওদের উদ্বেগ আর অসহায়তা শেয়ার করবে পুলিশ। তার বদলে মামুলি একটা এফ. আই. আর এবং তার সঙ্গে একগাদা অনাবশ্যক উপদেশ সম্বল করেই ফিরতে হচ্ছে তাদের। নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না সম্বিত। এখন একমাত্র ভরসা ওই শশাঙ্ক বোসই, যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল বাবা। শশাঙ্ককাকুকে দিয়েই না হয় লালবাজারে ডায়েরি করানো যাবে। আরো একবার যে সে ওই পুলিসের ওপরই ভরসা রাখতে যাচ্ছে তা খেয়ালই হয় না। করজোড়ে থানার ও. সি-কে নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্রানী আবার অনিশ্চয় উৎকন্ঠার মধ্যে এসে পড়ে।

বাইরে এসে মা ছেলে দু'জনেই ভেবে পায় না কী ভাবে, কোন পদ্ধতিতে পুলিশের আরো ওপরতলায় পৌঁছবে। বাবা যদি পার্টি লাইনে জবরদস্ত কেউ হত তো জোর একটা হল্লা পাকানো যেত। বাবা যদি সত্যিই বড়লোক হত তো পুলিশ নিজের থেকেই ইন্টারেস্ট নিত। বাবাটা একেবারেই সাধারণ একটা মানুষ হয়ে, সারটা জীবন একান্ত অনেস্ট থাকতে পারার লড়াই করতে করতে কাটিয়ে দিল। অথচ পুলিস অফিসার কী জঘন্য ইঙ্গিতই না করল, যে শশাঙ্ককাকু নিজেই উদ্বেগে ঘুমোতে পারছেন না তার সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল মনে। শুধু সন্দেহ ঢোকানো নয়, সেই সন্দেহকে এস্টাব্লিশ করার জন্য তাকে এ্যারেস্ট করার কথা পর্যন্ত ভাবতে পারল?

বিজন সেতুর কাছাকাছি পৌঁছে ইন্দ্রানী বলে, 'সব কীরকম বিষ বিষ লাগছে। শশাঙ্ককে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারব না? হলোটা কী বলত!'

'মা, একটা কোল্ড ড্রিংকস খাবে?' সম্বিত দাঁড়িয়ে পড়ে।

'নারে আমার ভাল লাগছে না। সত্যি ভাল লাগছে না।'

'সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে মা? তুমি একটা কোল্ড ড্রিংক্‌স্‌ না খেলেই বাবাকে পাওয়া যাবে?'

'ওরে তা নয়। ভাবত তোর বাবা এখন কোথায়, তোর বাবা এখন আদৌ আছে—' কথা শেষ না করেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে ইন্দ্রানী। সম্বিত বাধা দেয় না, বাধা দেবেই বা কেন?

'তবে চল শশাঙ্ককাকুকে একটা ফোন করি। ওঁর পরামর্শই এখন দরকার।'

'চল'। পা বাড়ায় দু'জনে পোস্টঅফিসের কাছের এস. টি. ডি বুথের দিকে।

'কাকু আমি সম্বিত বলছি।'

'..........।'

'মাও আমার সঙ্গে আছে। তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। তুমি এখন ফ্রি আছো তো?'

'.................।'

'হ্যাঁ আমরা থানায় ডায়েরি করেছি। এই তো সেখান থেকেই বেরোলাম।'

'...............।'

'অল বোগাস,..........পাত্তাই দিতে চাইল না।'

'..............................................।'

'না, না—হু, বুঝেছি। এরা যে কিছু করতে পারবে তা মনে হয় না।'

'..............................................।'

'পজিটিভ, না তেমন আশা পেলাম না।...একটা সাজেশন দিয়েছে ও. সি।...তুমি যদি সাথে থাকো...গিয়েই বলব।'

'..................................................।'

'আচ্ছা, আচ্ছা....বুঝেছি। আমি মাকে বলছি। তুমি কি মার সঙ্গে কথা বলবে?'

'............................।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। মা কাকুর সাথে কথা বল।'

ইন্দ্রানীরও ইচ্ছা করছিল। শশাঙ্ককে আবারও সর্ব-সমর্পিত আবেদন জানাতে। রিসিভার ধরে তবু থমকে দাঁড়ায়, কানের কাছে আনতে আনতে শুনতে পায় ও পাশে পৌনঃপুনিক 'হ্যালো, হ্যালো' হয়ে চলেছে। নিজেকে একটা ধাক্কা দিয়ে কানে চেপে ধরে রিসিভার, 'বলুন।'

'..............................................।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি যে আর—আর ঠিক থাকতে—না, না।'

'............................।'

'ভেঙে পড়লাম কই সবই তো করছি—বোঝেন তো। আপনি ছাড়া আমাদের—।'

'.........................।'

'আপনার কী দোষ? এর আগেও তো কতদিন আপনার গাড়ি করে গড়িয়াহাট মোড় পর্যন্ত এসে—হ্যাঁ গড়িয়াহাট থেকে কত ট্যাক্সি তো আমাদের এদিকে আসে। আপনি তো জানেনই।'

'.........................।'

'না ও. সি কিছু শুনতেই চাইল না। হেসে উড়িয়ে দিল—বিশ্রীভাবে, শেয়ার ট্যাক্সির কথা বলার স্কোপই—না, দিল না।'

'........................।'

'বাবু একা যাবে? আপনার কাছে আমাকে যেতে বারণ করছেন? না-না ওকে একা আমি ছাড়তে পারব না।'

'............................।'

'আপনি বুঝবেন না? বাবাকে হারিয়েছি, ওকে হারালে—।' আর কথা বলতে পারে না ইন্দ্রানী, চোখের জলে রিসিভার ভিজিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত তাকায় সন্বিতের দিকে।

## তিন

গা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ষাট ছুঁইছুঁই এক রমনী। ঘরের দরজা বন্ধ, জানালার অস্বচ্ছ কাচের ওপার থেকে সকালবেলার সূর্যকিরণ এত স্তিমিত যে আলোয় একটা কোমলতা মাখানো মনে হয়। তিনি প্রায় আদুল গায়ে চোখ বুঁজে শুয়ে, ফিজিও এখন দুই হাতের

চাপে স্পাইনাল কর্ড বরাবর ওপর থেকে ক্রমশ নীচে নামছেন। আরামে চোখ বুজে আছেন তিনি, এমন সময় টেবিলে রাখা কর্ডলেস মোবাইলগুলির মধ্যে একটা বেজে ওঠে রিনরিন শব্দে। সংবাহনে এতই মশগুল তিনি যে প্রথমে ফোনের ডাক কানেই ঢোকে না, যখন ঢোকে তখন অনিচ্ছার হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে নির্দিষ্টটি তুলে নেন। নিমীলিত চোখে কানে চেপে ধরেন ছোট্ট যন্ত্রটি। তিনি জানেন কে, কোথা থেকে ফোন করছে, উত্তেজিত না হয়ে তাই সেই স্বরের প্রতীক্ষা করেন।

ওপারের কথায় হঠাৎই তার সব আরাম, মন্থরতা দূর হয়, 'হোয়াট!' বলে উঠে বসেন। তাঁর শরীরের একমাত্র আবরণ খসে পড়ে, স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াও কাজ করে না। উৎকণ্ঠিতা রমণীর শিথিল স্তন, ঈষৎ মেদ চিক্কন উদর এবং নিম্ন-নাভী উন্মুক্ত হয়। ওপারের নির্দেশ মন দিয়ে শুনে মোবাইল রেখে এবার গায়ের কাপড় টেনে তোলেন। দাঁড়িয়ে থাকা ফিজিওকে বলেন, 'নাও য়ু মে গো। আয়্যাম টু সেট্ল্ সামথিং ডিফারেন্ট।'

'কাল, সবেরে, ফিন্।'

'ও ইয়েস্, টু মরো—এ্যাজ শিডিউল।'

ফিজিও চলে গেলে তিনি ঘরের জানালা দরজা খুলে দেন। দক্ষিণের জানালা পথে ভেজা বাতাস ধেয়ে এসে সারা শরীরে আর এক স্নিগ্ধতা মাখায়। বাথরুম সেরে বেরিয়ে এসে মনোযোগ দিয়ে সাজেন তিনি। ঠোঁট, ভ্রূ এবং ভ্রূ-মধ্য চর্চার পরে নখের পাতা থেকে বাহুমূল, উন্মুক্ত গ্রীবা-কণ্ঠ, অনাবৃত কাঁধ এবং আবৃত উদর ও নাভী দেশ কোমল তরলে দ্রাব করেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অনুচ্চে ডাকেন, 'রুক্সানা, রুক্মিনী।'

দু' জনে যেন এ ডাকের জন্য তৈরিই ছিল। দ্রুত ছুটে আসে তরুণীরা। চোখের ইশারাই যথেষ্ট, ইশারা পাওয়ার পরে এক গাদা পোশাকের মধ্য থেকে উজ্জ্বল নীল চুড়িদার বার করে তারা। তিনি বসে থাকেন, আপাদ বক্ষ পোশাকে সজ্জিত করার কাজ এখন রুক্সানা আর রুক্মিনীর।

এইভাবে রূপচর্চা, এইভাবে বেশভূষার সমাপ্তিতে তৃপ্ত তিনি স্ফটিকে নিজের শরীরটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, 'দ্যাট্স্ ওকে, ঠিক হ্যায় না?' বলে যেন সম্মতি চান।

ওরা মাথা নাড়ে।

ওদের মাথা নাড়ার সময়ই কাঙ্ক্ষিত ফোন বাজে। কানে তুলে নিয়ে তিনি বলেন, 'আয়্যাম রেডি। সে টুয়েলভ্ টু ফিফ্‌টিন মিনিট্স্। অল্ রাইট।'

ফোন রেখে রুক্সানা বা রুক্মিনীর দিকে ফিরে তিনি বলেন, 'মহিন্দর রেডি তো? সফেদ লিমুজিনকো বাহার করনে বোল। হারি-আপ কিড্স্—।'

ঘন্টা দু' এক বাদে তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তাঁকে খুব আনমনা আর ক্লান্ত দেখায়। তিনি ঘরে ঢোকার সময়েই রুক্মিনী আর রুক্সানা তাঁর পিছনে আসে। কোনও কথা বলতে হয় না, এ. সি-টা চালিয়ে দেয় তারা। ওই বাহিরের পোশাকে, বাইরের না-ধোয়া হাত পা নিয়েই কৌচে বসে পড়েন। ঘরটা ক্রমশ রমণীয় শীতলতা দিলে যেন সম্বিত পেয়েছেন এমন ভাব করে উঠে দাঁড়ান। বাথরুমে যান, ঝরঝর করা জলধারার শব্দ পাওয়া যায়। সারা মুখে, মাথায়, ঘাড়ে জল দিয়ে যখন বেরোন তখন সযত্নে করা মেক-আপ-চলে

গিয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ বেরিয়ে পড়ে। সেই মুখে ক্লান্তি, সেই মুখে চিন্তার ছাপ।

রুক্‌সানা বা রুক্‌মিনী কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি এই প্রথম অভ্যাস ভুলে নিজেই ওয়াড্রব থেকে হাল্কা, ঢিলে পোশাক বেছে নেন। অন্তর্বাসহীন সেই পোশাকে তাঁকে ঈষৎ পৃথুলা মনে হয়। বক্ষের শিথিলতা স্পষ্ট বয়সের ইঙ্গিত দিলেও তিনি কোনও অন্তর্বাস পরেন না। ওইভাবেই কিছুক্ষণ বসে থাকেন।

এখন লাঞ্চ টাইম, খাবার ঘরে গেলেন না তিনি। নিজের গড়া ডিসিপ্লিনকে ভেঙে এ ঘরেই খাবার দিতে বলেন। এইসব অনিয়ম দেখেও কারো সাহস হয় না এ কথা বলার, আজ তোমার কী হয়েছে? ট্রে-তে সাজানো খাবার থেকে নিজের ইচ্ছেমত খাদ্য এবং পানীয় তুলে নিয়ে বাবুর্চিকে ডাকতে বলেন। সে এলে জিজ্ঞেস করেন, 'মেহ্‌মানকো খানা ভেজ দিয়া তো?'

বাবুর্চি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তিনি উদ্বেগ না চাপতে পেরে আবারও জানতে চান, 'ও খানা খা লিয়া, উননে এ্যাক্‌সেপ্ট কিয়া তো খানা।'

'জি, হাঁ। বিলকুল আরাম সে খায়া।'

'ঠিক হায়। য়ু মে লিভ্ নাও।'

অতিথি স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়া-দাওয়া করেছে শুনে তিনি যেন একটু আশ্বস্ত হন। তারপর নিজের আহারে মন দেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি সামান্য প্রসাধন করেন। কিছুক্ষণ কী ভাবেন। তারপর ঘরের ঢিলেঢালা পোশাক ছেড়ে শাড়ী পরেন, শাড়ী মিলিয়ে ব্লাউস এবং কপালের টিপ।

এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরে তিনি থাকেন। পুবমুখো বাড়ির উত্তর দিকে একটি বাগান আছে। বাগানে নানারকম গাছ, গাছ আছে বলেই পাখিরা এসে বসে। তিনি এখন তাঁর দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাগান সংলগ্ন উত্তরের সেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান—যেখানে রয়েছে তাঁর মেহমান, তাঁর অতিথি। দরজায় দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ থামেন, তারপর করতলের সাহায্যে মৃদু আঘাত করেন, ডোর-বেল টেপেন না, করতলে মৃদু আঘাত হানেন। দরজা খুলে যায়, তাঁকে দেখে ভেতরের মুখঢাকা নারী চমকে ওঠে, কিন্তু কিছু বলে না। তিনি মৃদু অথচ স্পষ্ট বাচনে বলেন, 'য়ু মে গো নাউ।'

সে নারীর দ্বিধা তার বিস্মিত চোখে ফুটে বেরোয়। এ বাড়ির মালকিন বড় না বস বড় বুঝে উঠতে পারে না। এখন এ বিবির কথায় চলে গেলে আবার জীবন সংশয় না হয়। ওর দ্বিধা দেখে তিনি ঈষৎ হেসে বলেন, 'হামনে বস্‌সে বাত কিয়া, য়ু মে গো নাউ। আই এ্যাম টু টক উইথ দ্য গেস্ট—নাও এ্যাণ্ড এগেন।'

সে নারী মন্থরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি দরজায় খিল এঁটে সেই ছায়াচ্ছন্ন ঘরে খাটের ওপর পাশ ফিরে শোওয়া পুরুষটির কাছে এসে প্রায় স্বগতে গভীর কণ্ঠে বলেন, 'অতীশ দাসগুপ্ত।'

নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনে অতীশ এ পাশে ফেরে, গা ঘেঁসে দাঁড়ানো মহিলাকে, হাল্কা প্রসাধনের প্রলেপ মাখা পরিপূর্ণ একটি মুখকে দেখে চকিতে উঠে বসে। কত দীর্ঘ সময়, কত দীর্ঘ পল অনুপল বাদে একটি মুখ দেখল সে, একটি মানুষীর মুখ। উঠে বসে চোখ

জুড়িয়ে দেখতে থাকল সেই মুখ। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তিনি তাকিয়ে থাকেন, কৌতূহলী অতীশও অনেকক্ষণ বাদে উন্মুক্ত মুখ থেকে চোখ ফেরায় না। মহিলা তার সমবয়সী, কিন্তু জীবন যাপনের প্রক্রিয়াগত ভিন্নতার দরুণ অনেক সতেজ ও ঝকঝকে দেখায় তাকে। এই অন্ধকার ঘরে, এই অন্ধকার জগতে একে ঠিক মানায় না।

অতীশ উঠে বসায় তাকে জরিপ করতে সুবিধা হয়। তিনি দেখেন, মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে টাকের মত দেখা দিয়েছে, কানের পাশ ছাড়া বাকি চুলের রং বদলায় নি খুব। ভদ্রলোক যে চশমা পরেন তা বোঝা যায় নাকের দু'পাশে চোখের কাছটার ঘন কালো ছোপ থেকে। ওর কুতূহলী চোখে বয়সের গাম্ভীর্য, গভীরতা থমকে থামায় তাঁকে। তিনি তবু স্বগতে বলেন,'আপনি অতীশ দাশগুপ্ত?'

'হুঁ।' উদাসীন শোনায় সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'আমি অতীশ দাশগুপ্ত বলে একজনকে চিনতাম। এখন ঠিক মেলাতে পারছি না। পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, কত বদলে গেছি আমরা।' অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত মনে হয় তাঁকে।

এবার অতীশের পালা। ওই বিগত যৌবনা নারীর মধ্যে পরিচিত একজনকে আবিষ্কারের অভিযান চালানো। পঁয়ত্রিশ বছর শব্দটা অনুসন্ধানের একটি নির্দিষ্ট ক্লু অবশ্যই। বয়সের উজানে চলতে চলতে পঁয়ত্রিশ বছর আগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাম গাছে ঘেরা এক নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন সময়ের কথা আসে মনে। সেখানেই বনবালিকাদের মধ্যেকার একজন। কিন্তু তুমি কে, তুমি কে? ভাবতে ভাবতে অতীশ মহিলার গ্রীবাভঙ্গী লক্ষ্য করে, খুব গভীরভাবে তাকিয়ে থাকলে বাঁ চোখের কোণ কুঞ্চিত হয়। এবং সেই গ্রীবা, সেই কুঞ্চিত চক্ষু তাকে ঝরঝর বর্ষা দিনে আশুতোষ ভবনের প্রশস্ত বারান্দায় একটি তরুণীর কথা মনে পড়ায়। কিন্তু এই পরিবেশে এই বেশে, এই অন্ধকারে সে মেয়ের আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় অতীশেরই অন্য মন। অগত্যা অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে সে সেই রমণীর পরবর্তী কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

অধৈর্য তিনি বলেন, 'কী হাবার মত তাকিয়ে আছেন? আমি যে অতীশ দাশগুপ্তকে চিনতাম আপনি কি সে?'

অতীশ এবার গুটিয়ে নেয় নিজেকে, খুব আত্মস্থে বলে, 'ডোন্ট বি সিলি—। আমাকে এখানে আটকে রেখে এভাবে খোঁচাবার রাইট আপনার নেই। স্পষ্টই বলি আপনিই যদি আমাকে কিড্‌নাপ করার মক্ষীরানী হন তো আপনার সঙ্গে আমার কোনও পূর্ব সম্পর্ক থাকতে পারে না। আপনি আমার শত্রু।'

'ইয়েস, য়ু আর রাইট্। আয়্যাম ইন ইওর এনিমি ক্যাম্প—।'

অতীশের ভাল লাগে না এসব। এই মহিলা যে ওদের চক্রের এক জবরদস্ত সদস্যা এ অনুমান মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিষিয়ে যায় মন।

'প্লিজ, লিভ্ মি এ্যালোন।' বলে আবার শুয়ে পড়তে যায়।

'হ্যাঁ তুমি সেই অতীশ। সিক্সটি ফাইভ, ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি—। আমি কল্পনা; কল্পনা বোস ছিলাম।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীশ, যা ছায়া হয়ে, সন্দেহ হয়ে ঘুরছিল মনে তা যখন এমন বিপর্যয়কর সত্য হল তখন মনের ভেতরটা তোলপাড় করে ভেঙেচুরে একাকার করতে চাইল।

তাকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এই প্রৌঢ়ার মধ্যে তরুণী যুবতীটিকে খোঁজে, খোঁজে সেই মেয়েটিকে যে গানে গানে মাতিয়ে রাখতে পারত পুরো ডিপার্টমেন্টকে। ঐতিহাসিক নাটকে অভিনয় করার কালে অননুকরণীয় সহজাত গ্রীবাভঙ্গীতেই মাত করে দিত সবাইকে, সেই কল্পনার আজ একী রূপ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? শরীরকে ধরে রাখার, যৌবনকে বেঁধে রাখার চেষ্টার কৃত্রিমতায় মোড়া এক নারী। এবং তার চেয়েও বড় কথা—এক অপরাধচক্রের সক্রিয় সদস্যা সে।

এই বিরূপতার মধ্যেও অতীশের মনে হঠাৎই আশার ঝলক খেলে—পূর্ব পরিচয়ের খেয়া বেয়ে এবার হয়ত মুক্তি আসবে। এবং একথা ভেবেই অন্তরঙ্গে বলে সে, 'কল্পনা তোমরা আমায় ধরলে কেন? র‍্যানসাম যোগাবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? কত চেয়েছ তোমরা বল তো?'

কল্পনা মাথা নিচু করে থাকে। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে জবাব দেয়, 'প্রথমে একটা কথা তোমায় বলি। বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। তোমার কিড্‌ন্যাপিং-এর মধ্যে আমার কোনো হাত নেই। তুমি যেখানে আছো সেটা আমার বাড়ি এই পর্যন্ত। ওদের সঙ্গে অবশ্যই আমার যোগ আছে, কিন্তু কিড্‌ন্যাপিং-এ আমার অংশ নেই।'

'মানে তুমি কেবল তোমার বাড়িতে লুকিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছ। কেউ বিশ্বাস করবে তোমার এ বাহানা?'

'দ্যাট্‌স্ আপটু দেম। কিন্তু তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলব না। আর দু' নম্বর কথাটা আরো ড্রামাটিক, ওরা তোমাকে ভুল করে ধরে এনেছে। একজন বড় ব্যবসায়ীকে কিড্‌ন্যাপ করতে গিয়ে ভুলে, ইন্‌ফর্মারের চোখের ইশারা ঠিকমত বুঝতে না পারায় তোমাকে তুলে এনেছে।'

এবার কল্পনার কথার বিন্দু-বিসর্গ কিছু বুঝতে পারে না অতীশ। সব কিছু অলীক, দিবাস্বপ্ন বলে মনে হয়, অথবা বেশি ঘুমের ওষুধ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া। সামনে বসে থাকা কল্পনা যে আদৌ পয়ঁত্রিশ বছর আগেকার সেই ছিপছিপে মেয়েটি তা ভাবতেও কষ্ট হয়। 'ধ্যাত্, এসব নাটুকেপনা জীবনে হয় নাকি' নিজেকে নিজেই যেন বলে সে।

'হয় তা দেখতে পাচ্ছি। অতীশ আমিও কি তোমার নাম, ঠিকানা জানার আগে এসব ভাবতে পেরেছিলাম? 'বস' যখন আজ আমায় জানাল কথাটা তখন সবকিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেলাম আমাদের এক কনট্যাক্ট-এর কাছে। যাকে আনার কথা ছিল তার ছবিও দেখলাম—এত মিল না তোমার সঙ্গে যে ইন্‌ফর্মারারের ইশারার ভুলকে ভুল বলে মনে হয় না।'

'তাই নাকি?' এবার সরল, হাল্কা স্বর বেরোয়।

'তাছাড়া, তুমি সেদিন থ্রি-পিস্ পরতে গেলে কেন? ব্যাঙ্কের এক কেরানির পক্ষে থ্রি-পিস্ পরে রাত দশটায় কমলালয় থেকে গাড়ি করে বেরোনো কি স্বাভাবিক বলে মনে হয় তোমার?''

এবার আবার সেদিনটির কথা মনে হয় অতীশের। ইন্দ্রানী জোর করে ঐ স্যুটটা বানিয়ে দিয়েছিল তাকে। 'ক'দিন আগে শশাঙ্কের ছেলের বিয়েতে সে ওটা পরে গিয়েছিল। একটু পুরানো করে পরে আবার কেচে ধুয়ে রেখে দেবার জন্য সেটা পরেই কাটিয়েছে অতীশ। একটা পোশাক যে এমন বিভ্রাট ঘটাতে পারে কে জানত?

'তা, এখন কী হবে?' ঘুরে ফিরে নিজের প্রসঙ্গে আসে অতীশ।

'এখন কী হবে আমি জানি না। সবার মাথার ওপরে আছেন 'বস', ওল্ড-গার্ড, তিনিই জানেন তোমার কী হবে।'

ভয় পেয়ে যায় অতীশ। কল্পনাকে দেখে যে ভরসা হয়েছিল এক লহমায় তাতে সংশয়ের ছায়াপাত হয়। খুব সন্দিগ্ধ শোনায় তার কথা, 'তুমি জানো না?'

'শোন অতীশ, আমি এ পাঁকে জড়িয়ে গেছি। এ থেকে বেরোবার পথ মৃত্যু। তোমার ফেট্ আমি ঠিক করব না, এসব কেসে আমার কাজ বাড়িটাকে ইউজ করতে দেওয়া এর বেশি কিছু না।'

'এর বেশি কিছু না?'

'না, অতীশ এর বেশি কিছু করতে বা জানতে যাওয়ার অর্থ একটাই—।'

'কল্পনা, তুমি কী সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে। তুমি আমাদের রি-য়ুনিয়নে চিত্রাঙ্গদা সেজেছিলে মনে আছে?' ক্লান্ত, ধ্বস্ত শোনায় অতীশের গলা।

'হ্যাঁ, সেজেছিলাম—চিত্রাঙ্গদা।'

'মনে আছে? সুচিত্রা মিত্র তোমার নাচে-গানে তুষ্ট হয়ে চিবুক ধরে চুম্বন দিয়েছিল?'

'তোমার এত মনে আছে আমার সম্পর্কে?'

'মনে থাকবে না কেন ওই চুমুটা তো একা তোমার জন্য ছিল না, সিক্সটি ফাইভ্-এর পুরো ব্যাচ্‌টার জন্যই ছিল।' বলে অতীশ ভাবে, এইভাবেই তো কালচার ব্যক্তি থেকে সমষ্টির সম্পদ হয়ে যায়।

'হ্যা, অতীশ সে তো অনেক দূরের আমি, অনেক দূরের তুমি। বাদ দাও ওসব কথা, এখন তো আমার আর এক সাজ। আমাকে জয়শ্রীর সাজে সাজতে হয়েছে, আমি এখন জয়শ্রী কপুর।'

'ফ্রম মুম্বয়?'

'ইয়েস স্যার, ফ্রম, মুম্বাই। একটা কথা জেনে যাও—কল্পনা বিশ বছর আগেই দুই ছেলেকে বাপের কাছে রেখে একটা ফিল্ম পার্টির সঙ্গে বোম্বে পাড়ি দেয়। ওই ফিল্মওয়ালারা ফলতায় নদীর পাড়ে শ্যুটিং করতে এসেছিল, শ্যুটিং স্পট কল্পনার বাড়ির একেবারে কাছে। তারপর নানা ঘাট ঘুরে এখন এই জয়শ্রী কপুর'।

'তা মিষ্টার কপুরটি কোথায়? অতীশ লোভ সামলাতে পারে না।

রিন্‌রিন্ শব্দে হেসে ওঠে কল্পনা। একেবারে পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই মেয়েটি যেন, 'আরে মিস্টার বলে কেউ নেই। নামটার একটা পদবী তো লাগে, তাই কপুর। একা এক মেয়ে কপুর।'

এরপরে অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকে দু'জনে। কেউ তারা স্মৃতিতে যায় না। দু'জন দু'জনকে দেখে কেবল।

'শরীর, শরীর, একটা বড় ফ্যাক্টর অতীশ। এখনও মনে হয় এই শরীর ছাড়া আমার আর কিছু নেই।'

'তাই এ বয়সেও শরীরের দিকেই তাকাও বেশি।'

'এক্‌জাক্টলি সো অতীশ। আমাদের মন বলে কিছু থাকে না, মন একটা বানানো কথা মাত্র।'

'তবে তুমি আমাকে দেখতে এলে কেন? এ তো তোমার ডিসিপ্লিনের বাইরে।'

ধরা পড়ে যাওয়ার বিব্রতভাব ফোটে কল্পনার, 'ঠিকই বলেছ, তোমাকে একবার দেখার লোভ দমন করা উচিত ছিল আমার।' বলে তেমনভাবেই বসে থাকে জয়শ্রী, খেদ ফোটে তাঁর কণ্ঠে, 'কিন্তু আমার কিছু করার নেই। ওরা তোমায় গুমও করতে পারে, ছেড়েও দিতে পারে, ওটা ওদের মর্জি।'

'মেরে ফেলতে পারে?'

'পারে, ছাড়া পেলে তুমি তো পুলিসকে অনেক কিছু বলতেই পার, সরিয়ে দিলে সে ঝামেলা থাকে না।'

'জেনেও তুমি ওদের কিছু বলবে না?'

'না, ওটা আমার এক্তিয়ারে নেই। অতীশ তোমার জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন চলে যাক এ আমি নিশ্চয়ই চাইব না। তুমি বাইরে গেলে আমাকে ধরিয়ে দিতে কসুর করবে না, করবে?'

'জানি না, কল্পনা।'

'কল্পনা নয়, জয়শ্রী, জয়শ্রী কপুর।'

'ওসব নাটক-সিনেমায় হয়। এখানে হয় না। তোমার জীবন-মরণ এখন ওদের হাতে।' বলে জয়শ্রী উঠে দাঁড়ান, দরজার দিকে এগোন, তারপর কী মনে পড়ায় ফিরে এসে অতীশের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, 'ডোন্ট মাইণ্ড বয়, এহি দুনিয়া। তোমাকে আজ রাতে ওরা এখান থেকে নিয়ে যাবে। তার আগে এসো আমরা দু'জনে একসঙ্গে ডিনারটা খাই। ডু য়ু এ্যাক্সেপ্ট মাই ইন্‌ভিটেসান?'

অতীশ তাকিয়ে থাকে এই নারীর মধ্যে অন্য একজনকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করে ক্লান্ত ক্লান্ত হতে হতে মাথা নাড়ে, ইয়েস্ আই এ্যাক্সেপ্ট্ ইট্।

স্মৃতি-আলেখ্য

# সেকালের কথা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

# সেকালের কথা

## রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীমান বাসব সরকার যখন শারদীয় 'পরিচয়'-এর জন্য আমাকে আমার স্মৃতিকথা লিখিতে বলিলেন তখন ভাবিলাম আমার স্মৃতিকথার মূল্য কি? কিন্তু পরে ভাবলাম স্মৃতিকথা ঠিক আমার কথা নহে। ইহা অতীতের কথা, সেই অতীত সকলের। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে সেই অতীতের কথা উজ্জ্বল করিয়া, সরস করিয়া উপস্থিত করিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা। আমার ধারণা নাই। বিশেষ করিয়া রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' বা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' পড়িবার পর আর এইরকম রচনা সৃষ্টি করিবার সাহস হয় না। সম্প্রতি দুইজন বাঙ্গালী লেখকের স্মৃতিকথা আংশিক পড়িয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে আত্মস্থ না হইয়া আত্মকথা লেখা বিপজ্জনক।

তবুও শ্রীমান বাসবের প্রস্তাবে যে সম্মত হইলাম তাহার কারণ বলি। প্রথম কথা পরিচয়ের মত একটি বিদগ্ধ পত্রিকায় লিখিবার সুযোগ হারাইতে চাহিলাম না। কোন বাংলা পত্রিকায় লিখিবার সুযোগ পাই না। মাঝে মধ্যে ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি। কিন্তু ইংরাজি লিখিয়া আনন্দ পাই না। বরং বলিতে পারি ইংরেজি লিখিতে ভয় হয়। ভাল বাংলা লিখি না, কিন্তু নির্ভয়ে বাংলা লিখি। আর লিখিয়া আনন্দ পাই।

আর একটি কারণে এই স্মৃতিকথা লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। সেই কারণটি এই যে আমার অনেক সময় দুঃখ হয় যে অতীত যখন বর্তমান ছিল তখন তাহার মাহাত্ম্য যেন উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাহার অবশ্যই তুলনা নাই। কিন্তু সেই অতুলনীয়তা কি তখন বুঝিয়াছি? এখন বুঝিতেছি। এবং এখন অতীতের সেই মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া শান্তি পাইতে পারি। মনে হয় যাহা দেখিয়াছি এবং যাহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি তাহা মনে করিয়া বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতায় দুঃখ কথঞ্চিৎ দূর হইবে। ৮৬ বছর বয়সে আমার মনের ভাবটি বাল্যকালে পড়া একটি ইংরাজি কবির কথায় বুঝাইতেছি—

> I feel like one
> Who treads alone
> Some banquet hall deserted,
> Whose lights are fled
> Whose garlands dead
> And all but he departed.

সত্যই সহপাঠী সহকর্মী বা সমসাময়িক মানুষ কেহই বড় বাঁচিয়া নাই। স্মৃতিলোকে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের দেখা পাইব।

### পৈত্রিক ভিটা

প্রথমেই আমাদের গ্রামের কথা বলি। এই গ্রামটিকেই আমার দেশ বলিয়া জানিতাম। পূজার

সময় গ্রামে যখন যাইতাম তখন বলিতাম দেশে যাইতেছি। বঙ্গ আমার জননী আমার, ভারত আমার ভারত আমার—এই ভাবটি যেন তখন ঠিক ছিল না। স্বাদেশিকতার পথে সেই ভাব ক্রমে অর্জন করি। তখন গ্রামেই যেন বঙ্গজননীকে দেখিতাম। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় স্থানীয় ঠিকানা লিখিতাম কলিকাতার ঠিকানা। Home address-এর ঘরে লিখিতাম মাহিলাড়া, বরিশাল।

## মাহিলাড়া

বরিশাল শহরের বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই গ্রাম মাহিলাড়া। আমাদের থানা ছিল আরও পাঁচ মাইল দূরে গৌরনদী। আমরা বলিতাম আমরা উত্তর বাখরগঞ্জের মানুষ। গ্রামটি আয়তনে সুবৃহৎ ছিল এমন বলিতে পারি না। এইজন্যই বোধহয় আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। একটি খাল আমাদের গ্রামটিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছিল। আমাদের ভাগকে বলা হইত দক্ষিণপার। অন্য ভাগটি উত্তরপার। কিন্তু এই খাল গ্রাম্য সমাজকে বিভক্ত করে নাই। District Board-এর কাঠের সেতু পার হইয়া দক্ষিণপারে যাইতাম। কিন্তু তখন এমন বোধ হইত না যে ভিন্ন গ্রামে আসিয়াছি।

আমাদের গ্রামে কেহই বড় ধনী ছিলেন না। আমি মাত্র একখানি ইটের অর্থাৎ পাকা বাড়ী দেখিয়াছি। এই বাড়ীর নাম ডাক্তার বাড়ী। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন এই বাড়ীর মানুষ। তিনি আমাদের এই গ্রামটিকে এমন ভালবাসতেন যে তিনি যখন কলিকাতায় গৃহনির্মাণ করিলেন সেই গৃহের নাম দিলেন 'মাহিলাড়া।' ছয় নম্বর ডোভার লেনের এই বাড়ীটিতে এখনও শ্বেতপাথরে খোদাই করা এই মাহিলাড়া নামটি দেখা যাইবে।

এখন মাহিলাড়া সম্বন্ধে আমার অনুভবের কথা বলি। ১৯৪২ সালে যখন জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থখানি পড়ি তখন মনে হইয়াছে এই রূপসী বাংলার ছবি আমাদের মাহিলাড়ার ছবি। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' পড়িয়াও আমার এই কথা মনে হইয়াছে। আমার গ্রামে যেন আমি রৌদ্রবসনী বঙ্গমাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার এই গ্রামেই কল্মির গন্ধে ভরা জলে ভাসিয়াছি। আসলে গ্রামের কথা মনে হইলে এখন জলের কথাই বেশী মনে হয়। বর্ষাকালে সমস্ত গ্রামটি জলে ভরিয়া যাইত। কলার ভেলায় এ বাড়ীর মানুষ ও বাড়ীতে যাইত। একবার আমার ছোট দাদুকে দেখিয়াছি বাড়ীর উঠানের জলে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছেন। আবার রৌদ্রময় গ্রামও দেখিয়াছি। তবে গ্রামের পথ এমন বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ যে রৌদ্রের তাপ বড় সহিতে হয় নাই। প্রকৃতির ওই স্নিগ্ধতা আমি গ্রামের মানুষের আচরণেও লক্ষ্য করিয়াছি, এই গ্রামের মানুষের কাছে যে স্নেহলাভ করিয়াছি তাহা এখনও ভুলিতে পারি না।

এখন আমাদের বাড়ীর কথা বলি। একটি বড় উঠানের চারিপাশে চারিপোতা। যে গৃহে আমরা পূজার সময় বাস করিতাম তাহার পোতা মাটির। বেড়া হোগ্লার, চাল টিনের। অন্যান্য পোতার ঘরগুলিও এইরূপ। দক্ষিণে রান্নাঘর। অন্যদিকে হবিষ্য রান্নার ঘর, আর সামনে পুবের ঘর। উঠান পার হইয়া বাঁদিকে গোঁসাই ঘর এবং মণ্ডপ। অন্যদিকে সুপারী আর নারিকেল গাছ। বাড়ীর এই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের পর পুষ্করিণী। তবে একটি কথা এখানে বলিতে পারি যে আমাদের গ্রামে গাছপালা অনেক কিন্তু কোথাও কোন উদ্যান নাই। একথা

প্রায় সকল বাড়ী সম্বন্ধেই বলিতে পারি। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেক বাড়ীর গৃহস্বামী কলিকাতাবাসী। পূজার সময় দুই কি তিন সপ্তাহের জন্য গ্রামে আসেন। উদ্যান সৃষ্টি করার সময় কোথায়? তবে গ্রামের প্রকৃতির মূর্তি বড় সুন্দর। বট, অশ্বত্থ গাছ বড় দেখি নাই। তবে আম, জাম, কাঁঠাল গাছের অন্ত নাই। ফুলের কেয়ারী নাই, কিন্তু শরৎকালে শেফালীর গন্ধে সমস্ত গ্রাম ভরিয়া যাইত। জবা এবং স্থলপদ্ম গ্রাম্যপথের শোভা বাড়াইত। সাজান বাগান গ্রামে দেখি নাই, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি। কখনও মনে হয় নাই চারিদিকে কেবল জঙ্গল।

## কবিরাজ বাড়ী

আমাদের বাড়ীর নাম 'কবিরাজ বাড়ী'। আমার পিতা বা পিতামহ কবিরাজ ছিলেন না। কিন্তু আমার প্রপিতামহ হৃদয়কৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচন্দ্র এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ রামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন। আমার পিতামহী কামিনীসুন্দরী যে কবিরাজের পুত্রবধূ ছিলেন তাহা আমি কলিকাতার বাড়ীতে বেশ বুঝিয়াছি। আমাদের ভাই বোনদের অসুখবিসুখে ডাক্তার বড় আসিত না। ঠাকুমা নানারকম টোট্‌কা আমাদের সেবন করাইতেন। যেমন চুনের জল, খয়েরের জল, তুলসী পাতার রস, শেফালী পাতার রস ইত্যাদি। তিনি আবার হরিতকী বাটিয়া তাহাতে আবার অন্যান্য উপাদান যোগ করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিতেন, সেই বড়ির নাম ছিল ভুক্ত-পাক। আমরা আহারের পর কখনও কখনও এই ভুক্ত পাক চুষিয়া খাইতাম। আমি যে বরিশালের ভাষা খুব ভাল জানি তাহার কারণ ঠাকুমা ঐ ভাষাতেই কথা বলিতেন। কথার মধ্যে কত প্রবচন, কত শোক থাকিত। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট হইত। মনে হইত কথাগুলি যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। ঠাকুমার কাছে আমি আমাদের পরিবারের অনেক কথা শুনিয়াছি। আমার পিতামহ পূর্ণচন্দ্র দাশগুপ্ত যখন কলিকাতায় পরলোক গমন করেন তখন ঠাকুমার ষাট বৎসর বয়স। ইহার পর ছাব্বিশ বছর তিনি আমাদের কলিকাতার সংসার চালাইয়াছেন, কোনদিন ভাবি নাই পিতামহী অসম্পূর্ণ, বিধবা। মনে হইয়াছে তিনি এক সম্রাজ্ঞী, আমার পিতা নলিনাক্ষ দাশগুপ্ত তাঁহার মাসের বেতন ঠাকুমার হাতে দিতেন। পিতা মনে করিতেন যৌথ পরিবারে ইহাই সমীচীন। ঠাকুমা পূর্বকথা বড় বলিতেন না। কিন্তু আমার পিতামহ সম্বন্ধে ইনি একটি কথা আমাকে বলিয়াছেন। তখন আমি কলেজে পড়ি। একদিন ঠাকুমা বলিলেন। তোর দাদু এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি বরিশালের ভোলাগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আসিয়া তিনি আহারের পর ঘরের বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন। যত ছেলেমেয়ে বাড়ীর উঠানে আসিত তাহাদের ডাকিয়া ইংরাজি বাংলা পড়াইতেন। পড়া হইয়া গেলে ঠাকুমাকে বলিতেন ইহাদের হাতে লাড়ু দাও। ঠাকুমা নাকি মাঝে মাঝে বলিতেন এত লাড়ু কোথায় পাইব? সেইদিন আমি হাত জোড় করিয়া দাদুকে প্রণাম জানাই।

আমার জন্ম ১৯১৫ সালের ১১ই জুলাই মধ্য কলিকাতার ৪/১ বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে। বাড়ীটির সামনে আদি সিটি কলেজ। অন্যদিকে কলেজ ষ্ট্রীটের রাস্তা। দাদু যখন ১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন আমার বয়স চার বছর তিন মাস। দাদুর চেহারা মনে আছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। কণ্ঠস্বর মনে নাই। তিনি

যে আমাকে সকালবেলা পড়াইতেন তাহাও মনে নাই। তবে নিমতলা শ্মশানঘাটে বড়মার কোলে বসিয়া তাঁহার চিতায় একখণ্ড চন্দন কাঠ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহা বেশ মনে আছে। এখানে দাদুর সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে পারি। আমি যখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া আমার পিতাকে প্রণাম করিলাম তিনি তাঁহার পা দুখানি সরাইয়া লইয়া আমাকে বলিলেন আজ তোমার এই সাফল্যে তোমার দাদুর যে আনন্দ হইত সেই আনন্দ আর কাহারও হইতে পারে না। তিনি বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যরসিক মানুষ ছিলেন। তিনি নাই কিন্তু তাঁহার পরম সুহৃদ যামিনী সেন এখনও বাঁচিয়া আছেন। তুমি তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আর সকলকে প্রণাম করিবে।

আমি কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন তোমার দাদু লেখা-পড়া বড় ভালবাসিতেন। দাদু সম্বন্ধে মাহিলাড়ার অনেকের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি। সকলেই দাদুর ভদ্রতা ও চরিত্রবলের কথা বলিতেন। মাহিলাড়ার রায়বাহাদুর গোপাল সেন যখন বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের মানুষ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিল। গোপাল সেন এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইলেন না। তখন গোপাল সেনের বাড়ীতে একটি বিবাহ উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। গ্রামের লোক বলিলেন সেই বিবাহে তাহারা কেহ গোপাল সেনের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিবে না। আমার দাদু এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

এখানে গোপাল সেনের পরিবারের কথা বলিতে পারি। গোপাল সেনের দাদা অনন্ত নারায়ণ চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী উর্মিলা দেবীকে বিবাহ করেন। মাহিলাড়ার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের নাম 'অনন্তনারায়ণ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।' গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বাল্যকালে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে কত দেখিয়াছি। ইংরাজি, বাংলা এবং সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাই তিনি পড়াইতেন। একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাঁহার দৃঢ় চিত্ততার জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

মাহিলাড়া একটি ক্ষুদ্র, প্রায় দরিদ্র গ্রাম। কিন্তু শিক্ষায় এই গ্রামের সুনাম ছিল। অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচ জন মাহিলাড়াবাসী উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজিতে M.A. Degree অর্জন করিয়া তিনি Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের Honours Degree লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন ইহা জানিয়া আমি খুব বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি বহুকাল দিল্লির হিন্দু কলেজের ইংরাজির অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আমার বাবার প্রতি তাঁহার একটা বেশ টান ছিল। সেই জন্যে তিনি আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে বেশ কয়েকবার আসিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন Oxford-এ ইতিহাসের research degree লাভ করেন ১৯২৮ সালে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির প্রধান অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের গ্রামের মানুষ। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির Ph.D। আমাদের গ্রামের আর একজন ইংরাজির পণ্ডিত সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত Leeds বিশ্ববিদ্যালয়ের Lascelles Aber crombie র তত্ত্বাবধানে E. B. Yeats সম্বন্ধে thesis লিখিয়া Ph. D পাইয়াছিলেন। বহুকাল রংপুর কলেজের অধ্যাপনা করিয়া ইনি দেশবিভাগের পূর্বেই কলিকাতায় আসিয়া Ripon কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়া

আমি চমৎকৃত হইতাম। এমন স্মরণশক্তি একমাত্র প্রাচীন পন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতের মধ্যেই দেখিয়াছি। সংস্কৃত রামায়ণ হইতে অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। অশোকের অনুশাসনের বহুলাংশ সুধাংশুশেখরের মুখস্থ ছিল। গ্রামে সুধাংশুশেখরের গৃহের নাম ছিল নয়াবাড়ী। একবার পূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল, এবং একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি লেপ সরাইয়া আমাকে বলিলেন এই বৃষ্টিতে যেন কিছুতেই মন বসাইতে পারিতেছিলাম না, সেই জন্য একটু differential calculus কষিতেছিলাম। ইংরাজির অধ্যাপক differential calculus কষিতেছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি যখন অক্সফোর্ড-এ ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের ইংরাজির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন F. P. Wilson। ইনি তিনের দশকে Leeds বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানিয়া আমি তাঁহাকে সুধাংশুশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন Sengupta Ph. D.র ছাত্র হিসাবে পাণ্ডিত্যে বহু অধ্যাপকের সমকক্ষ ছিলেন।

মাহিলাড়ার সুধীরকুমার দাশগুপ্ত Scottish Church কলেজের বাংলার খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। আমি চার বছর তাঁহার ছাত্র ছিলাম। কলিকাতার নানা কলেজ হইতে বহু ছাত্র তাঁহার ক্লাশে আসিয়া বসিত। বাংলা সাহিত্যে আমার কোন ব্যুৎপত্তি নাই। কিন্তু এই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে অনুরাগ তাহা সুধীর দাদাই আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উচ্চারিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনেক লাইন আমার কানে এখনও বাজিতেছে। তাঁহার মুখে—

বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।

এখনও কানে বাজিতেছে। ইংরাজির ছাত্র হিসাবে তখন আমার মনে হইয়াছে এমন হৃদয়স্পর্শী লাইন যেন Milton-এর Paradise Lost-এও বিরল।

সুধীর দাদার এক বিশিষ্ট ছাত্র শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলা ভাষার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। যদিও শশীভূষণ বরিশালের চন্দ্রহার গ্রামের মানুষ, ইনি মাহিলাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিয়া আমাদের অনন্তনারায়ণ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমি শশিবাবুকে মাহিলাড়ার মানুষ বলিয়াই জানি।

মাহিলাড়ার অনেক কাহিনী সুরেন সেনের মুখে শুনিয়াছি। সেই সকল কাহিনী উপস্থিত করিয়া এই প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে চাহি না। তবে গ্রামের মানুষের কৌতুকপ্রিয়তা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে পারি। মাহিলাড়ার নুঠু (ভাল নাম জানি না) ছিলেন গ্রামের চারণ কবি। তাঁহার কবিতা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন তাঁহার কাব্যপ্রতিভা এক নূতন মোড় লইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কাব্যের নূতনত্ব কোথায়? তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন ইহার নূতনত্ব ইহার আধুনিকতা। এই কাব্যের একটি নমুনা হিসাবে তিনি শুনাইলেন—

তাল গাছে কুমিরের বাসা
উড়িয়া বেড়ায় গরু
বেড়া ভাইঙ্গা পালাইয়া গেল
ভেদী মাঝের ঝোল

সুরেন সেন মাহিলাড়ার গ্রাম্য ছড়ার কয়েক পংক্তি আমাকে শুনাইয়াছিলেন—

ও ভাই তারিণী, ছাগলে কামড়াইলে মাইন্‌ষে বাঁচেনি
তানা নানা না
ছাগলে কামড়াইলে মাইন্‌সে বাঁচে না।

## স্বদেশিকতা

মাহিলাড়া হইতে মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণে বাটাজোড় গ্রাম। এই গ্রামের অশ্বিনী দত্ত স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রধান পুরুষ। তাঁহার স্বাদেশিকতা আমাদের গ্রামে বহু মানুষকে প্রভাবিত করিয়াছে। আমি অশ্বিনী দত্তকে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক কথা আমাদের গ্রামবাসীদের মুখে শুনিয়াছি। মাহিলাড়ার বাজার বাটাজোড়ের বাজার। পূজার সময় যখন বাজারে যাইতাম তখন অশ্বিনী দত্তের বাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিতাম। দুইজন মাহিলাড়াবাসী বিশেষভাবে অশ্বিনী দত্তের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন সত্যপ্রসাদের পিতা অনন্তকুমার সেন। অনন্তকুমার সংকলিত 'স্বরাজ গীতা' এককালে ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে নিত্যপাঠ্য পুস্তক হিসাবে সমাদৃত ছিল। ইংরাজ সরকার কর্তৃক পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। অনন্তকুমারের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। রমাপ্রসাদ রায় লেনে তাঁহার বাড়ীতে বহুবার গিয়াছি। আর একজন হীরালাল দাশগুপ্ত। তিনি ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বছর। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হীরালাল গ্রেপ্তার হন। ১৯২১ সালে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বরিশালে কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। হীরালাল দাশগুপ্ত লিখিত 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল' সেকালে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। মাহিলাড়ার নাট্যাভিনয়ে আমি হীরালাল দাশগুপ্তের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

মাহিলাড়ার বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইনি যখন যুগান্তরের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন তখন যুগান্তরের দপ্তরে প্রায়ই যাইতাম। বাহিরে গম্ভীর হইলেও তিনি কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিজয়কাকা আমাকে যুগান্তরে লিখিতে বলিতেন, তখন পর্যন্ত কোন প্রবন্ধ কোন পত্রিকায় পাঠাবার সাহস হয় নাই।

কলিকাতায় মাহিলাড়াবাসীদের যে স্নেহ ও আদর পাইয়াছি তাহা বোধহয় আর কোথাও পাই নাই। এই বিষয়ে একটি গল্প বলিতে পারি। কলিকাতায় মাহিলাড়া সেবা সমিতি বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। আমি সেই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ছিলাম। একদিন ডোভার লেনে সুরেন সেনের বাড়ীতে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিতে গিয়াছি, সুরেন সেন একটি টাকা দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি আহার করিয়া আসিয়াছি কিনা। তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম বাসায় ফিরিয়া আহার করিব। তিনি বলিলেন, সর্বনাশ, একটার সময় তুমি যদি এখানে না খাইয়া যাও তাহা হইলে তোমার বাবা আমাকে আস্ত রাখিবেন না। একতলায় আসিয়া রান্নাঘর খুলিলেন এবং স্ত্রীকে আমার আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আহার শেষ হইলে আমাকে বলিলেন, বাবারে কইস আমি খাইয়া আসছি। সুরেন সেন বড় হৃদয়বান মানুষ ছিলেন। ১৯৩৭ সালে আমি আশুতোষ বিল্ডিং-এর একতলায়

দেখিলাম তিনি যেন পাগলের মত হাঁটিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া দাও। শুনিলাম তাঁহার ভাই ফোন করিয়া জানাইয়াছেন তাঁহাদের মা বিশেষ অসুস্থ। আমি দৌড়াইয়া একটি ট্যাক্সি ধরিয়া দিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। সুরেন সেন আমার পিতার বাল্যবন্ধু। এই দুইজনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা ভাবিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে British Indian Street-এ পিতার অফিসে চলিয়া গেলাম। ইনি সব শুনিয়া বলিলেন নিশ্চয়ই সুরেনের মা আর নাই। আমরা দুইজনে সুরেন সেনের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলাম সুরেন সেন তাঁহার ঘরের মেঝের উপর শুইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন। আমরা দুইজনে সেই রাত্রে শবানুগমন সারিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

সুরেন সেন যে কত মাতৃগত প্রাণ ছিলেন তাহা ইহার বার বৎসর পরে দিল্লিতে বুঝিয়াছিলাম। আমি তখন দিল্লির হিন্দু কলেজে কাজ করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে Lancer's Road-এ অধ্যাপক দিলীপকুমার সান্যালের বাড়ীতে বাস করি। একদিন সকালে সুরেন সেনের গলা শুনিলাম, ডালি মহারাজ উঠ্ছ। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলে উনি বলিলেন কইছি। উনি যে ঠিক কি হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। উনি বলিলেন কাল রাত্রে সংবাদ পাইলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Visitor আমাকে Vice-Chancellor নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা ইহার পর ব্রীজের উপর দিয়া অনেকক্ষণ হাঁটিলাম। সুরেন সেন তাঁহার মায়ের কথা বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, এমন মাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে হয় কিনা। ইহা বলিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সুরেন সেনের মায়ের সম্বন্ধে একটি কথা বলিলে পাঠক বুঝিবেন মাহিলাড়ার প্রাচীনারা কেমন মানুষ ছিলেন। সুরেন সেন তাঁহার মৃত্যুর কিছু আগে ডোভার লেনের বাড়ী নির্মাণ করেন। একদিন সকালে আমার বাবা সেই বাড়ী দেখিতে গেলেন। বাবা ফিরিয়া আসিয়া আমার ঠাকুমাকে যে কথা বলিলেন তাহা আমি শুনিলাম। বাবা বলিলেন, সুরেনের মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম বাড়ীটি বড় সুন্দর হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সুরেনের মা বাবাকে বলিলেন, ইহাতে আমার পুরা সুখ হয় নাই। তুই যেদিন বাড়ী করবি, সেইদিন আমার পুরা সুখ হইবে।

মাহিলাড়া গ্রামের সকল মানুষ যেন এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই বিষয়েও পাঠককে একটি কাহিনী শুনাইতে পারি। ১৯৪১ সালে আমি যখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করি তখন মাহিলাড়ার প্রায় সমস্ত কলিকাতাবাসীরা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমি ইংরাজিতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিলে সকলেই আমাকে বাহবা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার এই প্রাপ্তির মধ্যে একটি মিথ্যা আছে। সেই মিথ্যা আমি করি নাই, কিন্তু ইহা আমার জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। যে অর্থে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইংরাজির P.R.S. আমি সেই অর্থে ইংরাজির P.R.S. নহি। ইংরাজির P.R.S-এর প্রবন্ধ বরাবর বিলাতে পরীক্ষিত হইত। আমি ১৯৪০ সালে আমার প্রবন্ধ দাখিল করি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post-graduate বিভাগে ইংরাজির tutor। একদিন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ গিয়া একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার প্রবন্ধ পাঠান হইয়াছে কিনা। ভদ্রলোক বলিলেন Syndicate-এর নির্দেশ অনুসারে কোন thesis বিলাতে পাঠান হইবে না। জাহাজ যদি জার্মান সাবমেরিন ডুবাইয়া দেয় তাহা হইলে thesis খোয়া যাইবে। আমি বলিলাম,

জাহাজ যদি বিলাতে পৌঁছায়ও তাহা হইলেও ইংরাজ পরীক্ষক আমাকে ডুবাইবে। এ
কথা কেন বলিলাম তাহা সকলকে জানাইয়া একটু শান্তিবোধ করিতে পারি। আমার thesi
এর বিষয় ছিল Madieval Heritage of Elizabethan Comedy। এই বিষয় সম্ব
আমার কোন অধ্যয়ন ছিল না। একটা অস্পষ্ট বোধ ছিল। Thesis লিখিতে আরম্ভ করিব
পূর্বে বিষয় সম্বন্ধে একটি গ্রন্থপঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম ঐ তালিক
অধিকাংশ গ্রন্থই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বা Imperial Library-তে
Presidency কলেজে নাই। তবুও ক্রমে ক্রমে thesisটি লিখিলাম তাহার কারণ এই
M.A. পরীক্ষায় যে গবেষণাবৃত্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার একটি শর্ত ছিল এই যে এ
বৃত্তির ছয় বৎসর পর একটি গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিতে হইবে। আমি এ
শর্ত পালন করিলাম যদিও জানিতাম যে আমার thesis পাশ হইবে না। দুইজন বাঙ্গা
ইংরাজি অধ্যাপককে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা আমার thesis পাশ করিলে
তাঁহারা যে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না তাহা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই জানিতেন। যা
হউক, আমার এই সাফল্যে আমার গ্রামের মানুষ আনন্দিত হইলেন। সেই বছর পূজায় আম
বাড়ী যাইতে পারি নাই। কিন্তু মাহিলাড়ায় মানুষ গ্রামের সরকার বাড়ী প্রাঙ্গণে আমার পিতা
অভিনন্দন জানাইয়া এক প্রস্তাব পাশ করিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন বরিশ
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন, সুধীর দাদা প্রস্তাবটি আমার পিতাকে ডা
পাঠাইয়াছিলেন। আমার thesis হারাইয়াছি, এই অভিনন্দনপত্র হারাই নাই। প্রেমচাঁদ রায়চাঁ
বৃত্তিলাভের ইতিহাস যাহাই হউক এই পত্রখানি আমার এক পরম সম্পদ।

মাহিলাড়া গ্রাম সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। এই গ্রামে
মানুষের কেমন স্নেহ লাভ করিলাম, ইহাদের কাছে অনেক শিখিয়াছি। ইহাদের অনেকে
কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় নাই। Scholarshi
কাহাকে বলে তাহা সুরেন সেনের কাছে শিখিয়াছি। সুরেন সেনের বিদ্যার এক ভগ্নাংশ
অর্জন করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ আমার মধ্যে অবশ্যই সঞ্চারিত হইয়াছি
একদিন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি Noel Coward-এর আত্মজীবনী পড়িতেছে
মারাঠা ইতিহাসের পণ্ডিত এক অতি আধুনিক ইংরাজি নাট্যকারের আত্মকথা পড়িতেছে
দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। তিনি ইহা বুঝিয়া বলিলেন যে বইখানি আমি আনি নাই
প্রতুল আমাকে পড়িতে দিয়াছে। প্রতুল গুপ্ত সুরেন সেনের প্রিয় ছাত্র। তিনিও মারাঠা ইতিহ
সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। সুরেন সেন বড় বিনয়ী মানুষ ছিলেন। একদিন বলিলেন কে
এক অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে Sir Jadunath Sarkar-এর তুলনা করিয়াছেন। উনি বলিলে
দুইটি নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করা ঘোর অন্যায়। তিনি আমাকে কতভাবে উৎসাহিত করিয়াছে
এবং কতরকম ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন তাহার হিসাব নাই।

সুধীর দাদা আমার গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগ তিনি
আমার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র অবশ্যই হইতে পারি নাই। কি
তাঁহার অনেক গ্রন্থ এখনও পড়িয়া থাকি। একদিন গ্রামে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আ
সাঁতার জানি কিনা। আমি সাঁতার জানি না শুনিয়া আমাকে সেই দিনই একটি পুকুরে নামাই
এক দিনেই আমাকে সুন্দর সাঁতার শিখাইলেন। পরে দেখিলাম আমি কেবল সাঁতার কাটিতে
পারি না জলে ভাসিয়া থাকিতে পারি। আমি যখন পড়াশুনা করিতে বিদেশে যাই তখ

আমি বড় বিষণ্ণ ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেলের কাব্যে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করি, কিন্তু আমার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। রওনা হইবার সময় দেখি সুধীর দাদা উপস্থিত। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন আমার ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যের চর্চার সহায়ক হইবে। কোন সাহিত্যের সার্থক চর্চা করিতে পারি নাই। কিন্তু সুধীর দাদার এই আশীর্বচন যেন এখনও কানে বাজে।

মাহিলাড়ার অনেক অধ্যাপকই কলিকাতায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু বরিশাল শহরের তিনটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তিন প্রধান শিক্ষক যে মাহিলাড়াবাসী ছিলেন সেই কথা অনেকেই জানেন না। ব্রজমোহন ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অমৃতলাল দাশগুপ্ত। ইনি হীরালাল দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বরিশাল জিলা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রসরঞ্জন সেনের কথা কবি জীবনানন্দ দাশ অনেক বলিতেন। বাণীপিঠের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ গুপ্তও মাহিলাড়ার এক কৃতী পুরুষ। রামচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন নাট্যকার। অশ্বিনী দত্তের উৎসাহে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। বক্তা হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল।

মাহিলাড়া গ্রামের একটি ইতিহাস আজকে কে রচনা করিবে। আমি বোধহয় এখন মাহিলাড়ার প্রাচীনতম মানুষ। কিন্তু এই ইতিহাস রচনা করিবার যোগ্যতা বা দৈহিক সামর্থ যে আমার নাই তাহা বলা বাহুল্য। তবে এখনও ঐ গ্রামের ছবি যেন দেখিতে পাই। যে ছবিটি প্রায় নিত্য দেখি তাহা হইল সুধীর দাদা এবং আমাদের বাড়ীর সামনের দীর্ঘ পথটি। ঐ পথের শেষে সরকার বাড়ীর মঠ, Leaning Tower of Pisa-এর মত একটু হেলিয়া আছে। বিদ্যালয়ের বাড়ীর আটচালা হইতে যখন এই মঠের দিকে তাকাইতাম তখন দেখিতাম রৌদ্র যেন কাঁপিতেছে। দৃশ্যটি ভুলিতে পারি না।

হঠাৎ একটি কথা মনে পড়িল। সেই কথাটি বলিয়া মাহিলাড়া প্রসঙ্গ শেষ করি। সুধীর দাদা ছিলেন তালুকদার এবং আমরা তাঁহার প্রজা। ইহাতে সুধীর দাদা একটু অস্বস্তিবোধ করিতেন। একবার পূজার সময় সুধীর দাদা বাবাকে বলিলেন, খুড়ামশায় আপনি আমাকে একটি টাকা দিন। আমি আপনার জমি, বাড়ীর মালিকানা দলিল প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। বাবা মৃদু হাসিয়া বলিলেন সুধীর, আমি তোমাদের প্রজা থাকিয়াই সুখী। আত্মীয়তার রস যে কত গভীর হইতে পারে তাহা সেই দিন বুঝিলাম।

## শিক্ষারম্ভ

আমার শিক্ষা আরম্ভ হয় কলিকাতার বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। দাদুর কাছে বসিয়া যে কি শিখিতাম তাহা ঠিক মনে নাই। তবে আমার চারি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই বাবা আমার জন্য একজন ইংরাজি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সরকার S.C. Auddy-র বইয়ের দোকানের কর্মচারী। আমার ঠাকুরমার বাপের বাড়ী নলচিড়ার মানুষ। এই নলচিড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রাম। সুরেন সরকার আমাকে প্যারী সরকারের First Book পড়াইতেন। Bla, Cla পর্যন্ত মনে আছে। তাহার পর কি তাহা মনে নাই।

আমার এই প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলিতেছি কারণ সেকালে, অর্থাৎ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের শিশুদের এইভাবেই শিক্ষা আরম্ভ হইত। তখন বাল্যশিক্ষাতেও ইংরাজির একটা প্রাধান্য ছিল। তবে ইংরাজি শিখিয়া আমরা ইংরাজ সরকারের বা ইংরাজ

শাসনে পরিপুষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করিব এমন পরিকল্পনা সেকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার ছয় বৎসর পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী ইংরাজের প্রতি বিরূপ ছিল। আমার মনে হয় বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষার সম্পদ দেখিয়াই ঐ ভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিল। এখানে ভোলানাথ চন্দ্রের (১৮২২-১৯১০) ইংরাজি সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি। কথাটি তিনি বলিয়াছেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে London-এ প্রকাশিত তাঁহার The Travels of a Hindu গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি লিখিলেন আমাদের সাহিত্যে দেশাত্মবোধক কোন গান বা কবিতা নাই, ইংরাজি সাহিত্যে আছে। আমাদের সাহিত্যে Magnacarta বা Bill of Rights নাই। ইংরাজি সাহিত্যে আছে। অতএব ইংরাজির চর্চা এখন অপরিহার্য। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পর আমি ইংরাজির First Book পড়িতে আরম্ভ করি। আর একটু বড় হইয়া বুঝিলাম সেকালের বাঙ্গালীর ইংরাজি সম্বন্ধে উৎসাহ ভোলানাথ চন্দ্রের উক্ত মনোভাব হইতে অভিন্ন।

কিন্তু আমার বাংলা শিক্ষা ঐ সময়েই আরম্ভ হইল। আমাকে বাংলা শিখাইতেন আমার পিতামহী, খাগের কলম দিয়া তালপাতায় অ, আ, ক, খ, লিখিতে হইত। আমি 'খ' অক্ষরটি ঠিকভাবে লিখিতে পারিতাম না। একদিন দেখিলাম পিতামহীর চোখে জল। তখন বুঝি নাই যে আমি 'খ' লিখিতে পারি নাই বলিয়াই পিতামহী কাঁদিতেছেন। 'খ' অক্ষরটি অবশ্য এখনও সুষ্ঠুভাবে লিখিতে পারি না। কিন্তু বাংলা ভাষা একরকম শিখিয়াছিলাম। ইহার পর আমাদের পরিবারে এক দুঃসময় উপস্থিত হইল। আমার পিতামহের মৃত্যুর পর আমার এক ভাই এক বৎসর বয়সে চলিয়া গেল। আমরা কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া কাঁচরাপাড়ায় আমার এক কাকার বাড়ী চলিয়া গেলাম। কাকা Railway Quarters-এ থাকিতেন। এক বৎসর কাঁচরাপাড়ায় ছিলাম। আমার জ্যাঠামশায় আমাদের দুই ভাইকে ইংরাজি, বাংলা এবং নামতা শিখাইতেন। এই কাঁচরাপাড়ায় আমরা দুই ভাই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছিলাম। কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে শহর। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মচারীরা শহরের একটি পল্লীতে বাস করিত। খুব ঘটা করিয়া তাহাদের ছেলে মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। আমাদের বাসার কাজের লোকটির নাম ছিল ফটিক। সে আমাদের দুই ভাইকে খুব স্নেহ করিত। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন আমাদের দুই ভাইকে দুই কাঁধে বসাইয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পল্লীর মাঠে লইয়া গেল। পুরস্কার বিতরণের সময় এক সাহেব ফটিককে বলিলেন আমাদের কাঁধ হইতে নামাইয়া পুরস্কারের টেবিলের কাছে লইয়া যাইতে। আমরা দুই ভাই সেখানে উপস্থিত হইলে আমাদের হাতে দুইটি পুরস্কার তুলিয়া দিলেন। পুরস্কারের মোচার মধ্যে সুন্দর খেলনা আর সুস্বাদু খাদ্য। বাড়ীর সকলে আমাদের হাতে পুরস্কার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফটিক বলিল আমরা না দৌড়াইয়াই পুরস্কার পাইয়াছি। পরবর্তী জীবনে আমার দুই ভাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিল। তখন ভাবিয়াছি এই পুরস্কার কাঁচরাপাড়ার পুরস্কারের মত না দৌড়াইয়াই পাইয়াছি কিনা। তবে কাঁচরাপাড়ার পুরস্কার সেকালের মানুষের সহৃদয়তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

১৯২২ সালে যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম তখন আমার বয়স সাত বছর। কিন্তু আমাকে কোন পাঠশালায় ভর্তি করা হইল না। একালে দেখি দুই-তিন বৎসরের শিশু মা অথবা কোন পরিচারিকার হাত ধরিয়া ইস্কুলে যাইতেছে। পৃষ্ঠে বিদ্যার বোঝা। আমার ঠাকুমার ভয় ছিল যে আমরা দুই ভাই রাস্তায় বাহির হইলেই ছেলেধরার শিকার হইব। জ্যাঠামশায়ের

কাছেই লেখাপড়া চলিতে লাগিল। বাড়ীতে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা আমরা ইস্কুলে যাই না বলিয়া বিস্ময় এবং কখনও কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। অবশেষে দশ বৎসর বয়সে পল্লীর মধ্যেই একটি পাঠশালায় ভর্তি হইলাম। এই পাঠশালায় দুই বছর শিক্ষালাভ করিয়াছি। পাঠশালাতেও দেখি ইংরাজির প্রাধান্য। আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন পাঠশালার প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ সেন। বীরেন্দ্রনাথ সেনের ভাগ্নী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী। কিন্তু এই কথা প্রধান শিক্ষকের মুখে কোনদিন শুনি নাই। হেডমাস্টার মহাশয়ের ভাগ্নী অঞ্জলি আমাদের সঙ্গেই পড়িত। তাহার কাছেই নজরুলের কথা শুনিয়াছি। তবে অঞ্জলি বলিত দাদার সামনে নজরুলের নাম উচ্চারণ করিও না। হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ী ছিল ইস্কুলের কাছেই। সেখানে হেডমাস্টার মহাশয়ের মা বিরজাসুন্দরীকে দেখিতাম। ইনি যে নজরুলকে কত স্নেহ করিতেন তাহা সম্প্রতি নজরুলের জীবনীতে পড়িয়াছি।

হেডমাস্টার মশায় ইংরাজি বড় সুন্দর পড়াইতেন। বিশেষ করিয়া ইংরাজি ব্যকরণের মূল সূত্রগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেন। সূত্রগুলি ভাল বুঝিতাম না। কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি রপ্ত হইয়া যাইত। যদি একটুকু ইংরাজি শিখিয়া থাকি তাহা হইলে সেই শিক্ষা আরম্ভ এই হেডমাস্টার মহাশয়ের ক্লাশে।

বাংলা শিক্ষকও সুন্দর বাংলা পড়াইতেন। শিক্ষকের নাম ছিল জিতেনবাবু। তাঁহার পদবী মনে নাই। বাংলা কবিতা খুব মুখস্থ করিতে হইত এবং জিতেনবাবুকে কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে হইত। কবিতার সব কথা হয়ত বুঝিতাম না কিন্তু পুরা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতাম। ইহার পর কলেজে বাংলা পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছি আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী। অঙ্কের শিক্ষক অঙ্ক কতখানি শিখাইয়াছেন মনে নাই। কিন্তু তাঁহার নীতিশিক্ষা বেশ মনে আছে। আমাদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন রোজ কয়টা মিথ্যা কথা বলি, আমি বলিতাম স্যার গুণি নাই, তবে মিথ্যা কথা বলিবার বড় প্রয়োজন হইত না। এই অঙ্কের মাস্টারমশায় ছিলেন আমাদের ব্যায়ামের শিক্ষক, আমি ব্যায়ামে বড় পটু ছিলাম না তবে about turn-টা বুঝিতাম। জানিতাম যেদিকে চাহিয়া আছি ঘুরিয়া আবার সেইদিকেই চাহিতে হইবে। একবার এইরকম করিলেও মাস্টারমশায় হৃষীকেশবাবু আমাকে তিরস্কার করিলেন। আমি বলিলাম আমিও ঘুরিয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি দুইবার ঘুরিয়াছ। ইস্কুলে তিনজন দিদিমণি ছিলেন। তাঁহাদের নাম জানিতাম না। বড় দিদিমণি, মেজো দিদিমণি ছোট দিদিমণি। তাঁহারা সকলেই আমাদের খুব স্নেহ করিতেন।

ইস্কুলে একটা নৈতিক আবহাওয়া ছিল। ইহা বোধহয় তখন তত বুঝি নাই, এখন বিশেষভাবে বুঝি। হেডমাস্টার মশায় আমাদের আচরণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহাকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা করিতাম, তেমন ভয় করিতাম। একদিন আমাদের ক্লাশের পাঁচটি ছাত্র-ছাত্রীকে বলিলেন, ঠিক নীচের ক্লাশের একটি ছেলের আজ জন্মদিন। তোরা তার বাড়ীতে যাইয়া পায়েস খাইয়া তাহার মাকে প্রণাম করিয়া ইস্কুলে ফিরিয়া আসবি। পরে জানিলাম ছেলেটি নমশূদ্র। ইস্কুলের কাছেই এক বস্তিতে যাইয়া আমরা সেই ছেলেটির জন্মদিন পালন করিয়া আসিলাম।

আমাদের পাঠশালায় সরস্বতী পূজা হইত। হেডমাস্টার মশায় এই অনুষ্ঠানের সর্বদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। পূজার পর আমরা একসঙ্গে বসিয়া খিচুড়ি খাইতাম। আমাদের একটি সহপাঠী ছিল মুসলমান। হেডমাস্টার মশায় তাহাকে বলিলেন, ইয়াকুব তোর পূজায় থাকিতে হইবে

না, কিন্তু পূজার পর যে সকলে মিলিয়া খিচুড়ি খাইবে সেখানে তুইও সকলের সঙ্গে বসিয়া খিচুড়ি খাইবি। ইয়াকুব হেডমাস্টার মশায়ের এই কথা শুনিয়া আমাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া খিচুড়ি খাইয়াছিল। সেই দৃশ্যটি আমার এখনও মনে আছে।

ইস্কুলে একটি বার্ষিক সভা হইত এবং সেই সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা গান এবং আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন আমাদের ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষক নিবারণবাবু। নিবারণবাবু বিশেষ করিয়া আমাদের আবৃত্তি করিতে শিখাইতেন। একটি কবিতা ছিল 'আমি কহিলাম হারে রাম রাম নিবারণ যাবে সাথে।' ছেলেটি কিছুতেই নিবারণ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না। নিবারণবাবু তাঁহার কান ধরিয়া বলিলেন, বল নিবারণ যাবে সাথে। ছেলেটি ভয় পাইয়া নিম্নকণ্ঠে নিবারণ শব্দটি উচ্চারণ করিল। নিবারণবাবুর অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হইত। এই অনুষ্ঠানে আমি একটি পুরস্কার পাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছু না করিয়া এই পুরস্কার পাই নাই। 'নাসিকা কহিল চশমা আমার' এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম।

আমাদের সময় কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করিতেন না। সাধারণতঃ কোন অভিভাবকও তাহার ছেলেমেয়ের জন্যে প্রাইভেট টিউটর রাখিবার কথা ভাবিতেন না। আমার মনে আছে বাড়ীতেও খুব পড়িতে হইত না। মনে হইত সব কিছুই ক্লাশে শিখিয়াছি। তবে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখতে হয়। একালে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রম আমাদের কালের পাঠক্রম হইতে অনেক ভারী। একালের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থ সংখ্যাও অনেক বেশী এবং তাহাদের অনেক কিছু শিখিতে হয়। আমরা অল্প পড়িতাম। অল্প শিখিতাম। বর্তমান জগতে বিদ্যার পরিধি এত বিস্তৃত হইয়াছে যে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক কিছু শিখিতে হয়। আমি ৭০০ নম্বরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলাম। এখন ১০০০ নম্বরের মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যবস্তু আমার কালের পাঠ্যবস্তুর দশগুণ। তবে ইহাও ঠিক যে একালে বিদ্যার এক বিশেষ ভাগ। বোধহয় সিংহভাগ, information। ইংরাজ কবি একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

Where is the knowledge lost in information.
Where is the wisdom lost in knowledge.

আমাদের সময় যেটুকু শিখিতাম তাহা যেন আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিত। একালের বিদ্যা কতখানি আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে পরিপুষ্ট করে বলিতে পারি না। আমি এককালে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলাম। একালের সাহিত্যিকদের মুখে যত কথা শুনি তাহার বিন্দুমাত্রও আমি আমার অধ্যাপক জীবনের শেষ দিকেও জানিতাম না। এখন মনে হয় আমি যদি এখন অধ্যাপক থাকিতাম তাহা হইলে আমি আমার অজ্ঞতার জন্য নিগৃহীত হইতাম। Modernism, post-modernism, structuralism, post-structurism, deconstruction বিষয়ে আমি কিছুই বড় জানি না।

আর একটি কথা বলিয়া আমি আমার বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি যখন ছাত্র ছিলাম আমি জানিতাম না আমি জীবনে কি করিব। কি হইব। এই বিষয়ে পিতার কাছেও কোন নির্দেশ পাই নাই। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তুই বড় হইয়া কি করিবি। আমি নিরুত্তর থাকিতাম। একবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব। তিনি বলিলেন তুই বলিবি বড় হইয়া আলু পটল বেচিব।

# 'পরিচয়' : একটি কালপর্বের কথা

চিত্ত ঘোষ

পরীক্ষা দিতে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রটির চোখ পড়েছিল পরীক্ষাকক্ষের প্রহরী অধ্যাপকের হাতের পত্রিকাটির দিকে। প্রহরী অধ্যাপক পায়চারি করতে করতে পড়ছিলেন সেই পত্রিকা। আর সেই উজ্জ্বল তরুণ ঈর্ষার চোখে দেখছিলেন তাঁকে। সেদিনের সেই তরুণই পরবর্তীকালের বিখ্যাত বুদ্ধদেব বসু। আর পত্রিকা পাঠে মগ্ন সেই অধ্যাপক হলেন প্রবাদপ্রতিম সুশোভন সরকার। পত্রিকাটির নাম 'পরিচয়'। 'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যা।

এ-সবই আদি পর্বের কথা। তবু এর হয়তো কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ শুরু থেকেই সুশোভন সরকার 'পরিচয়'-এর নিয়মিত লেখক এবং নানাভাবে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া আজীবন তিনি এই পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা। সেভাবে যুক্ত না হলেও বুদ্ধদেব 'পরিচয়'-এ লিখেছেন। তাছাড়া দুজনই সুধীন্দ্রনাথ দত্তর বন্ধু।

এবার 'পরিচয়'-এর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রসঙ্গ। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে ঢাকা থেকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসার পর খুব অল্প দিনের মধ্যে যাঁর সঙ্গে আমার অটুট ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাঁর নাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হৃদয়বান এবং বিবেকবান মানুষ বলতে যা বোঝায় তা-ই ছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বীরেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত কোথায় কিভাবে হয়েছিল সেকথা আমার মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, বীরেনই আমাকে 'পরিচয়' অফিসে নিয়ে গিয়েছিল এবং 'পরিচয়'-এর একজন কর্মকর্তা রবীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। 'পরিচয়'-এ প্রকাশের জন্য একটি কবিতা আমি তাঁর হাতে দিয়ে এসেছিলাম। কবিতার নাম 'মহাভারতী'। যে-সংখ্যায় সে-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল সম্ভবত সে-সংখ্যায় বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও ছিল। সে-সময়ে হিরণকুমার সান্যাল এবং গোপাল হালদার বোধহয় সম্পাদক ছিলেন। সময়টা ১৯৪৭ কি ১৯৪৮ সাল হবে। আমরা সবে স্বাধীন হয়েছি। এ-স্বাধীনতা ঝুটা না সাচ্চা তা নিয়ে তখন তুমুল বিতণ্ডা চলছে।

এর আগে 'পূর্বাশা'য় আমার কয়েকটি কবিতা বেরিয়েছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পাদকের স্নেহ ও তারিফ আমি পেয়েছি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সাদরে ডেকে 'পূর্বাশা'র কাজে আমাকে নিযুক্ত করলেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনিল চক্রবর্তী তখন 'পূর্বাশা'র সহকারী সম্পাদক। কিন্তু এ-অবস্থা বেশী দিন টিকল না। 'পরিচয়'-এ 'মহাভারতী' প্রকাশের পর আমার প্রতি বিরূপ হলেন 'পূর্বাশা' সম্পাদক। তাঁর মনোভাবই পাল্টে গেল। তখন কংগ্রেস-আমল এবং আমার কবিতায় কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে কিছু শ্লেষবাক্য ছিল। তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা চওড়া ব্যবধান তৈরি হ'ল এবং আমি আমার প্রত্যয় প্রভৃতি নিয়ে মানসিকভাবে আরো দূরে চলে এলাম। কারণ লেখার ব্যাপারটা তো একান্তভাবে আমার নিজের। লিখতে হলে আমি তো আমার উপলব্ধির কথাই লিখব। কে ক্ষুণ্ন হবে, কে খুশি হবে সেকথা মনে রেখে তো নিজের কথা লেখা যায় না। কিছুদিনের মধ্যে আমি 'পূর্বাশা' থেকে নিজেকে

পুরোপুরি সরিয়ে নিলাম। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে আমি ঋণী। সে-ঋণ অপরিশোধ্য।

'পূর্বাশা' ছেড়ে আমি নতুন আশ্রয় পেলাম 'পরিচয়'-এ। খামে পুরে 'পরিচয়'-এর জন্য একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। তাড়াতাড়িই জবাব এল। সম্পাদক ননী ভৌমিক জানালেন যে 'একটি বিচারের দিন' কবিতাটি নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে তিনি 'পরিচয়' অফিসে সাদর আহ্বান জানালেন এবং লেখক শিল্পীদের একটি মিছিলে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। এভাবেই ননী ভৌমিকের সঙ্গে আমার পরিচয়। পাজামা বা ধুতির সঙ্গে ইট রঙের অথবা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পকেটে নস্যির কৌটো আর নস্যি মোছার রুমাল, পায়ে পুরোনো চপ্পল—এই হল সেদিনের ননী ভৌমিক। যতদূর মনে পড়ে 'পরিচয়' অফিসেই মঙ্গলাচরণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল এবং দীর্ঘদিনের প্রায় অর্ধশতাব্দীর সেই সম্পর্ক দিনে দিনে জানা-বোঝার মধ্য দিয়ে গভীর হয়েছে।

তখন থেকেই ৮৯ নং মহাত্মা গান্ধী রোডের দোতলার ছোট্ট ঘরটিতে আমার প্রায় নিত্য আসা যাওয়া। অফিস ছুটির পরই অবধারিতভাবে কলেজ স্ট্রীট মুখো। কোনো জরুরী কাজে আটকে গেলে ভীষণ রাগ হত। সে সময়ে 'পরিচয়'-এর ম্যানেজার ছিলেন সত্য গুপ্ত। কবি মণীন্দ্র রায় ঠাট্টা করে বলতেন মাইনর সত্য গুপ্ত। কারণ আরেকজন সত্য গুপ্ত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা তিনি মেজর সত্য গুপ্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

'পরিচয়' অফিসে প্রায়ই আমি যে বৃদ্ধ মানুষটিকে একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখতাম তিনি শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। অর্থনীতির নামী অধ্যাপক। কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন। ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, ওই বয়সে তাঁর সমবয়সীদের সঙ্গ নয়, আমাদের মতো তরুণদের সঙ্গই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। 'পরিচয়' পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ পথ দেখাত। তাছাড়া অর্থনীতি এবং সাহিত্য বিষয়েও তিনি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

'পরিচয়' অফিসেই আমি সুপণ্ডিত, সুহৃদয় ও বিনয়ী গোপাল হালদারকে দেখি। তিনি এলে পুরোনো দিনের অনেক কথা শোনা যেত, জানা যেত। হালের অনেক জটিল বিষয়েও তাঁর মতামতের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতাম। এক সময়ে তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী এবং কৃষক সভার সভাপতি হওয়ার ফলে চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও সে সিদ্ধান্ত পাল্টাননি। অন্তর্ধানের আগে সুভাষচন্দ্র বসু গোপালদার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সত্যরঞ্জন বক্সী মারফত সে-ইচ্ছার কথা গোপালদাকে জানানো হয়েছিল এবং গোপালদা নেতাজীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। 'পরিচয়' অফিস বসে সে-অভিজ্ঞতার কথা আমরা গোপালদার মুখে শুনেছি।

সবচেয়ে মজা হত হিরণকুমার সান্যাল অর্থাৎ হাবুলদা এলে। ছোট ঘরটার চেহারাই পাল্টে যেত। হাবুলদা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরতেন। কাঁধে থাকত একটি ঝোলা। একবার তাঁর ঝোলা হাতড়ে পেলাম এক ঠোঙা সোনা মুগের ডাল। অনেকটাই দ্রব্যগুণে, কিছুটা বা রান্নার গুণে যার সুঘ্রাণ প্রতিবেশী গৃহের অন্দরমহলে চলে যায়। হাবুলদা শুধু তার স্বাদের গুণগানই করতেন না, আসল সোনামুগ ডাল কোথায় পাওয়া যায় তার হদিসও দিতেন। একবার কি একটা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কথা উঠল। অনেক কথার মধ্যে হাবুলদা বললেন, তোমরা সব কাদম্বরী দেবীকে মহীয়সী নারী বল। আমি তাঁকে দেখিনি।

তিনি মহীয়সী ছিলেন কিনা জানি না। তবে একজন মহীয়সী নারী আমি দেখেছি। তাঁর নাম প্রতিমা ঠাকুর।

পরের দিকে হাবুলদা নিজে লিখতেন না। মুখে বলতেন। কেউ লিখে নিত। মানে অনুলিখন। দু'একবার আমিও লিখেছি। তবে সে লেখা হিরণকুমার সান্যালের নামে ছাপা হত না। ছদ্মনামে ছাপা হত। নামটাও মজার—ভবভীতি সান্যাল। হাবুলদার গদ্য বিস্তর প্রশংসা পেয়েছে। তাছাড়া কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শেলির 'রাত্রি' কবিতার যে অনুবাদ হাবুলদা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন—'কপাল-গুণে ওরকম অনুবাদ হয়।'

হাবুলদার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই কিছু না কিছু খাওয়া হত। পকেট ভারী থাকলে সন্দেশ, না থাকলে তেলেভাজা। একটা নোট বই-এ হাবুলদা রোজের খরচ লিখে রাখতেন। বছরের শেষে খাতা অডিট করা হত। হাবুলদা নিজেই অডিটর এবং সেজন্য তিনি অডিট ফি নিতেন। পুরোনোদের মধ্যে কখনো-সখনো 'পরিচয়' অফিসে আসতেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া ঘরের মানুষ চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমল দাশগুপ্ত প্রদ্যোত গুহ, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, ধনঞ্জয় দাশরা তো ছিলেনই। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় এলে দেবেশ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং কার্তিক লাহিড়ী এসে আড্ডা জমাতেন।

'পরিচয়'-এর প্রথম যুগে দিলীপ রায় নাকি 'পরিচয়'-এ প্রকাশের জন্য বন্ধু নীরেন রায়কে একটি কবিতা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কবিতা সম্পাদকের পছন্দ হয়নি বলে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে কবি জানালেন যে অমনোনীত কবিতাটি অরবিন্দর প্রশংসা পেয়েছে। সম্পাদকমন্ডলী মহাসমস্যায় পড়লেন। কিন্তু তাঁরা পিছু হঠলেন না। কবিতাটি নিয়ে সোজা চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং সম্পাদকের মতামত ও অরবিন্দর মতামত রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন যে, অরবিন্দর সঙ্গে শেষবার যখন তাঁর দেখা ও কথা হয়েছিল তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি বাংলা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। এ-সবই অবশ্য আড্ডায় শোনা গল্প।

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত অশোক রুদ্রর একটি প্রবন্ধ নিয়ে খুব জলঘোলা হয়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজত্ব। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র লিখেছিলেন যে, কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। এই মতের সমর্থনে তিনি তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছিলেন কিভাবে বিলাসদ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রীর বিক্রি বেড়েছে। কিন্তু তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির নেতারা বলে পাঠালেন যে, এরকম লেখা ছাপানো পার্টি বিরোধী কাজ। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এর সঙ্গে একমত হলেন না। তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে দুপক্ষের সভা ডাকা হ'ল। রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মুজফ্‌ফর আমেদ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার। আর পরিচয়ের পক্ষ থেকে ছিলেন সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস এবং সবার পেছনে আমি। 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে বলা হল যে, অশোক রুদ্রর বক্তব্যকে তথ্য দিয়ে খন্ডন করে কেউ যদি একটা প্রবন্ধ লেখেন, তাহলে সে-প্রবন্ধ অবশ্যই 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হবে। সত্য মিথ্যা নির্ধারণের সেটাই সবচেয়ে ভালো

উপায়। কিন্তু নেতারা তাতে রাজী হলেন না। ব্যাপারটার মীমাংসাও হল না। এবং 'পরিচয়' যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকল। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাম' গল্পটি নিয়েও এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' নিয়েও একটা বিতর্ক হয়। এবং সেটাও 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত অশোক রুদ্রর সমালোচনা নিয়ে। 'চারুলতা' রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পটির চলচ্চিত্ররূপ, কিন্তু সত্যজিৎ মূল গল্পের শেষটায় রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অনুসরণ না করে সিনেমার উপযোগী করে নিয়েছিলেন। অশোক রুদ্রর প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের গল্প এভাবে এদিক-ওদিক করা যায় কিনা। সে অধিকার চলচ্চিত্রকারের আছে কিনা? বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার তাঁর জবাবে বলেছিলেন যে, সিনেমার স্বার্থে কখনো-কখনো এরকম একটু-আধটু পরিবর্তন অপরিহার্য। এতে চলচ্চিত্রকারের যেমন অধিকারের সীমা লঙ্ঘিত হয় না তেমনি খোদার ওপর খোদকারিও করা হয় না।

অনেক ওঠা নামা, জায়গা বদল, অনেক দ্বিধা সংশয় মানসিক যন্ত্রণার নানা স্তর পেরিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছনো। এবং এখানেই বা কতোদিন কে জানে? চেকোশ্লোভাকিয়ায় যখন রুশ সৈন্য পাঠানো হল অনেকেই তখন বিভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ এমনকি কঠোরভাবে এর নিন্দায় ও বিরোধিতায় সরব। সব ছেড়ে-ছুড়ে দেব। এর মধ্যে আর নেই। কেউ কেউ এমন কথাও বললেন। চিন্মোহন সেহানবীশ, চিনুদা সেদিন 'পরিচয়'-এ এসেছিলেন। একটি কথাই তিনি বললেন। সবই তো বুঝলাম। কিন্তু যাবেটা কোথায়! এ-প্রসঙ্গে গোপালদার কথাটাই অনেকের মনে ধরেছিল। গোপালদা বলেছিলেন : মার্কসবাদ যতখানি মানবিক আমি ততখানি মার্কসবাদী। মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ চলছে। কিন্তু তার মীমাংসা এখনও হয়নি।

অনেক মজার ঘটনার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সোভিয়েত আমলে এখানকার নামী লেখকরা অনুবাদের কাজ নিয়ে মস্কো যেতেন। সেই দলে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি দেশে ফেরার পর সে দেশে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনার জন্যে 'পরিচয়' অফিসে একটা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি বলেছিলেন। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে পঞ্চমুখে তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। তাছাড়া ভারতীয়দের প্রতি সে দেশের মানুষের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের মনোভাবের কথাও কামাক্ষীপ্রসাদ বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রবাসী হয়েও অপ্রবাসীর মতই আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত হয়ে তিনি সেদেশে ছিলেন। তবে অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়েছে। যেমন তিনি hairy hand-এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন লোমশ হাত। কিন্তু ওপরঅলা রুশী সাহেব তা মানতে নারাজ। তাঁর যুক্তি হল : hair মানে তো চুল। তার অনুবাদ করতে হলে তো চুলশ করতে হবে। লোমশ কেন? সুনীতিবাবুর কোন বই-এ এ-বিধান আছে?

সে-আমলে যখন শারদীয় সংখ্যা বা কোন বিশেষ সংখ্যা বেরোত 'পরিচয়' অফিসে তখন একটা উৎসবের আমেজ। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভেতরে বসন্ত কেবিন থেকে আসত কাটলেট আর নীচের দোকানে ঢালাও চা-এর অর্ডার। অচিন্ত্য ছিলেন 'পরিচয়'-এর কর্মী। বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, প্রেসে প্রুফ দিয়ে আসা, বিল আদায় করা এসব কাজ তিনিই করতেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'পরিচয়' নিয়মিত পাঠানো হত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পাঠানো বন্ধ

হয়। রাজেশ্বরী দত্ত সে-সময়ে প্রয়াত স্বামীর কোনো বন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি 'পরিচয়' নিয়মিত পেতে আগ্রহী। রাজেশ্বরী দত্তকে তারপর থেকে 'পরিচয়' পাঠানো হত।

কোনো ব্যবস্থাই একরকম থাকে না। পাল্টায়। পুরোনোদের জায়গা নিলেন নতুনরা। প্রথমেই এলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন আমার চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু মাপে বড়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করে তিনি যে অপরিমিত আত্মবিশ্বাসের গরিমা নিয়ে বেঁচে ছিলেন, শুধু বেঁচে ছিলেন না, সার্থকভাবে স্মরণীয় অবদান রেখে বেঁচে ছিলেন তাঁকে অতুলনীয় বললেও কম বলা হয়। মনে আছে তিনি তখন ডায়মণ্ড হারবার লাইনে 'কপাটের হাট' বলে একটা জায়গায় থাকতেন। প্রতিদিন ডায়মণ্ডহারবারের শেষ বাস তিনি ধরতেন। পুরোপুরি সুস্থ তিনি কোনদিনই ছিলেন না। হাঁপানি। লিভার খারাপ। তার ওপর নিয়মিত অনিয়ম। এভাবে কতদিন চলে? এবং সত্যি চলল না। দীপেন চলে গেলেন।

দীপেন সম্পাদক হওয়ায় নতুন প্রজন্মের লেখকরা বেশী করে 'পরিচয়'-এ আসতে লাগল। ততদিনে দেবেশ এবং অমিতাভ জলপাইগুড়ির পাট চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে গিয়েছে। 'পরিচয়ে' তারুণ্য সঞ্চারিত হল। 'পরিচয়' আরো সময়োপযোগী হল।

'পরিচয়' অফিসে বসে কিছু অবাক করা ঘটনাও ঘটতে দেখেছি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর একটি স্মরণ সংখ্যা বের করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তারই প্রস্তুতি চলছিল। হঠাৎ একদিন বিকেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে চাদর ঝোলানো এক রাশভারি প্রৌঢ় 'পরিচয়' অফিসে এলেন। কোনরকম ভণিতা না করেই সোজাসুজি বললেন, আমার নাম সজনীকান্ত দাস। আপনারা মাণিকের স্মরণ সংখ্যা বের করছেন শুনলাম। এব্যাপারে আমার যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে জানাবেন। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। এ-কথা বলে আমাদের কথা শোনার অপেক্ষায় না থেকে তিনি চলে গেলেন। আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

শুনেছি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ সত্যজিৎ রায় তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সুশোভন সরকার এবং হিরণকুমার সান্যালকে জানিয়েছিলেন। তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়ে রাজেশ্বরী দত্তকে সমবেদনা জানান এবং 'পরিচয়'-এর তরফ থেকে মালা দিয়ে আসেন।

টি. এস. এলিয়টের মৃত্যুর পর লেক অঞ্চলে সাহিত্য অকাদেমির একটা ঘরে স্মরণসভা হয়েছিল। 'পরিচয়'-এর তরফে আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। পরিচিত অপরিচিত অনেকে এসেছিলেন। বিষ্ণু দে এসেছিলেন। এলিয়টের কবিতা বিষয়ে কিছু এলোমেলো কথা হ'ল। এক সময়ে প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরী বিষ্ণু দেকে একটা প্রশ্ন করলেন : প্রশ্নটা হল : কোনো বিচারেই এলিয়টকে প্রগতিশীল কবি বলা যাবে না। অথচ এ-দেশের প্রগতিশীল আধুনিক কবিদের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব! এটা কি করে সম্ভব? বিষ্ণু দে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ছোট্ট করে তার জবাব দিলেন। কবিতার ওই তো মজা।

এক সময় ছিল 'পরিচয়'-এ লেখা বেরলে লেখক জাতে উঠত। এখনও যে সে-আভিজাত্য ও মর্যাদা একেবারে নেই তা নয়। সময় পাল্টাচ্ছে। একটা প্রবল প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে। একটা আত্মিক সঙ্কটের মধ্যে আমরা আছি। যেন ভগ্নস্তূপের মধ্যে

দাঁড়িয়ে নির্মাণের কাজ করে যেতে হচ্ছে। যাঁরা এই পরিব্যাপ্ত ভাষণের গ্রাসকে অগ্রাহ্য করে 'পরিচয়'-কে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারার ছাপ রেখে যাচ্ছেন তাঁদের একরোখা জেদী মানসিকতাকে, অসম্ভবকে সম্ভব করার এই উদ্যম ও কর্মধারাকে সর্বপ্রকারে সমর্থন ও সাধুবাদ জানাতে হবে। সত্তর বছর ধরে একটি সাহিত্য পত্রিকা চলেছে, এখনও চলছে, তার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা নিয়ে চলছে, যাবতীয় মানবিক আদর্শ এবং শিল্প সংস্কৃতির নানা ধারার সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই মহান উত্তরাধিকারকে বহন করতে পারে।

যে সময়টা পেরিয়ে এলোম, দূর থেকে পেছন ফিরে সেই সময়টাকে দেখতে মন্দ লাগে না। ভবিষ্যতের মধ্যেই তো নিহিত থাকে অতীত ও বর্তমান।

# অরুণ মিত্র ও তাঁর কবিতার জগৎ—আধুনিকের মানবযাত্রা : একটি প্রেক্ষিত

সিদ্ধেশ্বর সেন

সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তার যখন আমন্ত্রণ পেলুম 'কবি অরুণ মিত্র আমার চোখে' বা "আমার অনুভবে'—এ বিষয়ে কিছু বলার, তখন আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করি। কিন্তু কিছু ভাবতে বা লিখতে গিয়ে আমার কলমের বিচলিতি আমায় জানান দিলে যে কী কঠিনতার মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি—এই নয় যে আমাদের কালের এই এক প্রধানতম কবির বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে কিছু বলিনি বা লিখিনি। কিন্তু এই জন্যেই যে আমার আত্যন্তিক শ্রদ্ধার ও কাছের কবি-মানুষটির মৃত্যুর দুঃসহ অভিঘাত আমার মন সামলে উঠতে পারেনি তখনও, তখনও সে দূরত্বই তৈরি হয়নি তাঁর না-থাকা ও থাকার মধ্যে যাতে আমি স্থির হতে পারি! তবু এই অসামান্য কবি সম্পর্কে আমার কাজে আমি স্থিত হলুম, এই নিবন্ধের শিরোনামে যেমন বলেছি, তাঁর কবিতার জগৎ—আধুনিকের মানবযাত্রা। কীভাবে বলেছি? না যেভাবে কবি নিজেই বলে গিয়েছেন : 'আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি/ আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি। /এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি : মানুষ/...তুমি প্রসন্ন হও।' (আর এক আরম্ভের জন্য, 'উৎসের দিকে')। এক দ্বৈততার উচ্চাবচে কবি তাঁর অনুভূত বাচনটি বলে যাচ্ছেন...'জনতার মধ্যে/শিশুর কণ্ঠ/ কোলাহলের খরজে/বেঁধে নেওয়া/নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ : / মানুষ—এই সর্বৈব মানুষের কবির কাছে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নামাব না তো, আর কোথায়?

আজকের এ সুধী সভায় আবারও মনে করিয়ে দিই যে মাত্র গত বছরেই এখানে অকাদেমির 'কবি-সন্ধি' অনুষ্ঠানে তাঁর অননুকরণীয় হাতের মুদ্রায় ও গলায় দীর্ঘসময় কবিতা-পাঠের আসরে কবি আমাকে বরাত দিয়েছিলেন, তাঁকে একটু বিরতি দেওয়ার জন্যে (তখন সবে তিনি অসুস্থতা থেকে উঠেছেন), আমি যেন তাঁর কিছু কবিতা পাঠ করে শোনাই, সে কবিতাও নিজে ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন বা আমার বাছাই-ই অনুমোদন ক'রে। এমনই ছিল এই কনিষ্ঠের প্রতি তাঁর আস্থা। এ বহু বছরের সম্পর্কের ফল। সেই বহুকথিত চল্লিশ দশকের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সহমর্মিতার প্রকাশ। কবি অরুণ মিত্রের নিজেরই দশক-দশকব্যাপী—নব্বই-এর দশক ও শেষপর্যন্ত কাব্যসম্ভারেই, সে জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ ফসল। কবিতার আঙ্গিক গদ্যপদ্য শৈলী কতই বদলেছে। কিন্তু সেই নিবিড় মূল্যবোধ—মহার্ঘ জীবনবোধ থেকে তিনি সরেন নি, বলেছেন 'আমি মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি।' সাম্প্রতিক নিবন্ধেও লিখেছেন '...শব্দপ্রয়াসকে আমি বক্তব্য থেকে আলাদা করে কখনো দেখিনি। শব্দকে মানুষের সঙ্গে না জড়িয়ে আমি পারি না। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে মানুষের অবস্থার সঙ্গে। আমার মনকে আমি পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না এবং করতে চাই না।...বলছি মানসিক আবহাওয়ার কথা, যে আবহাওয়ায় আমার প্রেম আমার কৌতুক আমার যন্ত্রণা আর আনন্দ রূপ নেয়। ....পরিপার্শ্বের চেতনা যদি অনিবার্য হয়, এমনকি অন্তরঙ্গ

অভিজ্ঞতার প্রকাশেও, তবে লেখার চারিত্র্য তৈরি হয় বাস্তবতার ভিতে। কিন্তু তাকে বাস্তববাদী কবিতা বলা যায় কিনা জানি না। কারণ, তাতে কিছু আকাঙ্ক্ষার উৎসার থাকে যা স্বপ্ন দেখার মতো, নানান ছবিতে কিছু কল্পনার নির্মাণ থাকে। এই জন্যে আমার কবিতায় সম্ভবত একধরনের লিরিসিজ্‌ম দেখা দেয় গদ্য কবিতাতেও। এটা হয়তো আমার লেখার একটা দোষ। আবার এটা হয়তো একটা গুণও হতে পারে'—এইভাবেই কবি নিজের কথা বলে গিয়েছেন 'কবিতা, আমি ও আমরা' নিবন্ধে। আর ঐ যে বললেন, 'লেখার চারিত্র্য বাস্তবতার ভিতে। কিন্তু তাকে বাস্তববাদী কবিতা বলা যায় কিনা জানিনা।' (নিম্নরেখ আমার; কিন্তু কবি কী তবে পরাবাস্তব-এর কথা বলতে চাইলেন এখানে—Surrealism! ঠিক তাই। কেননা দেখছি '...উৎসার থাকে যা স্বপ্ন দেখার মতো'... এমনও বলছেন। অর্থাৎ বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশে যাচ্ছে তাঁর কাব্যশৈলীতে)। এই বাক্‌সিদ্ধ কবির ফরাসি সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের কথা আমরা জানি। কিন্তু তা বা বৌদ্ধিক কোনো বিদগ্ধতাই তাঁর কবিতার গ্রহণে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এতটাই সহৃদয়, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন তিনি। শুধু আমাদের বাংলা কবিতার পরিধিতেই নয়—উভয় বঙ্গেরই—বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতির কথা ভেবেও আমি বলছি। এবং আরও, আমাদের নিখিল ভারতীয় বহুভাষিক কাব্য সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও কবিবর অরুণ মিত্রের এই বাচন এই শিল্পরূপ সৃষ্টি অনুভূতিশীলতার এক নতুন দেশ দিগন্তেরই উন্মোচন করে যাবে, সমকালের জন্যে ও ভবিষ্যৎকালের দিকে তাকিয়ে। এই সত্যটা আমি এখানে বলে যেতে চাই। যেমন বলেছি প্রগতি ভাবনায় জারিত তাঁর কবিতার জীবনময় মানবপন্থা, তেমনি তাঁর কবিসত্তার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর 'দ্রষ্টা'-র ভূমিকা ও 'তবু আশ্চর্যকে জেনো'র রহস্যোক্তি। যা আমার গোচরে এসেছে। যথাস্থানেই তা আরও বিশদ করব।

## অবিস্মরণীয় কবি

কবি অরুণ মিত্র—আমাদের সকলের প্রিয় সম্বোধনের অরুণদা। তাঁর এই চলে যাওয়াটা আজকের বাংলা সাহিত্যজগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার যবনিকা নামিয়ে দিলে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'অবিস্মরণীয় অরুণ মিত্র' এক সাক্ষাৎকার-নিবন্ধে এই কথা বলি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দু'হাত উজাড় করে যিনি অজস্র জীবন-সম্পৃক্ত কবিতার দানে আমাদের হৃদয় ও মনকে নিত্য উজ্জীবিত ক'রে রাখতেন, আমি ভাবতেও পারছি না আজ আকস্মিকভাবে আমরা তাঁর সেই নিরন্ত দান থেকে বঞ্চিত হলাম। এ অসহন ক্ষতি সবই কী করে! এমনকি ব্যক্তি অরুণ মিত্রও তাঁর শেষদান জাতিকে দিয়ে গেলেন তাঁর মরদেহ ও চক্ষু দুটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানবকল্যাণে উৎসর্গ করে। তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে বলে গেলেন সংস্কারমুক্ত মনে, তিনি কোনো প্রচলিত ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর না, মানবমঙ্গলই তাঁর একমাত্র ধর্ম। এর দ্বারা এই মহান কবি চিরায়তের কবিমনীষীর মতোই আমাদের কালের এক শিক্ষকেও পরিগণিত হবেন।

আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি, আমাদের যুগের এই শতাব্দীস্পর্শী কবিকে আজ অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল ধরে, ঠিক বলতে গেলে, পঞ্চান্ন বছরেরও আগে থেকে, নিকট সাহিত্যযোগেই জেনেছি ও তাঁর স্নেহ পেয়ে এসেছি। কীভাবে, এখন তা বলছি।

তার আগে বলে নিই কবি অরুণ মিত্রের কবিতা সম্পর্কে এক বড় প্রবন্ধে আমি ইতিপূর্বেই, প্রায় দেড় দশক আগে লিখি : কবি অরুণ মিত্র সেই বিরলতম দ্রষ্টা (visionary)-র

একজন, বহু পূর্ব থেকেই, প্রায় পাঁচ দশকের ওপর তো হবেই আমাদের বলে আসছেন, 'তবু আশ্চর্যকে জেনো।'

কী সেই 'আশ্চর্য।' বলেছেন, 'জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।' এটা বলা তাঁর 'অমরতার কথা'য় (উৎসের দিকে)। ফিরে ফিরে তাঁকে এমন কথাই বারবার নানা কবিতায় ও কাব্যগ্রন্থে বলে যেতে হচ্ছিল : 'এই এতোগুলো পাতা আমি গুঁড়ো করেছি, এতো ডালপালা। দ্যাখো তো এরা তোমাকে আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।' সেই 'কপালের রক্তচিহ্নটা' দেখিয়ে : 'তুমি হয়তো ঠিক ঠিক জেনে এসেছ।' মানুষ চেনার ও চেনাবার একটা ঝিলিক কী জানান দিচ্ছে, কিছু?

বোঝাচ্ছেন 'তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতর অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো...'

যা বলছিলুম, বোধ করি আমার এ ব্যক্তিগতভাবে বলা মার্জনীয় হবে এখন, কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার কবিতার মধ্য দিয়েই যোগের কথাটি। সে আজ নয়, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত প্রখ্যাত 'অরণি' পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি 'প্রস্তুতি', প্রকাশ পেল তাঁরই হাত দিয়ে। 'অরণি'র কবিতা দেখার দায়িত্বে তখন তিনি, কবি অরুণ মিত্র, সেদিনের এই সদ্য-তরুণের কবিতা প্রথম ছাপালেন তিনিই। সে ৫৫ বছর আগেকার কথা। (শুধু আমার নয়, এরই বছর কয়েক আগে-পরে আমার সমবয়সী কবি-বন্ধু সুকান্ত ভট্টাচার্য, এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা যে প্রথম 'অরণি'তে তিনিই ছেপেছিলেন, একথা তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করতে ভোলেন না কবি।)

সে ছিল উত্তাল চল্লিশের দশক, ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক-আন্দোলন ও গণনাট্যের যুগ। সেই মধ্য-চল্লিশের গম্‌গমে কাল আমারও গড়নের মুখপাতের যুগ। লেখায়, পত্রিকায়, বৈঠকে, ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের চারতলায় প্রগতি-সংস্কৃতির কেন্দ্রে, শিল্প-সাহিত্য-নাট্যের ও মননের উজ্জীবিত আবহাওয়ায় আমারও নিত্য যাওয়া আসা। শ্রদ্ধেয় ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যোগসূত্রে।

সেখানেই পেয়েছি আধুনিক কবিতার পুরোধা অগ্রজ ও বিদ্বজ্জনদের। কবি বিষ্ণু দে-কে (তাঁর ও কবি অরুণ মিত্রের জন্ম একই বছরে), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং চিন্মোহন সেহানবিশ, জ্যোতি বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোলাম কুদ্দুস, গোপাল হালদার, ডেভিড কোহেন উজ্জ্বল বিশিষ্ট বহু কবি শিল্পী সাহিত্যিকের কথাই আমার মনে আছে।

মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, মঙ্গলাচরণ, ননী ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, ডেভিড কোহেন এরা।

অনেক পরে ১৯৭৯-তে 'পরিচয়'-এ, আমার স্মৃতিতে উজ্জীবিত সেই যুগকে নিয়ে আমি এক দীর্ঘ কবিতা লিখি 'ঘুঙুর।' রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কাহিনীকে রূপকাশ্রয়ে নিয়ে ও রূপক ভেঙে : 'চারিদিকে বিদ্রোহের দিনপঞ্জী লেখার গৌরবে কবিকিশোরের/পদাতিকে-মিছিলে-জাঠায় হরতালে/...আকালে ও নবান্ন-উৎসবে, আবেদিন-স্কেচে, সন্দীপের চরের/মৃত্যুহীন/নবজীবনের মতোই জাগ্রতের গানে.../এমনকি কবিতা ভবনেরও কবিতার নিরিখের তর্কে,/কসাকের ডাকে/'ফ্যাসিস্ত-বিরোধে কবি শিল্পীর সততায়, ভারতীয়

সাম্যবাদীর/প্রাথমিক/স্বপ্নের নিষ্ঠায়/অপূর্ণেরই হয়তো এক সংস্কৃতির বিপ্লবে।' 'কসাকের ডাক, ৪২' কবি অরুণ মিত্রের কবিতাটি ছিল সে যুগের এক দ্যোতক।

উদ্ধৃত করি কবি অরুণ মিত্রেরই সময় ও সাহিত্যের আর এক অধ্যায় থেকে : 'দেশ, পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের ভাবনা এই কেন্দ্রে যেন এক বৃহৎ সঙ্গ পেল....এই বৈপ্লবিক ঘটনা যাঁরা সম্ভব করেছিলেন, আমি তাঁদেরই উদ্দীপনের পরিমণ্ডলে ছিলাম। তার পরের চলাটা কখনই সরল পথে এগোয় না...আরম্ভের আলোটা কিন্তু নেভে না।' কিছু আগে তাঁর সহধর্মিণী শান্তি মিত্র প্রয়াত হলেন। অনেকগুলি কবিতায় তাঁকে 'সহযোদ্ধা' বলে সম্বোধন করেছেন। জীবনের 'সংগ্রামের আভা'র কথা বলেছেন কবি।

সে সময়ের সেই ফ্যাসি-বিরোধী প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকে, কবিতা ভবনের কথাও ওঠে। কারণ, সেই প্রগতিরই দৈতে ও সাড়ায় কবি বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১ম সংস্করণ) তখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (তাঁর 'কবিতা'য় আমার লেখা বেরিয়েছে সেই ৪৫-এই, অক্টোবরে),—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা সে সংকলনের সম্পাদকদ্বয় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের লিখিত দুটি পৃথক ভূমিকায় বিশুদ্ধ না ফলিত, কাব্যতত্ত্বের এই নান্দনিক বিচার করেছেন। সেই পর্বও কবি অরুণ মিত্রের সবিশেষ জানা ছিল। (এর কিছুকাল পরে, ৪৮-এ তিনি প্যারিসে চলে যান ও ফরাসি সাহিত্যে ডক্টরেট করে দেশে ফেরেন।)

তিনি যখন এলাহাবাদে ফরাসি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপনায়, তখন সাংবাদিকতার কাজে দিল্লি থেকে ফেরার সময়ে আমি এলাহাবাদেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসতুম। একবার মনে আছে তাঁর ছবির মতো ছোট বাড়িটি থেকে অমাকে এগিয়ে দিতে দিতে কবিতার কথায় এসে বলেছিলেন : 'এই ছোট্ট গাছটি যেমন (রাস্তার ধারের একটি হেলানো শাখা দেখিয়ে), তার ছায়ার মধ্য দিয়ে যাবার আগে ও পরের একই মানুষ কি একটু বদলে যায় না?'

অরুণ মিত্রের কবিতাও তেমনি আমাদের বোধের ও চেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। সেই আগের 'প্রান্তরেখা', 'উৎসের দিকে' ও 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) উৎরে 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' (সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছাড়িয়ে। ছ'-সাত দশক জুড়ে তিনি আমাদের কাব্যের এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর কাব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করি 'পাথরে ঝর্নার ছোপ পাথরে গুঞ্জন'—শঙ্খ ঘোষ/অরুণ সেন সম্পাদিত 'কবি অরুণ মিত্র' সংকলনে।

## পাথরে ঝর্নার ছোপ পাথরে গুঞ্জন।

কবি অরুণ মিত্র সেই বিরলতম স্রাতা-র (visionary) একজন, বহু আগে থেকেই, পাঁচ দশকের ওপর তো হবেই, আমাদের বলে আসছেন, 'তবু আশ্চর্যকে জেনো।'

বলেছেন, 'জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।' এটা বলা তাঁর 'অমরতার কথা'য় (উৎসের দিকে)।

বলছিলেন, 'তার চারপাশে আদ্যিকালের গল্প....।'

কীভাবে, 'আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে এইসব আবিষ্কারের গরজ জন্মেছিল সে কাহিনীও : 'চলো, ঝর্না কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে পাহাড় বন

মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম।.....তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। ...তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজখবর আমাদের দেবে।'

এ পর্যন্ত।

ঠিক এর পরের উক্তিতেই কি কবির বলায় সংশয় বাসা বাঁধছিল? তাতে আবার লিখতে হল : 'কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।'

'অন্তরঙ্গ'তে তবে কি তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমরা? 'অন্যমনস্কতা?' মনোযোগের কোনো তারতম্য তখন কি তাঁর নজরে পড়েছিল?

বোঝালেন, 'তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো....।'

কোনদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে চাইছেন কবি?

এতক্ষণে আমরা 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' পৌঁছে গেছি। এ বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৭০। এই কথাটা, তাঁর কবিতাশরীরের ওই মর্মাত্মা প্রকাশমান হচ্ছে যখন, সেটা 'উৎসের দিকে'র কাল। এ বইয়ের আদি সংস্করণ ১৯৫৪-য়, পরিবর্ধিত হল ১৯৫৭-তে। তার মানে তখন প্রায় ষোলো থেকে পরে আরও উঠতি বছরের মধ্যে ওই আলোটা ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মাঝখানে 'ঘনিষ্ঠ তাপ' বেরিয়ে গেছে ১৯৬৩-তে। 'অন্তরঙ্গ' কবিতার উদ্ধৃতি সে-বই থেকে। 'উৎসের দিকে' থেকে তার ব্যবধান ন বছরের। 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' আরো সাত বছর পরে। অর্থাৎ তখন প্রায় দু-দশক ধরে তাঁর কবিতায় আসা-যাওয়া করছে ওই অত্যাশ্চর্য!

কথাটার শেষ হয় না, শেষ নেই বলে।

এর পরে, আরো অনেক পরে, প্রতিবারের মতোই এই কবি হালেরও, ১৯৮৬-র সমকালীনতার জমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এ পৌঁছে, ভিন্ন প্রেক্ষিতে আরেক প্রাসঙ্গিকতায় চিনিয়ে দিচ্ছেন আমাদের 'সময়ের খাতে'র কথায়, 'আকাল', 'দৈববাণী'র কথায় : 'ওই দ্যাখো সঙ্কেত কখন থেকেই উঠে আছে।'

কবি অরুণ মিত্র দীর্ঘ ছ-সাত দশক-প্রায় আমাদের কাব্যের অসামান্য অভিজ্ঞতা।

তুলনাহীন তাঁর চলা।

সেই 'যাত্রাগুরু চলা'—কবির নিজের ভাষাতেই, এতটা 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এ এসে পিছনের কতটা, মনে করেই কি লিখছেন : 'যাত্রাগুরু চলা—অক্ষরের ভিতরে এত রক্তপাত ফুটন্ত শিশির এত তাত বাড়ন্ত ছায়া....যাত্রাগুরু চলা—সব অক্ষর আমার কব্জির দপ্‌দপ্‌ নাড়ীতে আমার বুকের জখমে আমার পাগল সমুদ্রে....'

এ তো শুরু হয়েছিল তাঁর প্রথম বই 'প্রান্তরেখা' থেকে। ১৯৪৩-এ প্রকাশ। কবিতাগুলি রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল তার বেশ আগে থেকেই। সে এক প্রবল সময়ের সাড়া। সেটা চল্লিশের দশকের টালমাটাল, দেশ-কাল সচেতনতার যুগ। (মনে পড়ে, কিছুটা আগে-পরে বিষ্ণু দে-র 'সাত ভাই চম্পা' ও 'সন্দীপের চর'-এর পর্ব—'লোকায়তে বাঁধো লোকোত্তরের তীর্ণ প্রসাদ', সুকান্তের, তপ্ত-মথিত, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি', 'পদাতিক'-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধের গান')।

আমরা তখন সবে কেউ কৈশোর বা কৈশোরোত্তীর্ণে। তিনি তরুণ যুবা। সে-কথায় পরে আসছি। তবে বলে রাখতে হবে আজকের যে অরুণ মিত্রের অনন্যতা, সে কণ্ঠস্বর তিনি

বাংলা কবিতায় যোজনা করেছেন 'উৎসের দিকে'র থেকে। 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩) ও 'উৎসের দিকে'র (১৯৫৪) প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দশ বছরের। যদিও ১৯৪৪-৪৭ সালের মধ্যে আরও কিছু কবিতা লিখেছেন। পরে বিদেশপ্রবাস ১৯৪৮-৫১, ফরাসি দেশে, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও সাহিত্যগবেষণা নিয়ে। স্বভাবতই, ওই সময়টা আমরা তাঁকে পাই নি। পেলুম একেবারে ১৯৫৪-য় দ্বিতীয় বইতে, ১৯৫১-র থেকে লেখা ও 'স্মরণকাল'-এর কবিতাগুলি যার অংশ। পেলুম ও তিনি এলেন আমাদের আরেকভাবে জিতিয়ে দিতে।

'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮) কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৯-তে 'রবীন্দ্রপুরস্কার'-এর সম্মাননার উপলক্ষ হল। তাঁর লেখার বয়স তখন (গ্রন্থের প্রকাশকালের হিসেবে) প্রায় ৪০ ছুঁই-ছুঁই এবং তাঁর নিজের শারীরিক বয়সও প্রায় ৭০-এ পা দেবার। সে-সময়ে, 'পরিচয়'-এ (১৯৭৯) সে-প্রসঙ্গে লিখেছিলাম : তুলনাহীন তাঁর চলা। এতদিনে পুরস্কার তাঁর নাগাল পেল।

'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর পর ১৯৮০-তে, তখনও পর্যন্ত তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থটির আগে। তাঁর পারাপারের নৌকাটিতে ফসলের খুব ভার কি? কিন্তু সব ফসলই এত সুবর্ণ পাকা! আমাদের তা মনের অন্ন, স্বাভাবিক, অনিবার্য বাড়তির দিকে পুষ্টি : 'সেই যৌতুক আমরা চাই/অন্ধ জীবনের কাছে....' ('ছয় ঋতু সঞ্চয় করি')।

আর তাঁর হাত থেকে যৌতুক, জীবনেরই যৌতুক, কিন্তু তাঁরই হাত-ফিরতি হয়ে তা নিতে তাঁর কাছে আমাদের যাওয়াটাও হয় বড় কিছু আবিষ্কারের মতোই। মনে হয় বুঝি বেশ সহজ, কিন্তু অরুণ মিত্রের কবিতা আপাত সহজের আড়ালে আমাদের এক কঠিন বিপন্ন সময়ের আর তা থেকে উৎরে জীবনের স্বতোৎসারিত এক নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে পাথরে এই নির্ঝরের মুখ, সে কিন্তু শক্ত নিখাদ পাথরই। এক প্রচ্ছন্ন অথচ খর দ্যুতিতে তাঁর কবিতা অনেক কিছুই তখন আমাদের দেখে জেনে নিতে বলে। আর এই কবি এক প্রগাঢ় মমতায় আমাদের সেই ধরাছোঁয়ার জগৎটিতে পৌঁছে দিয়ে যান।

কবি অরুণ মিত্রের জগৎ এই ধরাছোঁয়ার জগৎই, এবং আরও বলি, তার হঠাৎ চকিত উদ্ভাসনের। আধুনিক বাংলা কবিতায়, এইখানে তাঁর জুড়ি নেই। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বিশেষ করে স্পর্শগ্রাহ্যতা। মাপাবাঁধা ছন্দের বাঁধনটি শেষ পর্যন্ত তিনি খুলে দেন ('প্রান্তরেখা' পর্বের অক্ষরবৃত্ত ঘনবদ্ধ সনেট চতুর্দশপদী অষ্টাদশপদী বা নিপুণ মাত্রাবৃত্তের), চলে আসেন বাক্‌প্রতিমার গদ্যছন্দের আটপৌরে, ঘরোয়া এক বিন্যাসে, অন্তরঙ্গ কথকতার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার এক আশ্চর্য রূপবদল ঘটিয়ে দেন, কবিতার পঙ্‌ক্তি বদলে যায় গদ্যের অনুচ্ছেদে, 'মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে/তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।'

অথচ এই বিশ্বাস তাঁর ও সেইসঙ্গে আমাদের অনেক ভাঙচুরের পথ বেয়ে আসে। সেই যে গোড়ার দিকে আমাদের তিনি দেখিয়ে দেন : 'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার', কি ভূমিকায়, লেখেন, 'তীক্ষ্ণ বাঁশীতে সুর কেটে গেছে সকালবেলা/ রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো'.... শোনেন ও আমাদের শোনান 'কসাকের ডাক।' কিন্তু তার কিছু পরেই 'শিশুর কান্নার ঘর', যেখানে, 'এ কী ভাষা/মৃতবৎসা পৃথিবীতে/এ কী আশ্বা/শিশুর কান্নার ঘরে', কিংবা 'পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয় জলে ভিজে,/ দৈত্যের প্রকাণ্ড লুব্ধ মুঠির আকারে' ('বর্ষমাণ') অথবা 'পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বাঁচে...' ('এ জ্বালা কখন জুড়োবে'), 'প্রতিমাগুলো

বয়ে এনেছিলাম/মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে/তারা এখন ভাঙল....' আমরা এসবও দেখতে পাই।

উৎসের দিকে থেকেই আমরা সেই প্রার্থনাময় পদবন্ধ পেয়ে যাই : 'আমি বিয়ের পাত্র ঠেলে দিয়েছি/ তুমি প্রসন্ন হও...আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি..../তুমি প্রসন্ন হও'; সমর সেনের তীক্ষ্ণ নাগরিক ধার, ধূসরতা, 'সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন'-এর উঁকি সত্ত্বেও, সে-নেতির শ্লেষের বিপরীতে অরুণ মিত্রের মাটি-ছোঁয়া দূর্ব আস্তিকতা আমরা জেনে নিই।

তিনি এর পরেও আমাদের দেখাবেন যে জগৎ সেখানে 'আমি এক পলকেই দেখে নিই/ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর/ভরসার সমস্ত দুর্গ/ কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধূলিসাৎ করে' ('আমার কাছে বদলে যায়'), আমাদের আশ্বস্ত করে বলবেন 'আমি হাটে হাটে ভেসে এসেছি/মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি', মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন 'এই তো নিশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ ....আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি' ('আর এক আরম্ভের জন্য'), তখন আমরা বুঝে যাই যে এই কবি আমাদের দোসর মেনেছেন, সঙ্গী করে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁর সেই ধরাছোঁয়ার আর-এক জগতে, প্রত্যক্ষতাই যেখানে তার নির্যাস।

ধরাছোঁয়ার জগৎই তো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর কেবলই তা ছাপিয়ে যাওয়া, যেমন করে তিনিই একমাত্র বলতে পারেন : 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো। আমার স্নায়ুতন্ত্র ধমনী নিয়ে আমি একে অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ করে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বকমুখের অন্ধকারে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাবো। ....দু-একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি দ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমার অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাবো।' ('প্রাজ্ঞের মতো নয়', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এ অসাধারণ কবিতার প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলাম। অরুণ মিত্রকে আমি 'স্রাতা' বলতে চেয়েছি। কারণ তাঁর কবিতা এখন আমাদের যে-জগতে এনে ফেলেছে, সেখানে আর সবই বাহুল্য, শুধু এই তীব্র মুগ্ধতা, 'মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধহয় কোনো এক সময় আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন করে গড়ে দিতে পারবে?' ('বৃষ্টির দেশ থেকে এলে')। বলছেন, আমরা প্রায় স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে এখন কবিকে না শুনে পারি না :

'...সময়ের গম্বুজের নিচে আমি দাঁড়িয়ে
পাথরগুলো খুঁটিয়ে দেখি
যদি কোনো ঝর্ণার ছোপ কোথাও লেগে থাকে,
তাদের উপর বার বার কান রাখি
যদি তারা গুঞ্জন করে।....'

('উন্মুখ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

তাহলে কী! ঝর্না নেই, কিন্তু তার 'ছোপ' পাথরে লেগে। জলধারা নেই, কিন্তু তার অলুপ্ত 'গুঞ্জন।'

তুলনায় নয়। তবু এ যুগের দুই প্রধান বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দের কাছে এই ঝর্না ও জলের প্রতীক অনুষঙ্গ কীভাবে আসে তা কি আমরা একবার জেনে নেব?

বিষ্ণু দে তাঁর 'অন্বিষ্ট' কবিতায় (১৯৪৭-৪৯) :

'...সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না....'

এ তো বহু বর্ণালির নির্ঝর, 'রঙের ঝর্না' আর 'বাঁচার বিস্ময়ে' অগাধ তার ছড়িয়ে পড়া—আর, আত্মসচেতনতার তীব্র অভিযানে 'গোবি মরুভূমিতে এক যাত্রা', '...মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধ মরু', সেই তাঁর চির-উজ্জীবনের 'জল দাও আমার শিকড়ে।'

'বেলা অবেলা কালবেলা'র জীবনানন্দে :

'...আঁধারের থেকে...
...ভেদ করে শোনা যায় শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি'—

তখন সব ঝরন-ধ্বনি নিয়েই আমাদের আরোগ্য চেয়ে নির্গলিত হতে চেয়েছে।

ষাট-সত্তরের অরুণ মিত্রে সে-ঝর্নাই নেই। কিন্তু, তাই-ই আবার আবিষ্কারেরও লক্ষ্য। আমরা বেরিয়ে পড়েছি তারই খোঁজে। তার শুকিয়ে যাওয়ার দাগ দেখতে পাওয়া গেছে প্রত্যক্ষ পাথরের গায়ে, সেই 'ছোপ' যেখান দিয়ে ঝর্না বেরিয়েছিল। কান পাততে হয় আজও তার 'গুঞ্জন' রয়েছে কি না শুনতে, আবার সেই পাথরেই! একই প্রতীক-অনুষঙ্গ আমাদের এই তিন কবির ব্যবহারে চিনিয়ে দেবে আমাদের সময়ের বদল, কবিতা ও অনুভূতির যৌটক তার তীব্রতা, একই সঞ্জীবনীর খোঁজ এই রূপান্তরের জগতে। কিন্তু কতই ভিন্ন করে তার সন্ধান!

অরুণ মিত্র নিজেও জানতেন সে অনিবার্যতা : 'জল টের পাবার স্পর্শ নিয়ে এক দুর্বোধ্য ঋতু/নিরুদ্দেশে গেল...আর দেরি কেন/দাও আমার কপালে যন্ত্রণার রাজটীকা দাও/আমার জন্যে এই সময়ই তো নির্ধারিত হয়েছে' ('দূর দূরান্তের পর')।

হতবাক হয়ে যাই আমরা কবির এমন করে সব বলতে থাকায় : 'এই কথার পর ঘুনধরা হুড়কোটা নামিয়ে আমরা বেরোই....এক এক জায়গায় রোদ জমে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চীৎকারের এক বিশাল প্রপাতের সামনে গিয়ে পড়ি।...শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আকাশ রাঙা। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নম্র হয়ে আছে, তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মগ্ন গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু জমছে।'....('...ঝাপিটা কাল খোলা হবে', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এই বইয়েরই আরেক অংশ 'বেনামা সময়ে' আমরা তাঁর কাছ থেকে 'উপরে ওঠা' 'পুতুলনাচ' কি 'মুখোশ খুলে রেখেছি'র মতো (আমি মুখোশ খুলে রেখেছি/এখন আমি তোমাদের মতো নই') তিক্ত তির্যক কিছু 'কনসার্ট' ও 'পার্সোনা'র মুখচ্ছদের কবিতা পাই

বটে, কিন্তু 'ঘরের পৃথিবীতে' এসে আমরা আবার ফিরে পাই তাঁর সেই প্রশান্তি, বুলার দুটো বছরকে ঘিরে, 'খরজ বদলে বদলে নতুন সুর। কথার রাজ্যে টলমল করতে করতে যে পা দিয়েছিল, সে যেন এক জাদুকরী।'

এই অরুণ মিত্র। 'শুধু রাতের শব্দ নয়' বইতেও তাঁর নানা মেজাজের কবিতা, যেমন 'স্বস্তির কথা কে বলে' ('আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে? দ্যাখো না আমার হাসিমুখ বুলা হঠাৎ হঠাৎ কি যন্ত্রণার মূর্তি হয়।'), যেমন 'দেয়ালের বাইরে' ('আমি আঙুল মুঠো করে ইঁটের উপর মারছি আর আমার বুকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে'), যেমন 'সাইকেলে ভর করে' (যতবার সে উচ্চারণ করেছে 'ক্লাউন' ততবার তার চোখমুখ বিরল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে')।

কিন্তু 'গর্জনের সামনে' কবির সেই চলাটিকেই আবার আমরা দেখতে পাব যেখানে তিনি বলে যাচ্ছেন, 'আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদূরেই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ওই তারা এখন কাঁপছে, আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।'

অরুণ মিত্রের চলার বাঁকে বাঁকে এমনি সব চরিত্রপাত ঘটে। নিকট সম্ভাষণে 'তোমাকে' 'তুমি', 'বুলা'র শৈশব, কিংবা তাঁর শেষতম 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর-এ এসে 'কামিলার দিনরাত।'

কত দূরে তাঁর যাওয়া, কত 'নিসর্গ' মাড়িয়ে? কোন 'ঝড়ের কেন্দ্র' ঘুরে? অনেক বড় কবির কবিতার নন্দন তাঁদের কাব্যেই নিহিত থাকে। এই অরুণ মিত্রই যেমন বলেন, 'তাদের আলাদা করে আর আমি বলতে পারি না।'

একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, একটিই কবিতা লিখিত হওয়ার কথা সারাজীবন। 'আওয়াজ আসছে সাতরঙে অন্ধকার ফাটছে টাটকা গলায় গান না কান্না...কিছুই স্তব্ধ নয় এই ফের আরম্ভ।' কিংবা 'এক সুত এধার-ওধার এই শোক এই আহ্লাদ/আর সমস্তক্ষণ ছিলেটান জাগা।' ('অপেক্ষা')

'প্রথম পলি শেষ পাথর' বইতে তাঁর স্বীয় প্রকরণ, লেখনশৈলী, পদ্য গদ্যের সীমালোপ, বিষয়টিতেও আসেন; 'কিন্তু কে আমার ভর নেবে? গদ্য? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়।....তার প্রশ্রয়ে এক এক সময়, কী যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চলকে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভিতর প্রক্ষালিত হতে থাকে। অবিশ্যি হাড়ের ঠকঠকানিও ওঠে। তবু তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবন-ডাঙায় চারিয়ে দেয়।' ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্যপদ্য')।

কিন্তু এই গদ্য অরুণ মিত্রেরই নিজের কবি ব্যক্তিত্বের খুব অংশ, আমার ধারণা। অনেক চলতি আকাড়া শব্দ অবশ্য তিনি তুলে নেন, নুড়ি যেমন করে লোকে তুলে নেয় প্রস্রবণের ধার ঘেঁসে চলবার বা পাহাড়ি ঝোরা পার হবার সময়। বা নদীমাতৃক দেশের পলিমাটি, মানুষ, তাঁকে এই অফুরান তাজা শব্দের জোগান দেয়। তাতে ক'রে তাঁর কবিতার স্বর কখনোই সদ্য হয়ে ওঠা না হয়ে পারে না।

'শাব্দ' কবিতায় নিজেই বলেছেন : '...এমনিই টান। কবে জল পড়ছিল পাতা নড়ছিল শব্দ গড়াচ্ছিল চালের বাতায় ছুঁয়ে আসছিল পুকুরপাড় ঘেঁটুঝোপ আমি মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে ভেসে গিয়েছি মাঠের চিৎকারে সন্ধেরাত্তিরের ফিসফিসে গেঁয়ো মেলার ডাকে মার ঘুমপাড়ানিতে। রক্তের শিকড় অভিধান থেকে নেমে প্রথমভাগ থেকে নেমে....।'

এই দুটি কাব্যগ্রন্থেই, বিশেষ তাঁর তখনও পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম ও সাহিত্য অকাদেমি সম্মান ভূষিত 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এ পৌঁছে দেখছি তার গদ্যও বদলে গেছে, বাক্‌রীতি, গঠনক্রিয়া, গদ্যের মধ্যে এমনকী গান ঢুকে যাচ্ছে (দুইঠাট), গদ্যছন্দের মধ্যে ঢুকে পড়ছে যতিহীন ব্যাকরণ-পালানো গদ্য বা ভেতরে ভেতরে পদ্যধ্বনির মিলমিশেল ইত্যাদি, যাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি নিজেই আঁচ করতে পারছিলেন : 'তাদের এ ইন্দ্রজালে আমি ভিড়ে আছি তারা আজ ফুরন্ত দুপুর বিকেল আমাকে অনবরত বাজিয়ে দিচ্ছে।' বলছেন কি 'ফুরন্ত', তবে? তখন পঁচাত্তরে পা আমাদের এই অফুরান 'উৎসে'র অবাক মানা, অবাক করা কবি।

এমনকী বুক পেতে যে আঘাত নিচ্ছেন, সইছেন, ক্ষয়িত পরিপার্শ্বের আরও ক্ষতিক্ষয় বিকারের, বিনাশের মুখভঙ্গী দেখে দেখে যে 'মলাট খুলতেই বেরিয়ে এল চেনা মানুষ আর চেনা রাক্ষস', এই প্রশ্ন তুলছেন 'চেনা কেন, তবে কি আমি মৃতদের মধ্যে রয়েছি? চেনা কেন, তবে কি আমি অবিনশ্বর মানুষ ও অবিনশ্বর রাক্ষসদের মধ্যে রয়েছি?' ('ছবিগল্প') -এ কবির কাছে সমাজের শ্রেণী-পরিচয়ও কি আর অজানা থাকে!

তবু, তাতেও যে, প্রায়-রিক্তের, সবহারার, খোয়ানোর নির্মোহ স্বগতোক্তি কবি করছেন, উলটোভাবে তাও কি তাঁর কাছ থেকে আমাদের সেই 'আশ্চর্যে'র, বাঁচার রহস্যময় আশ্বাস ও আশ্রয়ের মতোই এক ঠাঁই-পাওয়া হয় না।

'আমি এত বয়সে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি...
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হাঃ হাঃ আমি নদীকে বলছি...
খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দু'একটা বীজ ভিজে ওঠে
হাঃ হাঃ যদি দু'-একটা...
ঝিঁঝিঁ হুতোম প্যাঁচা শেয়াল
আস্থায়ী আর অন্তরায় রাত ধুনছে
আমি বলছি এক মাঠ ধান...
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

'নিসর্গের বুকে', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর...'

—অবিশ্বাস্য! কতখানি বুকফাটা, ফাঁকা, বুকের ফোকরের কতটা শূন্যতা উপুড়-করা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ওই বিদারণ! তবু তাই-ই আমাদের রক্তে ভিজে-ওটা বীজ, মাঠ আর ধানের কথা শোনাতে পারে! অরুণ মিত্রের কাছে বসে এইসব কবিতার পাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা হয়তো জেনে গিয়েছেন এই কবি ও তাঁর কবিতা,—অভেদ।

ওই 'প্রান্তরেখা', কি তিরিশের প্রান্ত ছাড়ে বলেই। তারপর চল্লিশ, পঞ্চাশ, দশক-দশক উজিয়ে, 'উৎস' থেকে—পাহাড়-পাথর-উপল ডিঙোনো স্রোতোমুখে এই আশি-র নব্বই-এর উচ্চাবচ উপপ্রান্তে পৌঁছে!

স্বতই, সে উৎসারণের সরল-অসরল ও ঘুরপথটি যতটা তাঁরই দেখানো চিহ্ন ধরে ধরে, প্রানত সরে না গিয়ে, আমার মতে সে প্রবাহের মূল একটি ধারাকে আমি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, এতক্ষণ। আমার মতো করে।

আমার মতো করেই কবির কথিত 'অন্ধ জীবনের কাছে যৌতুক' বুঝে নিতে হাত বাড়িয়েছিলুম। একসময় 'কসাকের ডাক', 'ভূমিকা', 'লাল ইস্তাহার', 'আন্তর্জাতিক'-এর কবি অরুণ মিত্রের অনেক কবিতার ছত্র আমাদের মুখে মুখে ছিল এবং এরকম বাক্যবন্ধের স্মরণীয়তা : 'পক্ষঘাতের শিলা গেল খসে/ বাহুপদ ঝঙ্কার', 'ঘূর্ণির ফুকার ভরা উচাটন', 'মাজিকবাতির দূর্বল ছায়ানাচ', 'জ্বলন্ত মশালমুখ', 'কঙ্কালমুঠি বাড়াও/নির্বোধ দ্বিধা...' 'জনসাধারণ অসাধারণ' এবং এরকম আরও প্রবচন।

তাঁর এইসব স্ফুরিত বাক্যবন্ধে তো তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছিলুম এক একটা সদর্থক ভঙ্গিই যেন, যেমন সংকল্পিত কেউ পা মিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—'পদনখে উড়ালাম ধূলা', হাত পায়ের ছন্দ বাজছে—'বাহুপদ ঝঙ্কার' বা এইরকম; চল্লিশের সমাজ-সচেতনায় কবিতার বিষয়মুখী শব্দটানের এক একটা রূপ। কবিরা অংশ নিচ্ছেন সমাজ ও চেতনার রূপান্তরণের আন্দোলনে, কবিতাকে সরাসরি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া—এই অভিপ্রায়ে। পরে, 'উৎসের দিকে' থেকে আমরা জেনে যাব তাঁর কবিতার এই শারীরিকতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, কোথায় অনুভবে কোন্ উত্তরণে এগিয়ে দিতে পারে।

তবু, অরুণ মিত্র, ছন্দকুশলী সেই কবি, পদ্যছন্দ ছেড়ে দিলেন, চলে এলেন গদ্যকবিতায়, যা পরে তাঁর হাতেই অনেক রূপবদলও ঘটাবে আমরা দেখতে পাব। কখন থেকে ঘটল এই বদল?

আবার বাংলা কাব্যে এমন ঘটনার প্রতিতুলনা মনে আসে। জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নজরুল-মোহিতলাল ছোঁয়া প্রথম বই 'ঝরা পালক' থেকে দ্বিতীয় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সেই 'বোধে', '...মাথার ভিতরে এক বোধ কাজ করে'তে বদলান কতদূর। প্রায়এক ভিন্ন প্রতিভা ও কবিত্বেরই এষণা ও বিকাশ ঘটে যায় যেন সে ব্যবধানে।

অরুণ মিত্রে এমনটা বলা যাবে না, মোটেই। তাঁর বলার স্বর, উচ্চারণ বদলেছে, কবিতার বিন্যাসে বাহন এল কথ্যগদ্য, কিন্তু তাঁর বলবার কথা, শিল্প ও জীবনের কাছে এই কবির মৌল দায়, আদপেই সরে না। বরং তা গদ্যের বাহনে তাই-ই হয় আরো হার্দ্য, গাঢ়, তন্ময়, কথোপকথনে ঘরোয়া সম্বোধনে অন্তস্পর্শী, দ্যুতিময়। তাঁর কবিতার কথকতার সামনে একজন ঘনিষ্ঠ শ্রোতার উপস্থিতি আমরা সব সময়ই টের পাই।

অরুণ মিত্রের কবিতায় টানা গদ্যশৈলীর এই অভিঘাত দেখা দেওয়ার মুখপাত-সময়ের কিছু যেন আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি।

আমাদের বন্ধু কবি সুকান্তের জীবন নিভে গেল ১৯৪৭-এ। দেশের স্বাধীনতার আগেই। এই অসামান্য কবিকিশোরের অকালমৃত্যুতে, ক্ষতিতে, সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্য জগৎই বিচলিত হয়েছিল সেদিন। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবিতায় লিখলেন : 'বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে/সে কিসের বসন্ত?') সেদিনের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় অরুণ মিত্রের কবিতা পেলুম আমরা :

'...ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে

দেবে...রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অস্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত।'
এই উদ্ধৃতি গদ্যকবিতা 'সুকান্ত', এখন তাঁর 'স্মরণকাল'-এর ('উৎসের দিকে') অন্তর্ভুক্ত।

আমার একটি পরম সৌভাগ্য হয়, অনেক পরে, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিরোপার মতো। সেটা ১৯৮১-র শীতকাল হবে। কলকাতায় বইমেলায় বসেছে। তার মধ্যে আমরা বসেছি,—আমি তো বরং সংকোচেই,—সেবারে 'পরিচয়'-এর বইয়ের স্টলে। আমার এতদিনের না-গাঁথা লেখা জড়ো করে দেবেশ রায় ও 'পরিচয়'-এর লেখকবন্ধুরা দরদী উৎসাহে বার করেছেন সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি, এবং কবি-লেখক বন্ধুসমাগমের সে সুধীসভায়, কৃতজ্ঞ আমি, বইটির প্রথম কপি গ্রহণ করলুম আমার আকৈশোর প্রিয় কবি অরুণ মিত্রের হাত থেকে। তিনি, প্রগাঢ় ভালোবাসায় সাহস, বলছিলেন, এই আজ বের হল ৮০-তে এসে, 'আশি'-র কবিই আমি তাকে বলছি, তার প্রথম কবিতা আমি ছেপেছিলাম অরণি'তে সেই ১৯৪৫ সালে।

এই একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল এক অগ্রজের সঙ্গে এক অনুজের সম্পর্কের।
তাঁরই দেওয়া বলে এই আশির অভিধাও রইল আমার সরস চাপা গর্বে!
পরে আমার একটি বই 'তোমার শুধু মানুষ' যখন তাঁকে উৎসর্গ করি—তিনি 'মানুষের দশা'র কথা (human condition) বলতেন তাঁরই সেই কথা তুলে দিয়ে 'মানবিক অবস্থা মনে রেখে'—খুশি হন কবি।
'উৎসে'র, আর তারও আগে থেকে তাঁর চলা দেখেছি, অবাক হয়ে।
'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' কি তবুও কম, আরও দূর বিস্তার পর্যন্ত-ই তো আমরা তাঁর সঙ্গে যেতে তৈরি। 'একালের কবিতায় (বিষ্ণুবাবু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনের জন্য কালচিহ্নিত ওই নামই বেছে নেন।) কত স্তর ঐশ্বর্যে অরুণ মিত্র তাঁর দান জমা দিয়ে গেলেন। তাঁর ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করেছি আমরা।
যে আশ্চর্যের কথা তিনি বলেছেন, বার্ধক্যে সুন্দর তরুণ অরুণ মিত্র নিজেই তো আমার কাব্যের সেই এক আশ্চর্য। মৃত্যুলীন হয়েও তিনি তা-ই।

**পরিশিষ্ট : 'মৃত্যুর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জীবনের স্তোত্র'**

কবি অরুণ মিত্রের দীর্ঘজীবন শতাব্দীস্পর্শী। এই অনন্য কবিব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে—কথাটি দুই অর্থেই প্রযুক্ত, বলছি বিংশ শতাব্দীকেই উৎরে তাঁর শারীরিক বয়সেরই পরিধিতে একানব্বই-এ পা-রাখা, আবার একবিংশ শতাব্দীকে ছুঁয়ে চিরবিদায়ে চলে যাওয়া (জন্ম : ২ নভেম্বর ১৯০৯, মৃত্যু : ২২ আগস্ট ২০০০)।

কবির এ দীর্ঘায়ুযাত্রা তাঁর নিজের ও আধুনিকের বাংলা কবিতায় যে আশ্চর্যকর ফলবিসারী, তার সাক্ষী ও অনুগ্রাহী তো আমরাই। অনুকূল প্রতিকূল সব পরিবেশকে জয় করে সেই স্বভূমিতেই তিনি আজ অকম্প দাঁড়িয়ে। কবিতা, সৃজনশীলতা ও জীবনযাপন তাঁর কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছিল। শেষের দিকে একবার তো আমায় বলেছিলেন, এখন আর ভাবি না, কবিতা কলমের ডগায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবি-অগ্রজ সম্পর্কে যথার্থই বলেন, (এলাহাবাদে অধ্যাপনায় অবসর গ্রহণের পর) 'কলকাতায় ফিরে তাঁর কবিতার ফোয়ারা দেখে এই বিশ্বাসই

দৃঢ় হয় যে বড়জাতের কবিদের বয়স কখনও ছুঁতে পারে না।'

তাঁর জীবনের শেষ দশক অনর্গল। ৯০-এর দশকেই পর পর সাতটি কাব্যগ্রন্থ বেরুল (এও এক বিরল ঘটনা) : 'এই অমৃত এই গরল', 'টুনি কথার ঘেরাও থেকে বলছি', 'খরা উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি', 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে', 'ওড়াউড়িতে নয়', 'ভাঙনের মাটি ও 'উচ্ছন্ন সময়ের সুখদুঃখ ঘিরে' ('৯৯)। আগেই বেরিয়েছিল 'যদিও আগুন ঝড় ধ্বসা ডাঙা' ('৮৬)।

আজীবন সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েই পথ হেঁটে গিয়েছেন, তাদেরই দোসর মেনে। শুরু সেদিনের 'প্রান্তরেখা' থেকেই। তাঁর 'অসামান্যতা' কবি মঙ্গলাচরণ, গোলাম কুদ্দুস ও অনেকেরই কাছে। চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনও মানুষের দোসর এই কবিকে আত্মজন মনে করেন।

সেই চল্লিশের দশকের আর এক কবি মণীন্দ্র রায়, যিনিও সম্প্রতি প্রয়াত হলেন, যেমন অগ্রজ কবি অরুণ মিত্রের পূর্বাপর খ্যাতিকে দৃশ্যত 'হাওড়া ব্রিজের দুই চূড়ায় বাঁধা' বলেছিলেন, তাঁর প্রথম ও উত্তরপর্বের খ্যাতিকে, শেষের অরুণ মিত্রের অজস্র কবিতায় তাঁর পরিণত অবলোকনের চিহ্ন সর্বত্র ছড়ানো—চলতি নগরজীবনের সংগতি অসংগতি কি গ্রামীণ পূর্বস্মৃতিতে।

'এইভাবে চলেছি আমি, প্রত্যেকটা মুহূর্তের মধ্যে ভরে দিচ্ছি গুঞ্জন এবং তার না থামা অনুরণনে ঘিরে রাখছি আগুয়ান পথে শেষের পা ফেলা। —সেই শেষ পদক্ষেপটি ফেলে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কবি, সেই কবি ও মানুষটির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

'খণ্ড সময়ের পাত্র উপচে' সময়ের বহির্দেশের কথাও কী তিনি বলে যান না :

'আমি সূর্য ঘড়ি লক্ষ্য করি। দূরে রাখি সময়ের অঙ্ক/ আমি রোদের সঙ্গে নিজেকে মেলাই/পাখির ডাকে ভাগ করি সকাল সন্ধে রাত/আর ধুলোয় যে মানুষদের পায়ের ছাপ আঁকা। তাদের খুব আপন অনুভব করে এগোই।'

বাংলা সাহিত্যে গদ্য কবিতায়, এখানেও, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবির পূর্বসুরী থেকে যান স্বয়ং 'লিপিকা'র রবীন্দ্রনাথই। আবার বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অরুণ মিত্রের মতো কবিই বাংলা কবিতার সেই ধারার সঙ্গে ফরাসি গদ্য কবিতার র‍্যাঁবো, ও পরবর্তী আধুনিকদের সাঁ-ঝন পোর্স, র‍্যনে শার ও আরও আমাদের সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নাৎসী দখলের প্রতিরোধের যুগের এলুয়ার, আরাগঁ, প্রেভেরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন নাকি! তাঁদের সুররিয়ালিস্ট প্রেক্ষাপট সমেত তাতে তাঁর হাতে বাংলা কবিতার আস্বাদনেরই নবায়মানতা সদ্য ও স্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের চল্লিশের অব্যবহিত পরেরই পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষ-এর উক্তিতে যেমন : 'এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে আমাদের আধুনিক কবিরা তাঁদের ভাবনার প্রধান পটভূমিতে রেখেছিলেন ইংরেজি মার্কিন কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতাকে। আর সেই সূত্রেই আধুনিকতা তার মস্ত একটা ঝোঁক তৈরি করেছিল মেধায়, মননে, বুদ্ধিতে। অরুণ মিত্রের কবিতা আমাদের সরিয়ে নিতে চায় এর আধিপত্য থেকে, আর বাংলা কবিতায় সেইখানেই হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব ভূমি। যুক্তির শাসন ভেঙে জীবনকে তিনি ছুঁতে চান তার সমস্ত শরীর দিয়ে, কিংবা বলা যায় অন্তঃশরীর দিয়ে।...তাঁর কাছে অন্তরঙ্গতর হয়ে আসে আধুনিক ফরাসি কবিতার জগৎ...।'

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে অরুণ মিত্র প্রকৃতপক্ষে 'মানবতাবাদী কবি ও সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে।' তাই খণ্ডিত নয়, যে-সমগ্রের জীবনবোধকে কবি অরুণ মিত্র সেই চল্লিশের প্রগতি আন্দোলনের দশক থেকে এগিয়ে দিয়েছেন এই শতাব্দীরই উত্তরণে, তাঁর সেই ধরা ছোঁয়ার জগৎ—যাকে বলেছি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য কথকতার শৈলীর জগৎ ও তাঁর কবিতায় চকিত উদ্ভাসনের—শেষ পর্যন্তই তা এমন সব চিত্রকল্পের আটপৌরে বিভায় অন্তর্ভেদী হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ নির্বাচিত ও শ্রেষ্ঠ কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থ ও সাহিত্য অনুবাদ নিয়ে চল্লিশটির ওপর বই প্রকাশিত হয়েছে ও তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর পরেও তাঁর অনেক লেখা ও কবিতা অগ্রন্থিত থেকে গেছে। আশা করা যায় অচিরে সেগুলি বই হয়ে প্রকাশ পাবে। পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আজীবনের। কবি অমিতাভ দশগুপ্তের কাছে 'অভিজাত কবি' তিনি। তাঁকে আপনজন মনে করেন কবি রাম বসু ও তরুণ প্রজন্মসহ এসময়ের সকলেই।

কবি অরুণ মিত্র প্রসঙ্গ দীর্ঘবিস্তরী। ফ্রান্সে তাঁর ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা 'র‍্যাঁভু ব্লাঁশ' বা 'শ্বেতপত্রিকা' গোষ্ঠী নিয়ে। তিনিই প্রথম এশীয় গবেষক যিনি এমন ফরাসি ভাষায় ফরাসি সাহিত্য নিয়ে কাজ করেন বা পরে মূল ফরাসি থেকে ভলতেয়ার-এর 'কাঁদিদ' অনুবাদ করেন সাহিত্য অকাদেমির জন্য, ফরাসি সরকার তাঁকে অর্ডার অফ পাম আকাদেমিক (Palms Academiques) সম্মাননায় ভূষিত করেন (১৯৯২)—এসব প্রসঙ্গে আমি যাইনি। আমি শুধু তাঁর কবিতার প্রবহমানতার মধ্য দিয়েই সেই জীবনসত্যকে ছুঁতে চেয়েছি, বাংলা কবিতার জগতে তাঁর নিজস্ব ভাস্বরতায়।

তাই, শেষে তাঁরই শেষলেখা একটি কবিতা, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খাতা থেকে উদ্ধার করে এবছরই শারদীয়ায় প্রকাশিত হয় ('দেশ' ১৪০৭); সেটি ও তাঁকে উৎসর্গীকৃত আমার একটি কবিতা পাঠ করে 'আমার চোখে বা আমার অনুভবে কবি অরুণ মিত্র'—এ নিবেদন নিষ্পন্ন করি।[১]

## বাঁচা

### অরুণ মিত্র

আমি একটা একটা করে পাথরগুলো গেঁথেছি। আমার একলার কাছে মায়াবী এই স্মৃতিস্তম্ভ। প্রত্যেকটা পাথরে রক্তের ছিটে, কিন্তু আমি তা মুছিনি। ওই মৃত্যুর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জীবনের স্তোত্র শুনব বলে। সমস্ত অস্থিরতা অনড় গম্ভীরে ডুবে চুপ। সেই মুহূর্ত থেকে আমার দশ আঙুল দিয়ে যন্ত্রণা ছাপিয়ে আনন্দমূর্তি গড়া। এই আমার কাজ। যদি কেউ বলে এ এক তুচ্ছ জীবনযাপন। যা এক ফুঁয়েই উড়ে যাবে। আমি চুপ করেই থাকব। আমি জানি আমার চব্বিশ ঘন্টার রক্তঝঙ্কারে এই আমার বাঁচা।

# অরুণ মিত্রের অমরতা

সিদ্ধেশ্বর সেন

'আমার প্রতিশ্রুতি কোথায় খোদাই হবে আর,
কোন্ পাথরে কোন্ কঙ্কালে'
তিনি দিয়ে গেলেন সবটুকুই উজাড় করে, উপুড় হাতে,
বাকি রইলো না তো আর কিছুই—

সেই যিনি বলেও গেলেন, 'তবু আশ্চর্যকে জেনো',
তাঁর 'অমরতার কথা'য়—
চেতানো, শূন্য মুঠিও তাই

তিনি নীরেট টেবিলে, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে
এখন, নতুন শতাব্দীর
সর্বত্যাগী কবি-সন্তের বা
ভাষা-বিপ্লবীর মতো শুয়ে—
তিনি নয়?—
তাঁর নির্বাণ-মরণোত্তর দেহ—
জগৎকে দেখবার-জানবার স্পর্শাতুর কবিত্বের চোখদুটি, সব নিঃশেষে—
মানবধর্মের ব্রতে, ধর্মহীন নিরীশ্বর তিনি
প্রজন্মের চৈতন্যের প্রগতিতে—
(জাতকের বোধিসত্ত্বের মহাবদানে যেন)
অস্থি-বসা-কোষ সর্বস্বই
দান ক'রে দিয়ে—

সেই 'প্রান্তরেখা' ছেড়ে, 'উৎসের দিকে' আরও উৎস খুঁজে নিতে
তাঁর উজানযাত্রায়!
(আমিও দেখেছি পূর্বাপর যাওয়াও তাঁর—
আমাকেও 'অরণি'র আলো ধ'রে দিয়ে)'
শেষে, নব্বই-পেরোনো শীর্ণ হাড়ে
তবু দধিচীর বজ্রের গুঁড়োয়
পাথুরে জমিতে সার দিতে—
কত চড়াই-উৎরাই, কতনা খরা-ডাঙা ভেঙে ভেঙে
গিয়েছেন হেঁটে

—'রক্তপায়ে যদি দু'একটা বীজ ভিজে ওঠে—
এই কথা সকলকে ডেকে ডেকে ব'লে, নাকি
'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' এসে—
হ্যাঁ, আমিও সে যাত্রার যাপনের সাক্ষী

'শুধু রাতের শব্দ নয়'—জেনেও, তবু
কখন্ যে রাত ঘুমে ঢ'লে
—শেষ ঘুম—তাও তাঁর আমরণ স্বপ্নের জোয়ার
এত ভেসে—

ওহো, মানুষ ও প্রকৃতির স্ফুরণের
বীজতলা ফেঁপে, জেগে ওঠো
আর তুমিও, জীবনেরই পাথুরে বনেদে গড়ো
জীবনেরই যোগ্য সে কবিতা ও শিল্প,
জেনো, মাটি ও ফলনে চোখ রেখে, চোখ বুঁজে
শুয়ে, তোমার আপনজন—
তোমাদেরই কবি—মহতের অরুণ মিত্র।।

---

১. সাহিত্য-অকাদেমির 'থ্রু মাই উইনডো' কর্মসূচীতে প্রদত্ত কবি অরুণ মিত্র স্মারক-বক্তৃতা।
২. 'অরণি'-তে (১৯৪৫) আমার প্রথম কবিতা প্রকাশ তাঁরই হাতে।

# মরিচ-সংবাদ

**শ্রীপান্থ**

"সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে", রবীন্দ্রনাথের 'মণিহারা' গল্পে বলেছিলেন স্কুল মাস্টার। শুধু 'স্ত্রীজাতি' কেন, বহুদর্শী কবি চোখ বুঁজে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন ভারতীয় নামক জাতিটিই আসলে ঝাল লঙ্কার ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবার জানিয়ে গেছেন ঝাল লঙ্কায় তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। যা ছিল তা আসলে আতঙ্ক। সেই ছড়াটির কথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে; "খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে,/পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে", ইত্যাদি। তারপর কী কাণ্ডটাই না হল, ডাক্তার যদিও অভয় দিয়েছিলেন, কোনও চিন্তা নেই,—"খাবার জিনিস খাদ্য", তা সত্ত্বেও "দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ।" কবির লঙ্কাতঙ্কের আরও নমুনা খুঁজে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। একটির বক্তব্য ছিল; "লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,/গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।/আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,।/ঘন্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,/বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত।" বৈদ্যরা শুনলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন। কেননা, লঙ্কা খেয়ে কেউ কখনও মারা গেছেন কখনও তা শোনা যায় না। লঙ্কার দ্রব্যগুণ জানা থাকলে কবি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, লঙ্কা আসলে জীবনদায়ী। তাকে মৃতসঞ্জিবনীও বলা চলে। সেসব কথা না হয় পরে হবে। আপতত বলার কথা এটাই, প্রাণেশ্বর না হলে ঝাল লঙ্কা আরও কোটি কোটি ভারত সন্তানের মতো আমারও প্রিয়। গরিবের কাছে তো বলতে গেলে প্রাণাধিক প্রিয়। আধখানা পেঁয়াজ আর গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা ও নুন দিয়ে গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষ এক থালা পান্তা উড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন এ-দৃশ্য আমার মতো আরও অনেকে নিশ্চয় দেখেছেন। চোখ খোলা রাখলে শহরেও কখনও কখনও দেখতে পাবেন গাছতলায় অ্যালুমুনিয়ামের থালায় লঙ্কা সহযোগে কেমন তৃপ্তির সঙ্গে নুন দিয়ে মাখা ছাতু খাচ্ছেন গরিব রিকশাওয়ালা!

বছর কয়েক আগে "দ্য স্টেটসম্যান"-এর পাতায় খ্যাতনামা প্রকৃতি পড়ুয়া এম কৃষ্ণনের একটি লেখায় পড়েছিলাম অন্ধ্রের উপকূলে গরিবদের একটি সাপ্তাহিক হাটে তিনি দেখেছেন সেখানে বেচা কেনা চলে নিছক তিনটি বস্তুর; দু'তিন ধরনের মোটা চাল, দু'তিন ধরনের নুন, আর চারপাঁচ রকম লঙ্কা। গরিবদের প্রধান খাদ্য বলতে এগুলিই!

শুধু গরিব কেন, সম্পন্ন বাঙালির হেঁসেলেও যাকে বলে সেই সেকাল থেকে লঙ্কার কদর। 'অন্নদামঙ্গল'-এ ভারতচন্দ্র নিরামিষ রান্নার বিবরণ দিয়ে লিখছেন,—"নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।/আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে।।/কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল।/ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।/কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে বই।।"....ইত্যাদি ভারতচন্দ্র যদি পশ্চিমবঙ্গের ঝালে আসক্তির কথা বলে থাকেন তবে বরিশালের কবি বিজয়গুপ্তের (মনসামঙ্গল) মুখে শোনা যাবে পূর্ববাংলার খবর, তা তিনি লিখছেন,—"মাগুর

মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছা।/ঝাল কটু তৈলে রান্ধে খরসুন মাছ।/ভিতরে মরিচ গুঁড়ো বাহিরে জুড়ায় সুতা।/তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিংড়ির মাথা।/ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।/কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।" সুতরাং, "চিলি-চিকেন" সূত্রে আস্বাদন নয়, লঙ্কা কিংবা মরিচ, যে-নামেই ডাকি, প্রকৃতির এই বিশেষ অবদানটির রূপ রস গন্ধ এবং স্পর্শের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কালের।

অথচ মজার কথা এই, লঙ্কা কিন্তু আমাদের আপন ধন নয়। তার মানে এই নয় যে, আমরা যুদ্ধ করে কাউকে পরাস্ত করে তার লঙ্কাক্ষেত দখল করে নিয়েছি। "আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়",—সবাই জানেন, সেটা কথার কথা মাত্র। তাছাড়া জয় করে থাকলেও সে লঙ্কা এই লঙ্কা নয়, যার আর এক নাম মরিচ। ইংরেজিতে এই লঙ্কাকে বলা হয়—"চিল্লি পিপার।" হিন্দিতে "মিরচা", বাংলায় মরিচ এবং লঙ্কা দুই-ই চলে। এই লঙ্কার আদি ভূমি মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও। মায়া সভ্যতায় তার বিশেষ মর্যাদা ছিল, মান এবং দাম ছিল আজটেকদের কাছে। মায়া সভ্যতায় লঙ্কা মুদ্রার বদলে বিনিময় পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হত। তাঁরা লঙ্কাকে এমনই অপরিহার্য বলে জ্ঞান করতেন যে, মৃতের সঙ্গে কবরেও লঙ্কা দিয়ে দেওয়া হত। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য তাদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত মন্ত্রপুতঃ অস্ত্রের মতো লঙ্কা। লঙ্কা ছিল তাদের কাছে উত্তেজক, রেচক, পরিপাকে সহায়ক, এবং বলবর্ধক। জ্বরে কিংবা বিষক্রিয়ায়ও ওঁরা প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করতেন লঙ্কা। ভারতের কোনও কোনও জনগোষ্ঠীও নাকি দরজায় শুকনো লঙ্কার গুচ্ছ ঝুলিয়ে রাখেন অপদেবতাকে ঠেকাবার জন্য। কিছু কিছু শহুরে গাড়ি চালকদের মধ্যেও এ-ধরনের সংস্কার চালু রয়েছে। তাঁরা বিপদতারিণী হিসাবে গাড়ির পেছনে জুতো এঁকে বা পুরানো জুতো ঝুলিয়েই ক্ষান্ত হন না, উইন্ডস্ক্রিন বা সামনের কাচে ঝুলিয়ে রাখেন লাল লঙ্কা।

সেটা ১৪১৯ সালের কথা। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এই ঝাঁঝালো বস্তুটিকে ইউরোপে নিয়ে আসেন ক্রিষ্টোফার কলম্বাস। স্পেন হাতে পেল অদ্ভুত স্বাদের ও গন্ধের লঙ্কা, যা দাঁতে কাটলে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যায়। জল খেলেও চট করে জ্বালা কমে না, চোখে জল আসে, কপাল ঘেমে যায়, নিঃশ্বাস তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে অনুচ্চ স্বরে হলেও উঃ আঃ করতে হয়। তারপর ইউরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে। ১৫৪৮ সালে খোঁজ নিয়ে দেখা ব্রিটেন সহ পশ্চিম ইউরোপের সব দেশেই পৌঁছে নতুন পৃথিবীর আশ্চর্য অবদান,—"চিল্লি পিপার",—লঙ্কা। ওদিকে নতুন দুনিয়ায়ও তার খাতির যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সপ্তদশ শতকে মেক্সিকোয় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ৪০ জাতের লঙ্কা, এখন নাকি তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯২।

ভারতে লঙ্কা নিয়ে আসেন পর্তুগিজরা। কেউ কেউ বলেন ভাস্কো ডা গামা-র প্রথম অভিযানের সময়ই ভারতে পৌঁছায় দক্ষিণ আমেরিকার লঙ্কা। অবশ্য ভায়া ইউরোপ। তারপর দেখতে দেখতে উপমহাদেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই আগ্নেয় শস্য। অন্তত ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, সারা ভারতেরই মন জয় করে নেয় লাল মরিচ। এই মশলার স্বর্গরাজ্যে লঙ্কা নাকি আজ সবচেয়ে প্রিয় মশলা। ঝাঁঝ আর ঝালে ভরপুর এই ক্ষুদে লঙ্কার কাছে এদেশে হার মেনেছে অন্য সব মশলা। তাছাড়া, আমাদের এই দেশই লঙ্কার প্রধান উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক দেশ। অর্থাৎ, এই ক্ষুদে শয়তান, এদেশে সাহেবরা

যাকে বলতেন "লিটল ডেভিল" শুধু যে আমাদের রসনাকেই তৃপ্ত করছে তা নয়। বিদেশ থেকে মোটা টাকাও রোজগার করে ঘরে আনছে।

এবার বুঝি সে-পথে কাঁটা পড়ল। কেননা। 'বাজার', 'বাজার' করে হাটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পশ্চিমের লুঠেরার দল। তাঁদের বাহুবল, অর্থবল দুই-ই আছে। তাছাড়া হাতে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধুনিক হাতিয়ার। মজার কথা এই, কেড়ে নেওয়াটাকেও তাঁরা দেখাতে চায় স্বাভাবিক আইনসম্মত মোলায়েম এক পদ্ধতি হিসাবে। ভুবনীকরণের নামে "ডব্লিউ টি ও" দোহাই পেড়ে তাঁরা এমন এক নিখুঁত জাল বুনেছে যে, তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই শক্ত। স্বভাবতই, ভারতের নিম, হলুদ, বাসমতী, দার্জিলিং চায়ের মতো ভারতের মরিচকেও তাঁরা তাক করেছেন। বলছেন, পশ্চিম-উপকূলের ওই যে লাল টুকটুকে মরিচটি সেটির স্বত্ব আমরা চাই। আগেই বলেছি মরিচ ইউরোপে অজানা বস্তু নয়। দক্ষিণ আমেরিকা তো বলতে গেলে মরিচময়। তবু ভারতের লঙ্কা ক্ষেতগুলোর উপরই নেকনজর কেন? তবে কি বেড়াল এখানে নরম মাটি পেয়েছে বলেই মাটি আঁচড়াচ্ছে?

জানি না। শুধু এটুকু জানি ভারতের নানা অঞ্চলে অনেক রকম লঙ্কাই ফলানো হয়। গোলগাল সবুজ ক্যাপসিকাম থেকে ক্ষুদে ধানি লঙ্কা। মনে পড়ে, কর্নাটকের এক বাজারে লঙ্কার বৈচিত্র্য দেখে সে কী বিস্ময়! কত ধরনের লঙ্কাই না ছিল দোকানটিতে। লম্বা, বেঁটে, মোটা, রোগা; বিশাল ক্ষুদে; গোল, চাপ্টা; সাদা, দুধ সাদা, লাল, টুকটুকে লাল, হলুদ, সবুজ, সে এক অভাবিত প্রদর্শনী। দেখলে বোঝা যায়, রসিকরা শুধু ঝাল নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের আরও অনেক কিছুই বিচার্য। অথচ, কে বলবেন, এই লঙ্কা একালে বিদেশ থেকে আমদানি করা! প্রাচীন কোনও ভারতীয় শাস্ত্রে লঙ্কার উল্লেখ নেই। সেখানে মরিচ বলতে কালা মরিচ বা গোল মরিচ। ঝালের জন্য পিপুল, শর্ষে বা অন্য কোনও কিছু ব্যবহার করা হত, লাল মরিচ কদাচ নয়। মাটি, জল হাওয়া এবং হাতের গুণে ভারতীয় কৃষকের সেই লঙ্কা কী অপরূপ রূপই না পেয়েছে!

অবাক হওয়ার পালা সেখানেই শেষ হয়নি। তারপরও আর একটি চমক। কয়েক মাস আগের কথা। হঠাৎ, খবরের কাগজে চোখে পড়েছিল ছোট্ট একটি সংবাদ। মর্ম ঃ লঙ্কার এক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তাতে প্রথম স্থান দখল করেছে ভারতের একটি বিশেষ জাতের লঙ্কা। অলিম্পিকে বিচার্য ছিল, কোন লঙ্কা কত বেশি ঝাল সেটাই। ঝাল পরিমাপের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে। ১৯১২ সালে উইলিয়াম স্কোভিল নামে একজন রসায়নবিদ সেটি উদ্ভাবন করেন। আশির দশকে সেই পদ্ধতি আরও উন্নত এবং নির্ভুল করা হয়েছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপবার জন্য রিখটার স্কেল নামে যেমন একটা পরিমাপ যন্ত্র আছে, জ্বর মাপবার জন্য যেমন রয়েছে থার্মোমিটার, ঠিক তেমনই লঙ্কার ঝাল মাপবার জন্য স্কোভিল-এর স্কেল। তাতে দেখা গেল ভারতের নাগাল্যান্ডের জোলোকিয়া ৮,৫৫,০০০ পয়েন্ট পেয়েছে, আর দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে লঙ্কার আদিভূমি মেক্সিকোর সাভিনা হাবানেরো পেয়েছে ৫,৭৭,০০০ পয়েন্ট পেয়ে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ খবর, নাগাভূমির এই লঙ্কা সেখানকার নিজস্ব ফসল। মোটেই বিদেশ থেকে আমদানি করা নয়। অবশিষ্ট ভারত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কোনও খবর রাখত না, এই যা। নাগারা যুগ যুগান্ত ধরে তা খেয়ে আসছেন পরম তৃপ্তি সহকারে। একমাত্র ওই অঞ্চলের হাটেই ওই লঙ্কা পাওয়া যায়। সমতলের মানুষ অবশ্য তা সংগ্রহ করেন তেজপুরের বাজার থেকে। তাই, অনেকের কাছে এই লঙ্কা—

'তেজপুরের লঙ্কা।' বাপরে! লাল রঙের সেই লঙ্কার সে কী ঝাল! একজন অভিজ্ঞ রসিক জানাচ্ছেন, একটি লঙ্কা ভেঙে ছয় জনে খেলেও কারও পক্ষে ঝালে ঘাটতির কোনও সম্ভাবনা নেই! আমেরিকার লোভাতুর মুদ্রারাক্ষসেরা এই লঙ্কার দিকেও রোমশ হাত বাড়িয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তা বাড়াতে আর কতক্ষণ!

সেকালের পৃথিবীতে এক দেশের জিনিস অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে। কেউ তাতে আপত্তি করেনি। সেই লেনদেনর পিছনে বাণিজ্যিক তাড়না থাকলেও না। কেননা, কেউ এমন জেদ ধরেননি যে, এটি শুধু আমরাই চাষ করব, তোমরা তা করতে গেলে আমাদের নজরানা গুণে দিতে হবে, নয়ত হাত কেটে নেব! খাদ্যের ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা জানেন, শতকের পর শতক জুড়ে এভাবে চলেছে ফুল, ফল, রকমারি শস্য, মশলা আর রকমারি গাছ গাছালির বিশ্ব পরিক্রমা। কিন্তু ভুবনীকরণের নামে ইদানীং যা শুরু হয়েছে তাতে একদল চাইছেন বিশেষ গাছ বা ফসলটির উপর একচেটিয়া অধিকার। এই সংকীর্ণতা আর নগ্ন স্বার্থপরতার কোনও তুলনা হয় না। কিছু কিছু সাদা মনের ভালো মানুষ আছেন, যাঁরা বলবেন, হলদি গাছটি বা তোমার ওই লঙ্কা গাছটি তো আর ওঁরা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন না,—তার একটা বিশেষ গুণকে চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবহারকেই নিজেদের একান্ত সম্পদ হিসাবে দাবি করছেন, এই যা। আমরা যে আগামী কাল বা পরশু নিজেরাই তা করতাম না, তা কে বললেন? হয়ত এই মুহূর্তে প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা কিছুটা অপ্রস্তুত, কিন্তু তার জন্য কি এভাবে কেড়ে নেওয়া গায়ের জোর খাটানো নয়? কিন্তু এই 'বাজারে' এসব যুক্তি নাকি অচল!

অথচ এই মরিচের বিশেষ ব্যবহার কিন্তু পশ্চিমের মানুষকে আমরাই শিখিয়েছি। ব্রিটেনের মানুষ আজ "কারি" বলতে পাগল। এই "কারি"-র অন্যতম অনুপান কিন্তু লঙ্কা। "কারি পাউডার" সেই অষ্টাদশ শতক থেকে চলছে পশ্চিমে। তাতেও বিশেষ ভূমিকা এই লঙ্কার। সাহেব মেমরা আজ যে পরিমাণ ঝাল খাচ্ছেন, বাপের জন্মে কোনও কালে ওঁরা তা খাননি। "ঝাল" ইংরেজি তাহলে "হট" হত না, অন্য কিছু হত।—তাই না?

লঙ্কার সঙ্গে আমাদের আগে ইংরেজ বা আমেরিকানদের পরিচয় হয়ে থাকলেও লঙ্কা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত ওঁদের গুরুতুল্য, ওঁরা শিষ্যমাত্র। তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত। অনেকেই জানেন, নিউইয়র্ক এবং আমেরিকার অন্যান্য বড় শহরে মেয়েদের পক্ষে রাস্তাঘাট আজ যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মেয়েরা অনেকেই তাই ইদানীং নাকি আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে রাখছেন লঙ্কার গুঁড়ো ভর্তি ছোট্ট একটি টিউব ('tiny canisters of chilli powder')। ক্যারাটে বা জুডো শিখতে হয়। এটি ব্যবহার অতিশয় সহজ। কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে অতুলনীয়। ছোরা বা পিস্তল প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু চোখে লঙ্কার গুঁড়ো লাগলে প্রাণনাশের কোনও সম্ভাবনা নেই। সবাই জানেন, চোখে ধুলো না দিয়ে আমাদের দেশে দুষ্কৃতিরা চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে ছিনতাই বা রাহাজানি করে। হামেশাই খবরের কাগজে তা বের হয়। শুনেছি 'মিরচ্ মশালা' নামে একটি হিন্দি চলচ্চিত্রেও নাকি এর দক্ষ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। আমরা একই ব্যবহার দেখি আরও পেছনে তাকালে।

নবাব শায়েস্তা খাঁ নাকি বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের পীড়ন করতেন। "মদনের গান" বা "মদনপালা" নামে একটি লৌকিক কাব্যে পীড়নের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি ছত্র—"তামাক খেয়ে শুল কারু ছাপ ধচ্চে গায়।/ লঙ্কা মরিচের

ধোঁয়া কারো নাকে দেয়।" অতলান্তিকের এপারে ওপারে সাহেবরা হয়ত লঙ্কার এই ব্যবহারটিও শিখে নেবেন! (পেটেন্ট না চাইলেই বাঁচি।)

অতঃপর শোনা যাক আত্মরক্ষার হাতিয়ার লঙ্কার ব্যবহারের কথা। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্যে "নুবেন্নেসা বা কবরের কথা" নামে পূর্ব্ববঙ্গের একটি লৌকিক কাব্য থেকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি (দ্রঃ ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৭৫১-১৮৫৫)

"কয়জন জাইল্যা তথায় সহিগরে মাছ ধরে।" এমন সময় নৌকোয় চড়ে মগ দস্যু দলের আবির্ভাব। তারপর

ডাঙ্গায় শুরু হৈলরে সেই ধু ধু বালুর চরে।
কারো মাথা ফাড়ি গেল গে, কেহ গেল মরে।।
জাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তাড়াতাড়ি আইল লগই মরিচের গুঁড়া।।
মরিচের গুঁড়া আনি কী কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলা দিল।।"

ব্যস। তারপর—"ভোম খাইয়া পড়ে ডাকাইত বালুর উপরে",—ইত্যাদি।

মেমদের পকেটে লঙ্কা গুঁড়োর ওই ছোট ছোট পাত্রগুলোর কপিরাইট কি ভারত দাবি করতে পারে না? কিন্তু বুঝতে পারি, যৎসামান্য চক্ষুলজ্জা থাকলে এসব নিয়ে বাণিজ্য কোনও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতির মানায় না। কিন্তু এই বৈশ্যযুগে, কে না জানেন, পশ্চিমী শ্রেষ্ঠীদের চক্ষুলজ্জা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সে চোখে জ্বল জ্বল করছে লোভ, আর লাভ।

'লাভ' মানে অবশ্য প্রেম নয়,—মুনাফা। তবে হ্যাঁ, প্রেমের পাঠেও যে লঙ্কার ভূমিকা থাকতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে। উইলিয়াম মেকপেস থ্যাকারের "ভ্যানিটি ফেয়ার" থেকে তার ছোট্ট একটি উদাহরণ। তরুণ ইংরেজ সন্তান জোসেফ ভারতে কোম্পানির একজন কর্মী। ছুটিতে তিনি দেশে ফিরেছেন। জোসেফ ইতিমধ্যে ভারতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তাঁর প্রিয় ডিস্ ভারতীয় "কারি।" পরিবারের লোকেরা তা জানেন। বেকি শার্প নামে একজন তরুণী জোসেফের বোন অ্যামেলিয়ার সহপাঠিনী। তিনি তখন বান্ধবীর সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন। জোসেফের বাবা মা ও বোনের ইচ্ছা এই মেয়েটির সঙ্গে জোসেফের পরিচয় হয়, এবং দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক কথায় ওঁদের মনোগত বাসনা জোসেফ ভবিষ্যতে এই মেয়েটিকে নিয়ে ঘর সংসার করে। সেদিন খাবার টেবিলে বাবা মা বোন এবং এই মেয়েটি একসঙ্গে হাজির। মা অনেক যত্ন করে রান্না করেছেন ছেলের প্রিয় ভারতীয় "কারি।"

জোসেফের মা মিসেস সেডলি অন্যদের মতো বেকি ওরফে মেয়ের বান্ধবী রেবেকার প্লেটেও দিয়েছেন "কারি।" রেবেকা জোসেফের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন, —এটা কী? জোসেফের চোখে মুখে তখন "কারি" খাওয়ার আনন্দ। তিনি বললেন,—চমৎকার! মা, ভারতে আমি যে "কারি" খেয়ে থাকি তোমার এই "কারি" অবিকল তার মতো হয়েছে।—ওহ্ তাই নাকি? ভারতীয় "কারি" যখন, তখন আমাকেও খেতে হবে বই কি! রেবেকা বলে উঠলেন।—আমি জানি ওদেশ থেকে যা আসে সবই চমৎকার জিনিস। জোসেফের বাবা মিঃ সেডলি হেসে ফেললেন। স্ত্রীকে বললেন—দাও ওকে কারি দাও। রেবেকা কারি মুখে দিয়ে বলে উঠলেন—চমৎকার। এদিকে ঝালে কিন্তু তাঁর মুখ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু পিছু

হটলে চলবে কেন? জোসেফকে যেমন করে হোক বোঝাতে হবে তাঁর পছন্দ আর ওঁর পছন্দ এক। জোসেফ ওঁর মুখে "কারি"র তারিফ শুনে বললেন,—মিস শার্প এর সঙ্গে তুমি চিলি-ও খাও। খেয়ে দেখ আরও ভাল লাগবে।—চিলি? রেবেকা হাতে তুলে নেন একটি কাঁচা লঙ্কা। মনে মনে ভাবেন, এটি নিশ্চয় ঠাণ্ডা কিছু, মুখের জ্বালা হয়ত এতে কমবে। লঙ্কাটা হাতে নিয়ে তিনি তা আদর করে পরখ করেন, —আহা, কী সবুজ, তাজা, আর কী সুন্দরই না দেখতে! তিনি লঙ্কা দাঁতে কেটে মুখে পুরে দিলেন। আর যায় কোথায়? "কারি"-র আগুনের সঙ্গে এবার যুক্ত হল লঙ্কার আগুন। মুখে বেচারার সে কী লঙ্কাকাণ্ড। তবু হার মানলে চলবে না। রেবেকার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে। কপাল ঘামে ভিজে গেছে। প্রেমের পরীক্ষায় তাঁকে জিততেই হবে। জোসেফ যে লঙ্কা অবলীলায় খেয়ে নিলেন, তিনি তা পারবেন না কেন? বেচারা। তাঁর হাত থেকে কাঁটা চামচ খসে পড়ল। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। আর্তনাদ করে উঠলেন—জল। জল! দোহাই লাগে, জল দাও! জোসেফের বাবা হেসে উঠলেন,—হ্যাঁ, এ বস্তু সত্যকারের ভারতীয় জিনিস! "—দে আর রিয়্যাল ইন্ডিয়ান, আই অ্যাসিওর ইউ।" ওগো, মিস শার্পকে জল দাও। জোসেফ আড় চোখে সব দেখছেন, আর মিটিমিটি হাসছেন।

তারপরও কি কেউ বলতে পারেন, লঙ্কা, যার আর এক নাম লালমরিচ, তা ভারতের নয়,—অন্য কারও?

# মুক্তমতি মার্কসবাদী অধ্যাপক সুশোভন সরকার

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

"পরিচয়" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী অধ্যাপক সুশোভন সরকারের জন্মশতবর্ষকে স্মরণ করে "শারদীয় পরিচয়" পত্রিকার একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ আমাকে জানিয়েছেন। তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। গোড়াতেই বলে রাখি যে আমার লেখাটি ধারাবাহিকভাবে অধ্যাপক সরকারের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিবরণী ও বিশ্লেষণ হবে না। তাঁর দীর্ঘজীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডের এমনকি চুম্বক আকারে বিবরণী দিতে গেলেও একটি বই লেখা, "শারদীয় পরিচয়ের" নির্দিষ্ট পাতায় তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া "পরিচয়ের" সম্পাদকমণ্ডলী অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্মৃতিচারণও করতে বলেছেন। দুটি কাজই মিলিয়ে মিশিয়ে লেখার চেষ্টা করব।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট, পশ্চিমবাংলার কাঁথি শহরে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম পরিবারে সুশোভন সরকারের জন্ম হয়। আর তিনি প্রয়াত হ'ন ১৯৮২-র ২৬ আগষ্ট নাকতলায় নিজের বাড়িতে। অসুস্থ ছিলেন, তবে পঙ্গু হয়ে পড়েননি, ঐ বছরই ১৯ আগষ্ট তাঁর জন্মদিনে অন্তরঙ্গ অল্প কিছু আত্মীয় বন্ধু অনুরক্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে যে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কাজকর্ম কেমন চলছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে বর্তমান প্রজন্মকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে প্রকৃত অর্থে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ অধাপক সুশোভন সরকারেরই মানস সন্তান। ১৯৭৭-এ কেন্দ্রে জনতা সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যখন ভারতের একাধিক বিশিষ্ট প্রগতিশীল ইতিহাসবিদের স্কুলের জন্য লেখা উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তককে তীব্র আক্রমণ করেন, তখন অসুস্থ শরীরেও অধ্যাপক সরকার "অমৃতবাজার পত্রিকায়" "in defence of progressive historians" বলে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। কেন্দ্রীয় সরকার রুষ্ট হতে পারেন। এই ধারণা থেকে "অমৃতবাজার পত্রিকার" পরিচালকরা প্রবন্ধটি ছাপতে সাহস করেননি। তবে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের রচনা একেবারে বর্জন করতেও তাঁদের বেধেছিল। তাই মধ্যপথ নিয়ে প্রবন্ধটি দৈনিকের চিঠিপত্রের স্তম্ভে তাঁর নামেই প্রকাশ করা হয়েছিল।

সেই দীর্ঘপত্র বা প্রবন্ধটি আমরা কয়েকজন মিলে পুস্তিকার আকারে ছেপে ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরের শেষে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করি। ঐ প্রবন্ধ-পুস্তিকাতেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আমরা ইতিহাস কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করি ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা ইতিহাস কংগ্রেস কখনও পরিচালত হবে না, উঁচুতে তুলে ধরবে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চাকে—এই কথা ঘোষণা করি। বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বক্তব্যের

সমর্থনে যাঁরা ভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব, ড. বরুণ দে, অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ, অধ্যাপক সুমিত সরকার, অধ্যাপক বিপান চন্দ্র ও এই প্রবন্ধের লেখক। বিপুল ভোটাধিক্যে শতকরা ৯০ জন প্রতিনিধিই এই বক্তব্যকে অনুমোদন করেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। NCERT প্রকাশিত ঐ সব উৎকৃষ্ট ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে।

কলকাতায় ফিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা যখন অধ্যাপক সরকারকে ভুবনেশ্বর অধিবেশনের সব খবর দিলেন, তখন তিনি খুব খুশি হ'লেন এবং আমাদের কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে ডেকে বল্লেন ঃ এবার তোমরা পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার একটা সংগঠন গড়ে তোল, যা শুধু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেই ইতিহাস চর্চার এই আদর্শ প্রচার করবে না, তাকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে। তাঁর এই পরামর্শকে শিরোধার্য করে ১৯৮৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ২০।২৫ জন অধ্যাপক মিলে জন্ম দিলেন পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে। দু'একজন ছাড়া উপস্থিত সকলেই ছিলেন কোনও না কোনও সময় অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ছাত্র। তাঁর একেবারের গোড়ার যুগের একজন ছাত্র ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ হ'লেন ইতিহাস সংসদের সভাপতি আর আমি হলাম তার আহ্বায়ক। অ-সাম্প্রযায়িক ও মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চার যে বীজটি অধ্যাপক সুশোভন সরকার রোপণ করতে সাহায্য করেছিলেন। দুই দশক্ পরে আজ তা শাখা-প্রশাখা মেলে বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সদস্য ও সংগঠক আছেন এ রাজ্যের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় সমস্ত কলেজে ও বেশ কিছু স্কুলেও। অধ্যাপক মাহমুদ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনিই ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি ও কর্ণধার এবং তাঁর পরামর্শেই বেশ কয়েক বছর হ'ল পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রতিবছর অধ্যাপক সুশোভন সরকারের জন্মদিনে একটি করে স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে আসছে। এ পর্যন্ত যাঁরা যাঁরা ঐ স্মারক বক্তৃতাটি দিয়েছেন (প্রত্যেকটিই ছেপে বের করাও হয়েছে) তাঁদের মধ্যে আছেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সুশোভন বাবুর আদিযুগের ছাত্র নিখিল চক্রবর্তী, এবং বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. অশীন দাশগুপ্ত। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,. এই প্রবন্ধের লেখক, অধ্যাপক গৌতম ভদ্র, অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং সমাজবিজ্ঞানী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার সপক্ষে এই নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করার জন্য সারা ভারতে ইতিহাস সংসদের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে এবং ইতিহাস সংসদের সাধারণ সম্পাদক ড. রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে ২০০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইতিহাস কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে এই সমগ্র কৃতিত্বের জন্মদাতা অধ্যাপক সুশোভন সরকার।

কিছুটা আশ্চর্য হতে হয় যখন আমরা জানতে পারি, তাঁরই স্মৃতিচারণ থেকে, যে সুশোভন সরকার ১৯২১-২২-এর দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ তো দেননি বটেই, বরঞ্চ তাঁর যুক্তিবাদী মন গান্ধীজির আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর সহমত ছিল

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ফলে তাঁর আজীবন প্রিয় বন্ধু হিরণকুমার সান্যালের (হাবুলদা) সঙ্গে মিলে তিনি যোগ দেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সোসাইটিতে, যেখানে তখন খুবই উদ্যোগী ছিল তাঁর চেয়ে কিছুটা বড়, পদার্থবিজ্ঞানী ও রবীন্দ্রভক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তরুণ ব্রাহ্মদের সর্বপ্রকার সামাজিক প্রগতিশীল উদ্যমে প্রশান্তচন্দ্র তখন নেতৃত্ব দিতেন। আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সুশোভন সরকার। পরবর্তীকালে সুশোভন সরকার বিবাহ করেন প্রশান্ত মহলানবীশের বোন রেবা দেবীকে।

১৯২৩-এ সুশোভন সরকার পড়তে যান অকস্‌ফোর্ডে, আধুনিক ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। তার আগেই অবশ্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'ন। ১৯২৫-এ অক্‌সফোর্ড থেকে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন সুশোভন সরকার। অকস্‌ফোর্ডে জিসাস কলেজে (Jesus College) পড়ার সময়েই মার্কসবাদে দীক্ষিত হন তিনি, প্রধানত তাঁর সহপাঠী ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পি. আর. ষ্টিফেনসনের সহায়তায়। ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে নয়াদিল্লির পি পি এইচ কর্তৃক প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Essays in Honour of Prof. S.C Sarkar-এর একটি প্রবন্ধে বিশিষ্ট গবেষক চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন (Communism at Oxford in the Mid-Twenties) যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর ১৯২৫-এর অক্টোবর মাসে তাঁদের গোপন দলিল "Communist propaganda among students at Oxford"-এ বলেছেন "কমিউনিষ্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন মাদ্রাজের কে. ভি. গোপালস্বামী ও বাংলাদেশের সুশোভনচন্দ্র সরকারকে মার্কসবাদী মতবাদে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে"। ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস ১৯২৫-এর ২৬ নভেম্বর ভারত সরকারকে এক গোপন চিঠিতে লেখেন ঃ " সি. পি. জি. বি-র দপ্তর তল্লাসী করে সেখান থেকে যে সব দলিলপত্র আমরা ফোটোগ্রাফ করে এনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে সরকার বলে অকসফোর্ডের একটি ভারতীয় ছাত্রকে তারা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। মনে হয় এই সরকার হচ্ছেন সুশোভনচন্দ্র সরকার যিনি ভারতবর্ষে ফিরে গেছেন এবং ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়ে কোনও সরকারি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করতে চাইছেন।"

১৯২৬-এ হোম/পল ফাইল নং ২৯-এ লেখা হয়েছে "বিহার ও উড়িষ্যার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশচন্দ্র সরকারের পুত্র হচ্ছেন সুশোভনচন্দ্র সরকার। অকসফোর্ড থেকে ফিরে তিনি বিহারে ইতিহাসের প্রফেসরের পদের জন্য দরখাস্ত করেন কিন্তু তাঁকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে তিনি মাসে ২০০ টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার পদে নিযুক্ত রয়েছেন। কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তরকে তাঁর কমিউনিষ্ট মতবাদের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সুশোভর সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন। এইখানে তাঁর প্রথম যুগের নাম করা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কালীকিঙ্কর দত্ত। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন ও আরও পরে কমিউনিষ্ট পার্টির সাংসদ ও বাগ্মী হিসেবে সর্বজনপরিচিত হ'ন। সুশোভন সরকারের জন্মশতবার্ষিকীর দিন (১৯আগষ্ট,

২০০০ খৃষ্টাব্দ) "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় সুশোভন সরকার সম্বন্ধে হীরেনবাবু একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে রিপন কলেজে পড়াতেন, পরে সুশোভন সরকার ১৯৫৬-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গঠিত ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকপদে নিয়োগ করেন। সেখানেও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর গোড়ার যুগের ছাত্র বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আর কালীকিঙ্কর দত্ত পরে গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে যোগ দেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রিডার পদে নিয়োগ করেন। এই সময় ঢাকাতে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ভুপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ—দুজনেই পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহকর্মীতে ও আজীবন তাঁর অনুরাগীতে পরিণত হ'ন। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সুশোভন সরকারকে তিনি গভীর স্নেহ করতেন এবং তাঁরই পরামর্শে সুশোভনবাবু ইতিহাসে গবেষণা পত্র প্রেরণের তৎকালীন একমাত্র সংস্থা Indian Historical Records Commission-এ ৫টি গবেষণা পত্র প্রেরণ করেন (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৯৩৬-এ)। গরমের দীর্ঘ ছুটিতে ১৯৩০, ৩১ ও ৩২-এ কলকাতায় এসে সুশোভন সরকার বাংলা সরকারের মহাফেজখানায় গবেষণা করে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করে ৬টি উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে ৪টি .১৯৩১ ও ১৯৩২-এর চারটি সংখ্যা Bengal Past and Present-এ প্রকাশিত হয়। পঞ্চমটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ Journal of the Burma Research Socity-তে। আর তাঁর গবেষণার সামগ্রিক ফলাফলের মূল্যায়নটি তিনি ১৯৩৯-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রবন্ধ হিসেবে পেশ করেন। এই অধিবেশনের স্থানীয় সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকারই। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সীমান্ত ইতিহাসের প্রামাণ্য কাজ Trade though the Himalaya গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের এই প্রবন্ধগুলিকে পরবর্তী কাজের বিশেষত, অর্থনৈতিক ইতিহাস গবেষণার উৎস বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতির ব্যবহার করে অধ্যাপক সরকারের ইতিহাস চর্চার এটাই সম্ভবত প্রথম নজীর।

১৯৩৩-এ সুশোভন সরকার স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রধান হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম. এ. ক্লাসে honorary lecturer পদেও নিযুক্ত হলেন। ১৯৫৬তে সরকারি পদ থেকে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত এই দুই দায়িত্বই তিনি পালন করে এসেছিলেন। এই দীর্ঘ ২৩ বছরে তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন যে সব সেরা ছাত্ররা, তাঁরা পরবর্তীকালে ইতিহাসের খ্যাতিমান অধ্যাপক, গবেষক, সাংবাদিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী, প্রতাপ সেন, মোহিত সেন, রণজিৎ গুহ, অশীন দাশগুপ্ত, পার্থসারথি গুপ্ত,

বিনয়ভূষণ চৌধুরি, বরুণ দে থেকে শুরু করে বহু তরুণতর ইতিহাসবিদরা। বহু বছর পরে বাংলায় লেখা তাঁর কিছু বাছাই করা প্রবন্ধ সমষ্টির (সমাজ ও ইতিহাস, ১৯৫৭) সংকলন গ্রন্থের মুখবন্ধে অধ্যাপক সরকার তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন সেইসব বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদের, ক্লাসে যাদের আগ্রহ ও প্রশ্ন তাঁকে বরাবর উৎসাহিত করেছে।

১৯৩১-এ গরমের ছুটিতে সুশোভন সরকার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সুশোভনবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। 'পরিচয়ের আড্ডার' খ্যাতিমান লেখক শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখছেন যে নতুন ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে বলায় "সুশোভন খুবই আনন্দিত হয়ে পরিচয়ে নিয়মিত লিখতে লাগলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি বের হল পরিচয়ের প্রথম সংখ্যাতেই, ১৯৩১-এর জুলাই মাসে।" আমরা দেখছি যে ত্রৈমাসিক পরিচয়ের ১৯৩১-এর জুলাই-আগষ্ট সংখ্যায় বেরচ্ছে সুশোভন সরকারের সেই সুপরিচিত প্রবন্ধটি ঃ রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা। ১৯৩৩-এ ঢাকা থেকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ নিয়ে স্থায়ীভাবে চলে আসার আগেই 'পরিচয়ে' তাঁর আরও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছেপে বেরিয়েছিল, যথা ১৯৩১-এর অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় ও ১৯৩২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পরপর দু সংখ্যা ধরে "রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধ; ১৯৩২-এর জুলাই-আগষ্ট সংখ্যা 'পরিচয়ে' বেরিয়েছিল "সোস্যালিজমের মূল সূত্র" ১৯৩৩-এ কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁর প্রবন্ধ অবিশ্রান্তভাবে বেরতে থাকে 'পরিচয়ে', যেমন "জার্মানীর দুরবস্থা" (জুলাই-আগষ্ট ১৯৩৩) "মাণ্ডুকুও" (শারদীয় পরিচয় ১৯৩৩), "আর্ন্তজাতিক সংকট" (জুলাই-আগষ্ট ১৯৩৫) এবং "ফ্যাসিজ্‌মো" (শারদীয় পরিচয় ১৯৩৫)। তাছাড়াও বিজন রায় ছদ্মনামে "দেশ-বিদেশ" বলে পরিচয়ে আর্ন্তজাতিক ঘটনাবলীর উপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলিও ছাপা হয়।

১৯৩৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সুশোভন সরকারের লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থ "মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ" প্রকাশ করেন। আমদের বয়সী কিশোরেরা (আমার বয়স তখন ১৫) যারা তখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, তারা গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আয়োজিত সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতায় ১৯৯৮-তে আমি লিখেছিলাম যে ঐ বইটি কত কষ্ট করে আমরা কয়েকজন বন্ধু (তার মধ্যে প্রয়াত প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন) কলেজ স্ট্রিটের রেলিং-এর দোকান থেকে কিনেছিলাম, তা আজকের দিনে অনেকে ঠিক বুঝবেন না। এইসময় ইংরেজিতে জন ষ্ট্র্যাচি লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ বই The Coming Struggle for Power। তারও বহু বছর পরে প্রসিদ্ধ ইংরেজ ইতিহাসবিদ ই. এইচ. কার লিখেছিলেন International Relation between two war. যা আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে একটি মূল পাঠ্যপুস্তক। ঐ দুটি বই-এর সঙ্গে গুণগতভাবে তুলনীয় ছিল অধ্যাপক সরকারের 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ' গ্রন্থটি। বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা এখন ব্যাপক হয়েছে। বইটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে। নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত

ইউনিয়নকে আক্রমণ করল ১৯৪১-এর ২২ জুন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বেআইনী। সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পার্টির নেতৃত্বে সংশয় ও দ্বিধা দেখা যায়। তখন জেলে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দী অজয়কুমার ঘোষ, রুদ্রদত্ত ভরদ্বাজ প্রমুখ পার্টির নেতৃত্বের গোপন কেন্দ্রের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে বিশ্বযুদ্ধ এখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে, এই মত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার যদিও কোনদিনই পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন পার্টিরই লোক। তাই তিনি তখন একটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক নোট লিখে পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন যে পার্টি নেতৃত্বর এখন উচিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের লাইনই গ্রহণ করা।

পরবর্তীকালে কমরেড পি সি যোশীর কাছে আমি শুনেছি যে অধ্যাপক সরকারের নোটের যুক্তিসমূহ আত্মগোপনকারী পার্টি নেতৃত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এইসূত্রে অনেক পরের যুগের একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতে জরুরী অবস্থা জারি করেছেন। সি পি আই নেতৃত্ব তখন জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার নীতি গ্রহণ করেছিলেন (যদিও পার্টি নেতৃত্বর অল্প কিছু কমরেড এই নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন)। অধ্যাপক সুশোভন সরকারও জরুরী অবস্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার নীতি পরিত্যাগ করে, সি পি আই-এর উচিত সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে মৈত্রী গড়া ও তার ভিত্তিতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলা কিন্তু প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে তিনি পার্টির বিরোধিতা করতে কোনদিনই চাননি। তাই জন্য তিনি আমাকে ও সুনীলকে (মুন্সী) বাড়িতে ডেকে বল্লেন ঃ আমি জানি তোমরাও জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে। শুনলাম তোমরা কোনও কাজে শীঘ্রই দিল্লি যাবে। তাই তোমাদের হাত দিয়ে আমার মতটা আমি কমরেড রাজেশ্বরও রাওকে (তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক) জানাতে চাই। তোমরা আমার চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ওঁর হাতে দিলে আমি খুব খুশি হ'ব।" আমরা সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

এই ঘটনার একটা পরিশিষ্টও আছে। ১৯৭৮-এ ভাতিণ্ডায় পার্টি কংগ্রেসে সি পি আই-এর নীতির আমুল পরিবর্তন হ'ল। তার আগেই উল্টাডাঙ্গাতে পার্টির রাজ্য সম্মেলনে এ রাজ্যেও পার্টির নীতির ও নেতৃত্বর পরিবর্তন হ'ল। পার্টির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জি যিনি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর মধ্যে একমাত্র লোক প্রথম দিন থেকেই জরুরী অবস্থার ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার বিরোধিতা করে এসেছিলেন। ভাতিণ্ডা কংগ্রেসের পর কলকাতায় এসে কমরেড রাজেশ্বর রাও অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কমরেড রাও অকপটে সুশোভনবাবুকে বলেন যে তাঁর চিঠির বক্তব্য তাঁরা তখন মানতে পারেননি। কিন্তু এখন তিনি স্বীকার করছেন যে অধ্যাপক সরকারের মতটাই সঠিক ছিল, পার্টি নেতৃত্বের মতটা গুরুতরভাবে ভ্রান্ত ছিল। এর এক পক্ষকাল পরে বিশ্বনাথদা অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি বিশ্বনাথকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে তাঁর সাহসী প্রতিবাদী মত প্রকাশের কথা তিনি জানেন ও তারিফ করেন। ফিরে আসবার পথে বিশ্বনাথদা আমাকে বলেন ঃ আমি

অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে একজন শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী বলেই বরাবর শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু তিনি যে পার্টি নীতির প্রশ্নেও এতটা ভাবনা চিন্তা করেন ও এত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, এটা আমাকে বিস্মিত করেছে।

এই প্রবন্ধের গোড়াতেই বলে রেখেছি যে এতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না। তা সত্ত্বেও আবার ফিরে যাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর সময়কালে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের নীতিকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্য পার্টি কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৯৪২-এর গোড়াতেই। পার্টি তখনও বেআইনী। তখন অধ্যাপক সুশোভন সরকার বিজন রায় ছদ্মনামে একটি ধারালো পুস্তিকা লেখেন "জাপানী শাসনের আসল রূপ"। তখন রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু উভয়েই জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি দেশের বাইরে থেকে প্রচার করছিলেন। তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করে অধ্যাপক সরকার ঐ পুস্তিকাটি লেখেন, জাপানী ফ্যাসিবাদের নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী চোহারাটি উদঘাটিত করে। পুস্তিকাটি পড়লে কিন্তু দেখা যাবে কোথাও তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানের দালাল বলে গালিগালাজ করেননি, বরঞ্চ তাঁর দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নীতিটাই যে ভ্রান্ত ও মারাত্মক ক্ষতিকর সে কথাই লিখেছিলেন। ১৯৪২-৪৩-এ পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "পিপলস্ ওয়ার"-এ এই সংযম আদৌ দেখানো হয়নি, যার মাশুল আমাদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

এই সময়ই পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীর অনুরোধে অমিত সেন ছদ্মনাম সুশোভনবাবু লেখেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Notes on Bengal Renaissance। অনেক পরে, আরও বেশ কিছু প্রবন্ধ যোগ করে স্বনামেই তিনি প্রকাশ করেন Notes on Bengal Renaissance and other Essays। তবে এই সময় বাংলা ভাষায় অমিত সেন ছদ্মনামে তাঁর যে বই বহু সহস্র তরুণ সাম্যবাদীকে মার্কসবাদ বুঝতে সাহায্য করেছে, সে বইটির নাম "ইতিহাসের ধারা"। বইটির সূচনায় তিনি লিখেছেন "মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা আর চেতনা সাম্যবাদের প্রাণ; কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আশ্চর্য জীবনী শক্তির মূল উৎস এইখানে...সাম্যবাদ কতকগুলি মন্ত্র বা বাঁধা বুলি নয়, প্রতি দেশে প্রতি মুহূর্তে সাম্যবাদী দলকে চারিদিককার অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হয়। ভারতীয় মার্কসবাদীকে সর্বদাই দেশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা এবং বাহিরের পরিবর্তন ধারার ভারতের উপর ঘাত প্রতিঘাত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। ...সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকিয়া প্রতিদিনের কাজের মধ্যেই মার্কসবাদ আয়ত্ত করিবার শ্রেষ্ঠ পথ আছে। তাহা হইলে শুধু পুঁথি পড়া মুখস্থ বিদ্যার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে। সেই আলোচনায় কিছু সাহায্য করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।"

দেশের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের কথা আগেই বলা হয়েছে। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে অনন্য করেছে, তা হল' মার্কসবাদের নামে মতান্ধতারও তিনি বরাবর বিরোধী ছিলেন। "ইতিহাসের ধারার" সূচনাতেই তাই তিনি বলেছেন যে মার্কসবাদ শুকনো মন্ত্র বা বাঁধা বুলি নয়। মার্কসবাদ-

লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসায় তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, নাৎসী জার্মানীর দ্বারা সোভিয়েত আক্রান্ত হলে, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সর্বদা সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু যখনই তাঁর মনে হয়েছে যে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নও কোনও অন্যায় করেছে, তখন তার সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তাই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। ১৯৮৬র আগষ্ট মাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে প্রবেশ করে, গায়ের জোরে সেখানকার কমিউনিষ্ট নেতা ডুবচেককে ক্ষমতাচ্যুত ও চেকোশ্লোভাকদের নিজেদের পছন্দসই মতে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাকে বানচাল করলে, তার বিরুদ্ধেও ধারালো সমালোচনা করেন সুশোভন সরকার। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পুস্তিকা—চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ অন্যমত। আর "পরিচয়"-তে তিনি লিখেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যুক্তিনির্ভর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির শেষের দিকে তিনি লিখেছিলেন যে বিপ্লবের পথ নিশ্চয় কুসুমাস্তীর্ণ নয়, আর সেই জন্যই "প্রাগের খোলা রাস্তা দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলেই বিপ্লবের সব সমস্যার সমাধান হয় না।" তাঁর জন্মশতবর্ষের শেষে সেই মুক্তমতি মার্কসবাদী অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

# রবীন্দ্র উপন্যাসে সামাজিক নিম্নবর্গ ঃ গোরা

বাসব সরকার

বাংলার সামাজিক নিম্নবর্গ সম্পর্কে বাংলার শিক্ষিত মানুষ, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের সচেতন করে তোলার দায়িত্ব অন্য অনেক বিষয়ের মতো প্রথম গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিদগ্ধজন যে 'গোরা' উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম উপন্যাস বলে গণ্য করেন, সেখানেই ঘটেছিল এই সামাজিক নিম্নবর্গ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের বলিষ্ঠ প্রকাশ। এর আগে অবশ্যই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিম শিক্ষিত বাঙালিকে রামা কৈবর্ত আর পরাণ শেখের কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু রামা কৈবর্ত আর পরাণ শেখের জীবন যাপনের কথা তাদের সমস্যা, মানহীন এই সব নিম্নবর্গের জীবনচর্যার নানা দিক শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাধারায় কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায় না। এইসব ছোটোলোকদের কথা জানা না গেলে বাংলা ও বাঙালি সমাজ সম্পর্কে কোনো কথাই যে ধারে ও ভারে শেষ পর্যন্ত কাটবে না, সেই চেতনাও তখন গড়ে ওঠেনি। স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল পর্ব যে সমগ্র বাঙালি সমাজকে স্পর্শ করেনি, আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি খুব কাছের থেকেই দেখেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাজাত হুঁশিয়ারি প্রকাশ পেয়েছে গোরা উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাসে, গোরার জীবনে দিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে।

## ১

গোরা উপন্যাসের রচনাকাল ১৩১৪ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত, এটাই ছিল মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ পর্ব। ইংরেজি হিসেবে সেটা ছিল আগস্ট ১৯০৭ থেকে মার্চ ১৯১০। সময়টা স্বদেশি আন্দোলনের এক বিশেষ পর্ব, যখন জোয়ারের বেলা শেষ হয়ে, ভাটার টান লাগার লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনে গোড়ার দিকে যতোটা সক্রিয় হয়েছিলেন, সেখান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। বলা দরকার রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি একটানা লেখা শেষ করে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে দেননি। প্রতি মাসে কিস্তিতে লেখা পাঠিয়েছেন, রবিজীবনীতে যদিও দেখা যায় শেষ কিস্তি প্রকাশের মাস তিনেক আগেই রচনার কাজ শেষ হয়েছে। কারণ গোরা উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে শেষ কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যে। প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গোরা উপন্যাসের অনেকখানি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় বর্জিত হয়েছিল। ১৩৪৭ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে এবং তার আগেই ১৩৩৪ সালের সংস্করণে প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশ যা আগে বর্জিত হয়েছিল, তার অনেকটাই গৃহীত হয়। সুতরাং গোরা উপন্যাসের বর্তমান পাঠ নানা গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়ার পর রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত পাঠ। বলা যেতে পারে সমকাল ও অনাগত কালের পাঠকদের সামনে গোরা উপন্যাসের কাহিনী ও ঘটনা বিন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠিক যে ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, এখনকার সংস্করণে ঠিক সেটাই আছে। বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

গোরা উপন্যাসে বাংলার সামাজিক নিম্নবর্গের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ২৬ ও ৬৭ পরিচ্ছেদে। এই আলোচনার প্রেক্ষিত রচনায় রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাসে একটা আকস্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এই আকস্মিকতা গোরা ও বিনয় দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর জীবনের গতিপথ তাদের সযত্নলালিত আচার ও বিশ্বাসের গণ্ডি ছিঁড়ে এমন এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যার জন্যে তাদের সচেতন কোনো প্রয়াস ও প্রস্তুতি ছিল না।

গোরা উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিনয়ভূষণ শ্রাবণের মেঘমুক্ত নির্মল রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তার বাসার দোতলায় দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তায় চলমান জীবনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রথম অনুভব করে "সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে" তখনই বাউলের দেহতত্ত্বের সেই গান "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়, /ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।" সেই অচিন পাখি যখন সবেমাত্র বিনয়ের মনে অনাস্বাদিত পূর্ব একটা ভাবের দোলা দিতে শুরু করেছে, তখনই একটা ঠিকাগাড়ি আর জুড়িগাড়ির সংঘর্ষ, ছোটোখাটো একটা দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ পরেশবাবু ও তাঁর স্নেহপ্রবণ কন্যা সুচারিতাকে বিনয়ের ঘরে এনে পৌঁছে দিল। উদ্ভিন্ন যৌবনা সুচরিত্রা সামান্য এই দুর্ঘটনার সুত্রেই অচিন পাখির মতোই বিনয়ের মনের খাঁচায় দোলা দিয়ে গেল। যে যৌবন প্রবাহ এতোক্ষণ বিনয়ের দর্শন ইন্দ্রিয়গোচর হয়েছিল, তার শরীরী মূর্তি সুচারিতারূপে তার ষড় ইন্দ্রিয়ের উপর এমন এক অভিঘাত সৃষ্টি করলো, যার সঙ্গে বিনয়ের বইপড়া টান ভালোবাসা, প্রেমের ধারণার কোনো মিল নেই। বহু বছর আগে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে এমনই এক প্রত্যুষে বিশ্ব চরাচরে অন্তত জীবন প্রবাহের যে চেতনা লাভ করেছিলেন, বিনয়ের অভিজ্ঞতা যেন তারই এক আংশিক পুনরাবৃত্তি। এই অভিজ্ঞতাই বিনয়ের গোরাকেন্দ্রিক জীবনকে উৎ-কেন্দ্রিক করে।

গোরাকেও উৎ-কেন্দ্রিক করে সুচরিতা। বিনয়ের ক্ষেত্রে কাজ করে ছিল সুচরিতার সম্মোহনী শক্তি। গোরাকে উৎ-কেন্দ্রিক করে সুচারিতার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত জিজ্ঞাসা, যা গোরাকে বুঝিয়ে দেয় এহেন এক নারীর সাহচর্য ছাড়া তার জীবন, সাধনা অপূর্ণ থেকে যাবে। নিজেদের অভ্যস্ত জীবনবৃত্ত আর কর্মকাণ্ডের বাইরে যে এক মহাজীবন রয়েছে, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের আদর্শ, বিশ্বাস যাচাই করে নিতে না পারলে, তাদের জীবন ও সাধনা যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এর আগে বিনয় আর গোরা কোনোদিনই সেই সমস্যার মুখে পড়েনি। সুচরিতাই কার্যত গোরাকে সেই উপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করে যে নারীর ভূমিকা বর্জিত তাদের দেশোদ্ধারের কর্মসূচি দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে বাদ দিয়ে কিছুতেই সফল হতে পারে না। গোরার চেতনায় এই উপলব্ধির অভিঘাত জোরালো না হলে সে দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার তাগিদে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হাঁটাপথে গ্রাম বাংলার দিকে যাত্রা শুরু করতো না। সুচরিতাই তার মনে দেশকে চেনার তাগিদ সৃষ্টি করে।

২

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে গোরা উপন্যাস রচনার কাজ শুরু হলেও উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৮৮০'র দশকের প্রথম কয়েক বছর। স্থান কলকাতা শহর। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকরা মনে করেন গোরা উপন্যাসের কালগত বিস্তার তিন বা চার মাসের ঘটনা। আর সময়টা নিঃসন্দেহে ১৮৮৪-র আগে কোনো বছর। গোরা উপন্যাসের কয়েক জায়গাতেই

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের রবিবাসরীয় উপাসনার উল্লেখ আছে। যেখানে পরেশবাবু সপরিবারে যেতে অভ্যস্ত, যেখানে গোরাও কিছুকাল যাতায়াত করেছে, এবং যেখানে বিনয় ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়েছে। কেশব প্রয়াত হন ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি। সুতরাং গোরা উপন্যাসের সময় ১৮৮৪ সালের পূর্ববর্তী কোনো সময় হতে বাধ্য। বাংলাদেশে সেই সময়ে কলকাতা শহর এবং মফঃস্বলের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং নব্য হিন্দু আন্দোলন দুটোই সমান্তরাল ধারায় গড়ে উঠছিল। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের খ্রিষ্টান সমাজ সম্পর্কে দুর্বলতা, বাইবেলের প্রতি ভক্তি মিশ্রিত অনুরাগ এবং রাজভক্তির প্রাবল্য চোখে পড়ার মতো ছিল। এরই বিপরীতে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৭৮) তখনও জনপ্রিয়তায় কেশবের ভারতবর্ষীর ব্রাহ্ম সমাজের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। নব্যহিন্দুরা কেশবের ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে। উপন্যাসে গোরা এই নব্যহিন্দু আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা। তাদের 'হিন্দু হিতৈষী সভা'র সভাপতি ছিল গোরা, সেক্রেটারি বিনয়।

রবীন্দ্রনাথ এই দুই ধর্ম আন্দোলনের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গোরা উপন্যাসে যাতে ১৮৮০'র দশকের বাংলার সমাজচিত্রের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের সমকালের বাংলার সামাজিক প্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা যায়। সামাজিক নিম্নবর্গ সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেশবের ব্রাহ্মসমাজ কিংবা নব্যহিন্দুদের সংগঠন, তাদের নেতৃত্ব, কর্মীদল, সাধারণ সদস্য সবাই ছিল উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের শিক্ষিত মানুষ। এর বাইরে যারা তাদের সম্পর্কে অবজ্ঞা, অনীহা ব্যাপক থাকার জন্যে তাদের 'ছোটোলোক' বলে উল্লেখ করতে কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগতো না। গোরার প্রথমবার পায়ে হেঁটে জনসংযোগের জন্য বের হওয়ার পর আনন্দময়ীকে লেখা চিঠিতে ঘোষপাড়া অঞ্চলের যাদের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয়ের খবর আছে, সেখানে "দেশের ছোটোলোকদের দুর্দশা দেখে দুঃখ করে" (পৃঃ ২১২) লেখার কথা বলা হয়েছে। গোরা তাদের সম্বন্ধে ঘৃণা অনীহা থেকে ছোটোলোক শব্দটি ব্যবহার করেছে বলে মনে করার কারণ নেই। বরং অনুমান করা যায় সামাজিক নিম্নবর্গের এই ছোটোলোক পরিচিতি, উচ্চবর্ণ ও বর্গের কাছে স্বাভাবিক অভিধা ছিল। সুতরাং সমাজ, দেশ, জাতি প্রভৃতি বৃহত্তর প্রশ্নে এইসব ছোটোলোকদের মতামত, ভূমিকা, সমর্থন ইত্যাদির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলে উচ্চবর্ণ ও বর্গের মানুষ স্বীকার করতো না। এটা কেবল ১৮৮০'র দশকের কথা নয়। স্বদেশি আন্দোলনের যুগেরও কথা। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন শৈশব কাটিয়ে দামাল হয়ে ওঠার সময়েও সমাজের সর্বত্র তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো তাগিদ স্বদেশি নেতারা অনুভব করেননি। নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের জীবনে দুই দশকের ঘটনাবলি কোথাও কোনো আলোড়ন তোলেনি।

দেশের জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশের এই ধরনের প্রান্তিকীকরণ কতোটা বিরূপতা সৃষ্টি করে সামাজিক নিম্নবর্গকে জাতীয় আন্দোলনের বাইরে, এমন কি বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে, স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে তার পরিচয় আছে। আন্দোলনের নেতাদের তারা কোনোদিন কাছের মানুষ, আপনজন বলে মনে করেনি, মনে করার সুযোগও পায়নি। ছোটোলোকে, অস্পৃশ্য পরিচয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা দূরে থেকেছে, থাকতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বাঙালি পরিচয়টাও নেতারা অস্বীকার করেছেন। ফলে একটা অস্বীকৃতি গড়ে ওঠে উভয়ত যার কথা রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে বলেছেন গোরা উপন্যাসের ৬৭ পরিচ্ছেদে।

৩

ব্যক্তিগতভাবে গোরা যে সামজিক নিম্নবর্গকে অস্পৃশ্য মনে করে তার ব্রাহ্মণত্বের সোচ্চার ঘোষণার জন্যে এড়িয়ে চলতো, উপন্যাসে তার পরিচয় নেই। কিন্তু অহিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে, এমন কি সামাজিক স্তরেও চরম শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল সে। পরেশবাবুদের বাড়িতে ব্রাহ্মদের দেওয়া খাবার, তৈরি করা চা পর্যন্ত সে গ্রহণ করতে চায়নি স্পর্শদোষ সংক্রমিত হওয়ার আশংকায়। বন্ধু বিনয় ব্রাহ্ম পরেশবাবুরদের পরিবারে ঘনঘন যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া শুরু করলে তার পূজার ঘরে বিনয়কে ঢুকতে নিষেধ করেছে। আনন্দময়ীর খ্রিষ্টান দাসী লছমিয়া গোরাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলেও, তার হাতে জলগ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আনন্দময়ী ছোঁয়ছুঁয়ি মানেন না বলে মায়ের হাতে রান্না খাবার খেতে নারাজ হয়েছে। এই বাছবিচার কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে। এটা ছিল এক ধরণের উগ্রহিন্দুত্বের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার লড়াই। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষ হিন্দু বলেই তাদের সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য, দূরত্ব বজায় রাখার দরকার হতো না।

গোরার রোজ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল, পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে যাতায়াত করা। "তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত।" (পৃঃ ১২৫) তারা গোরাকে বলতো দাদাঠাকুর, তাদের কড়িবাঁধা হুঁকোয় তামাক খেতে দিয়ে অভ্যর্থনা করতো। গোরা তাই তাদের সঙ্গে মেশার সুযোগ বজায় রাখার জন্যই তামাক খাওয়া শুরু করে। আলাদা হুঁকোয় তামাক খেতে দেওয়া গ্রাম বাংলার সনাতন আপ্যায়ন রীতি, সেখানে জাতের বিচার করা হয় না। আর কড়িবাঁধা হুঁকো অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গোরা তাদের পাড়ায় যায় বলেই সেটা দাদাঠাকুরের হুঁকো হিসেবেই আলাদা রাখা হতো শুধু তারই ব্যবহারের জন্যে। তবু এইটুকু স্পষ্ট নিম্নবর্গের সংস্রব একেবারে বাতিল করে উচ্চবর্গের শুদ্ধাচার আঁকড়ে থাকার মতো সংস্কার গোরা প্রশ্রয় দেয়নি।

কিন্তু গোরার সংস্পর্শে এসেও যে বিশ্বাস, মানসিকতা ও চেতনার দিক থেকে তারা সামান্যতম বদলায়নি, দাদাঠাকুর হিসেবে তাকে সম্মান দিয়েছে, শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু চরম বিপদেও আপনজন বলে মনে করেনি। তার প্রমাণ ছুতার বাড়ির বাইশ বছরের যুবক, গোরার একান্ত ভক্ত নন্দ মারাত্মক ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হলেও, নন্দ তার বাবা-মাকে অনুরোধ করলেও তারা গোরাকে খবর দেয়নি। ডেকে এনেছে ওঝাকে ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারাবার জন্যে। সেকালে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনার অভিঘাত গোরার অহংবোধের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার জন্যে দরকার ছিল। যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব যে কোথায় শুরু করতে হবে, গোরার চেতনাকে সেই দিকে প্রসারিত করার জন্যই তরতাজা যুবক নন্দের প্রাণ বলিদান প্রয়োজন ছিল। সামাজিক নিম্নবর্গের জীবনচর্যার কঠোর বাস্তবতা গোরার রোমান্টিক দেশ ও সমাজ ধারণার মূল ধরে নাড়া দেওয়ার জন্যেই দরকার ছিল।

নন্দর মৃত্যু যদি গোরাকে বর্ণ সমাজের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে একটা পদক্ষেপ হয়, তাহলে উপনিবেশিক ভারতের বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটি তুলে ধরতে দরকার ছিল আরেকটা ভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা। সেই ঘটনা ঘটে যায় নন্দর বাড়ি থেকে ফেরার পথেই। এক বৃদ্ধ মুসলমান মাথার ঝুড়িতে ডিম, রুটি নিয়ে কোনো সাহেব বাড়ি

বা হোটেলে যোগান দিতে যাওয়ার পথেই মস্তো জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া বাবুর গাড়ির সামনে এসে পড়ে। কেন সে সরে যায়নি সেই অপরাধে বাবুটি হাতের চাবুক কষিয়ে দেয় সেই বৃদ্ধের মুখের উপরে। বৃদ্ধ আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু জুড়িগাড়ি চলে যায় সদর্পে। গোরা সেই বৃদ্ধকে সাহায্য করে পথ থেকে ছিটিয়ে থাকা তার পসরা তুলে দিতে। এতোবড়ো অন্যায় অনাচারের বলি হয়েও সেই বৃদ্ধ প্রতিবাদ করতে পারে না। আল্লা দোষীর শাস্তিবিধান করবে, এই বিশ্বাসটুকু সম্বল করে সে বাঁচার লড়াইয়ে টিকে থাকতে চায়। গোরা তাকে বলে, অন্যায় সহ্য করে যারা তারা অন্যায় সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বলে "ভালোমানুষি ধর্ম নয়; তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে। তোমাদের মহম্মদ সেকথা বুঝতেন তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্মপ্রচার করেন নি।" (পৃঃ ১৩০)

গোরার এই কথা একনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদীর কথা নয়। এটা মানুষের সহজাত মানবিকতার কথা। গোরার সংবেদনশীল মন নিশ্চয়ই নন্দ'র আকস্মিক মৃত্যু আর এই বৃদ্ধ মুসলমানের নিগ্রহ, এই দুয়ের মধ্যে কোথাও একটা অস্পষ্ট যোগসূত্রের ধারণা অস্পষ্টভাবে হলেও খুঁজে পেয়েছিল। দুজনেই সামাজিক অসহায়তার শিকার, একজন কুসংস্কারের আরেকজন ধর্মীয় বিশ্বাসের। একজন প্রতিকারহীন অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, আরেকজন প্রতিকার সে করতে না পারলেও আল্লা করবেন সেই বিশ্বাসে সান্ত্বনা পেতে চায়। সামাজিক বাস্তবতার এই নিষ্ঠুর রূপটি গোরা সেদিন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুভব করেছিল। দুটি ঘটনাই ছিল দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার। নন্দ'র ক্ষেত্রে, কুসংস্কারের সামাজিক প্রাবল্য এক নিদারুণ মূঢ়তা, নন্দকে গোরার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ায় গোরার নিজের বিশ্বাসের শক্তিহীনতা; আর বৃদ্ধ মুসলমানের ক্ষেত্রে অসম সমাজে ধর্ম নির্বিশেষে সব নিম্নবর্গের জীবনে বিত্তবানের প্রাবল্য, এক মূহূর্তে সব সামাজিক ধর্মীয় ভেদ মুছে দেয়।

৪

পরেশবাবু বাড়িতে সীমিত যাতায়াতের মধ্য দিয়েই গোরার মনে অস্পষ্টভাবে হলেও এই ধারণা জন্মাতে শুরু করে যে, তার মত, তার যুক্তি যতোটা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বাস্তবতার উপরে বোধহয় ততোটা নয়। গোরাদের দল হিন্দু হিতৈষী সভার সব কর্মী, অনুরাগী এবং তার বাইরে শহরের শিক্ষিত হিন্দুরা নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রভাবে দেশকে হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই একান্ত হিন্দু দৃষ্টিকোণের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এটা একটা ছুঁৎমার্গের মতো হয়ে পড়ে। ফলে তার আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে হাজারো নিষেধাস্ত্রা। একটা সময়ে পরেশবাবুর পরিবারে মেলামেশার সূত্রে যখন বিনয়ের মন এই ধরনের বিধিনিষেধে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়েছিল, তখন দলের সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ের মনে হয়েছিল তাদের "ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি" (পৃঃ ৪৯)। এটা যে জবরদস্তি সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো গোরা কুণ্ঠিত ছিল না আদৌ। কিন্তু পরেশবাবুর বাড়িতে নানা বিতর্কে গোরা নিজের মত উচ্চকণ্ঠে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালালেও তার মনেও একটা সংশয় দেখা দিতে থাকে। তর্কে কিম্বা গলার জোরে যুক্তি জাহির করা আর কোন মতকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে অনস্বীকার্য করে তোলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে গোরার কাছেও সেটা স্পষ্ট হতে থাকে।

জীবনের চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনয় যখন বোঝে যে কেতাবি ধারণা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা যায়, কিন্তু প্রেম যখন মহাসমারোহে অস্তিত্বের গোড়া ধরে টান

দেয়, তখন পায়ের তলার মাটিই আল্‌গা হয়ে যায়। সব কিছু ছাপিয়ে উঠে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মুখে তাকে অস্বীকার করার আর জোর থাকে না। বিনয়ের কথায়, তার মুখে সেই প্রেমের অসংকোচ প্রকাশ দেখে গোরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই মুহূর্তে বিনয়ের মনে প্রেমের চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। সেই অভিজ্ঞতার আলোয় গোরাও স্বীকার করে যে, তার দেশভাবনার মধ্যে যেন কেতাবি ধারণার মিশেল অত্যন্ত বেশি। গোরা বিনয়কে বলে "তুমি এতদিন বই পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বইপড়া স্বদেশ প্রেমকেই জানি" (পৃঃ ১১০)। গোরার এই স্বীকারোক্তি অকপট ছিল। তাই নিজের ভাবনাকে যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই তার কাছে জরুরী হয়ে ওঠে দেশের মানুষদের খুব কাছের থেকে, তাদের মধ্য থেকে চেনা। রবীন্দ্রনাথ গোরার দেশভাবনার বস্তুনিষ্ঠ রূপটি তুলে ধরার তাগিদেই তাকে নিয়ে গেছেন শহরের বাইরে গ্রামে, যেখানে রয়েছে প্রকৃত ভারতবর্ষ, সেখানকার নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষদের কাছে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই রকম ধারণা করার কারণ কি? এই ধারণার সপক্ষে কয়েকটা কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন স্বদেশি আন্দোলন, যাকে বিনয় সরকার প্রমুখ পণ্ডিত পরবর্তীকালে 'বঙ্গবিপ্লব' বলেছেন, তার উত্তাল অবস্থা শহর কলকাতা আর মফঃস্বলের কয়েকটি শহর ছাড়া সারা বাংলাকে সামিল করতে পারেনি। শহরাঞ্চলেও আন্দোলনের জোশ সীমিত থেকেছে শিক্ষিত মধ্য ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে। শ্রমজীবী মানুষ যারা মুখ্যত ছিল নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গ তারা মোটামুটি আন্দোলনের বাইরে থেকেছে। অথচ বাঙালি বলতে যাদের বোঝায় তাদের বেশির ভাগই নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গ। এই ধরণের মানুষদের কাছে পৌঁছাবার কোনো তাগিদ নেতারা অনুভব করেনি। এই অভিজ্ঞতাকেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আগামী দিনের ধ্যানের ভারত সফল করার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা গোরাকে সমাজের নীচুতলার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত বাঙালি নিম্নবর্ণ যেমন আন্দোলনে কার্যত সামিল হয়নি তেমনই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই নিম্নবর্গ এই আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান হিন্দু নিম্নবর্ণের সমতুল্য হলেও একটা বিষয়ে তারা হিন্দু নিম্নবর্ণের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। সেটা তাদের সংহতিবোধ, সংঘশক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই সংহতিবোধ, সংঘশক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই গোরা উপন্যাসে যেখানেই মুসলমানদের প্রসঙ্গ এসেছে, যা না আনলেও উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে কোনো ঘাটতি হতো না, তখনই মুসলমান জনগোষ্ঠীর এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ভারত হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত দেশ স্বদেশি আন্দোলনে তিনি সেটাই সকলকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত ভারতীয় নেতৃত্বের চেতনায় স্বদেশি আন্দোলনের সময় পর্যন্ত বর্ণ-জাতিভেদ, অস্পৃশতা যে সামাজিক ব্যাধি, যার থেকে মুক্ত হতে না পারলে দেশের মুক্তি যে সম্ভব নয়, এই ধারণাই জন্মায়নি। হিন্দুর সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তাকে মেনে নেওয়াই ছিল অভ্যাস। ইংরাজ শাসকরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে দ্বন্দ্বজর্জর করে তোলার এই চমৎকার হাতিয়ার জাতিভেদ প্রথাকে টিঁকিয়ে রাখার সব চেষ্টাই করেছিল। জাতি-বর্ণব্যবস্থার সপক্ষে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তাকে বজায় রাখার ওকালতিও করা হয়েছিল। ১৯০৪ সালে

কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি স্যার হেনরী কটন জাতিভেদ প্রথার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখার কথাই বলেছিলেন। কংগ্রেসের নরম ও চরম কোনো পন্থীরাই সভাপতি কটনের বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখেননি। কটন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সহানুভূতি দেখানো, সমর্থন করার পাশাপাশি "জাতি-বর্ণব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন"।[১] মডারেট কিম্বা চরমপন্থীরা কেউই সভাপতির মতের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নি। আসলে বর্ণ হিন্দুসমাজ আর ইংরাজ শাসকদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত্য ছিল। মহর্ষির পরিবারেও জাতিভেদ মানা হতো, কিন্তু নিম্নবর্ণ সম্পর্কে উদাসীন, বিদ্বিষ্ট মনোভাব ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশি নেতারা বিদেশি শাসক, নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের যে অংশ রাজভক্ত, তাদের সম্পর্কে কোনো অবস্থান নেওয়ার আগে নিজেরা সরেজমিন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হোক। গোরাকেও সেই তাগিদে তিনি গ্রাম সমাজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

৬

'গোরা' রচনার কাজে হাত দেওয়ার কয়েকবছর আগেই রবীন্দ্রনাথের মনে গোরার প্লট তৈরি হতে শুরু করে। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে নিবেদিতা সম্ভবত ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহে যান। তখন জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে বোটে অবকাশ যাপন করেছিলেন। সেখানে নিবেদিতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে গোরা উপন্যাসের কাছাকাছি একটা প্লট শুনিয়েছিলেন। সেই কাহিনীতে গোরা একজন আইরিশ যুবক, যে ভারতকে আপন করে নিতে চাইলেও তার শিষ্যা এবং প্রেমিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিল শুধু বিদেশি বলে। গল্পটি নিবেদিতার ভালো লাগেনি। কারণ আইরিশ মহিলা হয়ে যে ভারতকে তিনি আপন জ্ঞান করেছেন, সেখানে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কোনো ইঙ্গিত তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলারই কথা। এই কাহিনী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক উইলি পিয়ারসনের এক প্রশ্নের উত্তরে ১৯২২ সালের জুলাই মাসে।[২] সাড়ে তিন বছর পরে যখন গোরা উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে সেখানে সুচরিতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বদলে গোরা গৃহীত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। অনুমান করা যায় স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকা দেশের জনগণের ব্যাপক অংশে তাঁকে অনেক বেশি কাছের মানুষ করে তুলেছিল, গোরা চরিত্রের রূপায়ণে নিবেদিতার এই গ্রহণ যোগ্যতার দিক রবীন্দ্রনাথকে কাহিনীর রদবদল করতে সাহায্য করে থাকতে পারে। সামাজিক নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্তি উপন্যাসে সেই সূত্রেই ঘটেছে। জন্মসূত্রে আইরিশ গোরা নিজের প্রকৃত পরিচয় জানার আগে যেভাবে হিন্দুত্বের আতিশয্যে আত্মহারা হয়েছিল সেখানে গোরার এই মনোজগতে প্রায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল প্রথমে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে গোরার হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ির সামাজিক বনিয়াদ নিতান্ত সংকীর্ণ, আর দ্বিতীয়ত তার জন্মকাহিনী তাকে কোনো সুযোগে জানিয়ে দেওয়া। জন্মরহস্য উদঘাটন পর্ব নিয়ে সাহিত্য সমালোচক মহলে কিছু মতভেদ আছে। অনেকেই মনে করেন যে কৃষ্ণদয়ালের অসুস্থতা, মৃত্যু হলে গোরার শ্রাদ্ধের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ ভাবিত শুচিবায়ুগ্রস্ত কৃষ্ণদয়াল গোরার আইরিশ রক্তের কথা জানিয়ে দেন।

কিন্তু গোরার হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর পরিবারে উত্তপ্ত আলোচনায় মাঝে

মাঝে উঠলেও গোরার প্রকৃতিগত জেদ তাকে সত্য বুঝতে দেয়নি। তার ধারণা ছিল বিনয় প্রমুখ তার শিষ্য সহযোগীরা যেমন শেষ পর্যন্ত তার কথাকেই মেনে নেয়, দলের বাইরে বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীও বোধ হয় তেমন করেই সবটা মেনে নেবে। সেটা যে অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক গোরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা না বুঝলে অন্য কোনো ভাবে তাকে বোঝানো যেত না। স্বদেশি আন্দোলনে নেতাদের হিন্দু নবজাগরণের মাতামাতি যে শেষ পর্যন্ত সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, গোরার সঙ্গে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সরাসরি মোকাবিলায় রবীন্দ্রনাথ সেই লক্ষ্যই পূরণ করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক নিম্নবর্গের কাছাকাছি না গেলে যে প্রকৃত স্বদেশিকতা অনায়ত্ত থেকে যাবে, গোরার কাহিনীতে সেই দায়িত্ব পালনের ভার নিয়েছে গ্রাম বাংলার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় গোরার জীবনের এই শেষ পর্যায়ের ঘটনা। অন্যভাবে বলা যায় কিস্তিতে কিস্তিতে গোরা কাহিনী প্রকাশনার জন্য রচনা করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার যে স্বরূপ দেখেছিলেন উপন্যাসে তারই এক নির্যাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাই গোরার অভিজ্ঞতা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই অভিজ্ঞতা।

৭

গোরার ২৬ পরিচ্ছেদে গ্রাম বাংলার যে অভিজ্ঞতা গোরাকে তার কল্পনার ভারতভাবনা থেকে রূঢ় বাস্তবের মুখে দাঁড় করায় সেখানে সে "ভদ্রসমাজ শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল।" সে দেখে এই গ্রাম্য ভারতবর্ষ "কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল, সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত" পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে চলার পথে সেখানে "কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধা...সংস্কার মাত্রই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন" (পৃঃ ২১৫)।

গ্রামে বাস করার সময় সেখানে একটা পাড়ায় আগুন লাগে। আগেও এখানে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। কিন্তু আগুন লাগার পর যতো গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি, কান্নাকাটি, আগুন নেভানোর জন্যে সমবেত উদ্যোগ, সংকল্প সেই অনুপাতেই অনুপস্থিত। অগ্নিকাণ্ডকে লোকে মনে করে দৈবের উৎপাত। সুতরাং অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি নেই। যাদের বোধশক্তি এমন অসাড় তাদের কাছে দেশের কথা, দশের কথা বলা যে কত অর্থহীন, গোরা এই প্রথম সেকথা বোঝে। গোরার গ্রাম পরিক্রমায় সহযাত্রী হয়েছিল তার চারজন শিষ্য, সহকর্মী, অবিনাশ, মতিলাল, বসন্ত আর রমাপতি। কয়েকদিনের পদযাত্রার পরে অসুস্থতার অজুহাতে অবিনাশ, বসন্ত কলকাতায় ফিরে যায়। সঙ্গে থেকে যায় মতিলাল আর রমাপতি। গ্রামের মানুষদের আশ্চর্য অসাড় চেতনা দেখে গোরা যেখানে ক্ষুব্ধ সেখানে রমাপতি আর মতিলাল মনে করে "ছোটোলোকরা তো এই রকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে,.....ছোটোলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে" (পৃঃ২১৬)। গোরার আচরণে ক্ষুব্ধ মতিলাল এবার গোরার সঙ্গ ত্যাগ করে কলকাতায় ফেরে। থেকে যায় একলা রমাপতি।

অবিনাশ, বসন্ত, মতিলাল, রমাপতিরাই ছিল স্বদেশি আন্দোলনের যুগের গড়পড়তা বাঙালি। গ্রামের নিরক্ষর, মানুষদের জন্য কিছু করা দূরস্থান, তাদের জন্যে সমবেদনা, সহমর্মিতাটুকুও এদের ছিল না। ছোটোলোকদের জন্যে সহানুভূতি সহমর্মিতাটুকু তাদের মতে

ছিল বাজে খরচ। হিন্দু জাগরণ, হিন্দু হিতৈষণার সংকল্প, কর্মসূচি যদি শহরের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সার্থক হয়, তাহলেই দেশোদ্ধার ঘটে যাবে বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। সাধারণ মানুষ, সামাজিক নিম্নবর্গ যে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হবে, সেটাই তাদের কাছে ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এই যে গ্রাম, যার নাম ঘোষপাড়া, সেখানকার মানুষজন, পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে গোরার স্বপ্নের বিপরীত মেরু, এটা মেনে নেওয়া এবং তারপর এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে ছোটোলোক বলে ভুলে যাওয়া যে সম্ভব, গোরার দূরতম কল্পনায় সেই ধারণা ছিল না।

ঘোষপাড়া ছেড়ে গোরা ও রমাপতি একদিন হাজির হয় চর ঘোষপুরে। এলাকাটি স্থানীয় এক নীলকুঠির ইজারাভুক্ত। প্রায় পঞ্চাশ ঘর মানুষের বাস, সবাই মুসলমান, আর আছে একঘর হিন্দু নাপিত। নীলকুঠির নায়েব মাধব চাটুজ্জ্যে, অত্যন্ত স্বার্থপর, চরম কূটকৌশলী, হৃদয়হীন এক মানুষ। কুঠিয়ালের হয়ে সব রকমের অপকর্মে সিদ্ধহস্ত। তার সহযোগী স্থানীয় থানার দারোগা। চাষিরা নদীর চরে বোরো চাষ করেছিল। কুঠিয়াল দাঁড়িয়ে থেকে সব ধান কেটে নিয়ে গেছে। তখন সব চাষি প্রতিরোধ করে। তাদের নেতৃত্ব দেয় ফরু সর্দার। তারই লাঠির ঘায়ে কুঠিয়ালের একটা হাত এমন জখম হয় যে শেষ পর্যন্ত সেটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ফলে গ্রামের সব পুরুষ জেলে আটক রয়েছে। বাড়িতে কেবল মেয়েরা আর তাদের ছেলেপুলের দল। দারোগা সদলবলে প্রায়ই গ্রামে আসে। নানা অত্যাচার করে। সারা গ্রামে সক্ষম পুরুষ বলতে একমাত্র সেই হিন্দু নাপিত। মুসলমান গ্রাম কার্যত সেই হিন্দু নাপিতের ভরসায় রয়েছে। ফরু সর্দারের দশ বছরের ছেলেটার প্রতিপালনের ভার নিয়েছে এই নাপিত পরিবার। নাপিতের স্ত্রীকে ছেলেটা গ্রাম সুবাদে মাসি বলে ডাকে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রমাপতির এই ম্লেচ্ছ সংসর্গ অসহ্য হয়। নাপিতই বলে দেয় ক্রোশ দেড়েক দূরে কুঠিয়ালের কাছারি বাড়ি। সেখানে থাকে নায়েব মাধব চাটুজ্জ্যে। গোরা ও রমাপতি চলে যায় কাছারি বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু গোরা ফিরে আসে। মুসলমানের ছেলেকে প্রতিপালন করছে এক হিন্দু নাপিত, নিজের ছেলের মতো কারণ সে বিশ্বাস করে "ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোন তফাৎ নেই" (পৃঃ২১৭)। গোরার কাছে এই অভিজ্ঞতা, এই নিরক্ষর মানুষের মুখে এই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, অভাবিত পূর্ব। শহরের যে জীবনে তাদের মতো শিক্ষিত মানুষরা হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে ধর্মমতের যে পার্থক্যকে প্রায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে, সেখানে চর ঘোষপুরের এই সামাজিক নিম্নবর্গ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় কেমন, কতো সহজে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুঃসময়ে, এটা যে হয়, নিতান্ত সহজ ও সম্ভব, গোরার জীবনে সেটা নজিরবিহীন। গোরা সেখানে থেকে কিছু করতে চাইলে সেই নাপিত তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, পরে পায়ে ধরে বলে গোরা সেখানে থেকে গেলে এই পরিবারগুলিকে আর বাঁচানো যাবে না। তখন নায়েব আর দারাগো একযোগে অত্যাচার শুরু করবে এই অজুহাতে যে নাপিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড়ের জন্যে বাইরে থেকে ভদ্রলোক ডেকে এনেছে।

৮

৬৭ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ গোরাকে নিয়ে গেছেন গ্রাম জীবনের এক ভিন্নতর অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। এবার আর পায়ে হেঁটে সদলে গ্রাম পরিক্রমা নয়। ট্রেনে কলকাতার বাইরে কোন ষ্টেশনে নেমে একা পল্লীভ্রমণ। দীর্ঘ একমাস কারাবাসের পর দলের সদস্যদের গোরাকে স্তবস্তুতিতে মহাত্মা বানানোর নিরন্তর প্রচেষ্টায় ক্লান্ত ও বিরক্ত গোরা

তাদের সংস্রবমুক্ত হওয়ার জন্যই পল্লীভ্রমণ সুরু করেছে। আগের মতো এখন আর সে নিজের সংস্কার ও বিশ্বাস বাঁচিয়ে যাদের বাড়িতে তার জাত যাবে না বলে মনে করতো সেই ধরনের বাড়ীতে না থেকে 'কলু, কামার, কৈবর্তদের পাড়ায়" আতিথ্য নিত। কিন্তু যখনই গোরা তাদের ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েছে তখনই তাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছে। গোরা তাদের সুখ দুঃখের কথা জানতে চাইলে তাদের মনে সন্দেহ জাগতো। তারা অপ্রিয় নানা কথা শোনাতেও কসুর করেনি। গোরা তাতে নিরস্ত হয়নি।

তখনই গোরা দেখে এই সব মানুষদের মধ্যে "সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি", জীবনের নিত্যকর্মগুলি "সমস্তই সমাজের নিমেষহীন চোখের উপর দিনরাত্রি রহিয়াছে।" লোকাচারের প্রতি প্রত্যেকের রয়েছে তর্কহীন সহজ বিশ্বাস। এরা হলো এমন এক "ভীত অসহায় আত্মহিত বিচারে অক্ষম জীব" যার "আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর কোনো মঙ্গলকে' চেনে না, বোঝালেও বুঝতে চায় না। "দণ্ডের দ্বারা—দলাদলি দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সবচেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে। কি করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদমস্তক জালে বাঁধিয়াছে—কিন্তু এ জাল ঋণের জাল, এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন। রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে।.....এই আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে" (পৃঃ ৫৩৮)।

গোরা দেখে "এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না। বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।" শিক্ষিত সমাজের অবস্থা এই রকম নয়। কারণ সেখানে সাধারণের মঙ্গলের জন্যে লোকে এক হয়ে দাঁড়াবার শক্তি বাইরে থেকে পায়। কিন্তু পল্লীচিত্র আলাদা, সেখানে "বাইরের শক্তি সংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না"। পল্লীর মানুষের এই অন্তহীন, ব্যতিক্রমহীন নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা "স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার মূর্তি" (পৃঃ ৫৩৯) একেবারে অনাবৃত দেখতে পায়। এই রূঢ় বাস্তবতার সামনে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গোরা দেখে নীচ জাতির মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। সেটা এবং অন্য নানা কারণে তাদের মধ্যে কন্যাপণ চালু আছে। অনেক পণ দিতে না পারলে বিয়ের কনে পাওয়া যায় না। অনেক পুরুষ চিরজীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হয়, না হলে বেশি বয়সে বিয়ে করে। বিধবা বিবাহে কঠিন নিষেধ। ফলে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হয়ে উঠেছে। যে গোরা শিক্ষিত সমাজে সামাজিক আচারে কিছুমাত্র শৈথিল্য সহ্য করে না, সে এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিতে গিয়ে প্রবল বাধা পায়। শোনে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি "ব্রাহ্মণরা যখন বিধবা বিবাহ দিবেন, আমরাও তখন দিব" (পৃঃ ৫৪০)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাদের রাগ হওয়ার প্রধান কারণ, গোরা তাদের হীনজাতি মনে করে অবজ্ঞার মনোভাব থেকে বিধবা বিবাহের সুপারিশ করছে। "তাহাদের মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত হীন আচরণ করাই যে শ্রেয় ইহাই গোরা প্রচার করিতে আসিয়াছে।" (পৃঃ ৫৪০)।

৯

পল্লীজীবনের তিনটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা। প্রথমে ঘোষপাড়া পরে চর ঘোষপুর, এবং সবশেষে

নামহীন এক পল্লী জনপদ, রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে গোরার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই এক তুলনামূলক আলোচনা আছে। ঘোষপাড়া মূলত এক হিন্দুগ্রাম যেখানে উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষ বাস করে। চর ঘোষপুর একান্তভাবেই মুসলমান বসতি। একঘর হিন্দু নাপিত সেখানে ব্যতিক্রম। আর সবশেষে নামহীন এই জনপদ মূলত হিন্দু নিম্নবর্গের মানুষদের বাস। সামাজিক মাপকাঠিতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, তারা সবাই নিম্নবর্গ। গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের উচ্চবর্গের কথা নানা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বললেও, মুসলমান উচ্চবর্গ বা আশরফদের কথা আদৌ বলেননি। বলেছেন গরিব, সাধারণ মুসলমান বা আত্‌রফদের কথা।

পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গোরা দেখে যে, (১) "মুসলমান মধ্যে সেইজিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাঁড় করানো যায়"। বিপদে আপদে মুসলমানরা যেমন "নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয়। হিন্দুরা এমন হয় না।" (২) এই দুই নিকট প্রতিবেশীর জীবনচর্চায় এমন পার্থক্য কেন হলো তা ভাবতে গিয়ে গোরা ব্যথিত মনে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে "ধর্মের দ্বারা সমস্ত মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে"। আচার সর্বস্বতা হিন্দুদের ঐক্য, সংহতি বিনাশ করেছে। (৩) আচারের বন্ধন মুসলমানদের অনর্থক বেঁধে রাখেনি বলেই "ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ"। হিন্দুরা আচারকেই ধর্ম মনে করে স্বসমাজকে অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে। ফলে ধর্মও থাকেনি, আচারেও ফাঁকি দেখা দিয়েছে। (৪) মুসলমানরা সকলে মিলে "এমন একটি জিনিসকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না' মাত্র নহে, যাহা 'হাঁ'; যাহা ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক" (পৃঃ ৫৪০)। হিন্দুদের মধ্যে কেবল ঋণাত্মক উপাদানের বাড়বাড়ন্ত।

এতোকাল গোরা কেবল স্বদেশানুরাগের বশে কাজ করেছে, তর্ক করেছে উকিলের মতো, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্যে। পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই দুই নির্বিশেষ সামাজিক নিম্নবর্গের মুখোমুখি হয়ে গোরা বোঝে যে, এখানে তার প্রতিপক্ষ নেই, তার যুক্তিতর্কের শ্রোতা নেই। তাই সামাজিক বাস্তবতাকে সে দিনের আলোর মতোই দেখতে পায়। কোনো আবরণ ছাড়াই। এই সত্যদৃষ্টি গোরা এর আগে লাভ করার কোনো সুযোগ ও পরিবেশ পায়নি।

## ১০

বাংলা উপন্যাসের শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ গোরা উপন্যাসের বিদগ্ধ ব্যাখায় সামাজিক নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন স্বীকার করেননি। বস্তুত গোরার সাহিত্য মূল্য বিচারে সামাজিক নিম্নবর্গের আলোচনা না থাকাটা অস্বাভাবিক কিম্বা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি যে সামাজিক বাস্তবতাকে বহু ক্ষেত্রে ঠাঁই দিয়েছে তাই নয়, সৃষ্ট চরিত্রের রূপান্তর, ভাবান্তর বোঝাতে সেই সামাজিক বাস্তবতা ব্যবহার করেছে, এই নিবন্ধে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করার একটা প্রয়াস রয়েছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোরা উপন্যাস নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তার প্রধান চরিত্রগুলির আন্তর সম্পর্কের জটিলতার গ্রন্থিমোচনে তাদের পরিণতি কেন কীভাবে একটা বিশেষ রূপ পেয়েছে তারই আলোচনা করেছেন। সেখানে গোরার পল্লীপরিক্রমায় কেবল "চরঘোষপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ জন্য" গোরার বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াবার উল্লেখ রয়েছে। আর বলা হয়েছে গোরা "দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক

রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে সেখানে জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত হইয়াছে"।[৩] নীহাররঞ্জন রায় গোরার আলোচনায় চর ঘোষপুর প্রসঙ্গই কেবল উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমাজের ক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের প্রত্যক্ষ অভিঘাত গোরার মানসলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেই সব ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক প্রেক্ষিত আলোচনার ভিত্তিতে গোরার জীবনদৃষ্টিতে তা বড়ো মাপের একটা পরিবর্তনের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, তার কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকার করা হয়নি। এই প্রসঙ্গটিকে তিনি উপন্যাসের 'বাস্তবনিষ্ঠা' বলেছেন এবং এর মধ্যে "গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার প্রয়াস" লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে গোরা পায়ে হেঁটে গ্রামে গিয়ে "গ্রামের লোকদের ভালো করিয়া জানিয়া বুঝিয়া ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল", যার মধ্যে দেশপ্রীতির একটা রোমান্টিক ভাবকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে এর মধ্যে "গোরার চরিত্রকে বাস্তবজীবনের ধর্মানুগত করিবার সজাগ চেষ্টা রহিয়াছে"।[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে ভারতবর্ষ গোরার চোখে এতোকাল একটা তত্ত্বরূপেই ছিল, "তার যথার্থ পরিচয়টি প্রত্যক্ষ করবার প্রয়োজনও তার ছিল সেই প্রয়োজন সাধিত হলে চর ঘোষপুরে"[৫]। কার্তিক লাহিড়ি গোরা'র আলোচনায় সে যে দেশের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করার প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ থেকে, 'বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা' বিদ্ধ হয়ে মুক্তির পথ খোঁজার জন্য নিম্নবর্গের সান্নিধ্য অভিপ্রেত মনে করেছে, সেটাই তুলে ধরেছেন। "এজন্য কৃষক, মজুর, নাপিত, ফেরিওয়ালা তথাকথিত শিক্ষিতের ভাষায় অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন গোরার নিজের বিচ্ছিন্নতা উত্তরণেরই প্রয়াস হয়।"[৬] কমল সমাজদার বলেছেন মহাকাব্যিক উপন্যাস গোরায় "ভাববস্তুর দিক থেকে উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথম দশকে জীবন চেতনার বিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য।"[৭]

সামাজিক নিম্নবর্গ সম্পর্কে সচেতনতা বিশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় যে আলোড়ন তুলেছিল, বিশ শতকের শেষ দুই দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা সূত্রে সেই চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। গোরা উপন্যাসের সাহিত্যগত আলোচনা ও মূল্যায়নের গুরুত্ব এই উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনার বড়ো অংশ হতে পারে, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্র চেতনায় সামাজিক নিম্নবর্গের অভিঘাত যে কতো ব্যাপক ছিল, সেই দিকে একালের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। *

---

* গোরা উপন্যাসের সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশিত ১৯৭২ সংস্করণ থেকে।

১. The Bramha Samaj : Jogananda Das. Studies is Bengal Renaissance. Ed. Atul Gupta. পৃঃ ৪৯৪

২. রবিজীবনী ঃ প্রশান্ত কুমার পাল, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২১৫

৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায, পৃঃ ১৫২

৪. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৩৪

৫. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায ঃ পৃঃ ৯৬

৬. বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি ঃ কার্তিক লাহিড়ি, পৃঃ ৮০-৮১

৭. বাংলা উপন্যাসে লোকজীবনচর্যা ঃ কমল সমাজদাব, পৃঃ ৭৭

## নয় কি ওরাই

**মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়**

আগুনরঙা ঝাণ্ডা উঁচু, আগুনখেকো
ওই-যে হেঁকে দিচ্ছে জানান—সজাগ থেকো,
বলছে—সবাই নাও হাতিয়ার, কঠিন লড়াই,
এস আমার পিছু-পিছু সামনে চড়াই।
পথের দু'পাশ ভিড় করে লোক, ইতিউতি
সম্ভ্রমে চায়, এগোয় না কেউ, ছড়ায় স্তুতি—
লাজাঞ্জলি—বীর যে-পথে করেন গমন,
ভাবে, বাবু একা একশো, শমনদমন,
ভাবে, নাগাল কই, বাবুরে যায় না ছোঁয়া—

ডাক শুনে কেউ না এলে বীর নেই-পরোয়া,
একলা চলার ধান্যে মনের আবাদ রোয়া,
অঙ্গ জুড়ে অহঙ্কারের রূপ জড়োয়া,
—সর্বখোয়া
ও'রই নাম কি বেপরোয়া?

সবাই কিন্তু যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই,
বাপ-পিতমো'র আমল থেকে ঘুরেফিরেই
সেই দু'বেলা উপোস, পিঠে ভূতের বোঝা,
বউ ঠেঙিয়ে ভাইকে মেরে রেহাই খোঁজা।
এল গেল রাজা মন্ত্রী রাজারও ঝি,
ঠকঠকালে হবে কী, নেই কপালে ঘি,
জমি বেহাত, লাঙলে চোখবাঁধা বলদ,
কারখানা-ছোড় বেকার খোঁজে কোথায় গলদ,
ভাবতে-ভাবতে মাথায় আগুন চক্ষে ধোঁয়া—

এমন সময় দেয়াল-লিখন রক্ত-খাওয়া :
রক্তারক্তি সামনে, ওঠো ও ঘরোয়া
ঘর ছাড়ো আর মারো মরো, কার পরোয়া?
—সর্বখোয়া
ডাকেন—যে বীর বেপরোয়া।

এগোয় না কেউ, কেবল সবাই যে-যার মনে
সাবেক ধরন আঁকড়ে আশার জালটি বোনে।—
তবু কেউ-কেউ সঙ্গে ওদের যায় যে থেকে
থাকে দিনের ধুলো রাতের কালি মেখে,
থাকে—দুঃখের বেড়া টপ্‌কায় শোকের সাগর
সাঁতার জোড়ে, আবার সবার সঙ্গে জাগর
থাকে সুখের বসলে নবত্ ক্বচিৎ-কখন,
ওরা সবার একজন ওই সাথী ক'জন
জীবন-মরণ জুড়ে পাশে সর্বখোয়ায়।

একই সঙ্গে খাওয়া-পরা, শেষের শোয়া,
বাঁচার লড়াই, মনটা অলঙ্কার জড়োয়া,
দিনবদলের ভয়ঙ্করেও নেই পরোয়া,
—খুব ঘরোয়া
নয় কি ওরাই বেপরোয়া?

## পেরু-র পিওন

রণজিৎ দাশ

আমার মাইনে পাঁচ পেনি, সঙ্গে
দু'মুঠো রেশন, আর কয়েকটা কোকো গাছের পাতা।
যাতে সেই পাতার বিষনেশায়
আমি খিদের কষ্ট ভুলে থাকতে পারি
এবং তোমাদের আনন্দ-ফূর্তির, প্রেম-পিরীতের,
দয়া-ধর্মের চিঠিগুলি বিলি করতে পারি।
তোমাদের তেড়ে-আসা কুকুরগুলোর স্বাস্থ্য ও গাম্ভীর্য দেখে
ভয় পেতে পারি।
এবং বিনা ঝুটঝামেলায়, অকালে ও অগোচরে, মরে যেতে পারি।

তবুও, কোকো পাতাগুলোর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাই।
খিদের কষ্ট, সত্যি সত্যি, টের পাইনি তেমন।
আর বিশেষ কী লিখি। মৃত্যুশয্যা থেকে—
আমি পেরু-র পিওন।

## সে নয়, তার স্মৃতি

### বাসুদেব দেব

রাজহাঁসের মতো শাদা ধবধবে এ্যামব্যাসাডর বাহিনী
গিটার হাতে ঈশ্বরী আমাদের হাজির হলেন
বিনা নোটিশে সেই সন্ধেবেলা, বাংলা একাডেমির সামনে

দূরদর্শন কর্মী ও পত্রিকার লোকেরা চিনতে পারে নি তাঁকে
চিনতে পারে নি চায়ের ভাঁড় হাতে গাছের তলায় ভিড়জমানো
আত্মমগ্ন কবিরাও, আগে তো কেউ তাঁকে দেখে নি কখনো

সিঁড়িতে ছড়ানো আমাদের হৃদয়, হৃদয় নয়, অজস্র পাণ্ডুলিপি
টপকে টপকে তিনি উঠে গেলেন স্বপ্নপতাকার মতো উঁচুতে
বাতানুকূল সভাকক্ষে হাততালি দিয়ে উঠলো খালি আসনগুলো
মাইক্রোফোনে বেজে উঠলো উদ্বোধনী সঙ্গীত
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...
আর তখনই শহর জুড়ে লোডসেডিং

কিমাশ্চর্য, যেন কার নির্দেশে আমাদের সব পাণ্ডুলিপি জ্বলে উঠলো একে একে
সেই বিপুল অন্ধকারে কী চমৎকার হয়েছিল আমাদের বহ্ন্যুৎসব
বর্ষার মেঘের নিচে আমাদের সেই আত্মনিবেদন

আলো যখন এলো তখন কেউ কোথাও নেই
সমস্ত চত্বর জুড়ে এক দুর্লভ বিষাদের গন্ধ
বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ালো অনেকক্ষণ

## সাম্প্রতিক

### ব্রত চক্রবর্তী

মহিমা, সব সবরকম মহিমাই ধুল্যবলুণ্ঠিত।
শুকনো ঝরাপাতার নাম, মায়া।
নিসর্গ বারুদগন্ধী, কেননা পাখি বা
কারুর পেখম দেখলেই,
শটগানে ট্রিগারে আঙুল চলে যায় আমাদের।
সম্পর্ক, সব সবরকম সম্পর্কই দ্বিচারিতা,
দুনৌকায়।

পতাকায় লাশ মুড়ে রাখা রাজনীতি।
সমাজ, সাজগোজ শিখেছে, ঠাটবাট;
রঙীন ঝালরের আড়ালে আসলে
শিল্পিত সোনাগাছি।
মাছি বহুজাতিক, মাছি শিল্পায়ন, মাছি বিশ্বায়ন;
ওড়ে, মাথা ঘোরে।
হাত তুলুন কে কোথায় দারিদ্র্যসীমার ওপরে।
গোধূলিগগনে মেঘ, তারা-ঢাকা;
ফাঁকা লাগে, একা।
ভালবাসার কথা যাকেই বলতে যাই,
সে-ই বলে ওঠে :
এই তো শতাব্দী শুরু, হাত একেবারে খালি...

## কেউ কারও মত হয় না

অরুণাভ দাশগুপ্ত

কেউ কারও মত হয় না
যে যার নিজের মত বেড়ে ওঠে প্রকৃতির নিহিত নিয়মে।
এসব জেনেও কেউ হতে চান নাট্যাচার্য শিশিরকুমার,
কেউ কেউ প্রমথেশ কারও মুখে উত্তমের হাসি
কণ্ঠে ভর করে লতা কারও ছন্দে রোশনকুমারী।

সুবর্ণরেখার রং-এ নিজেকে রাঙিয়ে কেউ ঋত্বিক নির্ভর
কারও স্বপ্নে বাসা বাঁধে জীবনানন্দের সেই লাশকাটা ঘর।

এও এক খেলা এক অসম দ্বৈরথ
নকল কখনও পারে চিনে নিতে আসলের পথ?
পারে না সে শুরুতেই নিজেকে হারিয়ে
পরগাছা হয়ে বাঁচে
পাছে কেউ যায় তাকে নিঃশব্দে মাড়িয়ে।

## বালিকা ও দুষ্টুলোক

মল্লিকা সেনগুপ্ত

[বালিকাকে যৌন হেনস্থার দায়ে স্কুলবাসের ড্রাইভার ও হেল্পার ধৃত—সংবাদ, আগস্ট, ২০০১]

স্কুলবাসের বাচ্চা মেয়ে
সবার শেষে নামে
সঙ্গীগুলো বিদায় নিলে
তার কেন গা ঘামে!

বাসের কাকু বাসের চাচা
কেমন যেন করে
হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে
আমায় নিয়ে পড়ে

কাকু জেঠুর মতন নয়
দুষ্টু লোক ওরা
মাগো আমায় বাস ছাড়িয়ে
দাও না শাদা ঘোড়া!

দুষ্টু কাকু দুষ্টু চাচা
থাকুক না তার ঘরে
বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কেন
অসভ্যতা করে!

এই পৃথিবী শাদা কালোয়
মন্দ এবং ভালো
তবুও কেন এই জীবনে
ঘনিয়ে এল কালো?

আমার কিছু ভাল্লাগে না
স্কুলের বাসে ভয়
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
ওই বাসে আর নয়,

আমাকে আর কিছুতে যেন
না ছুঁতে পারে ওরা
আমাকে দাও সবুজ মাঠ
পক্ষীরাজ ঘোড়া।

## নিউজ ডেস্ক : ১১ সেপ্টেম্বর

গৌতম ঘোষদস্তিদার

তুমি কোন দিকে—আরব না আমেরিকা
আজ রাতেই তা ঠিক করে নিতে হবে
ডেডলাইন খুব সাংঘাতিক ব্যাপার
কমপিউটারে বোসো, জালে আজ অনেক মাছ
ধরো, আর সুস্বাদু মশলা মাখিয়ে রাঁধো
তারপর গরম-গরম সাজিয়ে দাও পাতায়-পাতায়
তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যাবে কাল সকালে
আপাতত ঘাড় গুঁজে লেখো, সময় কম, মৃত্যুকে মাপো
সংখ্যা দিয়ে, ভাষা যেন মর্মস্পর্শী হয়—
হলিউডি কায়দায় কীভাবে বিমান
ঢুকে যায় হর্ম্যের পেটে, পেন্টাগনে
সে-সব বর্ণনার সঙ্গে সামান্য প্যাথোজ
আর হিংস্রতা মেশাবে আজ পরিমাণমতো
কোনও মার নেই কাল সকালে
লক্ষ-লক্ষ পাঠক পড়বে চেটেপুটে
তোমাকে হিংসার পথে গেলে হবে না
মুঠো-মুঠো পায়রা ওড়াতে হবে
আমেরিকা শান্তির দূত, আহা, আক্রান্ত
ও-সব আরব-গেরিলাটেরিলা ছাড়ো
ভিয়েতনাম হিরোশিমা অনেক হয়েছে
আকাশে আজ তুলে ধরো স্রেফ ইউনিয়ন জ্যাক!

## মায়াবাস্তব

বিভাস রায়চৌধুরী

ভোরবেলা আমি আরো কিছুটা গাছের দিকে ঝুঁকে পড়ি, ভোরবেলা...
বাচ্চা মেয়েটার জন্যে খরগোস খুঁজতে গিয়ে
চিঠি লিখে ফেলি, ভোরবেলা...
এই আমার পৃথিবী চমৎকার একজন বন্ধু,
যে আমাকে শিখিয়েছে চিৎকার নিজেই এক
লাজুক তরুণ কবি,
বহুদিন হয়ে গেল নির্জন ঘরের প্রয়োজনে
কবরখানার দিকে হেঁটে চলে গেছে...

আর এই পৃথিবীর চমৎকার সব ভোরবেলা
আমার শরীর থেকে ওড়া শুরু ক'রে
মৌমাছিরা দেখি ভাবছে—সামান্য কিছুটা কবিজীবনের পর তারা ঠিক
সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাবে...
আর প্রতিটি অন্নের পেছনে মাদল বেজে ওঠে...উঠতেই
একদিন সন্ধেবেলা
ঘুরে ঘুরে নাচ হবে...নেশা, ইয়ার্কি হবে...
আর প্রতিটি অন্নের পেছনে তির্যক উঁকি মেরে
দারুণ ঘুমিয়ে পড়বে চাঁদ
তালগাছের মাথায়...
একদিন সন্ধেবেলা মৌমাছিরা লেখা ছেড়ে দিয়ে
এইসব দেখবে...দেখবে একটু বালি সরালেই
সাধারণ মানুষেরা নদী, যে নদীতে ঝাঁক-ঝাঁক গ্রন্থ
হুবহু শিশুর মতো আঁকড়ে ধরেছে জগৎ...

এই আমার পৃথিবী চমৎকার একজন বন্ধু!
চিৎকার আসলে এক প্রতিভাবান লাজুক কবি!
আরো আরো বলেছি না কবরখানা আমাদের টানছে?
বলেছি না মৌমাছিরা সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাবে একদিন?
এই ভোরবেলা আমি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই গোপন রাখছি না...

আরেকটু ম্যাজিক করে বললে, সাদা কাগজের 'পর
আমি এক একলা ছুরি,
যার ধারালো অংশে কুয়াশার দাগ
সম্পূর্ণ মোছেনি কোনোদিন!

## সীমারেখা

মৃণাল বসুচৌধুরী

কে কখন কোথায় দাঁড়াবে
আগে ঠিক হোক
ঠিক হোক মুক্তমঞ্চে
কে পরাবে চন্দনের ফোঁটা
কার হাতে মাল্যদান
স্বাগত ভাষণে

কে জানাবে প্রথম কুর্নিশ
ঠিক হোক কে প্রথম
পরম বিশ্বাসে
নিঃশর্ত বাড়িয়ে দেবে উষ্ণতার হাত

ঠিক
কখন কিভাবে তিনি আসবেন
সে সব ভাবার কথা আমাদের নয়
আমাদের সামান্য ভূমিকা
সূক্ষ্ম সীমারেখা যতই অদৃশ্য হোক
আমাদের শিখিয়েছে
স্থির বিভাজন

## উদ্দেশ্যবিহীন

**আনন্দ ঘোষ হাজরা**

উদ্দেশ্যহীনতা জুড়ে আমার সর্বস্ব রাখা আছে;

এমন জটিল ভূমি হাজারো ভ্রমণ
রক্তাক্ত পথের প্রান্ত ছুঁয়ে তটনীল
এমন উদ্ভাস মেঘে। মেঘেদের ভাষা
কেই বা সমূহ বোঝে? তবু অগণন
জলবিন্দু ছুঁয়ে ভাসে মেঘের শরীর;
সেই সব শরীরের খোঁজে যাওয়া উদ্দেশ্যবিহীন
সহস্র কম্পনে ঘোরা পুনরায় ফেরা
বারবার আসা যাওয়া লক্ষবার শূন্যতার কাছে—
এমন অমোঘ টানে অলঙ্কারময় পথ চলা
জটিল ভঙ্গিল রেখা ধরে!

উদ্দেশ্যহীনতা জুড়ে আমার সর্বস্ব রাখা আছে।

## এক খোঁজে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমার পঙ্গু এবং অথর্ব বিছানা
আকস্মিক ঘূর্ণি হাওয়ায়
যৌবনের অভ্যস্ত আশায়
হু হু করে উড়ে যায়—
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কড়া নাড়ে, ব্যতিব্যস্ত কড়া নাড়ে
নিউ আলিপুরের এক প্রবাদ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী দরজায় ঃ
দীপেনকে চান?
দরজা খুলে শৈত্য প্রবাহ বলেন—
সেই কবে থেকেই তো আমাদের দীপেন নিখোঁজ!

সন্ধ্যার আকাশ ঝুঁকতেই
আমি "পরিচয়ে" হুড়মুড় ঢুকে
অমিতদাকে ঝাঁকিয়ে নাড়িয়ে জল—
তুমি তো দীপেনদার আত্মার আত্মীয় ঃ
বলো, বলো দীপেনদা কোথায়?
অমিতদা—অর্থাৎ অমিতাভ দাশগুপ্ত মশাই
চোখের জলে ভেসে গিয়ে প্রাণফাটা হাহাকারে বলে—
দীপেনকে অনেকদিন দেখিনি, ঠিকানাও জানা নেই।

অথচ দীপেনদাকে আমার বড় প্রয়োজন
একমাত্র দীপেনদার ঘন আলিঙ্গন
মুহূর্তে বদলাতে পারে পৃথিবীর যাবতীয় নষ্ট ভ্রমণ!
রুদ্ধশ্বাসে এক ছুটে আমি গিয়ে আছড়ে পড়ি
বাগুইহাটিতে দেবেশ রায়ের দরজায় ঃ
বাইরে বেরিয়ে তিনি খুব ধীর স্থির গম্ভীর গলায় বলেন—
দীপেনকে পাবেন কোথায়?
শ্রুতিতে বৈদিক মন্ত্র থাকলে
দীপেনের হয়তোবা দেখা পাওয়া যায়!

## আকাশগঙ্গা

অনন্ত দাশ

এ-পৃথিবী এক অদ্ভুত জমকালো
বৃত্ত রচনা করেছে আমার মনে
অন্ধকারের গভীর গোপন আলো
জমে থাকে যেন হৃদয়ের এক কোণে

দূরাগত সেই তারার মতন তুমি
আলেয়া স্বপ্নে ছুটেছিলে একদিন
ক্লান্ত শরীরে মৃত্যুর অভিমুখে
ছুটে চলা নেশা আজও হয়নিতো ক্ষীণ

নিশ্চিতি আর মেলেনা রঙীন পাখা
বালিয়াড়ি ভাঙে ঘোর সমুদ্রবায়ু
নিয়তির মত আমাকে তবু সে টানে
হাতের রেখায় কাঁপে দীন পরমায়ু

গুহার আঁধারে সেই সংকেতলিপি
পড়া তো যায়নি। যাবে কি কখনো আর?
উৎকণ্ঠায় তাই তো রয়েছি জেগে
আকাশগঙ্গা একদিন হবো পার...

## সনেট ১৩১

সুবোধ সরকার

যা দেবী সর্বভূতেষু, বন্ধ হবে কত কারখানা?
আমরা ইণ্ডাস্ট্রি চাই, সিঙ্গাপুর, চাই হলদিয়া
গ্লোবাল ভিলেজে থাকি, বিশ্বায়ন হবে সেতো জানা
বড়ে মিঁয়া চাইছেন কী আর করবে ছোটে মিঁয়া!

আদর্শের ঝোলা ব্যাগে আপাতত ওজন কমান
কে না চায় রোমে যেতে, রোম কাছে নাকি বহুদূর?
এক্সট্রা লাগেজ নয়, নীতিকথা বউকে শোনান
ডিভোর্সের আগে যার মূল্যবোধে ঢুকেছে ইঁদুর।

ইজ্জত অটুট রেখে যে মেয়ে মডেল হতে চায়
হতে দেবে বিশ্বায়ন? হতে দেবে লিরিল, রেক্সোনা?
পৃথিবী বলছে ওকে মরা দেশে আদর্শ মেরো না
আগে দুটো খেতে শেখো, আমেরিকা কাউকে খাওয়ায়?

ওয়াশিং মেশিনের পাশে বসে লক্ষ্মী সরস্বতী
যা দেবী সর্বভূতেষু, বিশ্বায়ন হলে কার ক্ষতি?

## লিবিডো

**অনীক রুদ্র**

যোগের প্রাপ্তিকে এই বসবাস
কেউ ভুল করে ভাবে ছায়া
কেউ গৃহহীন তালিকায় অভ্যাসবশত
সম্যক অগণনীয় ভাবে
জীবের কি কিছু আসে যায়?
সে তো আছে জলস্রোতে, পতঙ্গ ডানায়, বায়ুস্তরে
আরো তৃণ হয়ে আরো রেণুর নিয়তি হয়ে আছে

কয়েকটি চিহ্ন থাকে
সাংকেতিক, কখনো-বা লিপি, ভিন্ন স্বর
সেই যোগাযোগ হেতু অল্প দেখা,
বেশি অনুমান
অলঙ্ঘনীয়, ক্রমশ প্রাচীনতর সোপানের মত

এই দু-চার পংক্তির শোভা

লহমার মনস্কতা দাবি করে
অথবা লিবিডো

## মানুষ গন্ধ

### পঙ্কজ সাহা

একটা একটা করে
পর্দা উঠে যাচ্ছে
কিন্তু কোন মুখ ভেসে উঠছে না,
অথচ কেমন যেন
মানুষ মানুষ গন্ধ!

কেন একটার পর একটা
পর্দা উঠে যাচ্ছে
পর্দার আড়ালে যদি কেউ না থাকে!

কী নিয়ে এলো সকালের রোদ
কী নিয়ে যাচ্ছে বিকেলবেলার হাওয়া
কোন মানুষের গন্ধ
কোন মানুষের দিকে যাচ্ছে!

না-থাকা মানুষের কথা
না-শোনা মানুষের জন্যে
পথে পথে ঘুরছে।

## বিশেষ একটা দিন

### সত্য গুহ

আজ আমার মায়ের অদৃশ্য হাত নেমেছে মাথার ওপর
চুলের ভেতর নরম আঙুলগুলো যেন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে
তাঁর অবশিষ্ট কল্যাণ-বাসনা
মৃত্যুদিনে যা জব্দ ছিলো দৈ দৈ চোখের মধ্যে
আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী
এ পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই—
নেই কোনো অন্ধকার

অন্ধকারের কথা মনে হলেই
আমার আতঙ্ক দেখা দেয়

মনে হয় অজস্র রকম শত্রুতা আমাকে আক্রমণ করে
হিংসা, স্বার্থপরতা, অকারণ উঠোন চষে দেয়া
নদীতে বাঁধ দিয়ে ভেরী করে- বন্যা 'লেলিয়ে দেয়া
ফসলের ক্ষেতে গরু ছাগল নামিয়ে দিয়ে নারকীয় মত্ততা
সারাক্ষণ মেরুদাঁড়া বরাবর পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রাখা
এমনি আরো কত কী
জীয়ল মাছের মতো কিলবিল করে অন্ধকারে

আজ আমার অস্তিত্বের সহস্রাক্ষ থেকে সে দুঃসহ পরিবেশ অপসৃত
যে আঁধার আলোর চেয়ে বেশি
মায়ের উজ্জ্বল এবং অতলান্ত বাৎসল্য-রক্তের মতো প্রাণময়
সেই স্নিগ্ধ অন্ধকারের কাছে আমি আজ নিবেদিত
অনুভব করছি বিশ্বের সব অফুরন্তের আস্বাদ
মায়ের সহৃদয় মুখের মতো আজকের সকাল
আমার কী ভালো লাগছে—কী যে না ভালো লাগছে আমার
খবরের কাগজে আজ একটাও খুন ধর্ষণ রাহাজানির খবর নেই
শুধু বৃক্ষ রোপণ শিল্পোদ্বোধন ও পায়রা উড়োনোর সংবাদ

আমি আজ স্বাধীনতায় অবসিত
কী মধুময়ই না এই পৃথিবী—পৃথিবীর সব কিছু।

## আদিম চাষী

### দীপেন রায়

বৃষ্টি যার স্মৃতি ও জননী
তার দুই পাড়,
আকাঙ্ক্ষা মন্থন করে
উঠে আসে সুখ।

ভিতর বন্ধ বাহির খোলা
সবটুকু নীল নিয়ে,
দাঁড়িয়ে পড়েছে।
কখন আচম্বিতে।

এখানে শিশির জল দেয় রাতে
ভিজে ওঠে সেই মাটি,
কেউ জানে, জানে না কেউ
বীজ পোতে একজনই।

## গ্রহণ

### জিয়াদ আলী

শস্যের ভিতর থেকে উঠে আসা মানুষের সংখ্যা কমে যায়
প্রাচীন চেয়ারে বসে ফতোয়া হাঁকায় কিছু বাটপার দিগ্‌গজ
ভাবে এইভাবে তারা রয়ে যাবে অমর অক্ষয়।
মানুষের অমরতা এতোই সহজ
শ্রেণীযুদ্ধ ছাড়া কবে কোথায় হয়েছে শেষ জয়-পরাজয়।

সংসার ভরেছে বেনোজলে
কিছু মানুষের মুখ হয়ে পড়ছে ক্রমশই গ্রহণের চাঁদ
অন্ধকারে কিলবিল বেড়ে যায় বিষাক্ত পোকার
এভাবে মানুষ বাঁচে
সদর দরজায় যদি পাতা থাকে মরণের ফাঁদ!

## তুমি থেমে গেলে

### প্রদীপচন্দ্র বসু

তুমি থেমে গেলে কি হবে জানে না কেউ!
ভূমিকম্প হতে পারে অথবা প্রবল বর্ষণ,
নদীর ভাঙবে পাড়,
জঙ্গলে আগুন দ্রুত ছুটে যাবে শহরের দিকে,
রেশনে সামগ্রী নেই যেন জরুরী অবস্থা জারী
আর, মুখ বুজে সকলেই ঘুরে যাচ্ছি
নিয়মমাফিক!

তুমি থেমে গেলে কি হবে জানে না কেউ!
হয়ত আত্মজীবনী লেখা শুরু হতে পারে,
শেষ পর্বে স্বাভাবিক

দীর্ঘ হবে এই থেমে যাওয়া নিয়ে
সুগভীর বিশ্লেষণ। উত্থান-পতন ঘিরে
লেখা হবে সময়ের টুকরো টুকরো ইতিহাস
আর, তোমার ভূগোল!

তুমি থেমে গেলে যদি পরমাণু বিস্ফোরণ হয়,
পৃথিবীর পথে পথে দেখা যাবে বিকিরণে
বিকলাঙ্গ মানুষের
শান্তির পতাকা হাতে নীরব মিছিল!

## বিষণ্ণ কামুক

অমরেশ বিশ্বাস

রশ্মিজালে ঘেরা অই মধ্যযামে ঘর
অক্ষর ভাঙছে রাতে শব্দ চরাচর
কোন্ উজবুক?
মরাচাঁদ বলে ওঠে—
প্রতিরাতে পদপাতে চুম্বনের জন্য ফেরে বিষণ্ণ,কামুক।

নক্ষত্র-দেয়াল তুলে আকাশে আকাশে
কাঁদে নাকি বস্তুত সে হাসে!
লাবণ্যর অ্যানাটমি বড় মুগ্ধকারী
সেখানে প্রবেশপথে ছন্দহীন দ্বারী
নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে
প্রকৃতই দায়ী
কবি নয়,—নিতান্ত নচ্ছার সুরাপায়ী।

রশ্মিজালে ঘেরা অই মধ্যযামে ঘর
অক্ষর ভাঙছে রাতে শব্দ চরাচর
কোন্ উজবুক?
মরাচাঁদ বলে ওঠে—
প্রতিরাতে পদপাতে চুম্বনের জন্য ফেরে বিষণ্ণ কামুক।

## নদী খুলে গেছে সহসা

নন্দদুলাল আচার্য

তোর ওষ্ঠে যুঁথীর গন্ধ,
নদী খুলে গেছে সহসা,
কি কথা প্রতীকী মুদ্রায় বল ঈশিতা?
উন্মাদ হল আজকে বাদল সন্ধ্যা।

শিরীষ পাতার পোষাকে,
এত মানিয়েছে ওই অঙ্গ,
জানতে পারিনি, ইন্দ্রবনের মেয়ে তোর,
রূপ খেতে খেতে আমার দু'চোখ অন্ধ।

চুলে লেগে আছে রাত্রি,
দুই পায়ের পাতালে দর্ভ,
কোথা ভেসে যাস অর্গলহীন বন্যায়,
নিবি না আমাকে, মেঘনার নীলগর্ভে?

ওকি লেলিহ অগ্নি আঙুলে,
আমি জ্বলে পুড়ে হই ভস্ম।
তরুণ শোণিতে কে ছেড়েছে খ্যাপা অশ্ব?
উন্মাদ হল আজকে বাদল সন্ধ্যা।

## প্রলয় পয়োধি জলে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

খুব হতাশ বাতাসে হাঁটাহাঁটি করতে নেই
খুব ক্রুদ্ধ বাতাসেও নয়
চতুর্দিকে মধ্যপন্থী অনেকেই
মনোযোগী অচিরে বাড়বে কিসে পার্থিব সঞ্চয়

দুহাতে বাজালে তালি ছুটে আসবে প্রভুভক্ত জীব
তাড়ালেও সরানো যাবে না দরজা থেকে
অবহেলা না করাই শ্রেয়, যেহেতু জীব অর্থে শিব
ক্ষমার মুদ্রায় যিশু প্রলম্বিত ঘরের পেরেকে

ধর্ম নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ঠিক
ত্রাণশিবিরের বাৎসরিক ভিতপুজো আছে
ত্রিপল প্লাসটিক শিট জীবন্ত ধর্মেরও অধিক
দুষ্প্রাপ্য অমৃতফল লোভ দেখাচ্ছে স্বপ্নদৃষ্ট গাছে

আকস্মিক রোদ উঠছে, অকস্মাৎ বৃষ্টির ঝালর
পূর্বাশ্রমে দুঃখ ছিল, বর্তমান আরো অনিশ্চিত
তিন ভাগ অন্ধকার, এক ভাগ বিশীর্ণ আলোর
ফ্লাশবাল্বে ঝলকে ওঠা কাল্পনিক সমৃদ্ধির ভিত

ভাগবাঁটোয়ারা সেরে পিতামহ সূর্য অস্তগামী
পিছনে ফিরতে গেলে অনেক বিতর্ক দেখা দেবে
দার্শনিক প্রস্থানই নিরাপদ, অথচ সংগ্রামী
প্রলয় পয়োধি জলে ইতিহাস যা নেয়ার নেবে

বেশি অন্ধকারে খুব কি কঠিন হবে নদী পারাপার
আমরা তো আশৈশব অশ্রুজলে শিখেছি সাঁতার!

## হাওয়া বদল

রাণা চট্টোপাধ্যায়

হাওয়া বদল হওয়ার কোন সময় নেই, থাকে না
শুধু অপেক্ষা করা বুধন মাঝির মতোন
নিস্তরঙ্গ নদীর তীরে
হাওয়া এলে কাছি খুলে ভেসে যাওয়া।

আমাদের ঘুণধরা হৃদয়হীনতা প্রস্তুতিহীন
অভিনব সমাধানের পথ খুঁজে-খুঁজে
এখন শুভবুদ্ধির হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে
বুধন মাঝি হয়ে
আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের থালায়
ধর্মীয় অনুশাসন আর প্রথাবদ্ধ আত্মঘাতী অভিমান।

আমরা চাই হাওয়া বদল হোক
আত্মরুদ্ধ অহংকার ভেঙে, রণনীতি ও রণকৌশল ভেঙে
বুধন মাঝির নৌকা ভেসে যাক
আলোকিত স্বপ্ন নদী দিয়ে
মানুষের স্বপ্ন নির্মাণে।

## প্রার্থী

অনির্বাণ দত্ত

..তুমি তো জানই—আমি খুব সংযমী..তবু যদি সংযম হারাই—
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দেবে—আমাকে ছাড়াই?
আমি তো পারি না ঠিক গড়ে নিতে তোমাদের মুখ..
আকাঙ্ক্ষায় ছিলা-ছেঁড়া শ্লোকময় ক্লান্তির ধনুক
তবুও বিদীর্ণ করে; পুড়িয়ে আগুন-মুখে ধাতু-মাটি-জল—
এঁকেছি তৃষ্ণার বুকে স্বপ্ন আর শান্তির সম্বল।
জন্ম যায়, জন্ম আসে, লোকালয় জাগে ফের লুপ্ত লোকালয়ে..
মরণকামড়ে দষ্ট, পিষ্টঘাসও থাকে সুপ্তিতে, ..যায় নাকো ক্ষয়ে।
লোভবোধে, পাপবোধে যতই চঞ্চল হোক্ উচ্ছ্বসিত শরীরের ভার—
ওষ্ঠের গন্তব্যে তুমি, কবিছাড়া কোথা যাবে, আর?

## ম্যানিকিন্

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

রসিকতা, কতদূর যায়?

সংসারের ধূসর, বিষদাঁত?
আমি আর এক মুহূর্তও থাকবো না এখানে।

শুকনো মুখগুলো একফালি চাঁদের পাহাড়ে
বাদামী শ্যাওলায় বিক্ষিপ্ত, এই মুশকিল
বলয়ের মাঝখানে আমি আর কতক্ষণ দাঁড়াবো!

কি সেই অভিপ্সা-নির্যাস, কতো বড়ো মহেফিল?

বৃষ্টি আসে, আমি ভিজি।

নৌকোগুলো ডাঙায় দাঁড়ানো, চাঁদের আলো এসে
বালুতে মিশেছে, ছায়া ছায়া, দূরে কে যেন দাঁড়ানো
নাকি ম্যানিকিন্।

## হাসিখুশির একটা রোববার

নীরদ রায়

আজকাল আমাদের সব দায়িত্ব কর্তব্যই যেন
ঠিক বড় পিসিমার মতো, কি করবো, কিভাবে করবো—
ভাবতে ভাবতেই বর্ষাকাল, নদীয়া মুর্শিদাবাদের—
জাতীয় সড়কের দু'ধারে বানভাসি মানুষের ঢল,

এই তো গত মাসের মাঝামাঝি সর্বজনশ্রদ্ধেয় অতীনবাবু
হার্টের অসুখে ভর্তি ছিলেন এক নার্সিংহোমে—
কিছু একটা নিয়ে এবং সকলের কোনো জরুরী কাজ থাকবে না
এমন একটা শনিবার—আমাদের নার্সিংহোমে যাওয়া উচিত,
কিন্তু কবে এবং কিভাবে এই সব ভাবতে ভাবতেই—
অতীন একদিন শ্মশানের শিল্প হয়ে গেলেন,
এগিয়ে যাওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েও—
আমরা পকেটে লুকিয়ে রাখি দু'এক প্যাকেট নিরাপত্তা,
খুব গোপনে চিনে রাখি ফুড়ুৎ করে পালাবার গলি ঘিঞ্জি,

কোনো কিছুই আর ঠিকমতো স্পর্শ-করে না আমাদের,
রোজ যে ছেলেটি আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় চা দিয়ে যায়
যার মুখের বাঁ পাশটায় দুঃখ বসে থাকে কিভাবে বারোমাস,
একদিন সেই ছেলেটি বলেছিলো তার বাবার নাকি যক্ষা—
সকাল সন্ধে মুখ দিয়ে নাকি গল গল করে তাজা রক্ত—
আমরা বলেছিলাম সামনের রোববার সাহায্য করবো অবশ্যই—
সেই থেকে ক্যালেণ্ডারের পাতায় হাসিখুশির একটা রোববার
আমাদের সামনে আর এলোনা কখনো—।

## ডানা

সুব্রত রুদ্র

দোলপূর্ণিমার পরের রাত্রে একটা শাদা বক ডানা দুটি ছড়িয়ে
প্রতিপদের চাঁদের দিক থেকে মাঝসমুদ্রের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল

হঠাৎ যে কী ওর মনে পড়ে গেছে
একা একা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে
আকাশের এত প্রশ্রয় আছে বলেই তো
গরীবের শিশু বাড়তে পারলো

## সম্পর্ক, শুধু

নাসের হোসেন

কয়েকটা ভাঁড় উপুড় করে রাখা আছে টেবিলের উপর
কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, জানলা দিয়ে উড়ে আসছে সবুজ ফড়িং
দেয়ালের র‍্যাকে রাশি রাশি বই কে ব্যবহার করে, কখনো কি
জানা যাবে, কিংবা জানতে চাওয়াটাও কি উচিত হবে, দরজা কিন্তু
খোলাই আছে, অর্থাৎ কেউ প্রতিদিন এ-ঘর পরিষ্কার করে যায়
তার শরীরের রেশমিগন্ধ এখনও স্পষ্ট অনুভব করা যায়
সে-ই বা কে, কী-ই বা তাদের সম্পর্ক, শুধু আবির ছড়িয়ে যায়
পথে পথে, সমস্ত পথই হয়তো শেষপর্যন্ত একজায়গায় এসে মেশে
আর সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় পৃথিবীর উজ্জ্বলতম সূর্যটির নাম
ভালোবাসা, সে-ই রাত হয়, সে-ই দিন, কেবল দিনকে রাত আর
রাতকে দিন করার মন্ত্র না জেনেও একটি বাচ্চা ছেলে ছুটে যায়
কুয়াশার ভিতর, একটি বাচ্চা মেয়ে ছুটে যায় কুয়াশার ভিতর
কুয়াশায় মর্মরিত হয় ডালপালা, কয়েকটা পাখি উড়ে যায়

## নক্ষত্রের মৃত্যু

দুলাল ঘোষ

ঘুম আর স্বপ্নের মাঝখানে
যতটুকু ফাঁক
বিগত জন্মের পাপ
                        করি জড়ো
মনস্তাপে জ্বালাতে আগুন
                        দাউদাউ
খসে খসে নক্ষত্রেরা পড়ে সব
অস্ফুট নড়ে ওঠে ঠোঁট
ডমরু বাজিয়ে মেঘ নেমে আসে কাছে
দশদিক কাঁপিয়ে প্লাবন...
নিজের অজান্তে প্রক্ষালন সেরে
                        জেগে উঠি রোজ

শুরু হয় নতুন জীবন...

## লেনিনের মূর্তি

অজিত বাইরী

মূর্তি সবই সহ্য করে
যখন ছিটিয়ে দাও নর্দমার কাদা
কিংবা আলকাতরা লেপ্টে দাও মুখে
এলোপাথাড়ি গাঁইতি শাবল চালিয়ে
ভাঙো, আর কোমরে রসি বেঁধে
টেনে নামাও বেদি থেকে।

যে হাত ছুঁড়েছে নর্দমার কাদা
যে হাত লেপ্টে দিয়েছে আলকাতরা
যে হাত চালিয়েছে গাঁইতি শাবল
সেই হাতও একদিন ঝরে পড়ে।

কলঙ্কের দাগ মুছে সেই মূর্তি
আবার স্পষ্ট হয় একদিন।
ইতিহাসের যে পৃষ্ঠাগুলি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল
সেগুলি স্পষ্ট অক্ষরে সবাক হয়।
আমাদের চোখ থেকে ধীরে ধীরে
সরে যায় কুয়াশা, রাত্রির অন্ধকার ঠেলে
ভোরের কিনারায় পৌঁছে দেখি
মহান ঐতিহ্যের মত জ্বলজ্বল করছে
একটি নাম, যে নামের উচ্চারণে
সমস্ত বাহু মুষ্টিবদ্ধ হয়,
সব কণ্ঠ একটি কেন্দ্রীভূত ঝড় হয়ে ওঠে।

## লোনা গান

গৌতম দাশগুপ্ত

সাইবার কাফে থেকে
বেরিয়ে আসে খোলভাঙা নোনা বাতাস
আর বাতানুকূল কাঠের খড়খড়ি
অশান্ত মাউস বাগ মানছে না
বারবার গরমমশলার আরক দামে
ভুউস্ করে ভেসে উঠছেন নতুন বৌঠান

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন
এবার ঝড় উঠবে
ঐ মুরাদের ছিন্নমুণ্ড...
ধ্যাত্তেরি! ঐ বঙ্কিম পুরস্কার
ঘরময় জাফরানে-ঝোলে
মাখামাখি উঠে আসে
রবীন্দ্রনাথের সুঠাম দাড়ি বেয়ে
ইণ্টারনেটের কাঁকড়া

## জবানবন্দী

পার্থ রাহা

শেষ দৃশ্যে অভিনয় শুরু
বেশ কিছুদিন
আমার বোরোলিন শোভিত যৌবন, যৌবন নয়
উড়ন্ত উন্মাদ অভিযান

এখনো যখন
ঘাসের শিকড় ছোঁয়ার অহংকার
খানখান খানখান
এ শুধু সবুজ নরম ঘাসে নর্থস্টার ছাপ
শরতের বর্ষার স্বচ্ছতোয়া জলে নিশ্চিহ্ন বিলীন

বহুদিন হয়ে গেল জনতার অরণ্যে আমি একা
গণতন্ত্রবিহীন একা
আমিই রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী কিম্বা মহামান্য আদালত

বিগত পঞ্চাশের ভাঙা চিবুকের দাগে
নিজেকে জাহির করার স্লোগান
ফেস্টুন হাতের রেখায়
আন্দোলন আন্দোলন
এখানে টিয়ারগ্যাস নেই
কবে কোন আদিযুগ থেকে
দুচোখের দুধারে আবহমানের জল
লাঠিচার্জ বন্দুক গর্জন

ছত্রভঙ্গ পলাতক স্বপ্নের তুরঙ্গ সেনানী

যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে
ছারখার স্বপ্নরা আমার
ছারখার যৌবন আমার
ছারখার আকীর্ণ উজ্জ্বল ভালবাসা

এখনই কি ড্রপসিন পড়ার সময়?

## এখন যে প্রার্থনা

অপূর্ব কর

কথা বলো পরিশুদ্ধতা
আজ আমি তোমাকে চাই।

কথা বলো ঝলমল রোদ
আমার বুকের মধ্যে এখন বল্মীকের ঢিবি গ্রাম।

কান পেতে শুনি হাওয়ায়
আমার গা ছুঁয়ে এখনো হরিণ নারীরা ছোটে,
সব শেষে তবু কোনো বিষ তীর
কালান্তক খর্পর নিয়ে এসে হাঁকে—
রক্ত চাই, হে উচ্ছলতা তোর রক্ত চাই।

ঘাতকের ডেরাগুলো চিহ্নিত করি আমি
বড়ো সহজেই তা করা যায়,
কিন্তু কী অসহনীয় বাড়ে বিপরীত দুর্গ প্রাকার,
শক্তিদাতা ঝড়, এসো এসো তুমি
আমার উত্তোলিত হাতের উপর তোমারই তো অধিকার।

এসো বেহাল না হওয়ার
আমাকে সচল রাখার তুমুল ঝাঁকুনি
শিরা ও ধমনী থেকে শল্য মুখে ছেঁচে
সরাও যাবতীয় মরচের গান,
বিশ্বাস করো আমি রাত্রির নাগর নই
জেগে থাকা ভালোবাসি আমি এক অম্লান সকাল।

## চাঁদের ওপিঠ থেকে নন্দন প্রাঙ্গণে

রমেন আচার্য

সঙ্কুচিত যে ছেলেটি নন্দন প্রাঙ্গণে এসে থমকে দাঁড়ালো
তার ঘরে রুগ্ন বোন, টিউশনির খোঁড়ানো সংসার।
শ্বাসকষ্ট হলে রুগ্ন ছেলে
নন্দন চত্বর থেকে
চুরি করে নিয়ে যায় স্বচ্ছল বাতাস।

ধেয়ে আসা বিরূপতা আর ভেজা ঘুঁটে, উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধে
বিপর্যস্ত মায়ের রুগ্ন হাতে ত্যাড়া ঘাড় ভাঙা পাখা।
বুকে জমে অগ্নিহীন ধোঁয়া।

সারাক্ষণ এ ধোঁয়া থাকে না। সূর্য এসে রাত্রির
ময়লা পোশাক ধুয়ে দেয়। তারপর স্নান সেরে
জল থেকে ধীরে উঠে আসে।
ছেলেটিও ওঠে। বোনের শিয়রে গিয়ে বসে।
সংক্রামক রোগ, খালি পেটে কাছে যেতে নেই। তবু
আধপেটে, খালি পেটে মা কেমন রুগীকে আঁকড়ে রাখে বুকে!
মায়ের নন্দন নেই। মাঝেমধ্যে উড়ন্ত গানের কলি ঘরে ঢুকে
দু'একটা অতিরিক্ত জানালা টাঙিয়ে দিয়ে যায়।

## রাত বিষয়ক

উপাসক কর্মকার

কুয়াশার চাদরে মোড়া নিঃঝুম শীত রাত
জেগে থাকে শুধু হ্যালোজেন বাতি সার সার
সারমেয়কুল ঘোরাফেরা করে ইতঃস্তত
জীবন ঘুমিয়ে থাকে পরম নিশ্চিন্তে

কোনো কোনো ভয়ঙ্কর পুরুষ
প্রকৃতিকে করে উদ্দাম শাসন গমন
কোনো রুগ্না স্ত্রী স্বামীর কণ্ঠলগ্না
গিরিগুহা কন্দরের খোঁজ দেয় শীর্ণ হাতে

আসন্ন দিনের খোঁজে রাতপাখি
হিম ঝেড়ে কেশে ওঠে
চাড্ডি গরম ভাত আর অঙ্গসুখের জন্য
কামার্ত একটি দিন
ক্রমান্বয়ে শুষে নেয় পরিণত রাতের আঁধার

কাকেদের ওড়াউড়ি কাজের মেয়ের বাসনকোসন
সায়া ধোয়া জল টুথপেস্ট ফেনা
গড়িয়ে যাচ্ছে কলতলায়...এখন সকাল

## সহযাত্রিণী

### প্রবালকুমার বসু

অক্লান্ত শ্রাবণ ঝাপসা করে দিচ্ছে উইণ্ডস্ক্রিন, পর্যাপ্ত ব্যবধানবোধ
কোথায় এলাম সহযাত্রিণী প্রশ্ন করে, কোথায় চাইছে পৌঁছতে
আর একটু পরেই বাঁক, মেঘ ভেঙ্গে চাঁদ উঠবে, গায়ে গা লাগিয়ে এতক্ষণ
যতক্ষণ অচেনা থাকি উত্তেজনা, অবিশ্বাসের অতিরিক্ত মৌন আবেদন

এরপর সত্যি সত্যি চাঁদ উঠল, সঙ্গীনীটি উধাও হায়রে পার্শ্বসহচরী
প্রতিদিন মধ্যরাতে যখন আসি, গৃহকোণে স্থিতাবস্থা অবিমৃষ্য নারী
স্পর্শ হলে টের পাই চেনা গন্ধ, বিছানায় একটানা জেব্রা ক্রশিং
হাওয়া দিলে ভেঙ্গে যায় সম্পর্ক ঝাপসা করে দিচ্ছে উইণ্ডস্ক্রিন

অন্ধকার সরে গেলে রহস্যহীন, চাঁদ ঝরে পড়ছে অসময়ে
স্বপ্নে পাওয়া মুখ সহযাত্রিণী—খরগোশ হয়ে যায়

## অদ্ভুত এবং অদ্ভুত

সিদ্ধার্থ সিংহ

ভারী অদ্ভুত, এত বড় একটা দেশ অথচ একটাও বাচ্চা নেই!

আমগাছে জামগাছে কেউ ঢিল ছোঁড়ে না
ফড়িঙের পিছু পিছু ধাওয়া করে না কেউ
কেউ আর বৃষ্টিতে ভেজার জন্য বায়না করে না

এত বড় একটা দেশ, অথচ একটাও বাচ্চা নেই।
জন্মেই সবাই ছুটছে
ছুটছে পিঠে বোঁচকা নিয়ে স্কুলে, সাঁতারে, আঁকায়, গানে, ক্রিকেটে
এবং আকাশে
একদম রুটিন মেনে, অঙ্ক কষে—

ছবির মতো এত বড় একটা দেশ, অথচ একটাও তুলি দিয়ে আঁকা রঙচঙে
বাচ্চা নেই।

## উত্থানপর্ব

বিকাশ গায়েন

মূর্খ তুমি ইশারা বোঝ না : বলে সেই যাকে
বন্ধুরা দিয়েছিল খেলা থেকে বাদ
মাঠের বিকেল থেকে ফিরে এসে একা একা
অন্ধকার ঘরে আকাশ-পাতাল ভেবে
খুঁজেও পায়নি সে কীভাবে
বলের চামড়া তুলে, পিচ খুঁড়ে, ক্যারমের লাল ঘুঁটি
চকিতে সরিয়ে জয়ী হওয়া যায়।

সেই সে যে ঘরে বাইরে তাচ্ছিল্য কুড়িয়েও
সতীর্থরা খাতা থেকে টুকে টুকে নম্বর বাড়ানোর
চোরাগোপ্তা রাস্তায় হাঁটেনি কোনদিন
গোপাল সুবোধ বড়—প্রথম ভাগ পড়া মুগ্ধতায়
থেকে গিয়ে ছাপার অক্ষরে লেখা কোনদিন
সে তো কোন অন্যায় পড়েনি!

আজ যদি
'ঠকে গেছ-ঠকে গেছ' বলে সকলেই বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—

সেও তো মানুষ! তারও কাটলে ব্যথা লাগে,
রক্ত পড়ে।
খোল-নলচে বদলিয়ে আজ সেই মহল্লা শাসায়
নষ্ট হয়ে গেছি, ভাল থাকতেও তো দিলে না।

## জলের শব্দ
### চিত্রা লাহিড়ী

শাখাপ্রশাখায়
অজস্র জোনাকির শব্দ
নুয়ে পড়া রাতে
দুলে ওঠে ভূমি
নদীর ভেতর অবিরাম টুং টাং

অঝোর কুয়াশায়
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ভেসে আসে
সোনা-রঙ রেখা
শিমুলের ডালে
একা রাতপাখি বসে থাকে
মৃদু অন্ধকার নেমে আসে
পাতার ছায়ায়

শীতের সময় এখন
রেখাচিত্রে মুক্তি খোঁজে মরা বালিয়াড়ি
চক্রকারে পাখি ওড়ে শস্যখেতে
পালক ঝরে
জলের মধ্যে ঘুরে মরে শোকে
অজস্র জলের শব্দ

# তিনি ঢুলছেন

## সুজিত সরকার

তিনি এখন সত্তর পেরিয়েছেন। স্ত্রী মারা গেছেন পাঁচ বছর আগেই। দুই মেয়ে, তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন। ছেলে নেই। সকাল ন'টায় এক মহিলা এসে দু'বেলার রান্না করে, বাসন মেজে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, এলোমেলো বিছানা আবার ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। তারপর তিনি একা, সারাদিন একা, তীব্রভাবে একা। আমি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী। কিছুটা দূরত্ব থেকে লক্ষ্য করি তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন।

সার্কাসে, শায়িত বাঘের শরীরে মাথা রেখে মেয়েটি যখন শোয়, সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে আমি আড়চোখে চেয়ে দেখি : তিনি ঢুলছেন!

প্রেক্ষাগৃহে, নাটক যখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে, দর্শকেরা উত্তেজনায় টানটান, আমি কোণাকুণি সিট থেকে লক্ষ্য করি : তিনি ঢুলছেন।

টিভিতে তাঁর যৌবনের প্রিয় নায়িকা নাচছে, গাইছে। আমি অন্ধকার বারান্দা থেকে তাঁর আলোকিত ঘরে তাকিয়ে দেখি : তিনি ঢুলছেন।

তাঁকে দেখতে দেখতে মনে হয় : ফাঁকা একটা বাড়ি, বাইরে তালা ঝুলছে, ভেতরে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে ফোন, দেয়ালঘড়ির কাঁটা ঘুরছে।

# ঘর

## দীপশিখা পোদ্দার

সারারাত ধরে আমাতে খনন কার্য চালিয়েছ তুমি
দরজা ভেঙেছ, সম্মতি চাওনি; একটি একটি করে
জানলা কপাটহীন করেছ আমাকে।
উপকরণের জোরে মেঝে খুঁড়ে খুঁড়ে জানতে চেয়েছ—
এ ঘরের ইতিহাসে কোন দাগ আছে কিনা।
আমি ত্রস্ত বিনত তাই নীরবে ভেঙেছি। ভেঙেছি,
কেননা, প্রাচীন মাটিকে আজও ছুঁয়ে আছে এ ঘরের পিতৃপুরুষ

তবু দেখো, একদিন অট্টালিকা হবো আমি। গাঢ় ঝরনার মত
মেলে দেব জানলা দরজা সব।
সেইদিন, আমাকে ভাঙতে হলে
অন্য প্রযুক্তিতে তোমাকে নির্মিত হতে হবে।

## যারা জেগে আছে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

যারা জেগে আছে তাদের এখন ঘুমোতে ডাকি
যাদের ডেকেছি তারা বিজয়ীর মতো
কুর্নিশ জানাবে এমন ভাবা যাবে না
সব অনির্দেশ কথার ভিতরে
আড়ালে কেউ ডাকছে
দুঃখ ভেঙে পড়ছে প্রপাতের মতো
ধ্বংসের স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে সবাই
মৃত্যুর শিখর থেকে ফিরে আসতে চাইছে

তুমি কার চোখের ভিতরে আগুন দেখেছো
নিঃসঙ্গতার ভিতরে বিজয়ীর মতো
সবাই তো ফিরবে না
মনে পড়ছে অন্ধকারের দিনগুলি
কবন্ধের শীৎকারে কেউ কেউ গুটিয়ে যায়
কেউ আলোকবর্ষ পেরিয়ে
জীবনের জয়গান শুনতে শুনতে
চোখ বুজে ঘুমের ভিতরে
ডুবে যেতে থাকে

## গ্রামের মুখ

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

গ্রামের নাম নুনহণ্ড
মেদিনীপুরে অজ পাড়াগাঁ
ধানের ক্ষেত চাষের জমি
পানবরজ বাঁশের ঝাড়
মাটি লেপানো তেতলাবাড়ি
সব কিছুতে ওদের হাত
সেই হাতেরই বৃষ্টি, জলে,
সেই হাতেই শস্য ওঠে

মানুষগুলো সরল-সাদা;
খোয়া বেরানো রাস্তা বেঁকে

চাঁদের আলো ঝিকমিকিয়ে
পচাপুকুরে—স্বাস্থ্য নেই
দূরে কোথায় পানীয় জল
কলস কাঁখে আনতে হয়
অতিথি এলে স্নানের জলে
রোদ লুকোয় নুনহুণ্ড

নিয়ন আলো পৌঁছায়নি,
সভ্যতার অন্ধকার
আজকে দেখি নয়ন তুলে
স্তব্ধবাক গ্রামের মুখ

## যতটুকু থাকি
**জয়তী রায়**

যতটুকু থাকি,
হাঁসের পালকে ঢেকে রাখি
যাবতীয় প্রখর সংবাদ,
মুহুর্মুহু আগুনের শ্বাস
তোমার শিশিরপাতে ঢেকে দেবে
এই আশ্বাস।

তুমিও তো চড়ুই-এর ভাঙা বাসা
হাতে নিয়ে বসে আছ
গভীরে আশ্লেষে,
যেন এই নীলমাঠ ভরে যাবে
সূর্য বিভায়,
সব জট খুলে দেবে
খেলাচ্ছলে বালক বাতাস :

এই আকিঞ্চনে বেঁচে থাকা
জেগে থাকা সমস্ত সময়,
ঘুমোবার অন্ধ রাত, খিন্ন দিন
অনুনয়ে ভরে থাকে
ভিখিরি সঞ্চয়,

তবু মনে হয়,
কুয়াশাপ্রবণ এই সকালের রোদ
জলের সরের মত
ছায়াস্তর তুলে নেবে
কোন এক বিকেলের মাঠে।

## হ্রদের ভাষা

**বিশ্বজিৎ রায়**

অবলোকন ছিল, তুমি চিনে নিতে পারনি
পাহাড়ঘেরা সেই নিরুচ্চার হ্রদের ভাষা।
ছুঁতে পারনি ব্রেইল অক্ষরের বর্ণলিপি
গাঁথা ছিল যা স্বচ্ছ আঁশঘরে।

সাতরঙ পালকছটা দেখিয়েছ তোমার
শুনিয়েছ ঝুরি নেমে আসা আর্তনাদ,
তাই দ্যাখো, বেহালার ছড় কেমন খেলে যাচ্ছে
এই বুকের ওপর, রক্তপাতহীন।

রাত্রি তবু জেগে থাকে ম্লান,
তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে ঋদ্ধ দার্শনিক
উত্তরের জানালা খুলে।
একদিন দেখো, ঠিক ফুটে উঠবেই
এই শান্ত হ্রদের ভাষা সাদা দেওয়াল জুড়ে
তোমার, কোনও একদিন।

## কাঁখের কলস

নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড় শুনতে শুনতে কেটে গেলো বেলা
শুকনো ডালপালা—কান্নার নুন
আহত দিনের সব অহংকার বেচে
কেটেছে বেলা, একেলা একেলা।
কেউ ডাকেনি জল ভরার ছলে
কেউ ডাকেনি হাত খোঁপার আড়ালে
এভাবেই পারাপারহীন
আমার নাকছাবি সিন্দুকেই আছে
নূপুরেরাও রুমঝুম যায়নি ঘাটে
কাঁখের কলস নিঝুম বসন্তে একা।
এসব কথা বলার বয়স
ফুরিয়েছে এবার
কর্ণপাতহীন ঝমঝম বৃষ্টিধারা
পালতোলা নৌকো ছিল স্বপ্নে ভরা
পলাতকা দিন
সত্যি তোমাদের ইচ্ছে করেনি
কোনোদিনও ইচ্ছে করেনি জানতে—
মৃত্যুর দিকে কেন ছুটে যায়
কাঁখের কলস একা।

## হেমবার্তা

রেণুকা পাত্র

কে এলো তোমার কাছে
হেমবার্তা নিয়ে
সংগ্রাম শুধু অচঞ্চল
বিস্ময়ের সীমারেখা টেনে
প্রত্যুষ-গড়ানো-রোদে
জীবনের অঙ্গীকার।

মহাযোগ পণ্ড হয়
সময় ফুরানো পথে

একা একা বাড়ি ফেরা, কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা নিলে
তুমি আর আসবে না ফিরে
অচেনা শিবিরে।

রক্তঋণ, মনোভূমি করে তোলপাড়
এভাবে হয় না শোধ
আরও একবার ফিরে যেতে হবে
যেখানে মানুষ, মানুষের মত
কথা বলে।

## নির্জনতর

**শতরূপা সান্যাল**

এত বড় শহর পারেনি
পেতে দিতে পিঁড়ি বা আসন
একটু নিরিবিলির মাদুর
দু-একটা আয়েসী কুশন।

অজস্র ভীড়ের মধ্যে থাকি
তবু যে ধু ধু একা মাঠে
তালগাছ একপায়ে একাকী
কোলাহলে নির্জনতা হাঁটে।

এত বড় শহর বিস্মৃত
একটুকরো কালো মেঘ ছায়া
অঝোর শাওনও ভুলে গিয়ে
আব্রুহীন অলজ্জ বেহায়া!

আমাদের জন্য কেউ দেবে
নীল তাঁবু সবুজ বিছানা
কুয়াশার মায়াবী মশারি
এতটুকু বাসার ঠিকানা।

## একটি কবিতার জন্ম

**শঙ্কর বসু**

নাভিতে করবীফুলের গন্ধ মেখে
জ্যোৎস্নার ঘোরলাগা গাছেরা যখন এ ওকে চুমু খায়
তখনই মেঘ থেকে ঝাঁপ দেয় দু'ফোঁটা বৃষ্টি
তখনই পাতাগুলো দোল খায় আপন খেয়ালে
তখনই শরীরে শিহর জাগে খিলখিল শিশিরে

ক্যালেণ্ডারে সূর্যমুখী দেখতে দেখতে
আমি শস্যক্ষেতে ঢুকে পড়ি, তারপর
মাটিতে কান পাতি—
মাটির স্পন্দন আমার বুকে মেশে
আর ঠিক তখনই,
একটি নিটোল কবিতা কোটি জলের ফোঁটা হয়ে
লেখার পাতায় টুপ করে ঝরে পড়ে।

## প্রদীপতলায় অন্ধকার

**বিকাশ নায়ক**

রোদ্দুর, ও পুরনো দেশের। ঝাঁপাও এসে একটিবার।
ঝাঁপাও তো আজ প্রদীপতলায়। খুব জমেছে অন্ধকার।
হারিয়ে গেছে টুকুন-টুবাই। এক্কাদোক্কা। প্রদীপতলায়।

গল্পবলা-ঠাকুমা ওই হেঁটে যাচ্ছেন। ভর। মাত্র গাছের ডাল।
হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে দিগ্বিদিকশূন্যপুর—
গল্পগুলো সমস্ত যেই হচ্ছে ধুলো হচ্ছে বালি।
অমনি হঠাৎ দমকা-ঘূর্ণি। এক ঝটকা। উড়িয়ে দেয়।
ওড়াচ্ছে ওই ওড়াচ্ছে ওই। ফেলল এনে প্রদীপতলায়।
শর্বরে। আর সঙ্গে সঙ্গে। ধুলোবালি। মানে গল্পাবলি।
ব'নে যাচ্ছে। মুঠো টুকুন, মুঠো টুবাই। মুঠো টুকুন, মুঠো টুবাই...

ওরে মুঠো। ও টুকুন। ওরে ধুলো। ও টুবাই। জাগ রে জাগ।
লাফিয়ে পড়। দেদার লাফ। টুলটুলে পা'য়। ভাগ রে ভাগ।
'পশ্চিমে নয়, পূবের দিকে'। ভাগ রে ভাগ। জাগ রে জাগ।

## কাচঘর থেকে

সুবীর মণ্ডল

এই যে সাঁতারে যাই
জল ভাঙি, মুখে বুদবুদ

কাচের দেয়াল তাই
ভুল বোঝে—রঙীন জীবন

আদতে রক্ত ঝরে
টের পাও? মানবাধিকার

ভোর যদি মীমাংসা
শবদেহ ভেসে ওঠে কার!

## রণজিৎ সিংহের অপ্রকাশিত কবিতা

### নদীর মানুষের গান

অবসরের বেলায় চুপ করে গাছের পাতারা
চৈত্রের আকাশ ভরে তারায় তারায়
কইনা এখন গায়

নদীর উঠোনে ঘর বাঁধা আমাদের
বারবার উঠে আসা
ফের ঘর বাঁধা
আমাদের ফিরে যাওয়া নদীর উঠোনে

মাটি থেকে সুর জাগে
ধানের খামার থেকে জেগে ওঠে নাচ
ব্রহ্মপুত্র বহমান

আমাদের পায়ে পায়ে তারাদের অন্তহীন চলা

---

মৃত্যু—২৯ জুলাই ২০০১

# মাত্মপ্রতিষ্ঠাম্ : হিরণকুমার ও একটি বীজমন্ত্র

স্বপন মজুমদার

একটা গোটা শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত একজন মানুষকে ডাকনামে চেনে, প্রায় ভুলে যায় তার ভালো নাম; তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে গোপন ক'রে চলেন তাঁর সবরকম কৃতিত্বের কথা, তাঁর গুণী ও ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচিতবর্গের প্রসঙ্গ; তাঁর বাস যেখানেই হোক্—বাদুড়বাগান, একডালিয়া বা গড়িয়া—সে-পাড়ারই প্রধান সামাজিক হয়ে ওঠেন তিনি রিক্সাচালক, দোকানি থেকে শহরের কৃতবিদ্যরা প্রসন্ন হয়ে ওঠেন তাঁর দর্শনে; পাড়ার মস্তান তাঁকে দেখে সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়; তাঁর অবারিতদ্বার আবাসে অনায়াসে উপস্থিত হতে পারে যে-কেউ, প্রাতরাশের আগে বা নৈশাহারের পরে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে আন্তরিক আতিথেয়তা; তাঁর থেকে বছর চল্লিশ বড়ো প্রাজ্ঞজন থেকে অর্ধশতাব্দী ছোটো অর্বাচীন পর্যন্ত সকলেরই তিনি মিত্র, এমন অজাতশত্রু মানুষ বিংশ শতাব্দীর কলকাতার ইতিহাসে সম্ভবত একজনই ছিলেন, তিনি হিরণকুমার সান্যাল—অগ্রজ ও সমবয়সীদের 'হাবুল', অনুজদের হাবুলদা বা হাবুলমামা।

হাবুলদা পরিহাস ক'রে নিজেকে বলতেন চিড়িয়াখানার মানুষ। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা রামব্রহ্ম সান্যাল; খুল্লমাতামহ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। বিবাহসূত্রে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী-জামাতা, হেমলতা সরকারের কন্যা মীরাদেবীর স্বামী। জন্ম ও বন্ধুসূত্রে হাবুলদার জীবন গ'ড়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে। তাঁর সমসাময়িক অনেকেই ব্রাহ্ম পরিচয়কে আভিজাত্যের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মনে করতে ভালোবাসতেন। তাঁরা দুই বন্ধু : সুশোভন সরকার আর হাবুলদা কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের গোষ্ঠিবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণই মুক্ত ছিলেন। এমন-কি ব্রাহ্ম কোন-কোন আরোপিত আচার-আচরণ বিষয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করতেও ছাড়তেন না। তবে ছাত্রবয়সে তাঁদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল, নবীন বাঙালি সমাজের উজ্জীবনে তরুণ ব্রাহ্মদের ভূমিকা হবে পথপ্রদর্শকের। সে-বিশ্বাস অবশ্য অপনীত হয়েছিল অচিরেই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ সঙ্গতে গুরুচরণ মহলানবিশ বিষয়ে বর্তমান স্মৃতিচারককে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেছিলেন পুলিনবিহারী সেন। প্রথম যৌবনে এমন সম্মানে বিহ্বল হয়ে আমি যখন গুরুচরণ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে পুরনো ব্রাহ্ম সংবাদ-সাময়িকপত্র আর অভিলেখসামগ্রী সন্ধান ক'রে অনেকটা আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করেছি, সুশোভনবাবুকে শোনাচ্ছি আমার অভিযান-কাহিনী, হাবুলদা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশুনো তো অনেক করেছ, ব্রাহ্ম কুম্ভকটা রপ্ত করেছ তো? আমি বিভ্রান্ত; সুশোভনবাবু নিশ্চিত বুঝেছিলেন, কোন রঙ্গ-বক্রোক্তি আসন্ন, মৃদু হাসি খেলে গেল তাঁর চাপা অধরোষ্ঠে। যেন বন্ধুর প্রত্যাশিত সম্মতি পেয়ে হাবুলদা বললেন, চোখ বন্ধ ক'রে শরীর নিস্পন্দ রেখে নিঃশ্বাস নেওয়াটা অভ্যাস করেছ তো? ততক্ষণে কৌতুকটা বুঝতে পেরে তার নির্গলিতার্থ জানার জন্য আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। দুই বন্ধু মনে করতে থাকলেন, সমাজের কোন্ আচার্য কখন অনিবার্যভাবে চোখ বুঁজে থাকতেন, কখন দক্ষিণে বা বামে একটি চোখে লক্ষ্য ক'রে নিতেন পারিপার্শ্বিক, কখন আধোনিমীলিত লোচনে প্রসন্নতার দৈববিভা ছড়িয়ে দিতেন

মুখমণ্ডলে। একটু পরেই অবশ্য সুশোভনবাবু বিশ্লেষণ করতে শুরু করতেন কেন ও কীভাবে তরুণ ব্রাহ্ম আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য করা নিয়ে নবীন ও প্রবীণদের বিরোধ, প্রায়-রুদ্ধ একটি সমাজে আত্মীয়সম্পর্কের মধ্যে প্রণয়ের স্ফূর্তি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁদের সংশয়ী ক'রে তুলেছিল।

হাবুলদার বা সুশোভনবাবুর কথা বলতে গেলে অন্যজনের কথা না-ব'লে পারা যায় না। সমকালীন শুধু নয়, সহপাঠী দুই বন্ধুর এমন অনাবিল মধুর সম্পর্ক এখনকার তরুণদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা, বন্ধুর জন্য বন্ধুর গর্ব, সুশোভনবাবুর কৃতিত্বভাস্বর সফলতা ও সেই তুলনায় হাবুলদার ঈষৎ ম্লান কর্মজীবন; একজনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত জীবনশৃঙ্খলা আর অন্যজনের অভিমানী বাউলস্বভাব—এই আপাতবৈষম্য সত্ত্বেও অপরাপরের অনুভূতি, জ্ঞান, বিশ্বাস আর বোধের প্রতি সম্মান আমাদের তরুণবয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল। গভীর সাহিত্যপাঠ সত্ত্বেও সুশোভনবাবুর পরম নির্ভরতা ছিল হাবুলদার সাহিত্যরুচিতে; আবার চিন্তাচেতনার স্রোত-উপস্রোত তাঁর নখদর্পণে থাকলেও হাবুলদা সুশোভনবাবুকেই মনে করতেন যথার্থ অধিকারী। রুচির ক্ষেত্রে তাঁদের দু-জনেরই কর্ষিত আভিজাত্যের দূরত্ব ছিল। জন্ম ও বিশ্বাসের সূত্রে তাঁরা যে-বলয়ে লালিত হয়েছেন বা নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন যে-ক্ষেত্রপরিধি, এই অন্তর্গত আভিজাত্যের বোধ সেই বৃত্তসীমায় আবদ্ধ রাখতে পারেনি তাঁদের।

আমার মনে হয়, তাঁদের ব্রাহ্ম বিশ্বাসই একসময় পাত্রান্তরিত হয় মার্কসীয় বিশ্বাসে। সুশোভনবাবুর অপ্রকাশিত দিনলিপিতে এই পরিবর্তনের অন্তর্বয়ান ধরা আছে। হাবুলদা নিজের বিষয়ে কোন আত্মবয়ানই লিখে যাননি; কিন্তু তাঁর বন্ধুজনের স্মৃতিকথায় নেপথ্যস্থিত আমিটির চেতনাপ্রবাহের পথবদল অস্পষ্ট নয়। কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে তাঁরা নায়ক হিসেবে বরণ করেছিলেন তাতাদা (সুকুমার রায়) ও ভুলদাকে (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ)। সুকুমারের অকালমৃত্যু আর প্রশান্তচন্দ্রের প্রতিষ্ঠান-গঠনের বিভোরতা ব্রাহ্মসমাজের পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা বিলুপ্ত ক'রে দিল অনতিবিলম্বে। তাঁদের বছরে তিনবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অনুষ্ঠান, জাতীয়তাবাদী শিক্ষার অভ্যুত্থানের মধ্যে সমাধ্যায়ীদের চোখে সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার লজ্জা-অপমান-মিশ্রিত শ্রেয়োবোধ, সেই দুর্গের বাইরে বামপন্থী চিন্তাধারার বিস্তার তাঁদের কৌতূহলী করলেও সামাজিক দায়িত্ববোধের উন্মেষ তাঁদের কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করাতে পারেনি। ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত সমাজসংস্কারের তাত্ত্বিক ধারণাগুলি ক্রমে সমীপতা খুঁজে পেয়েছিল বামপন্থী গ্রাম-পুনর্নির্মাণ ও নিম্নবর্গের উন্নয়নের আদর্শে।

সুশোভনবাবু বিলেত থেকে মার্কসবাদী বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। হাবুলদা মজা ক'রে বলতেন, নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁকে কম্যুনিস্ট হতে জপিয়েছিলেন, কিন্তু অত ফিটফাট ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে নিজে শেষপর্যন্ত ও-পথে বেশিদূর এগোননি। চেলাও এ-বিষয়ে গুরুমারাবিদ্যে আয়ত্ব করতে পারেনি।

কম্যুনিস্ট : এই আদর্শ ও ভাবনা বিষয়েই অসীম শ্রদ্ধা ছিল হাবুলদার। চতুর্দিকে আত্মঘোষিত বহু কম্যুনিস্টকে তিনি বলতেন 'কম্যুচম্যু'। তিনি মনে করতেন, যথার্থ কম্যুনিস্ট হতে গেলে যে-আত্মশাসনের প্রয়োজন, কোন প্রত্যেক বুদ্ধ বা নিবিষ্ট গান্ধিবাদীর থেকে তা কোন অংশে কম নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কম্যুনের আদর্শ মিলতে পারে, মেনে নিতে পারতেন না হাবুলদা। প্রয়োজনকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা কম্যুনিস্টের প্রধান কর্তব্য, শুধু

তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাসই করতেন না, নিজের জীবনেও যথাসাধ্য পালন ক'রে চলতে চেষ্টা করতেন। বিষয়-সম্পত্তি বিষয়ে তাঁর কোন ধারণা ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটাই নির্লিপ্ত রাখতে চেষ্টা করতেন নিজেকে যে তার জন্য আঘাত স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন সহজে; সে-কথা তাঁর মুখ থেকে বিশেষ কেউ শুনেছেন ব'লে জানি না।

৭০ দশকের গোড়ায় যখন কম্যুনিস্ট জীবনযাপন আর চিন্তাচেতনায় ফারাক নিয়ে তরুণ তুর্কীর দল উচ্চকিত, হাবুলদার মতামত ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, কম্যুনিস্ট আন্দোলন সমাজের বহু স্তর জুড়ে ব্যাপ্ত হ'লেই একমাত্র সফল হতে পারে। শুধু গ্রামের মানুষ বা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মহাজন মনে করলে তার খণ্ডতা অনিবার্য। সে-ক্ষেত্রে প্রবণতা আর দক্ষতা দিয়েই নির্ধারিত হওয়া উচিত কোন্ বর্গের কোন্ ক্ষেত্র কার জন্য নির্দিষ্ট হবে। তার অন্যথা হ'লেই বরং হবে শৌখিন মজদুরি। (শৌখিন মজদুরি শব্দবন্ধে পৌঁছেই অবশ্য হাবুলদা অনিবার্যভাবে চ'লে যেতেন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে, তাঁর সমাজবোধ আর রাজনৈতিক ভাবনার আধুনিকতার কথায়।) সুশোভন যদি গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক ইস্কুলে পড়ায় আর অমুককে বলা যায় ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা বিষয়ে মার্কস্ আর এঙ্গেল্‌সে কোথায় তফাৎ বা কেন, সে-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে, তাহলে যা হবে আর-কি!

মার্কস্‌বাদে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস তাঁর অনড় থাকলেও, তার প্রয়োগ বিষয়ে দ্বিধা দেখা দিচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। হাঙ্গারির ঘটনায় প্রথম হয়তো অস্পষ্ট সংশয় তৈরি হয়েছিল। পক্ষে-বিপক্ষে তর্কতালাশের প্রয়োজন যে আছে, বুঝতে পেরেছিলেন ভেতরে-ভেতরে। কিন্তু নিতান্ত বিহ্বল বোধ করেছিলেন চেকোস্লাভাকিয়ার পর। দেশের বাইরে এই দুটি ঘটনা আর দেশে চীনের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ আর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দলভাগ তাঁর বিশ্বাসের মূলেই আঘাত করেছিল। উদারনৈতিক মানবতারই চূড়ান্ত লক্ষ্যে যে পৌঁছতে পারে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাও—এই বিশ্বাসই যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল তখন।

এমন পরিস্থিতিতেও তরুণ প্রজন্মের ওপর বিশ্বাস হারাননি হাবুলদা। 'পরিচয়ে'র তখনকার সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কম্যুনিস্ট নববিধানের আশ্বাস। শেষজীবনের সুশোভনবাবুর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষে শিকড় খুঁজে পেতে হ'লে সাম্যবাদকেও এ-দেশের মানুষ আর মাটির সঙ্গে মিলিয়ে না-নিলে যাত্রার সাজের মতো সমাজদেহের সঙ্গে তার মিল হবে না। ধর্মের পৌত্তলিক অনুষ্ঠান না-মানতে পারলেও, ধর্মের আধ্যাত্মিক অনুভবকে অস্বীকার করা বা আঘাত করাকে তিনি মনে করতেন এ-দেশে সাম্যবাদী চিন্তাবিস্তারের অন্যতম অন্তরায়। আস্তিকতাকে তিনি সম্মান করতেন; যদিও বিশ্ববিধান বিষয়ে তিনি প্রশ্নহীন হতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। গৃহিণী মীরাদেবীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর কপটক্রোধী তর্ক শুনেছেন অনেকেই। আমার মনে হ'ত, হাবুলদার আস্তিকতা কোন ধর্মীয় অনুভূতি থেকে পাওয়া নয়, সাহিত্য থেকে—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ থেকে—পাওয়া।

হাবুলদা যে রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত প'ড়ে ফেলেছিলেন বা বন্ধু অমল হোমের মতো গ্রাহকমহার্ণব ছিলেন, তা হয়তো একেবারেই নয়। গদ্যের তুলনায় কাব্যের, নাটকের তুলনায় নৃত্যনাট্যের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল বেশি। সুশোভনবাবু, সুধীন্দ্রনাথ বা আইয়ুবের মতো তাত্ত্বিকভাবে নিজের মতপ্রতিষ্ঠাও তিনি হয়তো করতে পারতেন না। করতে গেলে তাঁর রুদ্ধওষ্ঠ উচ্চারণ আরও বৃদ্ধি পেত, মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠত। সাহিত্যের ভোজে তিনি

ছিলেন রসভোগী, পরিমাণে তাঁর আগ্রহ ছিল না, রুচি ছিল না তত্ত্বে; তিনি বিভোর হতে জানতেন ছন্দের মন্ত্রে, শব্দের জাদুতে, চিত্রের বর্ণিলতায় আর ভাবের ব্যঞ্জনায়। সে-তৃপ্তির মুহূর্তে তাঁর মুখে ভেসে উঠত এক অপ্রাকৃত সারল্যময় সৌন্দর্য।

অথচ রঙ্গে-ব্যঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারত তাঁর রসনা, এমন প্রমাণ অজস্র ছড়িয়ে আছে তাঁর অগ্রন্থিত অসংখ্য লেখায়। শোনা যায়, বিশ্বভারতী ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট : দুই কর্মক্ষেত্রেই তাঁর কথা বুঝে ওঠা কঠিন হ'ত সতীর্থ অনেকের পক্ষেই। এবং প্রতিষ্ঠান-প্রধানের কাছে পল্লবিত হয়ে সে-অনুযোগ পৌঁছতে বিলম্ব হ'ত না। একমাত্র 'পরিচয়ে'র সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য। প্রায় সূতিকাগার থেকে অজ্ঞাতবাসের পর্ব পেরিয়ে তার প্রতিষ্ঠার গৌরবকাল পর্যন্ত প্রযোজক রাজনৈতিক গোষ্ঠি থেকে নিয়ত পরিবর্তমান সম্পাদককুল : সুধীন্দ্রনাথ-গোপাল হালদার-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেরই শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অপর্যাপ্তভাবে পেয়েছিলেন হিরণকুমার। তিনিও শাসনে-মমতায় তাকে সঙ্গ দিয়েছেন সময়-অসময়ে।

যিনি মানবিক ও সাহিত্যিক প্রায় সব বিষয়েই ছিলেন অসামান্য সহিষ্ণু, এমন-কি প্রশ্রয়প্রবণ, 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র সম্পাদক ও লেখকদের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল গভীর ও অনমনীয়। এঁদের অনেকেই তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ৪৬ নম্বরে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘে। কিন্তু মনে হয়, সে-সহাবস্থান অন্তত তাঁর পক্ষে ছিল নিতান্তই সমশত্রুর বিরুদ্ধে, একান্ত সাময়িক। এই একটি প্রসঙ্গে তাঁর ঔদার্যের ঊনতা দেখেছি। কিন্তু তার জন্য লজ্জিত ছিলেন না তিনি বিন্দুমাত্র। এমন-কি সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'কেও যেন তিনি গ্রেসমার্ক দিতে রাজি হতেন, কিন্তু ঐ-পত্রিকাত্রয়ী বিষয়ে নৈব নৈব চ। এর কারণ কী ছিল, কোনদিন প্রকাশ করেননি, কিন্তু তাঁর বিরূপতাও গোপন করেননি।

কলকাতার খাওয়াদাওয়া, শুধু কলকাতা কেন, বাঙালির ভোজন, পরিবেশন, ভোজনালয় বিষয়ে যেমন ছিল তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা, তেমনি ছিল অনুরাগ। রাধারমণ মিত্র যখন পায়ে হেঁটে কলকাতার পাথুরে বিবরণ সংগ্রহ করছেন, হাবুলদার সঙ্গে দেখা হ'লেই জানাতেন সদ্য সন্ধান-পাওয়া, উঠে-যাওয়া কোন রেস্তরাঁর কথা। কথাশেষে হাবুলদা বলতেন, চলুন এবার এখনও-আছে এমন কোথাও ভোজন-ভজন করি। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিপ্রপদে উল্‌টো দিকে হাঁটা দিতেন রাধারমণদা। খাদ্যরসিক হাবুলদা কিন্তু ছিলেন বেশ মিতাহারী। ধর্মতলায় পুরনো কমলালয়ের ভেতরে চায়ের দোকান, জ্ঞানবাবুর দোকান বা ফ্রেণ্ডস্ কেবিন তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন গোত্রের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার ঠিকানা ছিল। ট্যাংরার চীনে আর টেরিটি বাজারের তিব্বতী-চীনে খাবার, তার ঘর-সাজানো আলোর তফাৎ লক্ষ্য করতে এতটাই তন্ময় থাকতেন তিনি যে পরিবেশের অপরিচ্ছন্নতা তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করত না। খাওয়ার চাইতে খাওয়ানো, তার থেকে বেশি আড্ডাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। সুনীতিবাবু আর হাবুলদাকে যাঁরা এক আড্ডায় দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, তথাকথিত অপ্রয়োজনের কথায় তাঁদের কী আনন্দ ছিল। সাঙ্গুভ্যালি যে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি করে না, তার পেছনে আছে এক দর্শন এবং স্বদেশী বা পার্টির অজ্ঞাতবাসের দিনে সংবাদ সংগ্রহ ও জ্ঞাপনে কী ছিল তার ভূমিকা, হ্যারিসন রোড-অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে কেন গ'ড়ে উঠেছিল এত বোর্ডিং আর লজ—কী তাদের তাৎপর্য : সামাজিক ইতিহাসের এই দিকগুলিই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু কথায় পণ্ডিতি বা তার ভাণ ছিল না ব'লে অনেকেই লঘু আলোচনা মনে করতেন এমন সংলাপকে। সুবীর

রায়চৌধুরী আর রাধাপ্রসাদ গুপ্তর সঙ্গে আমিও জুটেছিলাম সে-ইতিহাসকে সন্ধান করতে, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এক বছরের মধ্যেই চ'লে গেলেন সুনীতিকুমার আর হাবুলদা।

আমাদের সমাজে নিজেকে দামি ক'রে তোলার কিছু ভঙ্গি কিছু মুদ্রা আছে। হাবুলদা সে-বিষয়ে বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর ৭৫ বৎসরের জন্মদিনের আয়োজন নিয়ে কী-কী মন্তব্য হতে পারে তার যে-পূর্বাভাস তিনি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর লোকচরিত্র অনুধাবনের অভ্রান্ত পরিচয় ছিল। সে-বিদ্যা জেনেও তিনি তার প্রয়োগ করতে চাননি। বরং নিজের মাপ আর ওজন অন্যের কাছে পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা নিয়ে একটু যেন কুণ্ঠিত আর বিব্রতই থাকতেন হাবুলদা। কথা যদি কখনো ঘুরে যেত তাঁর প্রসঙ্গে রিক্সা-ট্যাক্সি-চলন্ত বাসে বা ট্র্যামে তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধান কৌতুকের সঙ্গে কখনো-কখনো আশঙ্কার কারণও ঘটাত। যে-সমাজ আর তার মানুষ নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি অপমান ক'রে চলেছে, সে-সমাজে হাবুলদার স্মৃতি মুছে যাবেই, যাওয়াই ভালো। তিনিও হয়তো তা-ই চেয়েছিলেন।

(হিরণকুমারের কিছু অগ্রন্থিত লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে' (প্যাপিরাস ১৯৯১)। সে-বইয়ের ভূমিকায় বলা কথাগুলি এখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। আগ্রহী পাঠক বর্তমান লেখটিকে তার ব্যক্তিগত অনুক্রমিকা মনে করলে নিশ্চিন্ত হব।)